অধ্যক্ষা মমতা অধিকারী
ইলা দাশগুপ্তা

উচ্চ মাধ্যমিক

গৃহ পরিচালনা ও গৃহ শুশ্রূষা

HOME MANAGEMENT & HOME NURSING

নিউ বুক এজেন্সী • কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত।

উচ্চ মাধ্যমিক

গৃহপরিচালনা ও গৃহশুশ্রূষা

[Home Management & Home Nursing]

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

মমতা অধিকারী এম. এ, জে. পি.

অধ্যক্ষা, বিহারীলাল কলেজ অফ্ হোম এ্যাণ্ড সোসাল সায়েন্স ; ডিন অফ্ ফ্যাকালটি অফ্ হোম সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; সদস্যা, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিণ্ডিকেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; Governing Council, International Federation of Home Economics.

ও

ইলা দাশগুপ্তা

ব্যারাকপুর গার্লস হাইস্কুলের গৃহবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা।

নিউ বুক এজেন্সী

১৮/বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীহেমচন্দ্র বিশ্বাস
১৮/বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৭৬

মূল্য ঃ উনিশ টাকা।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবুবিশ্বাস লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

নিবেদন

সুধীগণের বিশেষ অনুরোধে এবং নূতন পাঠক্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হতে পারে অনুমান করে এই পুস্তক রচনায় আমি ও শ্রীমতী ইলা দাশগুপ্তা যুগ্মভাবে প্রবৃত্ত হয়েছি।

উচ্চ মাধ্যমিকের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উপযোগী গৃহপরিচালনা ও গৃহ শুশ্রূষা সংক্রান্ত পাঠ্যসূচী রচনার কাজে বিশেষ ভাবে জড়িত থাকতে হয়েছিল। সুতরাং সেই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুস্তক রচনার অনুরোধ যখন এলো তখন আর দায়িত্ব এড়াবার উপায় খুঁজে পেলাম না।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সব সময়ই এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ভাল করে মনোমত পুস্তক রচনার সময়ের একান্ত অভাব।

তবে নূতন পাঠক্রম শীঘ্রই শুরু করা হচ্ছে এ জন্যে অতি অল্প সময়ে এই বইখানি লিখতে বাধ্য হয়েছি বলে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার সম্ভবনা আছে। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করবো। এই পুস্তকখানি যদি শিক্ষাবিদ, শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পারে তা হলে পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

বিনীত—

মমতা অধিকারী

১লা নভেম্বর, ১৯৭৬

কলিকাতা

SYLLABUS IN HOME MANAGEMENT AND HOME NURSING

(Elective)

Full Marks—200

PAPER I (Marks—100)

Home Organisation and Community Concept

A. Study of the House :

1. The family and its housing needs.
2. Selection and planning of a residential accommodation for different socio-economic levels.
3. Allocating rooms for different purposes.
4. Interior decoration and colour schemes.

B. A good home maker :

1. Planning and processing of daily duties of a home maker.
2. Care of a house-household cleaning—cleaning of furniture and household epuipment.
3. Study of household pests—their prevention and control measures.

C. Ths Art of Good Grooming and the Home maker :

1. Importance of clothing.
2. Errors in clothing.
3. Choice of clothes for different occasions according to age, sex, occupation and seasonal variations.
4. Dress designing and principles of clothing construction.
5. Selection of fabrics with emphasis on beauty, comfort, washability durability and ease of handling.
6. Renovation and remodelling of old clothes.

D. Knowing the Fibres for the Family :

1. Study of different textile including synthetic fibres.
2. Different methods of washing and finishing materials of different fibres.

E. Elementary Anatomy and Physiology of Human Body :

1. Elementary knowledge of the structure and functions of different systms of the human body.
2. Hygiene : (a) Air—its composition, impurities, ventilation.
   (b) Water—its sources, pollution and purification.

F. Care of the Child :

1. Place of a child in the home.
2. General management of the baby. Elementary aspects of growth and development of children.

G. Care of the Sick at Home :

1. Basic Principles of Home Nursing.
2. General care of the patient :
   (a) Selection of sick room and its other requirement.
   (b) Nursing of the patient at different age levels—Child, adult and old.
   (c) Sponging the patient.
   (d) Taking temperature and maintaining record charts.
   (e) Giving bed pan and changing bed.
   (f) Administration of food and drugs to patient.

H. Common Infectious Diseases :

1. Common childhood diseases.
2. Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases.
3. Preventive measures :
   (a) Early diagnosis.
   (b) Isolation.

(c) Notification.

(d) Quarantine.

(e) Disinfection (concurrent, terminal).

(f) Immunisation.

(g) Health education.

1. **Providing First Aid at Home :**

   1. What is First Aid and where it is applied.
   2. Simple bandaging.
   3. Storage of poisonous medicines at home.
   4. Maintaining a First Aid Box.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

— দ্বিতীয় খণ্ড —

প্রথম অধ্যায়

গৃহ সমীক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবার ও গৃহের প্রয়োজনীয়তা

আদিমতম যুগে এক সময়ে লোকে যাযাবর জীবন যাপন করিত, তখন স্থায়ী লোক-বসতি ছিল না। তাহারা প্রকৃতি-দত্ত ফলমূল, বীজ, লতাপাতা প্রভৃতি আহরণ করিয়া এবং পশুপক্ষী, মৎস্যাদি শিকার করিয়া উদরপূর্তি করিত। কিন্তু এই ধরনের খাদ্য-সংগ্রহ যেমন বিপদজনক তেমনই আবার অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা কেবল শিকার না করিয়া বন্য জীব-জন্তুকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিল। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতিকে পোষ মানাইয়া গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত করিত। পরে তাহারা কৃষির দিকে মনোনিবেশ করিল। কালক্রমে কৃষির উদ্ভাবন ও উন্নতির ফলে মানুষ স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করিল। মানুষ গ্রাম, নগর, জনপদ, রাজ্য, সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল; মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহনির্মাণ-প্রণালীও উন্নত হইতে উন্নততর হইতে লাগিল। আদিম যুগের চামড়ার ছাউনি, লতাপাতা দ্বারা নির্মিত কুটির নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিরাট অট্টালিকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্যবস্ত্রের মত বাসগৃহও একান্ত অপরিহার্য। গৃহ হইতেছে শারীরিক ও মানসিক শান্তির আকর। কর্মক্লান্ত দেহে মানুষ যখন তাহার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করে, নিরাপত্তার অনুভূতিতে নিমেষের ভিতর তাহার ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। কবির মত এই চিন্তাই তাহার মনে আসে—"There's no place like home". পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি লইয়া এই আশ্রয়স্থলটিই হইতেছে গৃহ। এখানে আছে স্নেহের বন্ধন, প্রীতির বন্ধন; তাই "Home, Home, Sweet Home".

গৃহ কি?

সকল দেশের সকল বাসগৃহ একরূপ নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উপকরণের প্রাচুর্য অনুসারে বাসগৃহগুলি নির্মিত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান অঞ্চলের সহিত গ্রীষ্মপ্রধান

অঞ্চলের বাসগৃহের গঠন ও নির্মাণ-কৌশলে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। স্থানের প্রাচুর্য ও অভাবও বাসগৃহের আকারে ও গঠনে পার্থক্য ঘটায়। শহরে বাসপোযোগী স্থানের অভাব থাকায় সেখানে যেমন বহুতল গৃহ নির্মিত হইয়া থাকে, গ্রামাঞ্চলে বাসপোযোগী স্থানের প্রাচুর্যের ফলে তেমনটি আর হয় না। যে অঞ্চলে বাঁশ বা কাঠ অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানে গৃহ-নির্মাণে বাঁশ ও কাঠের ব্যবহার খুবই বেশী। যে অঞ্চলে খড় সহজলভ্য সেখানে খড়ের ছাউনির ছোট বড় বাড়ী প্রচুর পরিমাণে চোখে পড়ে। আবার যে অঞ্চলে খড়ের অভাব, সেখানে টালি, টিন, খাপরা প্রভৃতি গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বা বরফ পড়ে, সেখানে বাড়ীর চাল ঢালু না করিয়া উপায় থাকে না। মানুষের আর্থিক সঙ্গতিও গৃহগুলির আকার, আয়তন, গঠনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেশে দরিদ্র লোকেরা যেখানে ক্ষুদ্র কুটিরেই জীবন অতিবাহিত করে, সেখানে ধনীরা আবার প্রাসাদতুল্য গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে।

গৃহের আকার-প্রকারের পার্থক্যের কারণ

পাকা বাড়ীর আকার ও গঠন রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পাকা বাড়ীর কথা ছাড়িয়া দিলে গ্রামে অবস্থিত বাসগৃহগুলিকে আকার ও গঠনের দিক হইতে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(১) আয়ত তলদেশ ও সমতল ছাদযুক্ত গৃহ; (২) আয়ত তলদেশ ও ঢালু চালযুক্ত গৃহ; (৩) চক্রাকার তলদেশ ও শঙ্কুবৎ চালযুক্ত গৃহ। ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যল্প, সে সকল স্থানে সমতল ছাদযুক্ত গৃহ দেখা যায়।

গৃহের দেওয়ালও নানা উপকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মাটির দেওয়ালের প্রচলন সর্বাধিক। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে মাটির দেওয়ালই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বনাঞ্চলে শালের বল্লা পাশাপাশি বসাইয়া দেওয়াল নির্মাণ করা হইয়া থাকে। যে-সব অঞ্চলে বড় বড় গাছের শক্ত কাণ্ড সুলভ, সেখানে কাঠের দেওয়াল দেওয়া হয়। কাংড়া, কুমায়ুন প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরনের দেওয়াল খুবই দেখা যায়। বাঁশ যেখানে সুলভ, সেখানে বাঁশ দিয়াও দেওয়াল নির্মাণ করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে কাঠের ফ্রেমে চেরা বাঁশের টাটি আঁটাইয়া সুন্দর দেওয়াল নির্মাণ করা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গের বহু উদ্বাস্তু পরিবার এই ধরনের গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন লক্ষ্য করা যায়।

দেওয়াল

গৃহের দেওয়ালের মতোই গৃহের চালও একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বাংলাদেশে গৃহের চাল সাধারণতঃ খড় ও ছন দিয়া ছাওয়া হয়। আজকাল টালি ও টিনের ব্যবহারও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে খাপরার ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়।

হিমালয়ের পর্বতাশ্রয়ী অঞ্চলে যেখানে শ্লেট পাথর পাওয়া যায়, সেখানে চালে শ্লেটের টালি ব্যবহৃত হয়। কোথায়ও কোথায়ও কাঠের টালি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে বাঁশ সহজলভ্য সেখানে মোটা ফাঁপা বাঁশ মাঝখানে চিরিয়া ও মাঝের গাঁটগুলি কুড়িয়া সাফ করিয়া তাহাকে খাপরার আকারে ব্যবহারের রীতিও দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে ঘাস, লতাপাতা ও নারিকেল পাতার ছাউনিও প্রচুর পরিমাণে চোখে পড়ে।

চাল ও ছাউনি

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলবায়ু বিভিন্ন প্রকারের ; এখানে বিভিন্ন স্থানে গৃহ নির্মাণের উপযোগী উপকরণের প্রাচুর্যের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। তারপর এখানে ধনবৈষম্যও অত্যধিক। ফলে গৃহের আকার, প্রকার ও আয়তনের যে অজস্র বৈচিত্র্য থাকিবে তাহাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও ইহার পরিকল্পনা

বাসগৃহ নির্বাচনের সময় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। বাজার, স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা প্রভৃতি যেন বসতবাড়ী থেকে দূরে না হয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা থাকা চাই। অপর দিকে বসতবাড়ীর নিকটে যেন গোরস্থান, শ্মশান, কলকারখানা প্রভৃতি না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও পরিবেশও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সমস্যাটি জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থানাভাব এই সমস্যাকে জটিলতর করিয়াছে। আমাদের দেশে অপরিচ্ছন্ন, অপরিসর, আলোবাতাসহীন ও স্যাঁতসেঁতে বাসগৃহের সংখ্যাই অধিক। ঐ সকল গৃহ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহের নিকট প্রায়ই খানা, ডোবা, দূষিত নালা-নর্দমা, জলাশয় ও বন-জঙ্গলাদি দেখা যায়। বাসগৃহের পরিবেশ ভাল রাখিতে হইলে ঐ সকল খানা, ডোবা ভরাইয়া ফেলা, নালা-নর্দমা ও জলাশয়গুলি পরিষ্কার রাখা এবং বন-জঙ্গল সাফ করা একান্ত প্রয়োজন।

বাসগৃহের স্থান নির্বাচন

উপযুক্ত একটি স্থান ব্যতীত বাসগৃহ নির্মাণের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যায়। শুষ্ক, উঁচু ও ঢালু জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত। নীচু জমি হইলে বসতবাড়ীটি আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে থাকিবে। ইহাছাড়া বাস্তভূমি যাহাতে ভরাটকরা জমিতে, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে, নদীতীরবর্তী এবং পলিমাটি-পূর্ণ স্থানে না হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বাসগৃহ শ্মশান, গোরস্থান, হাট-বাজার, কলকারখানা প্রভৃতির নিকট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়—ইহার ফলে মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হইয়া যায়, অপর পক্ষে স্বাস্থ্যের হানি ঘটে।

উপযুক্ত বাস্তভূমি

বাস্তভূমির জমি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে মৃত্তিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। বহুরকমের মৃত্তিকা আছে। মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে বালি, কাঁকর, কাদা ও খনিজ দ্রব্যের অনুপাতের উপর। বালির অনুপাত বেশী থাকিলে বেলে-মাটি, কাঁকড়ের অনুপাত বেশী থাকিলে কাঁকর মাটি, কাদার পরিমাণ বেশী থাকিলে এঁটেল মাটি এবং বালি ও কাদা সমান অনুপাতে থাকিলে দো-আঁশ মাটি বলা হয়। চূণের ভাগ বেশী থাকিলে চুণামাটি এবং লোহার ভাগ বেশী থাকিলে লালমাটি বলা হয়।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা বাস্তভূমির উপর নানাভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বেলে-মাটিতে জল সহজে শোষিত হয় বটে কিন্তু বেলেমাটিতে গৃহের ভিত কখনও দৃঢ় হইতে পারে না। কাঁকর-মাটিতে জল অপসারিত হইলেও স্থানে স্থানে জল আটকাইয়া যায়। এঁটেল মাটিতে নিম্নস্থ ভূমিতে জল জমিয়া থাকার ফলে গৃহটি স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠে। মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর অগভীর হইলে অপ্রবেশ্য স্তরের জল ভূ-পৃষ্ঠের জমিকে স্যাঁতসেঁতে করিয়া তোলে। সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় হইল তৈরী জমিতে বাড়ী নির্মাণ করা। সাধারণতঃ ভরাটকরা জমিতে অতি অল্পদিনের ভিতর বাড়ী নির্মাণ করা হয়—ইহাতে বাড়ী নীচের দিকে বসিয়া যায়, জমি আর্দ্র হয় এবং নানারকম দুর্গন্ধযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া গৃহের পরিবেশকে দূষিত করিয়া তোলে। এই কারণে নীচু জমি ভরাট করিয়া দীর্ঘদিন ফেলিয়া রাখিবার পর এই উপমৃত্তিকায় বাড়ী নির্মাণ করা নিরাপদ।

গৃহের গঠন ঃ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বাসগৃহ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এখানে পাকা বাড়ী বা অট্টালিকার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। পাকা বাড়ীর ভিত্তি তৈরী করিবার সময় প্রথমে ৩ ফুট গভীর করিয়া মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়।

দেওয়ালের বেধ পছন্দ অনুযায়ী হইবে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, দেওয়ালের বেধের চতুর্গুণ গভীর করিয়া দেওয়ালের মাটি খুঁড়িতে হয়। মাটিখোড়া গভীর অংশটি সিমেন্ট ও কংক্রীট অথবা খোয়া ও সিমেন্ট ভরতি করিয়া লইতে হয়। ইহার পর এক ফুট উঁচু পর্যন্ত সিমেন্ট কংক্রীট দিয়া গাঁথিয়া তুলিতে হয়। সিমেন্টের অভাবে খোয়া, চুণ ও সুরকীর মিশ্রণ দ্বারা ঢালাই করা যাইতে পারে। ইহার পর ইটের গাঁথুনীর সাহায্যে ভিত ক্রমশঃ উপরের দিকে উঁচু করিয়া তোলা হয়। ভিত প্রস্তত হইলে উহাতে সিমেন্ট, বালি ও পাথর-কুচি দিয়া একটি গাঁথুনি তৈরী করিতে হয়। এই গাঁথুনি মেঝের আর্দ্রতা নিবারণে সাহায্য করে। মেঝে করিবার সময় মাটির উপর এক একখানি ইট বিছাইয়া সোলিং করা হয়। ঐ সোলিং-এর উপর সিমেন্ট কংক্রীটের মেঝে ঢালাই করিয়া শেষে শুধু সিমেন্টের গোলার সাহায্যে পালিশ করা হয়।

গৃহের গঠন

দেওয়াল ঃ খুব ভাল পোড়া ইটের সাহায্যে দেওয়াল গাঁথিতে হয়, খারাপ বা কাঁচা ইটের তৈরী দেওয়াল অতি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া বা ধ্বসিয়া যায়। দেওয়াল সাধারণতঃ ১০" হইতে ১৫" ইঞ্চি চওড়া হয়। ঘরের ভিতর ও বাহিরের দিকে দেওয়ালে চূণ, বালি ও সিমেন্টের পলস্তারা লাগানো থাকে। দেওয়াল সাধারণতঃ চূণ, বালি, সুরকী বা সিমেন্টের গাঁথুনীর সাহায্যে গড়িয়া তোলা হয়। দেওয়ালের স্থায়িত্ব ও শুষ্কতার জন্য চূণ, বালি ও সুরকী মিশ্রিত মর্টারের প্রয়োজন হয়। দেওয়ালের এই মর্টার আর্দ্রতা নিবারণে সাহায্য করে।

দরজা-জানালা ঃ ঘরে আলোবাতাসের প্রাচুর্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দরজা-জানালার প্রয়োজন। বায়ু চলাচলের জন্য রুজু রুজু দরজা-জানালা থাকা উচিত। দেওয়াল গাঁথিবার সময়ই বাড়ীর উচ্চতা অনুযায়ী দরজা-জানালা লাগাইবার কাজ শুরু হয়। দরজা-জানালার কাঠ ভাল না হইলে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহা নষ্ট হইয়া যায়। দরজা-জানালার কাঠে রং লাগাইতে হয়, ইহাতে কাঠ ভাল থাকে এবং দেখিতেও খুব সুন্দর হয়।

ছাদ ঃ মেঝে হইতে দেওয়ালের উচ্চতা সাধারণতঃ ১০।১১ ফুট হয়। দেওয়ালের শেষ প্রান্তেই ছাদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ছাদ ঢালাইর জন্য প্রথমে তক্তার পাটাতনের মত করিতে হয়। ঐ তক্তার উপর লোহার খাঁচা বা ফ্রেম তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর সিমেন্ট, বালি, খোয়া বা পাথরকুচির মিশ্রণের সাহায্যে ঢালাই করা হয়। ঢালাই যখন শক্ত হয় অর্থাৎ জমিয়া যায় তখন কাঠের তক্তা খুলিয়া ফেলা হয়। পাকা বাড়ীতে অনেক সময় টালি, অ্যাসবেস্টাস প্রভৃতির চাল দেওয়া হয়।

গৃহ-নির্মাণে মালমসলা ঃ মালমসলার উপরই গৃহের গঠন নির্ভর করে। এই মাল-

মসলার জন্যই ধনী, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণীর অধিবাসীদের বাসগৃহগুলির মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। **ভৌগোলিক** পরিবেশ ও **রুচিভেদে** গৃহ-নির্মাণের মালমসলার তারতম্য ঘটে। পাহাড়ী অঞ্চলে সাধারণতঃ কাঠ, অ্যাসবেস্টস্, টালি প্রভৃতির দ্বারাই গৃহ নির্মাণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ **টিন, খড়, কাঠ, মাটি** প্রভৃতি দ্বারা বাড়ী তৈরী হয়। তবে ইটের বাড়ীতে আর্দ্রতা-নিবারক স্তর না থাকিলে বাড়ীটি স্যাঁতসেঁতে হয়। এই স্তরটি নির্মাণ করিতে **অ্যাসফালট, বাইটুমেন** প্রভৃতি আর্দ্রতা-নিরোধক মালমসলা এবং চুণ, বালি, সুরকী প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। দেওয়ালে এবং ছাদের ভিতরের (ceiling) দিকটাতে ব্যবহারের জন্য **রং ও ডিসটেম্পারের** প্রয়োজন হয়।

গৃহের দরজা-জানালার জন্য **কাঠ** অপরিহার্য। এই কাঠের সৌন্দর্য ও দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য আবার ব্যবহৃত হয় নানা রকমের **রং, বার্নিশ ও ক্রিয়োজোট**। অনেক সৌখীন বাড়ীতে জানালা ও দেওয়ালে **কাচের** ব্যবহারও দেখা যায়। গৃহের কড়ি, বরগার জন্য কাঠ ও **লোহার** প্রয়োজন হয়।

অবস্থান ঃ পরিবেশ সুন্দর হইলে গৃহটিও সুন্দর হয়। বিশেষতঃ **শিশুর চরিত্র** গঠিত হয় বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়া। তাহার খেলাধুলায়, মেলামেশায়, আমোদ-প্রমোদে ও শিক্ষায় স্থানীয় পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনকি, মানুষ **বয়ঃপ্রাপ্ত** হইবার পরও স্থানীয় পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। স্থানীয় **শিক্ষাদীক্ষা, জীবিকার্জনের সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা, রীতিনীতি, ভাষা** সব কিছুই তাহার জীবনে সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। স্থানীয় পরিবেশে মানুষের চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে।

গৃহের পরিবেশ

অর্থনৈতিক অবস্থা, রুচি, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি অনুসারে বসতবাটির স্থান নির্বাচন করা উচিত। নিম্ন রুচিসম্পন্ন পরিবারের নিকটে মার্জিত রুচিসম্পন্ন পরিবার কখনই পাশাপাশি বাস করিতে পারে না।

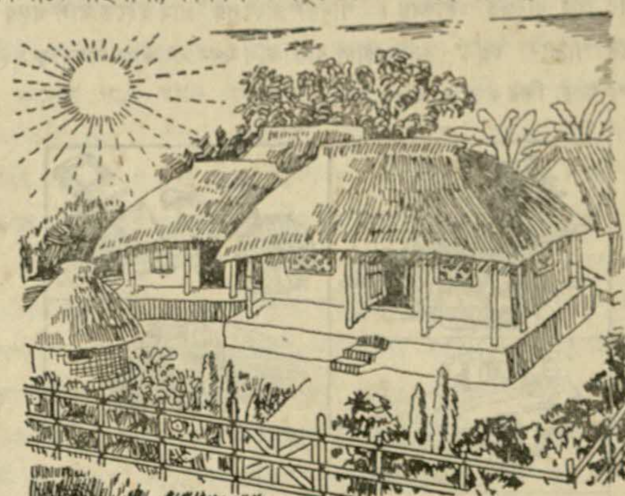
অবস্থা অনুযায়ী পল্লী নির্বাচন

বাসগৃহের নিকট **বিদ্যালয়, ডাকঘর, বাজার, রেলস্টেশন** প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। হাট-বাজার খুব কাছে না হওয়াই ভাল কারণ ওখানকার সোরগোল, চীৎকার ও আবর্জনাদির দুর্গন্ধে মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটায় ও স্বাস্থ্যের হানি হয়। বাসগৃহের অনতিদূরে **হাসপাতাল** থাকা ভাল। বাড়ীর নিকট **উপাসনা-মন্দির, মসজিদ, গীর্জা** প্রভৃতি থাকিলে ভাল হয়। বয়স্কদের বেড়াইবার জন্য এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যাহাতে মুক্ত হাওয়াতে খেলাধুলা করিতে পারে সেইজন্য গৃহের সন্নিকটে বড় **পার্ক** থাকা খুবই আনন্দদায়ক। বাসগৃহ যাহাতে **শ্মশান, গোরস্থান, কবরখানা** প্রভৃতির নিকট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত অঞ্চল মনের উপর এবং দেহের উপর যথেষ্ট খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বাসগৃহের অবস্থান

বৃক্ষবহুল স্থানে বাসগৃহ না হওয়াই ভাল। যেখানে বৃক্ষ বেশী সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়, এই কারণে ঐ অঞ্চলের বাড়ীঘরও সর্বদা **স্যাঁতসেঁতে** থাকে। তাহাছাড়া, **রৌদ্র ও আলো** প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বৃক্ষবহুল ও ঝোপ-ঝাড় অঞ্চলে কীটপতঙ্গ ও মশার উপদ্রব খুব বেশী। কিন্তু কতকগুলি বৃক্ষ আছে যাহার প্রভাবে বাসগৃহের পরিবেশ বিশুদ্ধ ও সুগন্ধ-যুক্ত হয়। **নিম, তুলসী, ইউক্যালিপটাস, দেবদারু** প্রভৃতি বৃক্ষ বাসগৃহ হইতে কিছুটা দূরে থাকা ভাল। গ্রামাঞ্চলের গৃহগুলির চারিপাশে থাকে গাছপালা, বনজঙ্গল ও সবুজ ক্ষেত। তাই গ্রাম্য কুটিরগুলি যতো জীর্ণ,

বাসগৃহের উপর বৃক্ষের প্রভাব



ক্ষুদ্র ও সাধারণ হউক না কেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শোভার দিক হইতে সেগুলি অতুলনীয়।

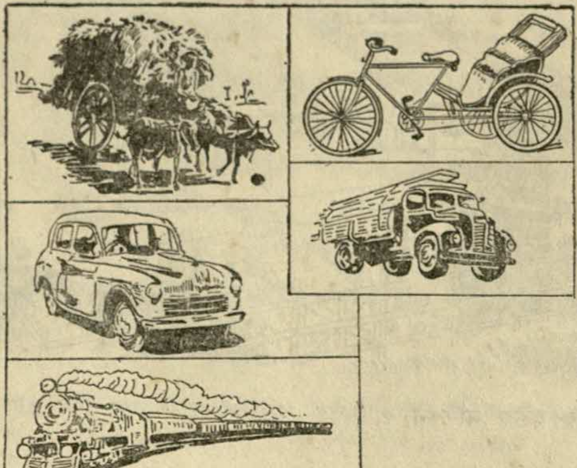
সূর্যকিরণ ও বায়ুর প্রভাব

বায়ু ও সূর্যকিরণ মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। অতএব সূর্যকিরণ ও বায়ু প্রবেশের বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ স্থানে গৃহ নির্মাণ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে।

গৃহের সংস্থিতিঃ গৃহের সংস্থিতি এরূপ স্থানে হওয়া উচিত যাহাতে আলো-হাওয়ার অভাব না ঘটে। ভৌগোলিক নিয়ম অনুসারে আমাদের বাসগৃহ দক্ষিণদ্বারী ও পূর্বদ্বারী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। দক্ষিণ খোলা থাকিলে সেখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ শীতল বায়ু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। পূর্বদিকে সূর্য উঠে বলিয়া উদীয়মান সূর্যের আলো ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। আবার গ্রীষ্মকালে দুপুরের পর ঘরগুলি উত্তপ্ত হইতে

পারে না। কারণ পূর্বমুখী ঘরগুলিতে পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্র প্রবেশের সুযোগ পায় না। দক্ষিণ খোলা গৃহে যখন শীতকালে উষ্ণতার প্রয়োজন তখন অতি সহজেই আবার সূর্যের তাপ উপভোগ করা যায় কারণ তখন সূর্যের দক্ষিণায়ন চলে।

পরিবহণের সুবিধাজনক উপায়ঃ সামাজিক জীবন যাপনে 'পরিবহণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সুপ্রাচীন কাল হইতেই স্থলপথে **গো-যান** ও জলপথে **নৌকা** পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তবে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ভাল রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে, সেখানে গরুর গাড়ীর পরিবর্তে আজকাল **মোটর, ট্রাক বা লরী** মাল পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম হইতে মাল গরুর গাড়ীতে অন্য স্থানে পাঠানো হয়। গ্রামে কাঁচা রাস্তাগুলি যখন বর্ষাকালে কর্দমাক্ত হইয়া উঠে, তখন গরুর গাড়ী ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।



এই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও পারিবারিক ক্ষেত্রেও পরিবহণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অতএব গৃহনির্মাণের সময় যাতায়াতের সুবিধা ও মাল আনা-নেওয়ার কাজটি যাহাতে সহজসাধ্য হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করা আবশ্যক। এই জন্য বাস-গৃহ এরূপ স্থানে হওয়া উচিত যেখান হইতে ট্রাম, বাস, রিক্সা খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রতিদিন রেলে যাতায়াত করিয়া অফিস কাছারী করেন তাঁহাদের পক্ষে রেল-স্টেশনটি বাড়ীর কাছাকাছি না হইলে সময়, অর্থ, শ্রম সব কিছুরই অপচয় ঘটে। যানবাহনের সুবিধা হইতে বঞ্চিত এরূপ স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে।

আলোর ব্যবস্থা : সূর্যই আলোর উৎস। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ম্লান হইয়া যায়। আলোর অভাবে আমরাও তখন কৃত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই অন্ধকার দূরীকরণের জন্য নানা প্রকারের আলোর আবিষ্কারও করিয়া যাইতেছে।

সাধারণ ভাবে আলোকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আলো এবং দ্বিতীয়টি কৃত্রিম আলো। সূর্যপ্রদত্ত আলোকে আমরা স্বাভাবিক আলো বলিব—এই আলো ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সমান ভাবে লাভ করিতে পারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা হেতু উপযুক্ত আলোর অভাব ঘটে। বাড়ীর গঠনভঙ্গী যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহা হইলে গৃহের অভ্যন্তরে অবাধ আলো প্রবেশ করিতে পারে না।

আলোর পরেই আসে অন্ধকারের কথা। কত কবি, কত লেখক আঁধারের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কর্মজগতে এ সৌন্দর্যের মূল্য নাই। তাই আলোকে আমরা জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করি আর অন্ধকারের তুলনা হয় অজ্ঞানের সঙ্গে। আদিম যুগে **মশাল** জ্বালাইয়া অরণ্যবাসী আদিম জাতি আলোর কাজ চালাইত। পশু শিকারেও তাহারা মশাল নিয়া ঘুরিত। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে বহু যুগ পর্যন্ত পল্লীগ্রামে **তেলের প্রদীপই** একমাত্র আলোর ব্যবস্থার উপায় ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের লেখাপড়ার কাজ প্রদীপের আলোতেই সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' উপন্যাসেও তেলের প্রদীপের কথা পাওয়া যায়। নানা রকমের তেলের সাহায্যে প্রদীপ জ্বালানো যায়। সাধারণতঃ **সরিষার তৈল, রেড়ীর তৈল এবং 'ঘি'**-এর ব্যবহারই বেশী প্রচলিত। আমাদের দেশের পল্লীঅঞ্চলে কেরোসিনের কুপিরও ব্যবহার দেখা যায়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই খারাপ। কুপি ছাড়া শহর অঞ্চলে কেরোসিনের আলোর ব্যবহার এখন পর্যন্তও আছে। কুপির আলো স্থির নহে, দূষিত গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং অল্প বাতাসেই নিভিয়া যায়। তাহা ছাড়া সামান্য অসতর্ক হইলেই আগুন লাগিবার ভয় থাকে। হ্যারিকেনে চিমনীর আবরণ থাকাতে এই সমস্ত ভয়ের আশঙ্কা থাকে না।

বর্তমানে এই বৈদ্যুতিক যুগেও আমরা আলোক-সজ্জায় মোমবাতি ব্যবহার করি। কোনও পূজা উপলক্ষে পূজার স্থানটি আমরা মোমবাতি দিয়া সাজাই, কালীপূজার সময় মোমবাতির সাহায্যে গৃহ আলোকিত করি। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে শহরতলীতে লোডশেডিং-এর ঝামেলায় আমরা ব্যাপকভাবে এই মোমবাতি ব্যবহার করি। মোমবাতির অসুবিধা বাতাসে নিভিয়া যায় এবং তীব্র আলো হয় না; অবশ্য মোমবাতির মাপ অনুসারে আলোর তীব্রতা ও ক্ষীণতা পরিলক্ষিত হয়।

মোমবাতি

গ্যাসবাতি-র আবিষ্কারক মিঃ মারডক লণ্ডনে যখন এই কৃত্রিম আলো আবিষ্কার করিলেন তখন আলোর ইতিহাসে এক নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটিল। গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গ্যাস সরবরাহ করে। গ্রামাঞ্চলে **কারবাইডের সাহায্যে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা** করা হয়। এই কারবাইড বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়।

গ্যাসবাতি

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে আলোর আবিষ্কার করিয়াছেন। শহর ছাড়াইয়া এখন গ্রামেও এই বাতির প্রসারণ ঘটিয়াছে। ঘরে, বাইরে, দোকানে, বাজারে, কর্মস্থলে সর্বত্রই এখন এই আলোর ব্যবহার দেখা যায়। বৈদ্যুতিক আলোর অনেক সুবিধা আছে। অপব্যয় না করিলে অন্যান্য বাতি অপেক্ষা ইহাতে কম খরচ হয়। যখন ইচ্ছা নিভানো যায়, আবার জ্বালানো যায়—ইহার জন্য কোনও হাঙ্গামার প্রয়োজন হয় না।

বৈদ্যুতিক আলো

বাল্ব এবং টিউব এই দুই-এর ভিতর দিয়াই আমরা বৈদ্যুতিক আলো পাই। আজকাল নানারকম দোকানে এবং বিভিন্ন সৌখীন পরিবারে এই **ফ্লোরেসেণ্ট টিউব** ব্যবহৃত হয়। ইহা সরলাকৃতি নলের মত। বাল্বের আলো অপেক্ষা ইহার আলো **সাদা, উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ**। এই আলো ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বার বার জ্বালাইলে বা নিভাইলে ইহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধা ভোগ করার কথা চিন্তা করিয়া বিদ্যুতের সুবিধা পাওয়া যায় এরূপ অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করা যুক্তিসঙ্গত।

জল-সরবরাহ ঃ দৈনন্দিন জীবনে আমাদের জলের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেরই জানা আছে। শহরে এই জল পৌরসভা সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্তির জন্য কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিতে হয়। গৃহ নির্বাচনে জলের কথাটি সর্বপ্রথম চিন্তা করা প্রয়োজন। অতএব জলের ব্যবস্থা না করিয়া গৃহ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া উচিত নহে।

(৫ম অধ্যায়ে জল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।)

গৃহে অনাময় ব্যবস্থা

শহরাঞ্চলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য সাধারণতঃ ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থাটি পৌরসভার উপরই ন্যস্ত থাকে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বাসগৃহের নিকট প্রায়ই খানা-ডোবা, দূষিত নালা-নর্দমা, জলাশয় ও বনজঙ্গলাদি দেখা যায়। ঐ সকল খানা-ডোবা ভরাইয়া ফেলা, নালা-নর্দমা ও জলাশয়গুলি পরিষ্কার রাখা এবং বনজঙ্গল সাফ করা একান্ত প্রয়োজন। মল-মূত্র আবর্জনাদি যাহাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যাহত না করে, সে বিষয়েও সতর্ক হইতে হয়। এইজন্য মশা, মাছি, পোকা ও জীবাণুনাশক ঔষধাদি ব্যবহার করিতে হয়।

গৃহপরিবেশের পরিচ্ছন্নতা

প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। আইনের শাস্তির ভয়ে অনেক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি অপরের স্বাস্থ্যের হানি হয় এরূপ কোনও অন্যায় কাজ করিতে সাহস পায় না। অবশ্য আইনভঙ্গকারী অনেক দুষ্কৃতিকারীরও অভাব নাই আমাদের দেশে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি গৃহেই নানা প্রকার আবর্জনা বা ময়লার সৃষ্টি হয়। আবর্জনাকে মোটামুটি ভাবে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি—**শুষ্ক আবর্জনা** ও **তরল আবর্জনা**। এই আবর্জনা গৃহের অভ্যন্তরে বা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে সঞ্চিত বা স্তূপীকৃত হইয়া থাকিলে বাসগৃহকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে।

শুষ্ক ও তরল ময়লা

শুষ্ক আবর্জনা বলিতে শুকনা পাতা, মাছের আঁশ, কাগজের টুকরা, পুরাতন কাপড়ের ন্যাকড়া, তরকারীর খোসা, ডিমের খোলা প্রভৃতিকে বোঝায়। অব্যবহার্য ভাঙ্গা জিনিসপত্র, ছাই প্রভৃতিও এই পর্যায়ে পড়ে। অপরদিকে স্নান-করা জল, বাসন-মাজা ও ঘর-ধোয়া জল, বস্ত্রাদি কাচার সাবানের ফেনাযুক্ত জল, ভাতের ফেন প্রভৃতি তরল আবর্জনার অন্তর্ভুক্ত। মলমূত্রকেও এই পর্যায়ে গণ্য করা হয়।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ভিতর নাগরিক কর্তব্যের চেতনা খুব স্পষ্ট নয়। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, রাস্তায় চলার পথে আমের খোসা ও কলার খোসা নিক্ষেপ করা, পানের পিক ফেলা—এই সকল ঘটনা প্রতিদিনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই কু-অভ্যাসগুলি যে কত মারাত্মক তাহা চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ময়লা নিষ্কাশন ঃ শহর অঞ্চলে ময়লা নিষ্কাশনের দায়িত্ব থাকে **মিউনিসিপ্যালিটির** (Municipality) উপর। আবার কলিকাতার মত বড় বড় শহরে বিভিন্ন এলাকার ময়লা অপসারণের সমগ্র দায়িত্ব নির্ভর করে **পৌর-প্রতিষ্ঠানের** (Corporation) উপর। **স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা** (Sanitary) দ্বারা শুষ্ক ময়লা অপসারিত হয়। আর **নর্দমার** (Sewer) ব্যবস্থা দ্বারা তরল ময়লা নিষ্কাশন করা হয়। ময়লা অপসারণের জন্য শহরবাসীদের জন্য কর্পোরেশন হইতে একটি **ডাস্টবিন** রাখা হয়। প্রত্যেক এলাকাতে একটি করিয়া ডাস্টবিন থাকাতে অনায়াসেই গৃহের ও রাস্তার আবর্জনাদি ঐ ডাস্টবিনের ভিতর ফেলিয়া দিবার সুযোগ ঘটে। ঝাড়ুদার বা মেথরের কর্তব্য প্রতিদিন ময়লা তুলিয়া লইয়া ডাস্টবিন খালি করা। আবর্জনা-পূর্ণ ডাস্টবিন দীর্ঘ সময় ফেলিয়া রাখিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং রোগজীবাণু ছড়ায়। ইহা ছাড়া মশা-মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।

শুষ্ক আবর্জনাগুলি নানাভাবে দূরীকরণ করা হয়।

(ক) পল্লীগ্রামে যেখানে ময়লা অপসারণ একটা সমস্যা বিশেষ, সেইখানে এই ময়লাগুলি অনেক সময় গর্ত করিয়া **গর্তে ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখা হয়।** দীর্ঘদিন পর আবার ঐ অঞ্চল সারযুক্ত হয়। কৃষির পক্ষে ইহা খুব উৎকৃষ্ট পন্থা কিন্তু কোনক্রমেই ঐ **ভরাট-করা জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে।**

(খ) তরলীকৃত করিয়া কম্পোস্ট সারে পরিণত করা হয়। স্তূপীকৃত আবর্জনার ভিতর নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ করিলে ঐ শুষ্ক ময়লা তরল আকারে পরিণত হয়। ইহাই **কম্পোস্ট** সার। এই সার জমিকে উর্বর করিয়া তোলে।

(গ) **পোড়াইয়া ফেলা :** স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত ইহা একটি উৎকৃষ্ট উপায়। গ্রামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অনেক গৃহস্থ প্রতিদিনকার ময়লা দিনান্তে এক জায়গায় জড়ো করিয়া পোড়াইয়া ফেলে। বড় বড় শহরে এই ব্যবস্থাকে **ইনসিনারেশন** (Incineration) বলে কেননা ইনসিনারেশন নামক একপ্রকার চুল্লীর সাহায্যে আবর্জনাগুলি পোড়ানো হয়।

পয়ঃপ্রণালী : বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত জল ও অন্যান্য তরল ময়লা সহজ ভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যে পথের সাহায্যে করা হয় তাহাকেই **পয়ঃপ্রণালী বা নর্দমা বলা হয়।** পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা অনেক রকমের হইতে পারে। গ্রামবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কারণে সাধারণতঃ সহজ ও অনাড়ম্বরপূর্ণ হয়। সেখানে প্রায়ই পাকা ও মাটির নীচের নর্দমার পরিবর্তে কাঁচা নর্দমার প্রচলন দেখা যায়।

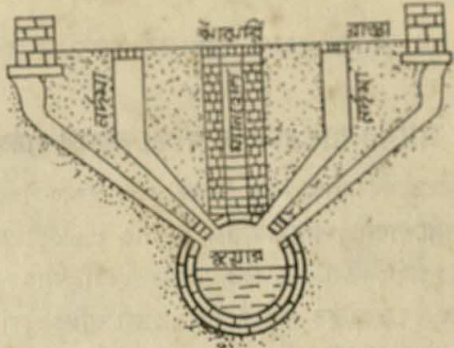
কাঁচা নর্দমার অসুবিধা

কাঁচা নর্দমার অসুবিধা অনেক। এখানে মাঝে মাঝে ময়লা জমিয়া পথ আটকাইয়া যায় ; পচা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। মশা-মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।

কলিকাতার মত বড় বড় শহরে তরল ময়লা নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত তাহাকে **জলবাহিত প্রণালী** (Water-carriage system) বলে। কলিকাতা শহরে মাটির নীচে অসংখ্য পাইপের সমাবেশে রান্নাঘরের ও স্নানের ঘরের জলও পাইপের সাহায্যে নীচে চলিয়া যায় ; পায়খানার স্বতন্ত্র পাইপের তরল ময়লাও অপসারিত হইয়া ঐ জলের সহিত মিলিত হইয়া এক সঙ্গে যুক্ত হয়, উহার কারণ দুইটি পাইপই একসঙ্গে যুক্ত থাকে। এইবার সমস্ত তরল ময়লা রাস্তায় বড় ড্রেন বা **সিউয়ারে** (Sewer) আসিয়া পড়ে।

কলিকাতার শহরের উপরে যে প্রণালীতে পায়খানা নির্মিত হয় তাহাকে **ড্রেন**

পায়খানা বলা হয়। এই পায়খানার তরল ময়লাও জলবাহিত প্রণালীর সাহায্যে পাইপের মধ্য দিয়া নীচে নামিয়া যায়।



পায়খানাটির নির্মাণ-প্রণালী এইরূপ—একটি চিনামাটির মলপাত্র বসানো থাকে যাহার দুইদিকে পা রাখিবার জন্য উঁচু দুইটি পা-দানি থাকে। পায়খানার উপরে লোহার একটি জলপাত্র (cistern) বসানো থাকে। একটি নল দ্বারা ইহা মলপাত্র বা প্যানের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই জলপাত্রের উপরে হাতল-যুক্ত একটি **শিকল** (chain) লাগানো থাকে। মলত্যাগ করার পর ঐ শিকল ধরিয়া টানিলে উপরের জলপাত্র হইতে এক গ্যালন জল প্যানের ভিতর সবেগে গড়িয়া পায়খানাটি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। প্রতিটি বাড়ীর ছাদের উপর একটি চৌবাচ্চায় পরিমাণ মত জল থাকে। পায়খানার উপরের জলপাত্রটি খালি হওয়া মাত্র ছাদের চৌবাচ্চা হইতে এক গ্যালন জল আসিয়া ঐ জলপাত্রটিকে আবার পূর্ণ করিয়া দেয়। মলপাত্রের নীচে একটি বক্রনল বা **সাইফন** থাকে। ইহার ভিতর সব সময়ই কিছু জল জমা থাকে ; ইহার ফলে দুর্গন্ধ উপরের দিকে ছড়াইতে পারে না। মল-নিঃসরনী পাইপের সাহায্যে অত্যন্ত তীব্রবেগে তরল ময়লা বিরাট পাইপের ভিতর দিয়া নীচে চলিয়া যায়। এই তরল ময়লার জলস্রোতকেই বলা হয় **সিউয়েজ** (Sewage) এবং যে নালার ভিতর দিয়া উহা প্রবাহিত হয় তাহাকে বলে **সিউয়ার** (Sewer)। সিউয়ারের সহিত হাউস ড্রেন-এর যোগ আছে। সেই ড্রেনের ভিতর দিয়া আবার গৃহের সমস্ত অপরিষ্কার জল আসিয়া সিউয়ারে পড়ে। এই রূপে শহরের সমস্ত তরল ময়লা সিউয়ারের ভিতর দিয়া চালিত হইয়া গঙ্গাবক্ষে পতিত হয়।

প্রত্যেক বাড়ীর নীচে একটি হাউস ড্রেন থাকে। ইহা রাস্তার ড্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ড্রেনের কার্যপ্রণালী নষ্ট হইয়া গেলে পরীক্ষার জন্য এবং পরিষ্কার করণের জন্য মাঝে মাঝে **ম্যানহোলের** ভিতর ঢুকিয়া কর্পোরেশনের লোক আবর্জনা পরিষ্কার করে বা

প্রয়োজন মত পরীক্ষা করিয়া মেরামত করে। ম্যানহোলের মুখে একটি লোহার ঢাকনি থাকে।

কলিকাতার মত বড় বড় শহরের সমস্ত তরল ময়লা জলবাহিত প্রণালী দ্বারা নিষ্কাশিত হয়।

গ্রামের পায়খানা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা

গ্রামের যে পল্লীতে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নততর এবং শিক্ষায়-দীক্ষায় কিছুটা অগ্রগামী সেই সব অঞ্চলে **মলশোধনী পায়খানার** (Septic tank) ব্যবস্থা আছে। এই পায়খানার নির্মাণ-প্রণালী তিনটি ট্যাংকের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এই ট্যাংক বা চৌবাচ্চার ভিতরেই মল তরলীকৃত হইয়া নালার সাহায্যে বাহির হইয়া আসে।

(ক) পায়খানার নীচে গভীর গর্ত খুঁড়িয়া পাশাপাশি দুইটি বাঁধানো চৌবাচ্চা নির্মাণ করা হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় ছোট এবং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, এখানে কোন রকমে আলো ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। চৌবাচ্চাটির অর্ধেক জলে ভর্তি থাকে। মল-ত্যাগের পর প্যানের ভিতর প্রচুর জল ঢালার পর ঐ মল চীনামাটির নলের সাহায্যে প্রথম চৌবাচ্চায় গিয়া পড়ে। এখানে **অবায়বীয় জীবাণু** দ্বারা মল কঠিন অবস্থা হইতে আংশিক তরলে পরিণত হয়।

(খ) বায়ুপূর্ণ চৌবাচ্চা—দুই চৌবাচ্চার মধ্যবর্তী দেওয়ালে বড় ছিদ্র থাকে। তরল ময়লা প্রথম চৌবাচ্চা হইতে দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় পড়ে। এখানে বায়ু প্রবেশের পথ আছে। বায়বীয় জীবাণুর ক্রিয়াতে আংশিক তরল সম্পূর্ণ তরল ও বিশোধিত হয়।

(গ) সামান্য গন্ধযুক্ত এই পরিস্রুত জল তৃতীয় চৌবাচ্চার ঝামার স্তরে গিয়া পৌঁছায়। এখান হইতে ঐ জল নালার সাহায্যে নিকটবর্তী কৃষির জমিতে প্রেরণ করিয়া সারের কাজে ব্যবহার হয়।

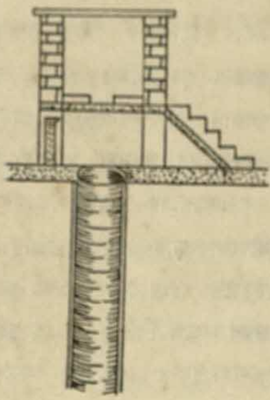
খাদ পায়খানা ঃ সাধারণতঃ কোথায়ও সাময়িক ভাবে কিছুদিনের জন্য কোনও উৎসবের ব্যবস্থা হইলে, কোনও মেলা বা যাত্রা অনুষ্ঠানে এইরূপ বহু লোকের সমাগম হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই পায়খানার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

৬ ফুট অন্তর খুব লম্বা লম্বা কয়েকটি খাদ কাটা হয়। খাদের চারিপাশ উপরের দিকে বেড়া দেওয়া থাকে। ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গেলে মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। দীর্ঘ দিন পর ইহা একটি সার জমিতে পরিণত হয়।

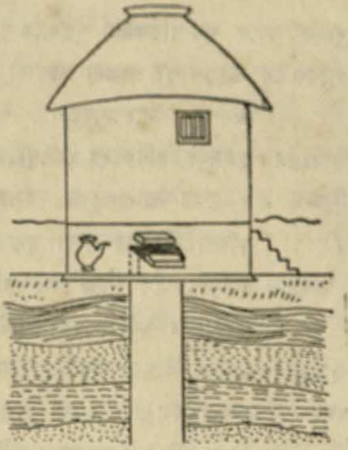
কূয়া পায়খানা ঃ গ্রামের দরিদ্র পরিবারে এই পায়খানার প্রচলন দেখা যায়। পায়খানার নীচে কূয়ার মত গভীর গর্ত খোড়া হয়। কূয়ার অল্প জলের সহিত মল মিশ্রিত

হইয়া উহা পচিতে থাকে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মাঝে মাঝে এই গর্তের পাঁক তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং চুণ বা ব্লিচিং পাউডার ছড়াইতে হয়। এই পায়খানা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত নহে।

গর্ত পায়খানা ঃ একটি উচ্চভূমি নির্বাচন করিয়া দেড়ফুট ব্যাসের ১০ হইতে ২০ ফুট গভীর গর্ত কাটিতে হয় ; উপরে পায়খানার ঘর নির্মাণ করিতে হয়। গর্তটি মলে প্রায়



কুয়া পায়খানা



গর্ত পায়খানা



খাটা পায়খানা

অর্দ্ধেকটা ভরিয়া গেলে ছাই ও মাটি চাপা দিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। পার্শ্ববর্তী আর একটা স্থানে পুনরায় এইরূপ পায়খানা নির্মাণ করা হয়। এই ভাবে বসতবাটির নিকটবর্তী কিছুটা অংশ উর্বর জমিতে পরিণত হয়।

খাটা পায়খানা ঃ ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই পায়খানার প্রচলন খুব বেশী। একটি পাকা বা কাঁচা পায়খানা

তৈরী করিবার পর প্রায় ৬ ফুট নীচে মল পড়িবার জন্য একটি বড় বালতি বা মাটির গামলা রাখা হয় এবং মেথরের প্রবেশের জন্য নীচের দিকে একটি দরজা থাকে। শৌচ-কার্যের ব্যবহৃত জল নিঃসরণের জন্য পায়খানার পাশে একটি সরু নর্দমা থাকে। মেথর প্রতিদিন সকালে ঐ মল লইয়া না গেলে ঐ পায়খানা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে।

গৃহনির্মাণে পরিকল্পনা

আধুনিক কালে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে গৃহ নির্মাণ হইতেছে। কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও যে এইরূপ পূর্ব কল্পনা অনুযায়ী শহর এবং গৃহ নির্মিত হইত, তাহার নিদর্শন মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা। মহেঞ্জোদড়োর শ্রমিকদের গৃহসমূহ, বণিকদের গৃহসমূহ, দোকানদারদের গৃহসমূহ, দরিদ্রের গৃহ ও ধনিকের প্রাসাদতুল্য গৃহসমূহ, ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও সহজেই পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যায়। মহেঞ্জোদড়োর সহিত হরপ্পার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। হরপ্পার সর্ববৃহৎ যে গৃহটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৯ ফুট এবং প্রস্থে ১৩৫ ফুট। ইহা দুইটি অনুরূপ অংশে বিভক্ত। এই দুই অংশ ২৩ ফুট প্রশস্ত একটি অলিন্দের দ্বারা যুক্ত। প্রত্যেক অংশে ৬টি করিয়া হল এবং দুইটি হলের মধ্যে একটি করিয়া বারান্দা আছে। প্রত্যেকটি হল আবার চারটি করিয়া ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত। শহরের গৃহগুলি পোড়ানো চারকোণা ইট দিয়াই তৈয়ারী। সিমেন্টের বদলে কাদাই গাঁথুনির কাজে ব্যবহৃত হইত। জল ঢোকা বন্ধ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে পীচ ব্যবহার করা হইত। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার গৃহগুলি একতল হইতে দ্বিতল, ত্রিতলও হইত। গৃহগুলিতে কক্ষসমূহ ছাড়াও কূপ, স্নানাগার, আবৃত নর্দমা থাকিত। গৃহগুলি প্রায়ই চকমিলানো হইত। গৃহের মধ্যে শান-বাঁধানো আঙিনা থাকিত এবং আঙিনার চারিদিকে থাকিত কক্ষসমূহ এবং কক্ষগুলির দরজা ও জানালাগুলি আঙ্গিনার দিকে খোলা থাকিত। আঙ্গিনার এক কোণে থাকিত রন্ধনশালা। রাস্তাতেও আবৃত নর্দমা থাকিত। গৃহের নর্দমার সঙ্গে এই নর্দমা যুক্ত ছিল। নর্দমাগুলি মাঝে মাঝে সাফ করিবার জন্য ম্যানহোলের মত ব্যবস্থা ছিল। শহরের ময়লা ঐ সকল নর্দমা দিয়া নির্গত হইয়া পরে নদীতে গিয়া পড়িত। একটি স্তম্ভযুক্ত ৮০ বর্গ ফিট বিরাট হলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক বড় বড় গৃহ পাওয়া গিয়াছে—কি উদ্দেশ্যে ঐগুলি ব্যবহৃত হইত তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই।

প্রাচীন ইতিহাসে বাড়ীর পরিকল্পনা

প্রাচীন ইতিহাসে গৃহ-পরিকল্পনা

প্রাচীন নিদর্শন থেকে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সর্বযুগেই গৃহনির্মাণে পরিকল্পনার

প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ না করিলে উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অর্থ ব্যয় করিয়া একবার নির্মিত হইয়া গেলে উহাকে ভাঙ্গিয়া আবার ইচ্ছামত কিছু করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য গৃহ নির্মাণের পূর্বেই এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বাড়ির একটি নক্সা তৈরী করিয়া লইতে হইবে। শহরাঞ্চলে পৌরসভা কর্তৃক বসতবাটির নক্সা মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। প্রতিবেশীর অসুবিধা সৃষ্টি হয় এরূপ কোনও গৃহ পরিকল্পনার নক্সা পৌর কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করেন না।

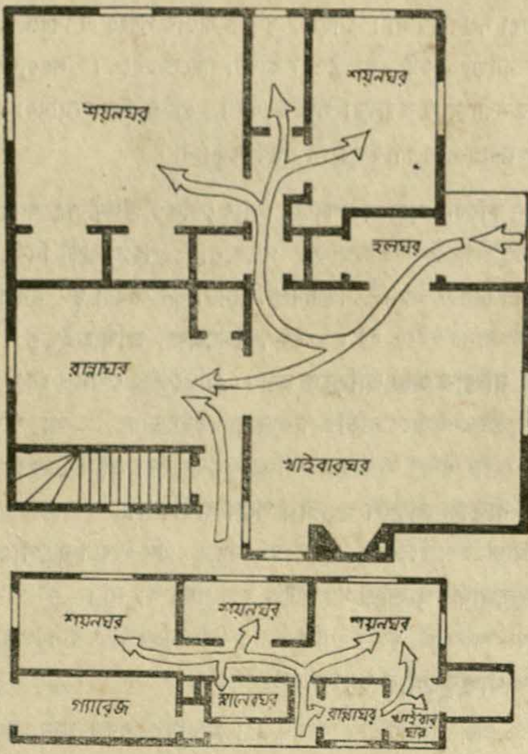
বাসগৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ কোনও ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা বাড়ীর নক্সা তৈরী করিয়া লইলে আর কোনও অসুবিধা থাকে না। শহরে বাড়ী নির্মাণে কতকগুলি বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। সেই সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় অগ্রসর হইতে হয়। যেমন, **নিজের জমি হইতে কিছু জমি রাস্তার জন্য ছাড়িতে হয়**। প্রতিবেশীর কোনও রকম অসুবিধা না ঘটে সেইভাবে বাড়ীর পরিকল্পনা হওয়া উচিত। স্বল্প পরিসর জমিতে বাড়ি নির্মাণ করিতে হয় বলিয়া অনেক সময় **প্রতিবেশীর** গৃহে **আলো বাতাস প্রবেশ হওয়ার পথে বাধা পায়,** অথবা এক বাড়ীর নালার জল অন্য বাড়ীর স্বাস্থ্যময় পরিবেশকে নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে **কর্পোরেশনের** বা **পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত** গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। কী গ্রাম, কী শহর অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী গৃহের পরিকল্পনা হওয়া উচিত এবং বাসগৃহের উপকরণ ও নির্মাণ পদ্ধতিও **অর্থানুকুল্যের** উপরই নির্ভর করে।

গৃহ নির্মাণে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

শহরের বাসগৃহ অল্প জমির ভিতর হয় বলিয়া ইচ্ছামত সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা যায় না। এখানে অঙ্গন বা প্রাঙ্গণ বলিতে কিছু থাকে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে চওড়া বারান্দারও অভাব ঘটে। একটি বা দুইটি ঘরেই বিভিন্ন কক্ষের উদ্দেশ্য মিটাইতে হয়। শহরে **ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই** বহু বাসগৃহ নির্মিত হয়। ঐ সমস্ত গৃহে বসবাস করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয় না। ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী নির্মাণ করিলে সেখানেও **জল কল, পায়খানা, নর্দমা** প্রভৃতির সুব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অধুনা শহরে ও শহরতলীতে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগেও বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন মানের পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মিত হইতেছে। **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়** প্রায় **সাত লক্ষ গৃহ** নির্মিত হয়। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** আরও **পাঁচ লক্ষের** মতো গৃহ নির্মাণের কাজ হয়। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য

প্রায় **১৫২৫ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয় এবং উহাতে প্রায় **৪২ লক্ষ নূতন গৃহ** নির্মাণ করা হয়। **সরকারী হিসাব** হইতে জানা যায় যে আমাদের দেশে এখন ৮ কোটি

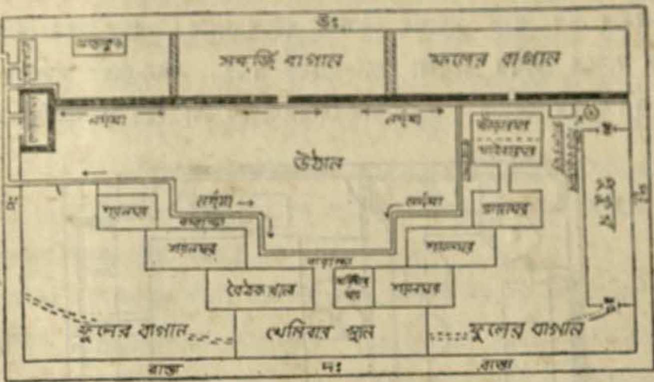


শহরের বাসগৃহের নক্সা

৪৫·লক্ষ পরিবার রহিয়াছে এবং গৃহ রহিয়াছে **৭ কোটি ৯২ লক্ষ**। বহু গৃহ প্রতি বৎসর নষ্টও হইতেছে। **সরকারী প্রচেষ্টায়** এবং **ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট** থেকে যে সকল গৃহ নির্মিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নিতান্তই অল্প, অতএব দেশবাসীকেই নিজ নিজ গৃহ নির্মাণে উদ্‌যোগী হইতে হইবে।

গ্রাম দেশের বাড়ী শহর অঞ্চল অপেক্ষা বেশি জমি লওয়া হয়। সেই কারণে গ্রামের বাড়ীর পরিকল্পনাও পৃথক হয়। পরিবারের **লোক সংখ্যা** অনুযায়ী গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা হওয়া উচিত। গ্রামের বাড়ী সাধারণতঃ **শয়ন ঘর, পড়ার ঘর, বসার ঘর, শিশুর ঘর বা খেলার ঘর, ভোজন ঘর, রন্ধন গৃহ, ভাঁড়ার ঘর, স্নানের ঘর, পায়খানা**, ফলের বাগান, ফুলের বাগান প্রভৃতি বিস্তৃত পরিবেশ লইয়া তৈরী হয়।

গ্রামের বাড়ীতে দুইটি অংশ থাকে—**বহির্বাটি** এবং **অন্দর মহল**। এই বহির্বাটিতে



গ্রামের বাড়ীর নক্সা

একখানি বড় বৈঠকখানা ঘর থাকে। এখানে বাহিরের লোকজনের সমাগম হয়; অন্দর মহলের সহিত ইহার কোনও যোগাযোগ নাই। পক্ষান্তরে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অন্দর মহলের **চওড়া বারান্দায়** বসিয়া গল্প-গুজব করিয়া অবসর সময় কাটায়। এখানে পাড়া প্রতিবেশীর মহিলারা আসিয়াও গল্পে যোগ দেয়। শহরে এই চিত্র দেখা যায় না। অতএব গ্রামের বাড়ীর পরিকল্পনায় বড় **বারান্দা ও প্রাঙ্গণের** স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

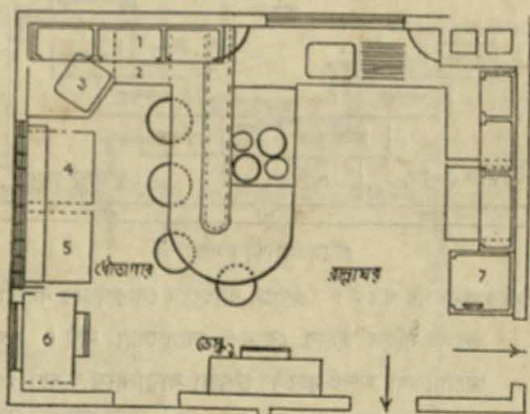
গ্রামের বাড়ীর অংশ ভাগ

রন্ধন-গৃহ

একটি সুপরিকল্পিত ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত রন্ধন-গৃহ ব্যতীত প্রাসাদতুল্য বসত বাটির উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়। আগেকার দিনে রন্ধন গৃহ ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল। আধুনিক যুগে অবশ্য নানাভাবে নানা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রন্ধন-গৃহ তৈরী হইতেছে। রন্ধন-গৃহের উপর বাড়ীর মেয়েদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। রন্ধন-গৃহে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। **ধূম নির্গমের** জন্য **চিমনীর** ব্যবস্থা রাখা উচিত। যে রন্ধন-গৃহটির ভিতর ভোজনের কাজটি সমাপন হয় সেক্ষেত্রে রন্ধন-গৃহটি যথেষ্ট বড় হওয়া প্রয়োজন। রন্ধন-গৃহে অযথা দরজা জানালার প্রাচুর্য না হওয়াই উচিত। উহাতে স্থান সঙ্কোচন ঘটে। যতদূর সম্ভব **দেয়াল তাক** বা **দেয়াল আলমারীর** ব্যবস্থা রাখিয়া তৈজসপত্রাদি সুষ্ঠুভাবে সন্নিবেশ করিতে হয়। মেঝেতে জিনিষ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে নানাভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন ঘটে। অনেক স্থলে রন্ধন-গৃহের ভিতর ভাঁড়ার ব্যবস্থাটিও করিতে হয়। সেক্ষেত্রে তাকের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। রন্ধন-গৃহের মেঝে যাহাতে জল

রন্ধন-গৃহের পরিকল্পনা

জমিয়া **স্যাঁতসেঁতে** না হয় সেজন্য উত্তম নর্দমার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। **ঢালু ও মসৃণ** নর্দমার জল অতি সহজেই নিঃসরণ হইতে পারে। রন্ধন-গৃহের নিকটবর্তী একফালি জমিতে **কৃষির ব্যবস্থা** করা যাইতে পারে। রন্ধন-গৃহের ব্যবহার করা যাবতীয় জল নালার সাহায্যে ঐ জমির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া দিলে পৃথক করিয়া সারের



রন্ধন গৃহের পরিকল্পনা

প্রয়োজন হয় না। এইভাবে **লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়শ, টমেটো, কাঁচালঙ্কা** প্রভৃতি টাটকা খাওয়ার সুযোগ হয়।

বহু পরিকল্পনায় রন্ধন-গৃহ হইতে পারে। প্রথমতঃ U (ইউ) আকারের রন্ধন-গৃহ সম্বন্ধে যদি আলোচনা করি তাহা হইলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে ইহাতে সমস্ত

U আকৃতির রন্ধন গৃহের সুবিধা

সরঞ্জামাদি সুবিন্যস্তভাবে সন্নিবেশ করিয়া কম পরিশ্রমে রন্ধন সম্বন্ধীয় কাজগুলি সম্পন্ন করা যায়। এইরূপ রন্ধন-গৃহে উনুন, বাসনকোসন, কল, জল প্রভৃতি সুন্দরভাবে গুছাইয়া হাতের কাছেই সন্নিবেশ করা যায়। U আকারের রন্ধন-গৃহ ছাড়া 'L' আকৃতি এবং চৌকা আকৃতির রন্ধন-গৃহের প্রচলনও দেখা যায়। U আকারের ন্যায় তত সুবিধাজনক না হইলেও এই আকৃতিগুলিও রন্ধন-গৃহের পরিকল্পনায় স্থান পাইতে পারে।

কাপড় কাচিবার ঘর

এই অর্থনৈতিক সমস্যার যুগে বেশির ভাগ পরিবারে দেখা যায় নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ নিজেরাই বাড়িতে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়। ধোপাকে কাপড় দিলে অনেক

অসুবিধা আছে। কম পরিশ্রমে কম খরচে পরিষ্কার করিবার জন্য উহারা কাপড়-চোপড়ে **ব্লিচিং পাউডার দেয়।** ফলে কাপড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায়। রঙীন কাপড়ের রং তুলিয়া বস্ত্রখানি **পরিধানের অযোগ্য** করিয়া তোলে। অনেক সময় এই দুর্মূল্যের বাজারে বস্ত্রাদি **হারাইয়া** ফেলিতেও ইতস্ততঃ করে না। সর্বোপরি উহাদের হার-এতো বৃদ্ধি করিয়াছে যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে ধোপাকে কাচিতে দেওয়া প্রায় একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ধোপাকে কাপড় দেওয়ার অসুবিধা

পাশ্চাত্য দেশে কাপড় কাচার কাজ উহারা নিজেরাই করিয়া লয় এবং ঐ জন্য উহাদের **বৈজ্ঞানিক উপায়ে** বিশেষ বন্দোবস্তও আছে। কিন্তু আমরা প্রায়ই এই কাজটা বাইরের কোনও চাতালে অথবা স্নানঘরের ভিতরেই করিয়া থাকি। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে যে গৃহ নির্মাণের পূর্বে যদি একটি সুপরিকল্পিত কাপড় কাচার ঘরের ব্যবস্থা করা হয় তবে গৃহস্থালীর প্রতিটি কাজের পক্ষেই উহা সহায়ক হইবে।

কাপড় কাচার ঘর

কাপড় কাচার ঘরটি সাধারণতঃ রান্না ঘরের সংলগ্ন হইলেই ভাল। এই স্থানটি যথেষ্ট **বিস্তৃত ও আলো বাতাস পূর্ণ** জায়গায় হওয়া উচিত। কাপড় কাচার সমস্ত তৈজসপত্রাদি ও সাজ-সরঞ্জামাদি এই ঘরেই সন্নিবেশ করিতে হইবে। এই ঘরে যথেষ্ট জলের ব্যবস্থার জন্য পাশেই একটা **জলের কল** থাকিবে। কাপড় **শুকাইবার ও ইস্ত্রি করিবার** ব্যবস্থাটিও এই ঘরেই করা হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গৃহের কক্ষ বণ্টন

শয়ন ঘর, পড়ার ঘর, বসিবার ঘর, খেলার ঘর, রান্না ঘর, স্নানের ঘর—প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া মূল বাসগৃহের বিভিন্ন স্থান দখল করিয়া অবস্থান করিয়া আছে। কোনও কক্ষের উদ্দেশ্যকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি না। তাছাড়া উদ্দেশ্যরও কিন্তু আবার সীমা নাই। **আর্থিক সঙ্গতি, জীবনের মান, ব্যক্তিগত রুচি,** পরিবারের **লোকসংখ্যা** এই বিষয়গুলির সহিত আবার উদ্দেশ্যগুলির যোগাযোগ রহিয়াছে। আগেকার দিনে রাণীদের আবার **গোঁসা ঘর** থাকিত।

শয়ন ঘর : গৃহের অর্থ ই হইতেছে **'আশ্রয় স্থল'**। এই আশ্রয় জীবনের নিরাপত্তা দেয় এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। গৃহের মূল কক্ষটি শয়ন ঘরকেই গণ্য করা হয়। এই একখানি ঘরেই অভাবের সংসারে সমস্ত কক্ষের উদ্দেশ্য মিটানো হয়। তাই গৃহ পরিকল্পনায় শয়ন ঘর অপরিহার্য। সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর করার জন্য এবং সুনিদ্রার জন্য মানুষ আশ্রয় নেয় এই শয়ন কক্ষটিতে। ইহার নির্মাণ প্রণালী ও পরিকল্পনাটিও তাই হওয়া চাই সতর্কতামূলক। **পথের কোলাহল** ও অন্য প্রকার **বিরক্তিজনক কোলাহল থেকে দূরে এই গৃহের অবস্থান হওয়া উচিত।** ঘরে যথেষ্ট রুজু রুজু জানালার বন্দোবস্ত থাকা চাই, যাহাতে যথেষ্ট **আলো বাতাসের** অভাব না ঘটে। শয়ন ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিক খোলা থাকিবে। ইহাতে গ্রীষ্মের সময় প্রয়োজন মত বাতাস এবং শীতকালে **পর্যাপ্ত কিরণ** প্রবেশ করিয়া ঘরটিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে এবং বাস করার পক্ষেও **আরামপ্রদ** হইবে। লোকসংখ্যা অনুযায়ী শয়ন ঘরটি আয়তনে বড় না হইলে গৃহে **কার্বন-ডাই-অক্সাইডের** মাত্রা বাড়িয়া যায়—এই কারণেই আবার ছোট ঘরে বা **একই বিছানায়** বেশি লোক শয়ন করা উচিত নয়। **স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী** একজন লোকের শয়ন ঘরের আয়তন হওয়া উচিত ১১ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া। আমাদের দেশের শয়ন ঘর সাধারণতঃ প্রয়োজনের তুলনায় ছোট হয়। এক্ষেত্রে ঐ শয়ন ঘরে বেশি আসবাবপত্র সন্নিবেশ করা উচিত নয়—উহাতে বায়ু চলাচলের ও আলো প্রবেশের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অনেক স্থলে শয়ন ঘর সংলগ্ন একটি স্নান ঘরের (Attached Bath Room) ব্যবস্থা দেখা যায়। এই-রূপ ব্যবস্থায় সুবিধা তো বটেই অধিকন্তু গৃহস্বামীর সু-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। শয়ন ঘরের ভিতর দিয়া অন্যান্য ঘরে **যাতায়াতের পথ** না থাকাই বাঞ্ছনীয়—ইহাতে **ঘুমের ব্যাঘাত** ঘটে এবং শয়ন ঘরের **আব্রু** বজায় থাকে না।

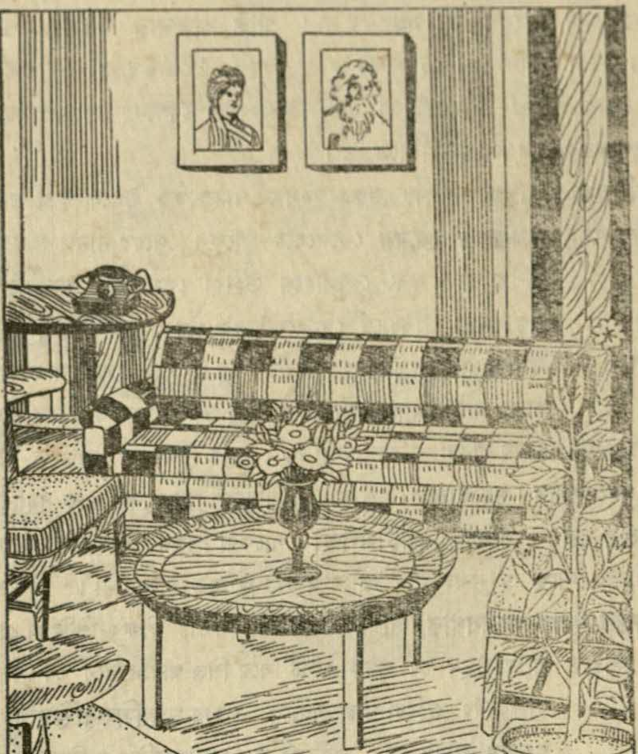
শয়ন ঘরের গুরুত্ব

শয়ন ঘরের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা

বৈঠখানা ঘর : অন্যান্য ঘর থেকে বৈঠকখানা ঘরটি স্বতন্ত্র। এই ঘরের অবস্থিতি সাধারণতঃ বাহিরের দিকেই হয়। **অন্দর মহলের** সহিত সরাসরি **যোগাযোগ** থাকে না। এই ঘরেই গৃহকর্তা তাঁহার **অতিথি অভ্যাগতকে** স্বাগত জানান। গৃহটি প্রধানতঃ বন্ধু-বান্ধব ও অতিথিদের জন্য। এখানে উহাদের বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনের তাগিদে আগমন ঘটে আবার অনেক সময় তাস, পাশা খেলা এবং নিছক গল্প করার উদ্দেশ্যেই পদার্পণ করে। রসিক ব্যক্তির বৈঠকখানা ঘরটিতে অনেক সময় হাসির ফোয়ারা ছোটে। **রাজনীতির গল্প** বিভিন্ন **তত্ত্বমূলক গল্প** এবং নিছক **সাধারণ**

বৈঠকখানা ঘরের পরিবেশ

গল্পের আসরও জমে। বিভিন্ন চরিত্রের লোক এখানে জমায়েৎ হয়—কিন্তু গৃহস্বামীর স্বভাবের গুণে পরিবেশটি কখনও বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে না। বৈঠকখানার গল্প নিয়ে অনেক সময় **সাহিত্য রচনা** হয়। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে শরৎচন্দ্রের **"বৈঠকী গল্পের"** কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।



বৈঠকখানা ঘরের পরিকল্পনা

অন্দর মহলের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া আবার সকল সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ হইতে ঘরখানিকে দূরে রাখিলে চলিবে না। ভোজন ঘরটি এই কক্ষের নিকটবর্তী হওয়া

উচিত এবং যাতায়াতের দরজার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের গৃহের অন্যান্য কক্ষের ভিতর দিয়া ভোজন ঘরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হয় না। কক্ষটি যথেষ্ট বড় হইবে এবং **আলো-বাতাস** প্রবেশের জন্য আবশ্যক মত **দরজা-জানালা** থাকিবে। বৈঠকখানা ঘরে অনেক সময় বহু লোকের সমাবেশ ঘটে, অতএব অন্যান্য ঘরের তুলনায় কক্ষটি বড় না হইলে প্রত্যেককে স্থান পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। **গান বাজনার আসর, সভাসমিতি** প্রভৃতির ব্যবস্থা অনেক সময় এই কক্ষেই করিতে হয়। "বৈঠকখানা" এই শব্দটির ভিতর দিয়াই ইহার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায়—অতএব উপবেশনের উপযোগী বহুল সংখ্যক আসবাবপত্রের সংস্থান এখানে রাখিতে হয়।

কক্ষটির পরিকল্পনা

পাঠ কক্ষ ঃ শিক্ষা দীক্ষার গুরুত্ব হিসাবে পাঠকক্ষের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রতি পরিবারেই **ছাত্র-ছাত্রী স্তরের** ছেলেমেয়ে থাকে। গৃহের নানা রকম বিঘ্নজনক পরিস্থিতিতে এবং কোলাহলে উহারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়। পড়াশুনার সুবিধার্থে ছেলেমেয়েদের পৃথক একখানি পড়িবার ঘরের ব্যবস্থা থাকিলে উহা শুভফলদায়ক হয়। পাঠ কক্ষটি সাধারণতঃ শয়ন ঘরের পার্শ্বে **নিরালা** স্থানেই হওয়াই ভাল। কিন্তু বাহিরের দিক থেকে ঐ কক্ষের একটি দরজার ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। গৃহ শিক্ষকের যাতায়াত ঐ দরজার সাহায্যে হইতে পারে। গৃহাভ্যন্তরে বেশি আসবাব সন্নিবেশ পাঠকক্ষের পক্ষে সমীচীন নহে।

পাঠ কক্ষের প্রয়োজনীয়তা

শিশুর ঘর ঃ সেকালের **প্রাচীনপন্থী** লোকেরা শিশুর জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে এ কথা মনে প্রাণে স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আধুনিক যুগে **মনস্তত্ত্ব মূলক গবেষণার** ব্যাখ্যা থেকে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে পৃথক একটি ঘরে শিশু স্বাধীনভাবে যে খেলাধুলা ও কাজকর্মের সুবিধা পায় তাহাতে তাহার **মানসিকবৃত্তি**গুলি পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ হয়। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও চালিত হইয়া শিশুর স্বাস্থ্যকে **সুন্দর** করিয়া তোলে। খেলার ভিতর দিয়া শিশুর **কল্পনা শক্তি** বৃদ্ধি পায়। শিশু কখনও 'বাবা' হয়। কখনও 'কানাই মাষ্টার' হয়, আবার কখনও দাদা হইয়া ছোটভাইকে শাসন করে। আবার অনেক ছোট মেয়ে তার মার মত রান্নাবাড়া করে। কাজের ফিরিস্তি দেয়, ছেলেমেয়ে বিয়ের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকে, কখনও বা ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। জীবন শিক্ষায় এই **খেলাগুলি** তাৎপর্যপূর্ণ। অতএব আপন মনে শিশুর এই খেলাধুলার সুযোগ দিতে গেলে পৃথক একটি কক্ষের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

খেলা ঘরের প্রয়োজনীয়তা

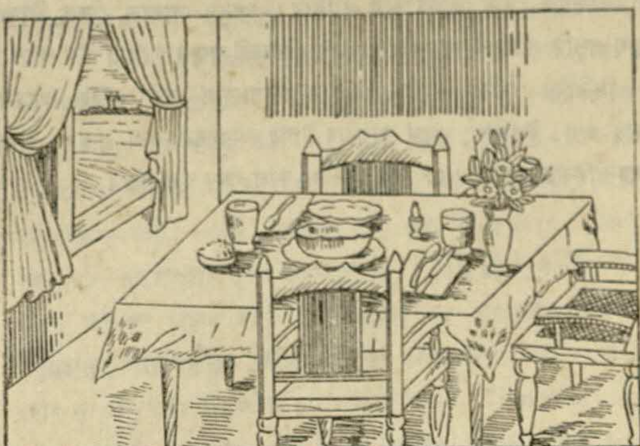
কক্ষটির পরিকল্পনা

ঘরটিতে বেশি **আসবাবপত্র** থাকিবে না। শিশুর ঘরে যাহাতে আলো হাওয়ার কার্পণ্য না ঘটে সেদিকে বয়স্কদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে **সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত আলো** প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে দরজা জানালার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। ঐ ঘরের মেঝে যেন খুব **মসৃণ ও পিচ্ছিল** না হয়, উহাতে শিশুর পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।



শিশুদের খেলাধুলার কক্ষ

ভোজন কক্ষ ঃ রন্ধন গৃহের পাশেই ভোজন কক্ষের ব্যবস্থা রাখা উচিত। অনেক



ভোজনকক্ষের পরিকল্পনা

সময় এই উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র ঘর না থাকিলে রান্না ঘর ও হল ঘরের মাঝখানের স্থানটিতে

টেবিল চেয়ার সন্নিবেশ করিয়া খাওয়ার ঘরের উপযুক্ত করিয়া তোলা যায়। যেখানেই ব্যবস্থা করা হউক না কেন স্থানটি যথেষ্ট **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন** হওয়া চাই। **অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে** ঘরে কখনই ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। **আলো-বাতাসপূর্ণ** জায়গায় খাদ্য গ্রহণের কাজটি সমাপন করিতে হয়। আধুনিক যুগে **পাশ্চাত্ত্য রীতি** অনুযায়ী আমাদের দেশের বেশির ভাগ পরিবারে **টেবিল চেয়ারে** খাওয়ার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করিলে আমাদের দেশীয় প্রথা (মেঝেতে) **আসনে** বা **পিঁড়িতে** বসিয়া খাওয়ার নিয়ম বর্জন না করিলেও চলে।

ভোজন উপবেশনের রীতি

স্নানের ঘর ঃ স্নানের ঘর গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দেয়। সৌখীন ও বিলাসী ব্যক্তি স্নানের ঘরটিকে সুসজ্জিত করিয়া মনোরম করিয়া তোলে। স্নানের ব্যাপারটি একটি **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতার বিষয়**। অতএব এই ঘরটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এইজন্য জল নিকাশের জন্য ভাল **নর্দমা** রাখার প্রয়োজন। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে স্নানের কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। **খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী** প্রভৃতি জলাশয়ে স্নানের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে স্নান ঘরটি অত্যন্ত অবহেলিত।

বাথরুমের আয়তন হওয়া উচিত ৫'×৫' উঁচুর দিকে একটি **দরজা** থাকিবে এবং একটি মাত্র **জানালা** থাকিবে। কাপড় চোপড় রাখার জন্য একটি ব্রাকেট থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া দেওয়ালে ছোট একটি তাক থাকিবে। ওখানে **সাবান, তেল, দাঁতমাজার উপকরণ** প্রভৃতি সন্নিবেশ করা হইবে। স্নানের ঘরটি **রন্ধন গৃহের** ঠিক পাশে অবস্থিত হইলে ধূম্রবিহীন চুল্লীর সহিত পাইপের যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া স্নানের ঘরের চৌবাচ্চার জল শীতকালে গরম করিবার উপায় অবলম্বন করা যায়। অবস্থাপন্ন ও রুচিসম্পন্ন পরিবারে স্নানের ঘরে মোজাইক-এর কাজ লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ প্রকল্প

গৃহ হইতেছে শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের আকর। গৃহের নির্মাণ প্রণালী বা পরিকল্পনা বিষয় আলোচনা করিলেই উহা শেষ হইয়া যায় না। গৃহে বাস করিয়া কেহ **স্বর্গ সুখ** লাভ করে আবার কেহ বা **নরক যন্ত্রণা** ভোগ করে। মানুষ আশ্রয় স্থলটি নির্মাণ করিয়া কত সুখ-শান্তির কল্পনা রচনা করে। ইহা কার্যকরী হওয়ার জন্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করে। নূতন গৃহে বসবাস করিবার পূর্বে আমরা গৃহ সংস্কার অনুষ্ঠানটি করিয়া লই। এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আমরা গৃহ দেবতাকে পূজা করি। এই পূজার ভিতর দিয়াই গৃহটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। গৃহটিকে আমরা সাজাইয়া গুছাইয়া আনন্দের ভিতর দিয়া উৎসবের আয়োজন করি। এই সৌন্দর্য ও শুচিতা দ্বারাই গৃহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এই সৌন্দর্য ও **শুচিতাই** গৃহের শ্রী, গৃহের **লক্ষ্মী**। সৌন্দর্যই আমাদের শান্তিদান করে। গৃহের ত্রুটিবিচ্যুতি ঢাকিয়া সুন্দরতর করিয়া তোলার নামই **প্রসাধন**। প্রসাধন হইতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি।

গৃহ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

গৃহ প্রসাধন গৃহের একটি **প্রধান অঙ্গ**। মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, দৈহিক আরাম ও কাজকর্মের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ প্রসাধন কাজটি হওয়া উচিত। গৃহ সজ্জায় উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক মান মর্যাদার কথা বিবেচনা করিয়া প্রসাধন কার্যটির প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে। গৃহ প্রসাধনে রুচি হইল প্রধান কথা। **সৌন্দর্য জ্ঞান** (Aesthetic sense) ও **রুচি** না থাকিলে গৃহ প্রসাধন ব্যর্থ হইয়া যায়। রুচি থাকিলে **সাধারণ** ও **স্বল্প উপকরণ** দ্বারাই ঘর সাজানো যায়। রুচির কোনও বাধা ধরা নিয়ম নাই। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি—প্রত্যেকটাই সুন্দর হইতে পারে। ইহার **মাপ কাঠি** নাই, পরিবেশের উপর ইহার ভালমন্দ বিচার হয়। একটি সার্থক গৃহ প্রসাধনের ভিতর দিয়া **ব্যক্তিগত শিল্পসত্তা, পারিবারিক ঐতিহ্য** প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যে কৌশলেই গৃহসজ্জা হোক না কেন উহা আড়ম্বরপূর্ণ না হওয়াই ভাল। "Simplicity is the keynote of the modern decoration", যে কোনও সজ্জার ব্যাপারেই কথাটি প্রযোজ্য। আধুনিক যুগে কোনও রমণী তাহার দৈহিক প্রসাধনে অলঙ্কারের বাহুল্যে তাহার দেহখানি আচ্ছাদিত করিয়া রাখে না। আল্পনার দ্বারা, সুন্দর একখানি **কার্পেট** দ্বারা এবং

গৃহ প্রসাধন

কয়েকখানা স্থায়ী **দেওয়াল চিত্র** দ্বারা অনাড়ম্বরভাবে **বাহুল্য বর্জিত** রুচিসম্পন্ন গৃহ প্রসাধন সম্ভব হয়।

গৃহ সজ্জার মূলনীতি

গৃহ সজ্জার উপকরণ হিসাবে বিভিন্ন জিনিষ গ্রহণ করা যায়। আসবাবপত্র, কার্পেট, দেওয়াল চিত্র, পর্দা, মাটি বা ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মূর্ত্তি ইত্যাদি আরও কত টুকিটাকি তুচ্ছ পদার্থ। এমনকি একখানা আলপনা ও ফুল লতাপাতার সাহায্যেও ঘরটিকে সুন্দর করিয়া তোলা যায়। যে উপকরণ দিয়াই সাজানো হউক না কেন মূলনীতিগুলি বজায় থাকিলে ইহা সার্থকতা লাভ করিবে। সৌন্দর্যের মূলনীতি হইতেছে সমন্বয়, সামঞ্জস্য, মাত্রাজ্ঞান ও ছন্দ (Harmony, balance, proportion and rhythm)।

সমন্বয়ঃ সমন্বয় দ্বারা ঐক্যের সৃষ্টি হয়। সমন্বয় ও সঙ্গতির ভিতর একটি সীমারেখা টানা কঠিন ব্যাপার। পূর্ণের সঙ্গে অংশের বা এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের সমাবেশ ঘটাইলে যখন কোন এক বিশেষ রূপ ফুটিয়া ওঠে তখনই বোঝা গেল যথাযথ বিন্যাসের সমন্বয় ঘটিয়াছে। আসবাব পত্রের সঙ্গে বাড়ির আয়তনের, পর্দার রং-এর সহিত দেওয়ালের রং, আবার দেওয়ালের রং-এর সঙ্গে আলোর রং—এরূপ প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির সামঞ্জস্য রক্ষাই সমন্বয়। এই সমন্বয়ের অভাবে সৌন্দর্যের হানি ঘটে।

সামঞ্জস্যঃ সাধারণ কথায় কোন কিছুর ভারসাম্য রক্ষা করাই সামঞ্জস্য। গৃহ প্রসাধন করিতে গেলে একদিকে যদি অন্য দিকের তুলনায় বাহুল্যের সমাবেশ ঘটে তবে সেখানে সামঞ্জস্যের অভাব হয়। অনেক সময় আসবাবপত্রাদি বা 'অন্যরূপ' আকর্ষণীয় বস্তু সমাবেশের বাহুল্যে দৃষ্টি একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই সময় তাহার বিপরীত অংশে কিছু রাখিয়া কক্ষটির ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য দুইদিকে একই মূল্য বা ওজনের বস্তু সমাবেশ করিতে হইবে তাহা নহে। দ্রষ্টার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একদিকে ভারী বস্তু বিপরীতদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সন্নিবেশ করিয়াও এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। গৃহ প্রসাধনে সামঞ্জস্য বিধান অবশ্যই কর্তব্য।

সঙ্গতি বা মাত্রাজ্ঞানঃ যে কোনও সজ্জায় মাত্রাজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। দুইটি জিনিষের পারস্পরিক মিত্রতা বা একত্রিত হওয়ার নাম সঙ্গতি। সুন্দর ও ভাল জিনিষেরও মাত্রা ছাড়াইয়া প্রয়োগ করা হইলে উহা সৌন্দর্যহীন হইয়া পড়ে। ফুল সুন্দর; গৃহ সজ্জায় পুষ্প বিন্যাস একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। কিন্তু সুন্দর কতকগুলি ফুল লইয়া যদি ফুলদানীতে ঠাসিয়া রাখি তবে সেগুলি কখনও মানানসই হইবে না। তার পরিবর্তে যদি ফাঁক ফাঁক করিয়া পাতাসহ কয়েকটি ফুলের গুচ্ছ রাখা যায় তবে সৌন্দর্যের দিক থেকে উহাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে।

ছন্দ : গতি এবং যতি এই উভয় মিলিয়া ছন্দ। গানে ও নৃত্যে ছন্দ পতন ঘটিলে উহা চিত্তবিনোদক হয় না। সেইরূপ গৃহ প্রসাধনেও ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। নৃত্যের ছন্দ পতনে যেমন তাল নষ্ট হইয়া যায়, গৃহ সজ্জার ছন্দ পতন ঘটিলেও সেইরূপ রূপের ব্যাঘাত ঘটে। ছন্দ রক্ষা করিয়া না চলিলে এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর পার্থক্য অনুভব করা যায় না।

গৃহের আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে অনেক গৃহ স্বামী পূর্ব থেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। তাই গৃহ পরিকল্পনায় গৃহটি নির্মাণের সময় মেঝেটি **শ্বেতপাথর** বা **মোজাইক** করা বিভিন্ন নক্সার দ্বারা তৈরী করাইয়া লয়। এরূপ মেঝে হইলে দ্বিতীয় কোনও আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয় না। দেওয়ালে **ফ্রেস্কো বা** অন্য কোনও দেওয়াল চিত্র আঁকা থাকিলে সেখানে নূতন করিয়া আর সাজ-সজ্জার প্রয়োজন হয় না। অসমান, ফাঁটা, ভাঙ্গা মেঝেতে একখানি সুন্দর কার্পেট পাতিয়া উহার দৈন্যতা ঢাকিয়া দেওয়া যায়। গৃহের মেঝেতে লাইনোলিয়ামের পাতও ব্যবহার করা যায়। দরজার সম্মুখে একখানি **কারুকার্য খচিত** পাপোষও গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করায়। মোট কথা যেভাবেই সাজানো হউক না কেন এজন্য চাই **সুক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি, কল্পনাশক্তি** ও **বিন্যাস কুশলতা**।

গৃহ সজ্জায় পূর্ব পরিকল্পনা

আসবাবপত্র নির্বাচন : আসবাবপত্র নির্বাচন গৃহ প্রসাধনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। আসবাবপত্র নির্বাচনে সব সময় রুচির উপর নির্ভর করে না। **ক্রয় ক্ষমতা** না থাকিলে উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর আসবাব সংস্থাপন করা কোন প্রকারে সম্ভব হয় না। এজন্য **পুরাতন আসবাব** পত্রাদি **রং ও পালিশ** করাইয়া গৃহে ব্যবহার করা যায়। ভাঙ্গা চোরা আসবাবপত্রও মেরামত করিয়া কাজে লাগানো যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় সুরুচি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, রুচি এবং সৌন্দর্য্যবোধের সহিত **আর্থিক সঙ্গতি** থাকিলে প্রসাধন ব্যাপারটি সার্থকতা লাভ করে।

আজকাল অনেক পরিবারে **পুরানো আসবাবপত্র** (Second Hand) **অল্প দামে** ক্রয় করে। এইগুলিতে রং পালিশ করিলে আবার নূতনের মত মনে হয়। বিভিন্ন কক্ষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আসবাবপত্র সন্নিবেশ করিতে হয়। আসবাবপত্রের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও গৃহে আসবাবপত্রের স্থান দিতে হয়। অত্যন্ত ভারী এবং **কারুকার্য খচিত** আসবাবপত্র নির্বাচন না করাই ভাল। ঐ সমস্ত ভারী আসবাব-পত্র স্থানান্তর করা যায় না, তাহা ছাড়া **ধূলা জমিয়া** জিনিষটাকে নষ্ট করিয়া দেয়। হাল্কা অথচ মজবুত সামান্য কারুকার্যযুক্ত ও দেখিতে সুন্দর এরূপ আসবাবপত্র নির্বাচন করা প্রশস্ত।

গৃহের আয়তন ও **অবস্থান** অনুযায়ী আসবাবপত্রের আকৃতি হওয়া উচিত। একটি ক্ষুদ্র কক্ষের জন্য কতকগুলি বৃহৎ আকৃতির আসবাবপত্র সংস্থান অত্যন্ত বেমানান হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া **আলো বাতাস প্রবেশের বিঘ্ন সৃষ্টি** করে, **চলাচলের** পক্ষেও অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

ছেলে মেয়েদের পড়ার জন্য **চেয়ার টেবিল** বা **ডেস্ক** নির্বাচন করিতে হইলে পড়ুয়ার **দৈহিক উচ্চতা** অনুযায়ী আসবাবপত্রটি ছোট, বড় বা মাঝারি মাপের হওয়া উচিত। সেইরূপ শিশুর ঘরের আসবাবপত্রগুলি যথেষ্ট ছোট হওয়া প্রয়োজন। কোনও ভারী আসবাবপত্র শিশুর কক্ষে সন্নিবেশ করা উচিত নয়। আসবাব পত্রাদির অভাবে গৃহ সজ্জার কাজটি কেবলমাত্র আলপনার দ্বারা সুসম্পন্ন করা যায়।

গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সজ্জা: গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সজ্জা একটি কঠিন ব্যাপার। সেইজন্য গৃহ নির্মাণের সময় ইহাতে **ফ্রেস্কো** (Fresco) বা অন্যান্য **দেওয়াল চিত্রাঙ্কনের** ব্যবস্থা করিয়া নিলে উহাই স্থায়ী হইতে পারে। নূতন করিয়া সাজাইবার প্রয়োজন হয় না। অন্য পদ্ধতিতেও দেওয়াল সজ্জার ব্যবস্থা করা যায়। দেওয়ালে **আয়না** লাগাইয়া, **ওয়াল পেপার** লাগাইয়া প্রভৃতি দেওয়াল সাজাইবার নানা পন্থা অবলম্বন করা যায়। দেওয়াল সজ্জার প্রধান কথাই হইল রং। কেবলমাত্র উপযুক্ত রঙ্গীন দেওয়ালের বিভিন্ন রকমের ছবি টাঙ্গানো থাকিলেই দেয়াল সজ্জার কাজটি সম্পন্ন হয়। শয়ন কক্ষের দেওয়ালের রং হাল্কা নীল অথবা হাল্কা সবুজ হইতে পারে। আবার



গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সজ্জা

পাঠ কক্ষের রং হওয়া উচিত **সোনালী** রং, ছোট শিশুর খেলার ঘরেও এই রংই নির্বাচন

করিতে হয়। **রুচি সম্পন্না ও আর্থিক সঙ্গতি** সম্পন্না গৃহকর্ত্রী অনেক সময় দেওয়ালে চিত্রাঙ্কণ করাইয়া গৃহটিকে মনোরম করিয়া তোলে। এই চিত্রাঙ্কণও বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন ধরণের হইবে। কেননা শয়ন কক্ষে যে চিত্র চলে বসিবার ঘরে তাহা অনেক সময় অনুপোযোগী হয়। শয়ন কক্ষের ছবি আলো ও রঙ্গের খেলায় এক স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করে যাহা মনের ও দেহের ক্লান্তি দূর করার সহায়ক হয়। কোনও কোনও চিত্র আবার মানুষকে **কল্পনা বিলাসী** করিয়া তোলে। এরূপ ছবি ছেলেমেয়েদের পাঠ কক্ষে কখনই অঙ্কন করা উচিত নয়। আধুনিক যুগে অনেক গৃহকর্তা প্রাচীন ইতিহাসের **অজন্তা গুহার** নানা প্রকার ছবি দেওয়াল চিত্র হিসাবে অঙ্কন করাইয়া গৃহের **সৌন্দর্য বর্ধন** করেন। ইহা ছাড়া **প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর** ছবি যে কোনও কক্ষে চলিতে পারে।

শিশুদের খেলার ঘরে রং-এর উজ্জল্যে ঝলমল করা কোনও ছবি দেওয়ালে সন্নিবেশ করিতে হয়। এই ঘরের ছবিগুলি দেওয়ালে খুব উঁচু স্থানে অঙ্কিত না হইয়া যতটা উঁচুতে শিশুরা সহজেই দেখিতে পারে ততটা উচ্চতায় আঁটকানো উচিত। দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন করানো ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া দেওয়ালে চিত্র সন্নিবেশের কাজ সার্বজনীন-

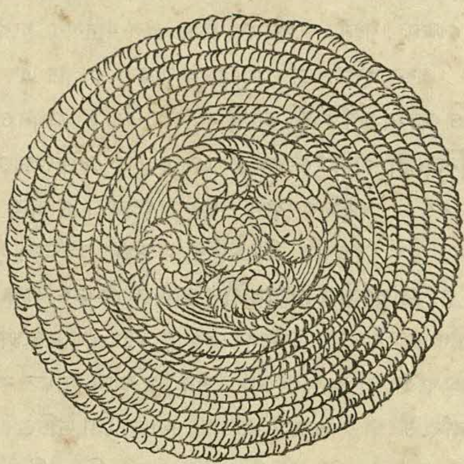
ছবি নির্বাচন

ভাবে চলিতে পারে। দেওয়ালে চিত্র সন্নিবেশে রুচি ও সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। চিত্র সন্নিবেশে কতকগুলি কথা সব সময়ই স্মরণ রাখিতে হয়। কোনও **অশালীন নগ্ন ছবি** দেওয়াল সজ্জা হিসাবে ব্যবহার করা **রুচি বিরুদ্ধ**। কোনও **হাস্যাস্পদ** ছবি দেওয়ালে স্থান না পাওয়াই উচিত। মানুষকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোন ছবিও সন্নিবেশ করা উচিত নয়। সব মানুষই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব—যাহা সুন্দর, যাহা সত্য, এবং যাহা **শান্তি ও স্নিগ্ধতা** আনিয়া দেয়, সেই সমস্ত ছবিই দেওয়ালের জন্য নির্বাচন করিতে হয়।

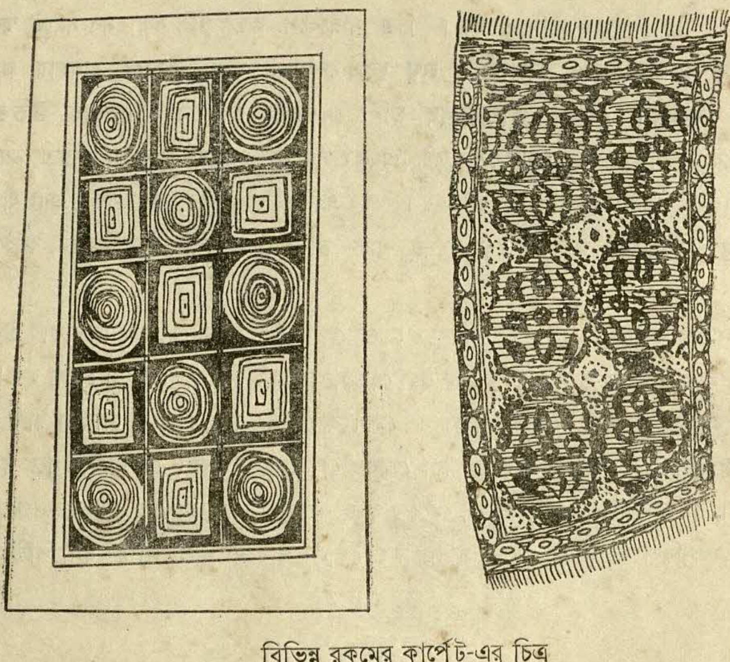
আবার অনেক সময় চিত্রের পরিবর্তে দেওয়ালে চিত্রিত মাদুর মোটা ক্যানভাসের উপর আঁকা নানা রকমের ছবি প্রভৃতি টাঙ্গাইয়া দেওয়ালের ত্রুটি বিচ্যুতি ঢাকিয়া ফেলা হয়।

মেঝের সজ্জা : মেঝের সজ্জা অর্থ মেঝেকে কোনও কিছুর দ্বারা ঢাকিয়া রাখা বা **মোজাইক, শ্বেতপাথর** প্রভৃতি দ্বারা মেঝের শোভা বর্ধন করা (এই কাজটি পরে সম্ভব হয় না, বাড়ি নির্মাণের সময় এইরূপ মেঝের কাজ করাইয়া নিতে হয়)। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহের মেঝে সাধারণতঃ কোন আবরণ থাকে না। ধনী পরিবারে

বিভিন্ন কার্পেটের সাহায্যে মেঝের সজ্জা সম্পন্ন করা যায়। ইহা বহুল পরিমাণে গৃহের শ্রী



বৃদ্ধি করে। সতর্ক না হইলে অনেক সময়ই এই ব্যবস্থায় কার্পেটের ভিতর **ধূলা** জমে



বিভিন্ন রকমের কার্পেট-এর চিত্র

এবং **রোগজীবাণুও** আশ্রয় নিতে পারে। কার্পেট ছাড়া কারুকার্য করা **দড়ির ম্যাটিং,**

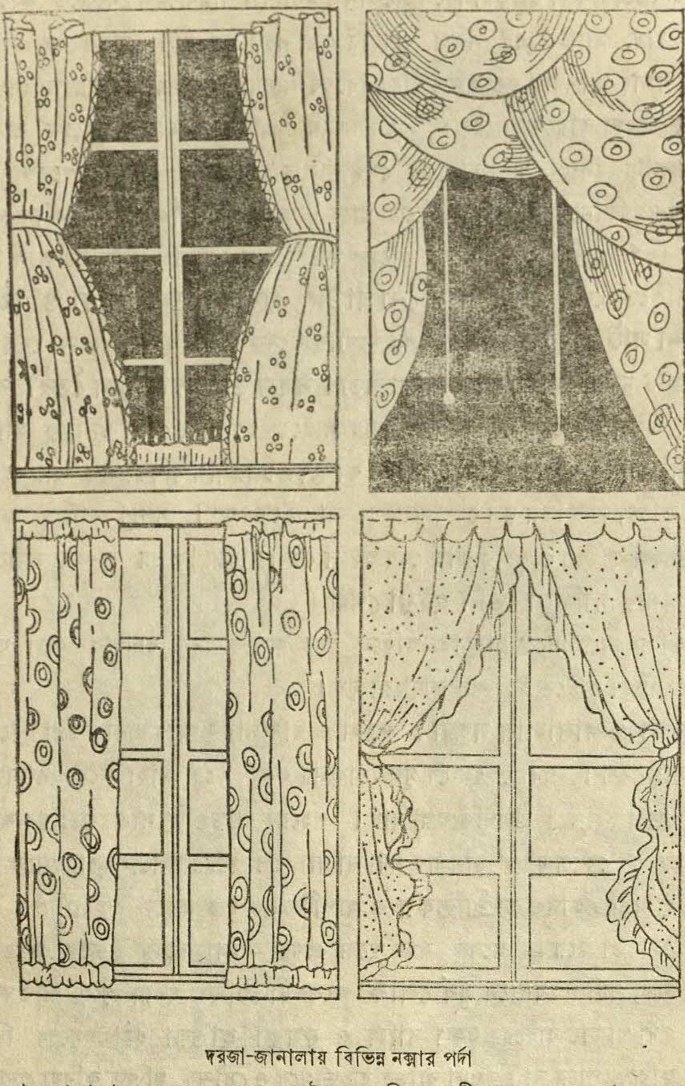
লিনোলিয়ামের পাত প্রভৃতিও মেঝের আচ্ছাদন হিসাবে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়তা করে।

নিম্নবিত্তদের কথা ছাড়িয়া দিলেও কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারেও মেঝেতে কার্পেট, লিনোলিয়াম, ম্যাটিং এই সকল ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। তবুও গৃহ সজ্জায় বৈচিত্র্য বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ অনুষ্ঠানে গৃহকর্ত্রী মেঝের আচ্ছাদনের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন। এমন অনেক জিনিস আমাদের গৃহস্থের সংসারে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে ফেলা যায়, যে সেই সকল অবহেলার জিনিস অনেক সময় একটি সুন্দর জিনিসে পরিবর্তিত হইতে পারে। অবশ্য গৃহকর্ত্রীর এদিকে ঝোঁক থাকা দরকার।কর্মঠ গৃহকর্ত্রীকে সংসারের কাজের ফাঁকে অনেক সেলাই ফোঁড়াইর কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। **পুরানো ব্লাউজ, পুরানো ফ্রক, সাদা ও রঙ্গীন পুরানো সার্ট প্রভৃতি** জমাইয়া যখন সংখ্যায় অনেক বেশী হইবে, তখন সেইগুলি ছোট ছোট টুকরা কাটিয়া ভাজ করিয়া অত্যন্ত **সহজ প্রক্রিয়ায় ফুল তৈরী করা** যায়। এইবারে কক্ষের যে অংশে আসবাব সন্নিবেশ হয় নাই, সেই স্থানটুকু মাপিয়া ঐ মাপের মার্কিণ কাপড় কিনিতে হয়। কাপড়ের চারিপাশ মুড়িয়া এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফুল রং মিলাইয়া লাগাইতে হয়। সম্পূর্ণ মার্কিণ কাপড় খানিতে ফুল জুড়িয়া দেওয়ার কাজ শেষ হইলে দেখা যাইবে বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে একটি **সুন্দর গালিচা তৈরী হইয়া গেল**।

ইচ্ছামত মাঝে মাঝে ব্যবহার করিলে ইহা অনেক দিন ব্যবহার করা যায়। মেঝের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ইহা কম কার্যকরী নয়।

দরজা ও জানালার সজ্জা : দরজা ও জানালার সজ্জার প্রধান কথা হইতেছে **পর্দা সন্নিবেশ**। পর্দা কেবল যে গৃহপ্রসাধনের কাজ করে তাহা নহে—নানাভাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। শহরের বাড়িগুলি সাধারণতঃ খুব কাছা-কাছি হয়, সে ক্ষেত্রে দরজা জানলায় পর্দা না থাকিলে ঘরের **আব্রু** বজায় থাকে না। আবার বাইরের কোনও **অপ্রীতিকর** ও আপত্তিজনক দৃশ্য হইতে গৃহবাসীদের দূরে রাখার সহায়তা করে। অনেক সময় সূর্যের প্রখর আলো ঘরের ভিতর তীব্রভাবে প্রবেশ করে, পর্দা সংযোজনে **সূর্যালোক** অনেকটা স্তিমিত হইয়া গৃহে প্রতিফলিত হয়। পর্দা থাকায় বাইরের **ধূলা বালি ও দমকা হাওয়া** হঠাৎ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। পর্দা বাড়ির বহির্ভাগকেও সৌন্দর্য মণ্ডিত করিয়া তোলে। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পর্দা বাড়ী **চিহ্নিত করে** অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাড়িটি চিনিবার উপায় হয় এই পর্দা।

নানা রকমের নক্সার পর্দা হইতে পারে তবে ছোট জানালা, দরজার **সাদাসিধা** সরল এবং সহজ কাটিং-এর পর্দাই মধ্যবিত্ত পরিবারে ব্যবহার হয়। পর্দা সংযোজনার



দরজা-জানালায় বিভিন্ন নক্সার পর্দা

নৈপুণ্যে জানালাকে অনেক সময় ছোটা বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পর্দা সংযোজনার কতকগুলি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। পর্দা আড়ম্বরপূর্ণ না হইয়া সহজ সরল হওয়াই ভাল। **কুচি, ফ্রিল** ও লেসযুক্ত পর্দা অনাবশ্যকভাবে পর্দাকে ভারী করিয়া

তোলে এবং অযথা কাপড় নষ্ট হয়। পর্দা বিন্যাসে সামঞ্জস্য ও মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখা আবশ্যক।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্দাটিও বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন নক্সার হইবে। পর্দা বিন্যাসে রং একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ঘরের আলো, দেওয়ালের রং ও চিত্র প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পর্দার রং হওয়া উচিত। উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ রং পর্দার জন্য ব্যবহার করা যায়। এই কারণে পর্দার রং **নীল** বা **সবুজ** হইলে ভাল হয়। পড়ার ঘরের ও শিশুর ঘরের পর্দা **সোনালী রং**-এর হইতে পারে। শিশুর ঘরের পর্দায় বড় বড় **জন্তু জানোয়ারের** রঙ্গীন ছবি থাকিলে ভাল হয়, উহা শিশু মনকে আকৃষ্ট করে।

গৃহ প্রসাধনে পুষ্প বিন্যাস : আদিম যুগের লোকেরা বন লতাপাতা দিয়া উহাদের আশ্রয় কুটির নির্মাণ করিত আবার ফুল লতাপাতার অলঙ্কার পরিধান করিত। সেই আদিম প্রকৃতি আধুনিক যুগের নারীর ভিতরও রহিয়া গিয়াছে। ফুলের গহনা পরিধান করা আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত। কোন উৎসব পরিবেশে মেয়েরা ফুল দিয়া **কেশবিন্যাস** করে। আবার নব বিবাহিতা বধূকে আমরা ফুলের আভরণে সজ্জিত করি। ফুলের সমাদার সর্বযুগে সর্ব দেশে সর্বজনের কাছে চলিয়া আসিতেছে। **জাপানীরা** তাহাদের চিঠির ভিতর দুই ছত্র লিখিয়া তাহাদের ভিতর ফুলের একটি নক্সা আঁকিয়া দেয়। ফুল ভালবাসে না এমন ব্যক্তি জগতে খুব কমই আছে। রুচিসম্মত গৃহের একধারে প্রাঙ্গনে ছোট্ট একটি ফুলের বাগান দেখা যায়।

পুষ্পের প্রয়োজনীয়তা

দেবদেবীর পূজায় পুষ্প একটি অপরিহার্য দ্রব্য। ফুল ছাড়া কোনও পূজা হয় না। শহরে এই ফুল প্রায়ই কিনিতে হয়। দেবতার পূজায় অর্পণ করা হয় বলিয়াই হয়তো ফুল এতো পবিত্র। ফুলের মত পবিত্র আর কিছু নাই। পবিত্র শিশুর তুলনা দিতে গেলে ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়া আমরা বলি "নিষ্পাপ শিশু ফুলের মতই সুন্দর"।

গৃহ প্রসাধন করিতে গিয়া ফুলকে বাদ দিলে গৃহ সজ্জার একটি প্রধান ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। সামান্য কয়েকটি পাতাযুক্ত কয়েকটি ফুল ঘরের আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়।

জন্মদিনে, বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ফুল উপহার দেওয়ার রীতি আমাদের দেশেও প্রচলিত। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান, স্কুল-কলেজের-উৎসব, সভা-সমিতি প্রভৃতি যে কোনও সাজ-সজ্জাতেই—পুষ্প একটি অপরিহার্য দ্রব্য।

গৃহে পুষ্প সজ্জার রীতি : পুষ্প বিন্যাসের জন্য নানা রকমের ফুলদানী (Vase) আছে ; যেমন—**ছোট, বড়, চওড়া, চ্যাটলো,** আরও কত রকমের নক্সা,—প্রত্যেকটিই ফুল অনুসারে ব্যবহার করা হয়। ফুলদানীগুলি টেবিল, টুল, টি-পয়ের উপর সাধারণতঃ রাখা হয়। ঘরে **কুলুঙ্গেও** ফুলদানী রাখিয়া শোভা বর্ধন করা যায়। **খাওয়ার টেবিলে** ফুল সহ একটি ফুলদানী রাখিলে গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ফুল-



গৃহের পুষ্প সজ্জা

দানী রাখিবার ব্যাপারে কোনও **বাঁধাধরা** নিয়ম নাই। ঘরের মাঝখানে, এক কোনে যে কোনও স্থানেই গৃহের আসবাব পত্রাদি সন্নিবেশ অনুযায়ী ফুলদানী রাখা যায়। তবে গৃহের মাঝখানে **টিপউয়ের উপর এক গুচ্ছ ফুল** ঘরটিকে অধিকতর স্নিগ্ধ ও মনোরম করিয়া তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। **পড়িবার ঘর, শয়নঘর, বসিবার ঘর খাবার ঘর** যে কোনও ঘরেই পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত করা যায়। সাধারণতঃ গোলাপ, চাঁপা, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, প্রভৃতি ফুলেরএকত্রিত সমাবেশ ঘটাইয়া পুষ্প বিন্যাসের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এই সমস্ত ফুল রূপে, গন্ধে, বর্ণে কক্ষটিকে এক অপূর্ব স্বষমায় ও মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তোলে। ফুল মানুষের সমস্ত **মানসিক ও শারীরিক** ক্লান্তি দূর করিতে সহায়ক হয়। শয়ন ঘরে মৃদুগন্ধ যুক্ত সাদা ফুল হইলেই ভাল হয়। **যুঁই, বেল, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা** এই ফুলগুলি **শুচিতার প্রতীক** হিসাবে মনকে পবিত্র করিয়া তোলে।

বিভিন্ন ঘরের পুষ্প সাজসজ্জা

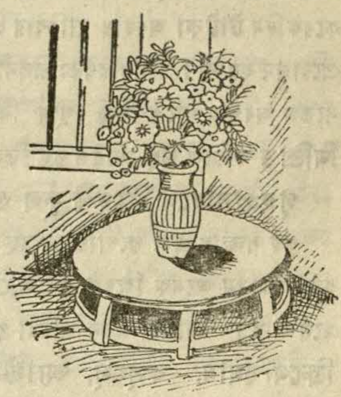
দেওয়াল ফুলদানী দ্বারাও ঘরকে সাজানো যায়। সাধারণ ফুলদানীর মত দেওয়াল ফুলদানীর গঠন বা আকৃতি একরূপ হয় না। দেওয়াল ফুলদানীর পিছনটা চেপটা থাকে এবং দেওয়ালে লাগাইবার জন্য একটা আংটা থাকে। দেওয়াল ফুলদানীতে কৃত্রিম ফুল দ্বারা সাজাইতে পারিলে কাজটি সুবিধাজনক হয়। কারণ প্রতিদিন পরিষ্কার করিবার হাঙ্গামার প্রয়োজন হয় না।

দেওয়াল ফুলদানীর ব্যবহার

কিন্তু প্লাষ্টিকের তৈরী কৃত্রিম ফুল লতাপাতা প্রকৃতির ফুলের সহিত তুলনাই হইতে পারে না। ইহার রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নাই—আছে কেবল বর্ণের চাকচিক্য। ধুলাবালি পড়িলে এবং বায়ুর প্রভাবে কিছুদিন পর এই উজ্জ্বলতাও নষ্ট হইয়া যায়।

পুষ্পবিন্যাসের জন্য কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন না করিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি ফুল ও লতাপাতা সহ গৃহের বিভিন্ন কক্ষকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিলে খুবই মনোরম ও শোভনীয় হয়। অবশ্য এজন্য সুরুচির প্রয়োজন হয়। ফুল দিয়া ঘর সাজাইবার ব্যাপারটিতেও মাত্রা, ছন্দ ও সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়। অনেকে খুব জমাকালো কাজ করা একটি ফুলদানীর ভিতর বিভিন্ন রং-এর ফুল লতাপাতা সহ একটি গুচ্ছ রাখিয়া দেয়—এই প্রসাধন দৃষ্টিকে পীড়াদায়ক করিয়া তোলে। ইহা মোটেই চিত্ত বিনোদনের সহায়ক হয় না। আধার সব সময়ই সহজ ও আড়ম্বড় শূন্য হইবে তাহা না হইলে ফুলের উপর দৃষ্টি না পড়িয়া ফুলদানীর উপর পড়িবে। ফুলের সৌন্দর্য ইহাতে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। দোতলায় উঠিবার সিঁড়িতে ধাপেধাপে বিভিন্ন ফুলের টব সাজাইয়া রাখিতে পারিলে ঐ স্থানটি একটি প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপে আবার গৃহে প্রবেশ পথের একধারে দরজার নিকট মানিপ্ল্যাণ্টের গাছ লতাইয়া দিতে পারিলে সমগ্র গৃহটির প্রবেশ পথ সৌন্দর্যে ভরিয়া ওঠে। টবে রঙ্গীন অর্কিডের চারা ঝুলাইয়া দিলেও দেখিতে খুব সুন্দর হয়।

ফুল ও ফুলের আধার

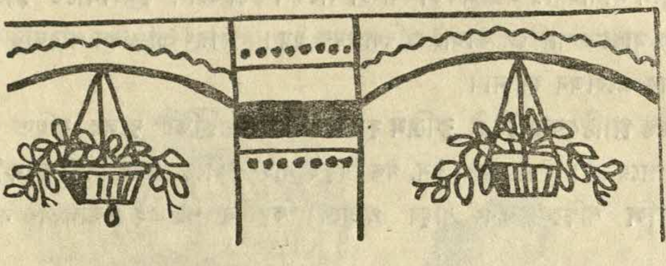


আড়ম্বরশূন্য আধারে পুষ্পবিন্যাস

কতকগুলি ছোট ফুলকে আমরা চ্যাটালো ফুলদানী অথবা সুন্দর একখানি

রেকাবীর ভিতর রাখিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারি। **শিউলি, বকুল, দোপাটি, গাঁদা**, প্রভৃতির ফুল এইরূপ প্রসাধনের কাজে ব্যবহার করা যায়।

পুষ্প গুচ্ছ এবং ঝরা ফুল ছাড়া **মালা** দিয়াও ঘর সাজানো যায়। গৃহে কোনও



ফুলঝড়া

মহামানবের ছবি, **ঠাকুর দেবতার** ছবি এবং কোনও **মৃত প্রিয়জনের** ছবিতে আমরা সাদা ফুলের মালা পরাইয়া বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গৃহের রূপকে পরিবর্তন করিয়া দিতে পারি।

শহরের দিকে গৃহ প্রসাধন অনেক সময়ই ব্যয় বহুল হইয়া থাকে। ফুলকে কয়েকদিন **টাটকা** অবস্থায় রাখিবার প্রক্রিয়া জানা থাকিলে প্রতিদিন ফুল কেনার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ রজনীগন্ধা, ডালিয়া, পদ্ম কেনার পরও দুই একদিন সতেজ অবস্থায় থাকে কিন্তু পুষ্প বিন্যাসের ব্যপারে ফুলদানীর ভিতর জলে **লবণ মিশ্রিত** করিলে উহা আরও দুই তিনদিন বেশি ব্যবহার করা যায়।

গৃহপ্রসাধনে বিদেশী ফুল ও পাতা

গৃহ সজ্জায় এবং পুষ্পোদ্যানে বহু বিদেশী ফুলের সমারোহ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এমন অনেক বিদেশী ফুল আছে, যাহা আমরা নিজেদের দেশের ফুল বলিয়াই মনে করি। ডালিয়া এখন আমরা পুষ্প বিলাসীদের উদ্যানে দেখিতে পাই। **জিনিয়া, ক্রিমেন্থিমাম, কস্‌মস্‌, অ্যাস্টার, ফ্লক্স, কক্সকম্ব, নিকোটিয়ানা, পপি, সুইটপীজ, হোলিহক**—এই সকল আমাদের ভারতীয়দের উদ্যানে এতো বেশী যে বিদেশী বলিয়া যেন আর গণ্য করা যায় না। বিদেশী ফুলের গন্ধ অপেক্ষা রূপের বাহারই বেশী। এগুলি আমরা পূজা অর্চ্চনায় ব্যবহার করি না কিন্তু রং বেরং-এর ছোট, বড় ফুলগুলি যখন পাতার সহযোগে ফুলদানীতে রাখিয়া দেওয়া হয় তখন সেই কক্ষটির আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়।

ফুলের সহিত লতাপাতার সন্নিবেশ পুষ্প বিন্যাসকে পূর্ণ করিয়া তোলে। ফুলের

স্তবকের ভিতর পাতা মিশাইয়া আমরা সব সময়ই উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করি। আমাদের দেশী পাতার ভিতর কোনও নূতনত্ব লক্ষ্য করা যায় না। আকৃতিতে ও রঙ্গে সবই প্রায় এক। চাইনিজ **এভারগ্রান, সাইট্রাম, ক্যামেলিয়া, ইউক্যালিপটাস, ক্যানা পাতা** এবং অন্যান্য বিদেশী রঙ্গীন পাতা ফুলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ফুলের সৌন্দর্য অনেক বাড়াইয়া দেয়।

আলপনা

সংস্কৃতের **'আলিম্পন'** শব্দ হইতে 'আলপনা' শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। আদিম যুগ হইতে এই আলপনার প্রচলন চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন যুগের আলপনা এবং আধুনিক যুগের আলপনার ভিতর রূপগত ও ভাবগত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। আদিম যুগের গুহাচিত্রের ছবিতে আলপনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই আদিম অধিবাসীরা যখন গৃহ রচনা করিতে শিখিল, তখন অপদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মঙ্গল কামনায় এবং নানারূপ **প্রাকৃতিক দুর্যোগ** হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৃহদ্বারে এবং গৃহ সংলগ্ন বেদীতে মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ নানারূপ রেখা চিহ্নিত করিয়া রাখিত। পৌরাণিক ইতিহাস হইতেও যজ্ঞস্থানে নানা রূপ জ্যামিতিক রেখার টান লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান যুগেও আদিবাসী **সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল** প্রভৃতি জাতির গৃহগুলিতে নানাপ্রকার আলপনার নক্সা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে কেবলমাত্র যে চালের গোলার আলপনাই দেওয়া হয় তাহা নহে। পল্লী রমনীগণ **ফুল, ফল, শস্য** বিভিন্ন দ্রব্যের আলপনা অঙ্কিত করিয়া দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনার স্থানটি পবিত্র ও মনোরম করিয়া তোলে। বিচিত্র দ্রব্য সম্ভারে স্থানটি রূপে রসে, গন্ধে ভরপূর হয়ে ওঠে। আলপনার স্থানটি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ছোট বড় বিভিন্ন রং এর ফুলের সাহায্যে **ছন্দ, মাত্রা, সামঞ্জস্য** বজায় রাখিয়া মনের ইচ্ছা মত বিভিন্ন নক্সার আলপনা অঙ্কন করা হয়। প্রয়োজন বোধে ইহাতে অনেক সময় পাতা ব্যবহার করা যায়।

ফুলের আলপনা

ফুলের সহিত **আমপাতা, বেলপাতা** ব্যবহার করিলে আলপনাটি আরও সুন্দর মনে হয়। **পূজার্চ্চনার উদ্দেশ্যটিও বজায় থাকে**। ফলের আলপনা দিতে গেলে সাধারণতঃ পাথরের থালা এবং কাঠের রেকাবীতেই দেওয়া উচিত। ফলের আলপনার মাধ্যমে নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি বজায় রাখা যায়। **আম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, পেয়ারা, জাম, আপেল, আঙুর, কুল, বাতাবী লেবু, কমলালেবু** প্রভৃতি ফল টুকরা করিয়া নক্সার সাহায্যে থালাতে সাজাইয়া দেওয়া যায়। ফুলের মত ফলও রং বেরং এর

ফলের আলপনা

হয়। রং এর সমাবেশে আকৃতির বৈচিত্র্যে এই আলপনাও কম আকর্ষনীয় হয় না।

শস্যের আলপনা

শস্যের আলপনায় বিভিন্ন **ডাল, চাল, গম, তিল, সরিষা** প্রভৃতি স্থান পায়। বিরাট আকৃতির একটি পিতলের থালায় শস্যের আলপনা দিতে পারিলে ভাল হয়। শস্য বসাইবার পূর্বে আলপনার নক্সাটি আঁকিয়া নিলে ভাল হয়। **মুসুরি, মুগ, মটর, ছোলা, কলাই, ধান, চাল** প্রভৃতি শস্যের বিভিন্ন আকৃতি বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে এবং শিল্প চাতুর্যে এই ধরনের আলপনা নূতনত্ব সৃষ্টি করে সন্দেহ নাই! এই সকল আলপনা রচনায় যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে আলপনা সৃষ্টি করা বাংলার মেয়েদের একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট মেয়েরা প্রদর্শনী সাজাইবার জন্য, **খই, সাবুদানা, কালোজিরা** প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের সাহায্যে সুন্দর সুন্দর নক্সা অঙ্কন করিয়া আলপনা দিয়া থাকে। এই আলপনার জন্য বড় কাগজের উপর পেন্সিলের সাহায্যে নক্সা আকিয়া উহার উপর **গঁদের আঠা** লাগাইতে হয়। তারপর খই, সাবুদানা, কালো-জিরা প্রভৃতি দ্বারা ভরাট করিতে হয়। রুচিবোধ ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান থাকিলে নানা জাতীয় জিনিস দ্বারা আলপনা দেওয়া চলিতে পারে।

প্রাচীনকালে পল্লী বাংলায় আলপনা মেয়েদেরই একচেটিয়া শিল্প ছিল। পূজা, পার্বন, ব্রতেই আলপনার ব্যবহার চলিত। আলপনার উপাদানের অনেক পরিবর্তন

গৃহসজ্জায় আলপনার স্থান

ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া পূজা পার্বন ছাড়া গৃহ সজ্জায় এখন আলপনা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। আলপনার জন্য **প্রয়োজন হয় শিল্পী মন, অর্থের প্রয়োজন হয় না**। গৃহ প্রসাধনে যেখানে আসবাব পত্রের অভাব সেখানে কেবলমাত্র কয়েকখানি আলপনা কক্ষটির সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে। **ঘরের কোণে, জানলার কাছে ঠিক পর্দার নীচে, দরজার সামনে** আলপনা দিয়া রাখিলে খুবই মনোরম হয়।

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অসুন্দরকে বর্জন করিয়া সুন্দর দেবতার মূর্তি কল্পনায় নানা রকম **প্রতীক** চিহ্ন আলপনায় দিতে আরম্ভ করিল। গৃহের ঐশ্বর্যও মঙ্গলসূচক প্রতীকের ভিতর দিয়া তাহারা দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল। অপ দেবতা হইতে ভয় দূর হইয়া দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিল। এইভাবে আদিম যুগ হইতে সভ্য যুগে আলপনার কৌশলেরও পরিবর্তন হইল। আলপনায় 'প্রতীক' প্রথম সূর্য পূজায় স্থান পাইয়াছে। সূর্য গোল বলিয়া সূর্য পূজায় মণ্ডলাকারের রেখা চিত্র অঙ্কন করিয়া সূর্যকে আরাধনা করা হইত। **বাংলাদেশের** আলপনায় **সূর্য-প্রতীকের**

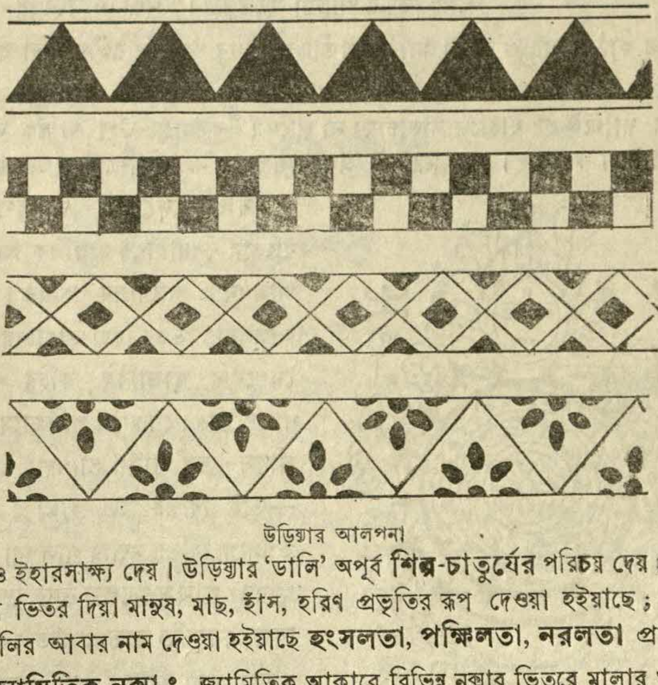
পরই লক্ষ্মী প্রতিকের আবির্ভাব। আলপনার রেখাচিত্র হইল কামনা-বাসনার প্রতীক।

আলপনার প্রতীক

আলপনায় ব্যবহৃত **লক্ষ্মীর ঝাঁপি, আয়না, চিরুণি** সবই মানুষের কামনার বস্তু। কালের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলপনায় প্রতীক-ধর্মীর পরিবর্তে সৌন্দর্য সৃষ্টির ঝোঁক দেখা গেল।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আলপনা

উড়িষ্যার আলপনা : উড়িষ্যার প্রাচীন **মণ্ডন-শিল্প** আজ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। উড়িষ্যার বর্তমান আলপনার কাজে এখন আর কোনও নৈপুণ্য নাই। এখনকার এই সহজ সরল মোটা কাজ দেখিলে মনে হয় না যে, উড়িষ্যা একদিন আলপনার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল ; ঐ শিল্পসমূহকে আলপনা না বলিয়া মৃৎ-শিল্প বা স্থাপত্য-শিল্প বলিলেই ভাল হয়। উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দির ও ভগ্ন স্থাপত্য শিল্পগুলি



উড়িষ্যার আলপনা

আজও ইহারসাক্ষ্য দেয়। উড়িষ্যার 'ডালি' অপূর্ব **শিল্প-চাতুর্যের** পরিচয় দেয়। বিভিন্ন লতার ভিতর দিয়া মানুষ, মাছ, হাঁস, হরিণ প্রভৃতির রূপ দেওয়া হইয়াছে ; এইজন্য এইগুলির আবার নাম দেওয়া হইয়াছে **হংসলতা, পক্ষিলতা, নরলতা** প্রভৃতি।

জ্যামিতিক নক্সা : জ্যামিতিক আকারে বিভিন্ন নক্সার ভিতরে মালার আকারে বিভিন্ন আলপনা উড়িষ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলপনাগুলিকে **মালা** বা মালী বলে। ছোট ছোট কতকগুলি চতুষ্কোণ ও বৃত্ত মিলিয়া একটি ঘণ্টিমালা অঙ্কিত হইয়াছে। এইভাবে বিন্দু, রেখা, বৃত্ত প্রভৃতির সমন্বয়ে এক অপূর্ব শিল্প-নমুনা সৃষ্ট হইয়াছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিল্প ও কারুকার্য এখন আর নাই ; অতীতের কোনও এক যুগে ছিল। ইতিহাস কেবল তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

দক্ষিণ ভারতের আলপনা ঃ দক্ষিণ অঞ্চলের আলপনাকে **'রঙ্গোলী'** বলা হয়। দক্ষিণ ভারতে কেবলমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠানেই নহে, দৈনন্দিন জীবনের আচার-অনুষ্ঠানেও আলপনা দিবার রীতি আছে। প্রতিদিনই উহারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে আলপনা দিয়া থাকে। আলপনার উপকরণ হিসাবে উহারা **চালের গুঁড়া, খড়ির গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, কাঠকয়লার গুঁড়া** প্রভৃতি রঙ্গের সাহায্যে শুষ্ক আলপনার নক্সা অঙ্কন করে। বিভিন্ন রং দিয়া করা হয় বলিয়াই এই আলপনাকে রঙ্গোলী বলা হয়। মেঝের উপর এই আলপনার নক্সা অঙ্কন করে।

জলের আলপনা

আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলপনা দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় উহারা জলের ভিতর আলপনা রচনা করে। কাগজের উপরে নানা রকম নক্সা আঁকিয়া নক্সাযুক্ত স্থানটি অসংখ্য ছিদ্র করিয়া উহা স্থির জলের ভিতর আঁটিয়া দিতে হয়। পরে ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া জলে কাঠকয়লার গুঁড়া বা আবির জাতীয় ভাসমান পদার্থের রঙ্গীন গুড়া ছাড়িয়া দিলে জলের উপর ঐ নক্সাটির ছাপ পড়িয়া যায়। এই জলপাত্রটি ঘরের ভিতর খুব সাবধানে রাখিতে হয় যাহাতে নাড়াচাড়া না লাগে। বর্তমানে উহা যান্ত্রিক উপায়ে নলের সাহায্যে করা হয়। বাজারে এই 'জল আলপনার নল' কিনিতে পাওয়া যায়।

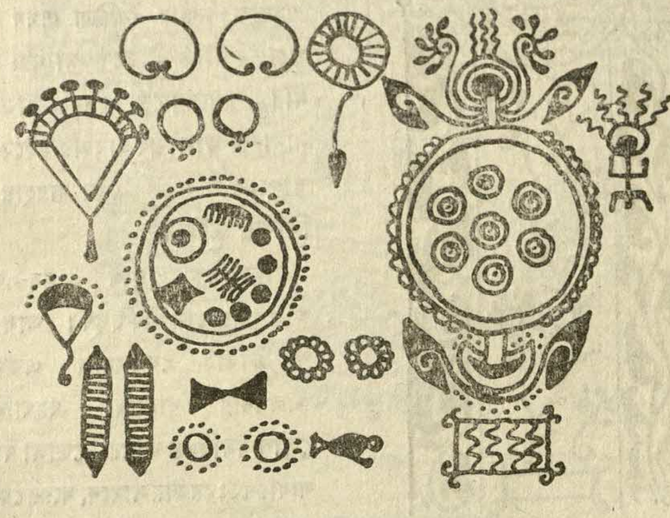


বাংলাদেশের আলপনা

বাংলাদেশের আলপনা ঃ বাংলার পুরনারীগণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনার আয়োজন করিত। এই আলপনার ভিতর দিয়া তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাভাবিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে পল্লীগ্রামে **বার মাসে তের পার্বণ** লাগিয়াই থাকিত—তাই বিভিন্ন ব্রত, পূজা ও পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন নক্সায় আলপনা অঙ্কন করিত। **মাঘমণ্ডলের ব্রত, তারার ব্রত, সেজুতি ব্রত** প্রভৃতি এক মাস ধরিয়া করা হইত এবং প্রত্যেকটি ব্রতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে আলপনা আঁকা হইত। **বরাসনের পিঁপড়ি, বউছত্র** প্রভৃতির ক্ষেত্রে আজও আমাদের দেশে আলপনা দেওয়ার প্রচলন আছে। বাংলাদেশের আলপনার

ভিতর কোনও ভাস্কার্য বা স্থাপত্য শিল্পের স্থান নাই। আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া বাংলার বধূরা এই আলপনা রচনায় এক সহজাত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছে। তাহাদের হাতেই এই গৃহ-শিল্পের জন্ম। **ধানছড়া, কলাছড়ি, শঙ্খলতা, কলমীলতা, মোচালতা** ইত্যাদি নক্সা বাংলার আলপনা শিল্পে চিরদিন স্থায়ী হইয়া থাকিবে।

আলপনা দেওয়ার কতকগুলি রীতি পালন করিয়া গৃহ-লক্ষ্মীরা এই কাজে অগ্রসর



চালের পিটুঁলির আলপনা

হয়। যে জায়গায় আলপনা দেওয়া হইবে, সেই স্থানটি **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** করিয়া পরিষ্কার সাদা কাপড়ের টুকরার সাহায্যে আঙ্গুল ঘুরাইয়া প্রথমে একটি **বৃত্ত** আঁকিয়া লয়। এই বৃত্তটিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ চারিদিকে নক্সাটি বিস্তৃত করে। **আতপ-চালের পিটুঁলির** গোলা তৈরী করিয়া উহার সাহায্যে আলপনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে যে আলপনার সৃষ্টি তাহা পুরাপুরি শুচিতার মাধ্যমে করা হয়—ইহাতে রং-এর কোনও স্থান নাই।

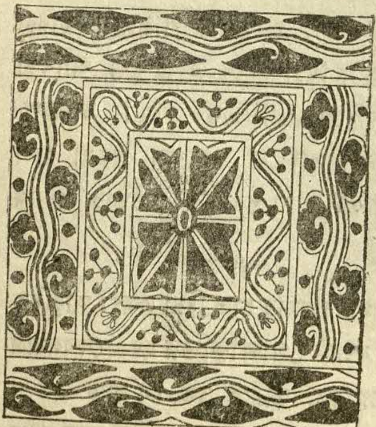
আলপনার নক্সাগুলি সুদূরকাল হইতে ঠাকুরমা-দিদিমার হাত দিয়া ক্রমশঃ আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রায় সমস্ত নক্সাই **গোলাকৃতির** হয়—কেবলমাত্র তারার ব্রতের **নক্সা চতুষ্কোণ**। মাঘমণ্ডলের ব্রত, তারার ব্রত, সেঁজুতি ব্রত—এই সমস্ত ব্রতের প্রচলন এখন নাই বলিলেই চলে। কেবলমাত্র **লক্ষ্মীর ব্রত** প্রতি বৃহস্পতিবার গৃহস্থ পরিবারে সন্ধ্যায় এখন পর্যন্তও পালন করা হয়। লক্ষ্মীর ব্রতে বা

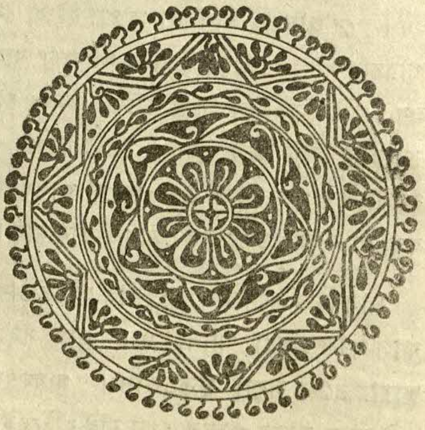
লক্ষ্মী পূজার আলপনায় মঙ্গল ঘট, পদ্মফুল, শঙ্খলতা, লক্ষ্মীর পা, ধানের গোলা প্রভৃতি প্রতীকের মাধ্যমে স্থান পায়।



বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় 'আলপনা' আধুনিক যুগের শিল্পকলার প্রভাবে এক **নবরূপ** ধারণ করিয়াছে। আলপনার উপকরণ, দেওয়ার পদ্ধতি, এমনকি নক্সার বৈচিত্র্য এখন আর পুরাতন রীতি-নীতিকে মানিয়া চলে না। আলপনাতে এখন বাজারের নানাবিধ **দামী রং** ব্যবহার হইতেছে ; আঙ্গুলের পরিবর্তে এখন ব্যবহার হয় **বিভিন্ন তুলি**।

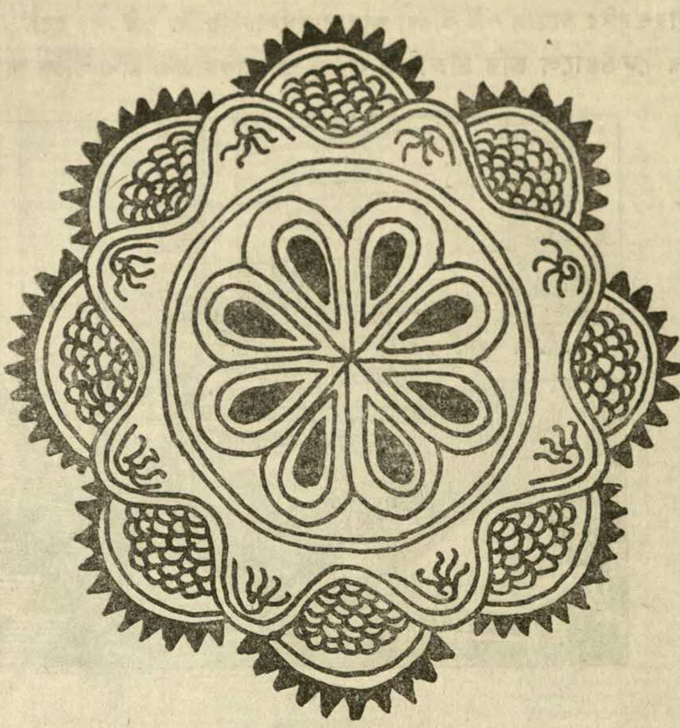
আধুনিক যুগে গৃহ-সজ্জায় আলপনার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আসবাব-পত্র ছাড়াই কেবলমাত্র একখানি আলপনার সাহায্যে ঘরখানিকে **সৌন্দর্যমণ্ডিত** করিয়া তোলা যায়। সাধারণতঃ দরজার সামনে, ঘরের কোণে আলপনার জ্যামিতিক **নক্সা** হইলে





আলপনার বিভিন্ন রূপ

ভাল হয়। **পুষ্পসজ্জা ও আলপনার সমন্বয়ে** গৃহের সুষ্ঠু প্রসাধন সম্পন্ন হয়।



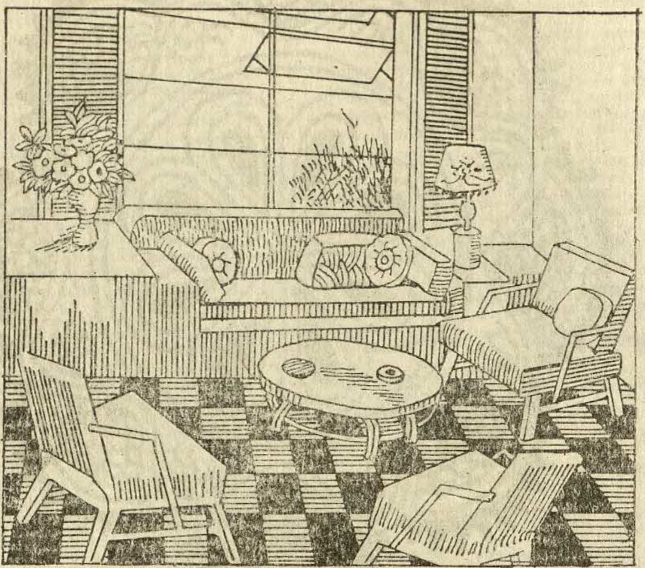
বাংলার বৌছত্র

বিভিন্ন কক্ষের প্রসাধন

বৈঠকখানা ঘরের সজ্জা ঃ এই ঘরখানি সম্পূর্ণ **স্বতন্ত্র**—শয়ন-ঘর বা অন্য কোনও ঘরের সহিত ইহার **যোগাযোগ** নাই। **অতিথি-অভ্যাগতের** বসিবার **স্থান** এই কক্ষে। কাজেই একটি **সার্বজনীন রুচি** লইয়া এই ঘরের প্রসাধন কার্যটি সম্পন্ন করা উচিত।

একটা **আরাম** ও **স্বাচ্ছন্দ্যের** পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এই কক্ষে থাকিবে একটি সুন্দর বড় রকমের সোফাসেট ; তাহা ছাড়া **কয়েকখানি গদি-আঁটা চেয়ার**। এই কক্ষে একটি **ইজি-চেয়ারের** ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। বৈঠকখানা ঘরের আলো হইবে **উজ্জ্বল** ও **স্নিগ্ধ**—**নিয়ন আলোর** স্নিগ্ধতা কক্ষখানিকে মনোরম করিয়া তুলিতে পারে। টিপয়ের উপর ফুলদানীতে **পাতাসহ এক গুচ্ছ ফুল** বৈঠকখানায় একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ঐ ফুলদানীটি যেন

কাহারও দৃষ্টির আড়াল সৃষ্টি করিয়া আলাপ-আলোচনার বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। বসিবার ঘরের **দেওয়ালে ছবি টাঙ্গানো** যাইতে পারে কিন্তু লক্ষ্য রাখা উচিত তাহা যেন



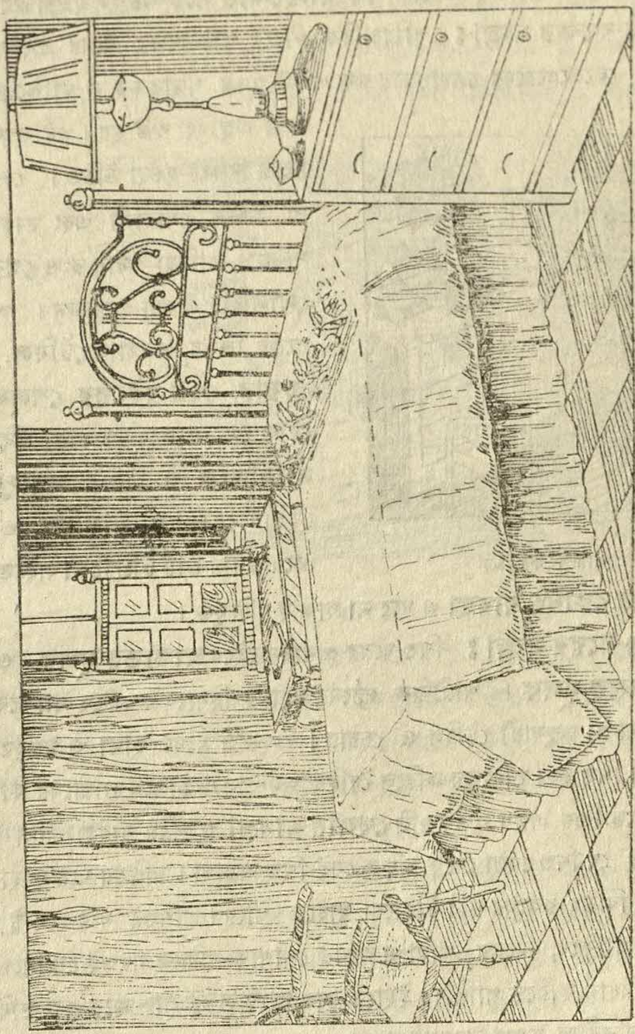
বৈঠকখানা ঘর

গৃহস্বামীর ব্যক্তিগত রুচির কোনও ছবি না হয়। **প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর** ছবি এবং **মহাপুরুষদের** ছবি এই কক্ষের জন্য নির্বাচন করা যাইতে পারে। **অতিরিক্ত আসবাব-পত্রাদির সন্নিবেশ** ঘটাইয়া কক্ষটিকে **ভারাক্রান্ত** করিয়া না তোলাই উচিত—ইহাতে চলাফেরারও অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

শয়ন-ঘরের সজ্জা ঃ শয়ন-ঘরটি সম্পূর্ণ নিজস্ব। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য গৃহস্বামী আশ্রয় নেয় এই ঘরখানিতে। কাজেই প্রসাধনের নৈপুণ্যে এখানে **নিরালা, স্নিগ্ধ** ও একটি **শান্তি পরিবেশ** সৃষ্টি করিতে হয়, যাহা মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ কর্ম-জগতের পরিবেশ হইতে দূরে লইয়া যায়।

এই ঘরে বেশী আসবাব-পত্র থাকিবে না ; শয়ন করিবার একটি **খাট**, একটি **ছোট টেবিল**, একটি **চেয়ার**, কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য একটি **আলমারি** ও **ড্রেসিং টেবিল**। দেওয়ালে থাকিবে নিতান্তই ব্যক্তিগত ও **আত্মীয়স্বজন** প্রভৃতি **প্রিয়জনদের ফটো**, আর থাকিতে পারে **প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর** ছবি যাহা মনকে সজীব করিয়া তোলে। শয়ন-ঘরের দেওয়ালের রং হওয়া উচিত স্নিগ্ধ ও শান্ত ; এক্ষেত্রে

হাল্কা **নীল ও সবুজ** রং নির্বাচন করা যায়; দেওয়ালের রং-এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া **আলোর রংও হাল্কা** হইবে। ঘরের রং-এর সঙ্গে আলোর রং-এর **সমন্বয়ে**

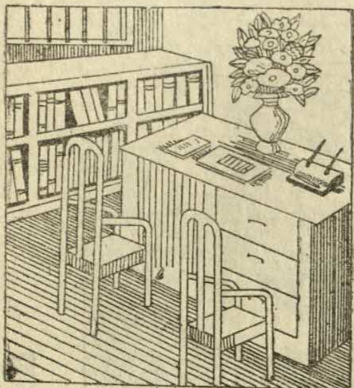


শয়নঘর

এক **স্বপ্নময় পরিবেশ** সৃষ্টি করিবে যাহা **সুনিদ্রার সহায়ক**। পর্দার রংও **সবুজ** অথবা **নীল** হইলে ভাল হয়। শয়ন-কক্ষে ফুলের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল, তবে রাত্রে ঘুমের সময় গৃহাভ্যন্তরে কোনও ফুল ফুলদানীতে না থাকাই ভাল। এমনকি শয়ন-

কক্ষের নিকটবর্তী বারান্দায় কোনও **ফুলগাছের টব রাখা** উচিত নয়। গাছ রাত্রে **কার্বন ডাই-অক্সাইড** ছাড়ে, এই গ্যাস শরীরের পক্ষে **ক্ষতিকর**। শয়ন-ঘরের সাজ-সজ্জা মানুষের **শারীরিক** ও **মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের** পক্ষে অনুকূল হওয়া প্রয়োজন।

পাঠ-কক্ষের সজ্জা : পারিবারিক জীবনে পাঠ-কক্ষের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র পড়ার ঘর না থাকিলে অনেক সময় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই কক্ষটি শয়ন-ঘরের নিকটে হওয়া উচিত। দেওয়ালের রং উজ্জ্বল সোনালী এবং তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া পর্দার রংও **গেরুয়া** বা **সোনালী** হওয়া প্রয়োজন। আসবাব-পত্রের ভিতর একখানি **টেবিল, দুইটি চেয়ার,** একটি **বইয়ের শেল্ফ** আর দেওয়ালে থাকিবে বড় বড় **বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক** ও বিভিন্ন **মহাপুরুষের** ছবি। দেওয়ালে **মানচিত্র** ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় **চার্ট টাঙ্গানো** যাইতে পারে। **আরামের কোনও ব্যবস্থা** এ ঘরে না থাকাই যুক্তিযুক্ত।



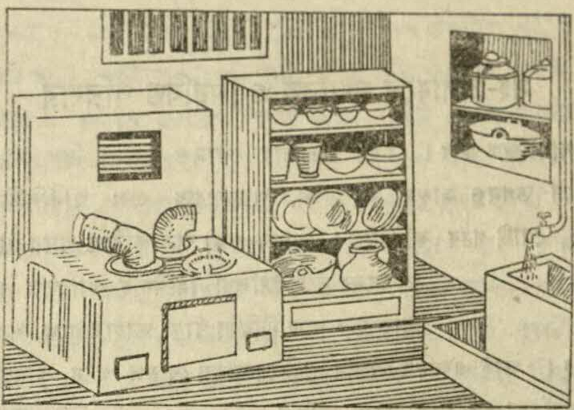
পাঠ-কক্ষের চিত্র

শিশু-ঘরের সজ্জা : শিশু-ঘরের প্রসাধন হইবে **স্বাস্থ্যতত্ত্ব-মূলক** ও অপর পক্ষে **মনস্তত্ত্ব-মূলক**। শারীরিক গঠনের সহায়ক হিসাবে কক্ষটিতে থাকিবে শিশুর দৈহিক উচ্চতা অনুযায়ী টেবিল ও চেয়ার। এগুলি যথেষ্ট হাল্কা ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন। শিশু ইহা স্থানান্তর করিলে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনে ব্যায়ামের কাজ হয়। শিশুর কাছে প্রিয় এরূপ কতকগুলি **খেলার সামগ্রী** ও ছবির ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন। যে শিশু খেলা থেকে বঞ্চিত সেই শিশু অভাগা। শিশুর ঘরে তাহার বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের ছবি টাঙানো যাইতে পারে। শিশুর ঘরে ছোট্ট একটি **আলনা** থাকিবে, নিজের জামা ও অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই সে নিজে লইয়া নিজেই পরিধান করিতে পারিবে। ইহাতে শিশু **আত্মতৃপ্তি** লাভ করে এবং ভবিষ্যতেও **আত্মনির্ভরশীল** হওয়ার সুযোগ পায়।

শিশুর ঘরের রং হইবে **সোনালী** এবং দেওয়ালের রং-এর সহিত রং মিলাইয়া আলো হইবে **উজ্জ্বল**। শিশুর ঘরে কোনও মৃদু আলোর ব্যবস্থা রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। ইহা শিশুর মনে বিষণ্ণতা আনিয়া দেয়।

শিশু-কক্ষটি এমন ভাবে সাজাইতে হয় যাহার ফলে শিশু তাহার অফুরন্ত আনন্দ-উচ্ছলতা প্রকাশের সুযোগ পায়।

রান্নাঘরের সাজ-সজ্জা : রান্নাঘরের দেওয়ালের রং হওয়া উচিত ধূসর বা গেরুয়া। শয়ন বা বসিবার ঘরের মত, এ ঘরের সজ্জা কখনই **জাঁকজমকপূর্ণ** হয় না। রান্নার খাদ্যসামগ্রী রাখার জন্য এখানে একটি **মিটকেস্** থাকিলে সুবিধা হয়;



রন্ধন গৃহ

জাল-নির্মিত আলমারিতে খাদ্যদ্রব্য রাখা নিরাপদ। বসিয়া রান্না করা যায় এরূপ একটি ছোট **টুলও** এই ঘরে উনানের পাশে থাকিবে। উনানটি **ধূম্রবিহীন** বা **গ্যাস চুল্লী** হইলেই ভাল হয়। বাসন-কোসন রাখার জন্য একটি **টেবিল** থাকিবে। রান্নাঘরের বাসনপত্র ছাড়া অন্যান্য তৈজসপত্রাদি এই ঘরের তাকে সন্নিবেশ করা হইবে। রান্নাঘরের **আলো খুব জোরালো** হওয়া যুক্তিযুক্ত।

ভোজন-কক্ষের সজ্জা : **পাশ্চাত্ত্য রীতি** অনুযায়ী আমাদের দেশেও এখন বেশির ভাগ পরিবারের ভোজনের জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করা হয় এবং পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুকরণ করিয়া সজ্জা-ব্যবস্থাটিও প্রায় সেই রকমেরই হয়। এই কক্ষটি প্রসাধনে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। আহার কার্যটি অসুবিধা ও অসাচ্ছন্দ্যের ভিতর সম্পন্ন করা যায় না, উহাতে আরামের ব্যাঘাত হয়। খাবার জন্য প্রয়োজন বড় একটি টেবিল এবং **মাপমত খান কয়েক চেয়ার**। খাবার-টেবিলে পুষ্প-বিন্যাসের ব্যবস্থা করিলে একটা মাধুর্যপূর্ণ পরিবেশর সৃষ্টি হয়। সমস্ত তৈজস-পত্রাদি অর্থাৎ খাইবার ডিস, গ্লাস, বাটি ঐ টেবিলেই সাজানো থাকিবে।

ব্যবহারের পর এই বাসনগুলি রাখিবার জন্য **কাবার্ড** (Cupboard) থাকা দরকার। অবস্থাপন্ন পরিবারে এই কক্ষটিতে **রেফ্রিজারেটার** রাখিতে পারে—ইহাতে ঘরখানির আভিজাত্য বৃদ্ধি পায়। ভোজন-কক্ষটিতে যাহাতে **আলো-বাতাস প্রবেশের** ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব-পত্রের বাহুল্য ঘটাইয়া ঘরটিকে **ভারাক্রান্ত** করিয়া না তোলাই যুক্তিযুক্ত।

গৃহ-প্রসাধনে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। যখন সভ্যতার কোনও আলো ছিল না, সুদূর সেই আদিম যুগে তখনও মানুষ আত্মরক্ষা, খাদ্যসংগ্রহ এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য দল বাঁধিয়াছে; গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে। মানুষ একা বাস করিতে পারে না, তাহাকে দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই থাকিতে হয়। নতুবা প্রাকৃতিক দ্বন্দ্বে টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। তাই একদিন স্বার্থের খাতিরে মানুষ যে দল গঠন করিয়াছে তাহাই সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মার্জিত সভ্যসমাজে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে এই সামাজিক জীবনের আবার বিভিন্ন স্তর পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী সমাজকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে; যেমন, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তরের বিভিন্ন পরিবার উহাদের স্বীয় ক্ষমতায় সমাজে অধিষ্ঠিত। একে অপরের সহিত পাল্লা দিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে না। বাসগৃহ, খাদ্য-ব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, সাজ-সজ্জা প্রভৃতির প্রত্যেকটির পরিকল্পনাও উহাদের নিজ নিজ অর্থ নৈতিক ক্ষমতার ভিতর সীমিত থাকে।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবার মোটামুটি **স্বচ্ছল পরিবার** হিসাবে পরিগণিত হয়। গৃহকর্তী এখানে সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত চাহিদা মিটাইয়া স্বচ্ছন্দগতিতে সংসারটিকে চালাইয়া লইতে পারে। তাহাদের সাংসারিক কাজে সমারোহ আছে, সমস্যা নাই। গৃহ-প্রসাধন কাজটি তাহাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বিচিত্র **দ্রব্যসম্ভারের সমারোহ ছাড়া** আর কিছুই নয়; সেখানে বাহুল্য আছে, বৈচিত্র্যও আছে। অনেক স্থলে ঐ প্রসাধনের ভিতর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে না। এক কথায় ইহাতে চোখ ভরিলেও মন ভরে না। বিভিন্ন

উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কক্ষের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা মিটানো একটি **মধ্যবিত্ত পরিবারের** পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। দুইটি কি তিনটি কক্ষ লইয়া সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত একক পরিবারের বাস ; সেখানে স্বতন্ত্র পড়ার ঘর, বসিবার ঘর, শিশুর ঘর এই সকল অতিরিক্ত ঘরের চাহিদা সাধারণতঃ ঐ নির্দিষ্ট দুই-তিনটি ঘরের ভিতরই ব্যবস্থা করিতে হয়। ঐ সমস্ত কক্ষে দামী দামী আসবাব-পত্রের সন্নিবেশ ঘটানোও গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নাই। এই সকল পরিবারে দুইটি শয়ন-ঘরের একটিতে পাঠ-কক্ষের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। শয়ন-ঘরে একটি **খাট, আলমারি** ও ছোট একটি **শো-কেস** থাকিতে পারে। এই শো-কেসের মাথার উপর একটি **রেডিও সেট** থাকিবে ; উহার পাশেই মাটির একটি সুন্দর মূর্তি রাখিতে পারিলে ঘরের পরিবেশটিকে সুন্দর করিয়া তোলা যায়। শো-কেসের ভিতরে বাড়ীর মেয়েদের হাতে তৈরী বিভিন্ন রকমের **পুতুল,** ও **আরও টুকিটাকি উপকরণ** রাখিতে পারিলে নূতন করিয়া কিনিবার প্রয়োজন হয় না ; অধিকন্তু গৃহসজ্জায় ইহা একটি বৈশিষ্ট্য আনয়ন করে। **রঙ্গীন কাগজ, কাপড়ের টুকরা, অবশিষ্ট পশমের গুলি, পাট, ব্যাটারি, পণ্ডস্-এর শিশি, টুথপেস্টের ঢাকনি, ডিমের খোলা** প্রভৃতি গৃহের পরিত্যজ্য দ্রব্যসকল দ্বারা নানাবিধ সুদৃশ্য **ঘর সাজাইবার উপকরণ** তৈরী করা যায়। ইহা ছাড়া বাজার হইতে **মাটির ফুলদানী, পাউডার কেস, ছাইদান** প্রভৃতি কিনিয়া বাড়ীতে ইচ্ছামত উহাতে তুলির সাহায্যে রং-এর নক্সা করিলে উহা বাস্তবিকই ঘর সাজাইবার উপযোগী হয়।

আসবাবপত্র সন্নিবেশ

অব্যবহার্য্য ফেলে দেওয়া জিনিস কাজে লাগানো

দ্বিতীয় শয়ন-ঘরটিতে বাড়ীর ছেলেদের শয়ন-ব্যবস্থার ভিতর **পাঠ-কক্ষের উদ্দেশ্য** সাধিত হইতে পারে ; অতএব এখানে ছোট **একটি তক্তপোষ, একটি টেবিল, দুইটি চেয়ার** থাকা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বাড়ীর প্রয়োজনীয় অথচ অব্যবহার্য **বাক্স-পেটরা, পুরাতন স্যুটকেস** প্রভৃতি রাখিবার স্থান এই ঘরেই করা যাইতে পারে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে দেওয়ালের রং সাধারণতঃ কক্ষের উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবস্থা করা যায় না ; সব ঘরেরই রং হওয়া উচিত **স্নিগ্ধ ও হাল্কা নীল অথবা সবুজ**। দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের ভাল ভাল ছবি মাত্রা, ছন্দ ও সামঞ্জস্য অনুযায়ী টাঙ্গানো হইবে। দেওয়ালে কোনও খুঁত থাকিলে **চিত্র সন্নিবেশেই তাহা ঢাকিয়া দেওয়া যায়**। দামী দামী দেওয়াল কাগজ বা চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন এখানে অযৌক্তিক। মেঝে মাজিয়া ঘষিয়া

দেওয়াল ও মেঝের সজ্জা

পরিষ্কার রাখিতে পারিলেই গৃহের সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে। গৃহকর্ত্রীর হাতের একটি **সুন্দর আলপনা ঘরটিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিতে পারে**। কার্পেটের আচ্ছাদন অপেক্ষা আলপনার সৌন্দর্য অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী। বিশেষ কোনও উৎসবে **হাতে-তৈরী ফুলের নক্সা-করা আচ্ছাদন** গালিচার মত ব্যবহার করা যায়।

বসিবার ঘরের দেওয়ালে বড় বড় **মনীষীর ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবি** রুচিসম্মতভাবে সাজাইয়া রাখিতে পারিলে জাঁকজমকের কোন প্রয়োজন পড়ে না। মেঝেতে একটি বড় টেবিলের চারি পাশে কয়েকখানা চেয়ার থাকিবে, সম্ভব স্থলে একটি সোফা-সেটের ব্যবস্থা একপাশে রাখা যায়। নীল বা সবুজ দেওয়ালের রং অনুযায়ী **সাধারণ ছাঁটের রঙ্গীন পর্দা** সকল কক্ষের জানালা-দরজায় সন্নিবেশ করা হইবে। পর্দায় ছাঁট-কাটের বাহুল্যের পরিবর্তে গৃহকর্ত্রীর হাতের সূচী-শিল্পের দুই-একটি নক্সা থাকিলে উহা অনেক বেশি মনোরম হয়।

পর্দা সন্নিবেশ

মধ্যবিত্ত পরিবারে পৃথক রন্ধন-গৃহের ব্যবস্থা থাকে **কিন্তু পৃথক খাওয়ার ঘর** অনেক স্থলেই থাকে না। সেক্ষেত্রে **রন্ধন-গৃহটি বড় হইলে উহার এক পাশেই খাওয়ার ব্যবস্থা** করিয়া লইতে হয়। **দেওয়াল-তাকে** যাবতীয় বাসন-পত্র সুন্দর ভাবে সন্নিবেশ করিয়া একপাশে উনুনের ব্যবস্থা করিতে হয়। পানীয় জলের জন্য এক প্রান্তে একটি **কলসী বা কুজার** ব্যবস্থা রাখিতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গৃহ নির্মাণের সময় রন্ধন-গৃহটি **U আকৃতির** করিতে হয়। U আকৃতির রান্নাঘরে অল্প জায়গায় সমস্ত ব্যবস্থা ভালভাবে সম্পন্ন করা যায়।

রন্ধন-গৃহের সুব্যবস্থা

বড় বড় শহরের বাড়ীতে পায়খানার সংলগ্নই সাধারণতঃ স্নানের ঘরের ব্যবস্থা থাকে। সেক্ষেত্রে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শক্ত ঝাঁটা দিয়া ফিনাইল ও জলের সাহায্যে বিশেষ ভাবে ধুইয়া ফেলিতে হয়; এজন্য **ভাল নর্দমার ব্যবস্থা** রাখিতে হয়। তাক থাকিলে সেখানে স্নানের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি রাখা যায়। কাপড়-চোপড় রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি **তার টানানো থাকিবে**।

ছোট ছোট শহরে বা গ্রামে স্বতন্ত্র জায়গায় সিমেন্ট করিয়া চারিদিকে দেওয়াল ঘিরিয়া এবং **ছাদে টিন, টালি অথবা অ্যাসবেস্টসের আচ্ছাদনের** ভিতর সুন্দর একটি স্নানের ঘর তৈরী হয়। শহরের ছোট ছোট অন্ধকার স্নানঘর অপেক্ষা এই ব্যবস্থা অনেক ভাল। এখানে **আলোবাতাসের কোনও অভাব ঘটে না**। কাপড় কাচার কাজটি এখানেই সুসম্পন্ন হইতে পারে।

স্নানের ঘরের ব্যবস্থা

নিম্নবিত্ত পরিবারকে সাধারণতঃ একখানা ঘরের ভিতরই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। সংসারের অপরিহার্য ব্যয়গুলি সঙ্কুলান করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, সেক্ষেত্রে গৃহসজ্জার জন্য ব্যয়ের চিন্তা নিতান্তই অমূলক। গৃহকর্ত্রী যদি রুচিসম্পন্না হয় তাহা হইলে ঐ একখানা ঘরের ভিতরই সাজাইয়া গুছাইয়া সুখের নীড় গড়িয়া তুলিতে পারে। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাই গৃহ-সজ্জার মূল নীতি।** ঘরখানিকে ঝাড়িয়া-মুছিয়া, সামান্য ছবি টাঙ্গাইয়া, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেসগুলিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারিলেও গৃহের শ্রী বৃদ্ধি পায়।

গ্রামে নিম্নবিত্ত সম্পন্ন বাসগৃহের সজ্জা

গ্রামে গৃহস্থঘরের এক একখানা বাসগৃহ মনে হয় ছবির মত। খোলা প্রকৃতির ভিতর সামান্য কুটিরখানির দীনতা ঢাকিয়া সুন্দর করিয়া তোলার যে অপূর্ব চেষ্টা তাহা অট্টালিকা প্রসাধনের ব্যবস্থাকে অনেক সময় হার মানাইয়া দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একখানা কাঁচা বাড়ী; **শুষ্ক খটখটে, আর্দ্রতাবিহীন একখানি মেঝে।** কাঁদা মাটির লেপনে প্রায় সাদা খড়ির বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

গৃহই ছবি

সামান্য কয়েকটি আসবাবপত্র, নিতান্ত প্রয়োজনেই একখানা বড় তক্তপোষ রহিয়াছে। স্বচ্ছলতার অভাবে দরজা-জানালায় শোভা পাইতেছে, **পুরাতন ছাপার শাড়ির মোটা ভাজের পর্দা।** বাক্স-পেটারার ও অন্যান্য আচ্ছাদনও রুচিসম্মতভাবে **পুরাতন কাপড়ের বিভিন্ন রং-বেরং-এর সুন্দর সুন্দর ঢাকনা।** তক্তপোষের উপর তোষক, বালিশ, চাদর মিলাইয়া পরিপূর্ণ একখানি শয্যা। কিন্তু তার সন্নিবেশও সম্পূর্ণ আলাদা। তক্তপোষের পাশেই **পাকানো পাড়ের দড়ি কাঁচা বেড়ার দুই পাশে আংটার মতো ঝুলানো,** তাহাতে বালিশগুলি একটার পর একটা সন্নিবেশ করা হইয়াছে; তক্তপোষের উপর তোষক বিছাইয়া উহাতে **সতরঞ্চিটি** বিছানো, আবার কখনও **রঙ্গীন একটি মোটা চাদরও স্থান গ্রহণ করে।** অতিথিরা বসেন এখানেই। আবার কখনও ঘরের কোণ হইতে একখানা মাদুর বিছাইয়া দেওয়া হয় খোলা বারান্দায়।

গৃহের সামনেই মাটির প্রাঙ্গণের একপাশে তেরছাভাবে একফালি জায়গায় শোভা পাইতেছে **ছোট একটি ফুলের বাগান।** বিলাতী ফুলের সমারোহ নাই বা থাকলো **গন্ধরাজ, টগর, যুঁই, সন্ধ্যামালতী, গাঁদা, জবা, দোপাটি, কলাবতী** বিভিন্ন ঋতুতে রূপে রসে গন্ধে এরা সব আসর জমায়। এমন মনমাতানো

স্থান আর কোথায় মেলে! আঙ্গিনার অপর প্রান্তে **তুলসীমঞ্চ**; সন্ধ্যায় এখানে প্রদীপ জলে, এখানের **গৃহকর্ত্রী যেন গৃহলক্ষ্মী**।

অদূরেই রান্নাঘর, ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দুইটি সাধারণ চুল্লী পাশাপাশি, **চকচকে, ঝকঝকে বাসন-পত্র**, নিজের হাতের ধোয়া, মাজা। ভিম পাউডার নাই, নাই ষ্টীল উল, নাই কোনও বুরুশের ব্যবস্থা। সাধারণ **কয়লার ছাই, তেঁতুল**, আর **খড়ের গুচ্ছ**। আর কি প্রয়োজন? ষ্টিলের বাসনে দাগ পড়িবে, চীনা মাটির ডিস ভাল পরিষ্কার করা দরকার—এ সবের কোনও সমস্যা নাই। বাপ-ঠাকুরদার আমলের **কাঁসা-পিতলের বাসন**, আর কয়েকখানি প্রয়োজনীয় **অ্যালুমিনিয়াম, এনামেল আর লোহা**, প্রয়োজন ইহাতেই মিটিয়া যায়। ভাঁড়ার ঘর নাই। এ সমস্যার সমাধানও গৃহকর্ত্রীর পরিকল্পনায় আছে।

মূল বাসগৃহের নিকট লক্ষ্য করা যাইবে ঐ ঘরের সংলগ্ন আর একখানি ছোট ঘর। সেখানে প্রবেশ করিয়াও প্রাণ জুড়ায়। দারিদ্র্যের রিক্ততাও এখানে ধরা পড়ে না। **দেব-দেবীর মূর্তি ও ছবি সন্নিবেশের** কার্পণ্য নাই; যথাযোগ্য ফুল-বেলপাতার আয়োজনের মাঝখানে সামান্য খাদ্যের উপকরণে ছোট ছোট থালাগুলি ভরপুর। **লক্ষ্মীর প্রতীক-চিহ্নের একখানা আলপনা** ঘরখানিকে আরও সুন্দর, মনোরম ও পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ভুল হয়, মনে হয় **গৃহমন্দির**! না **দেব-মন্দির**। গৃহস্থালীর জিনিসগুলিও অবহেলিত অবস্থায় নাই। ঘরের বেড়ার উপর দিকে দুই পার্শ্বে **দুইটি চওড়া কাঠের তাক আছে**। তাকে সাজানো আছে সংসারের সারা মাসের খাদ্যসামগ্রী—**চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা, চিনি আরও কত কী**। সমস্ত কৌটা ও বোতলগুলি খাদ্যের **নাম লেখা লেবেলে আটকানো**। সর্বসমক্ষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দুইটি রঙ্গীন পর্দাও ঝুলিতেছে। তাহাতে গৃহকর্ত্রীর হাতের **মোটা সূচের, মোটা সূতার শিল্পকার্যের সহজ ও সুন্দর নক্সাও** মনকে আকৃষ্ট করে।

ছোট ছোট শিশুরা বাইরে আঙ্গিনায় **আলো-বাতাসে** খেলাধুলা করে;—সেখানে আড়ম্বর নাই, কৃপণতা নাই, আছে শুধু প্রাণের **স্বাভাবিক উচ্ছলতা**। এই তো গ্রামের রূপ, এই তো গৃহকর্ত্রীর হাতে গড়া গৃহের ছবি। এর সঙ্গে **শহরের জাঁকজমকতার** কত পার্থক্য!

গৃহ-প্রসাধনে বর্ণপ্রকল্প

বর্ণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। গৃহ-প্রসাধনে বর্ণ-সমাবেশ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। মানুষের দেহ ও মনের ভিতর বর্ণ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে—তাই প্রসাধন ক্ষেত্রে বর্ণ-নির্বাচন কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত করিতে হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গৃহের দেওয়ালের রং নির্বাচন করিতে হয় এবং এই দেওয়ালের রং-এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্যান্য জিনিসের রং নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত। **তিনটি বা চারিটি** রং-এর বেশি একত্রে সমাবেশ ঘটানো উচিত নয়—ইহা **চোখকে পীড়িত** করিয়া তোলে এবং শান্ত ও স্নিগ্ধতার পরিবর্তে ঘরের ভিতর একটি **উগ্রভাব আনিয়া দেয়।** সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত।

বিজ্ঞানীদের মতে **সূর্যরশ্মির মধ্যে** সাতটি রং আছে; এই **সাতটি রংকে** সংক্ষেপে নাম দেওয়া হইয়াছে (Vibgyor) **'ভিবজিওর'**। এই সাতটি বর্ণ হইতেছে বেগুনী (Violet), তুঁতে, (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red)।

চিত্রশিল্পীরা এই সাতটি বর্ণকে **তিন শ্রেণীতে** ভাগ করিয়াছেন—(১) **প্রাথমিক বর্ণ**, (২) **মাধ্যমিক বর্ণ** ও (৩) **প্রান্তিক বর্ণ**।

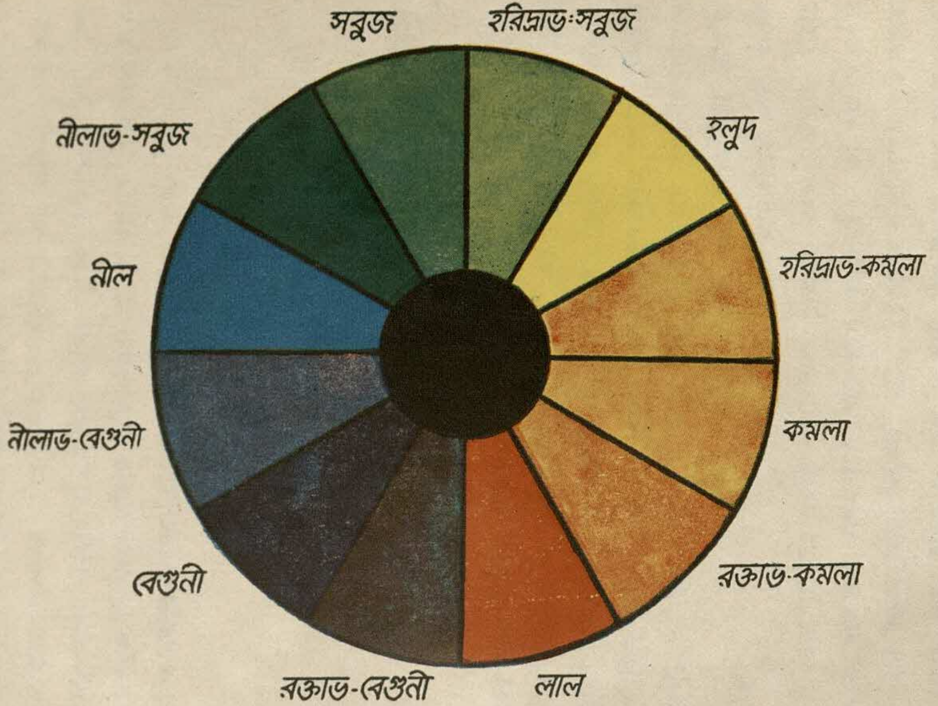
একটি বর্ণচক্র পরীক্ষা করিলে উহার ভিতরে নানা রকমের রং দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণের শ্রেণী ভাগ করিলে দেখা যায়—**লাল, হলুদ ও নীল** রং এই তিনটি **প্রাথমিক রং**। এই তিনটির যে-কোনও **দুইটি রং মিশাইলে** একটি নূতন রং-এর সৃষ্টি হয়। এগুলিকে বলা হয় **মাধ্যমিক** রং। লাল হলুদে কমলা রং হয়, আবার **হলুদ** ও **নীলের সংমিশ্রণে সবুজ রং** হয়। **লাল** ও **নীলের** সমাবেশে **বেগুনী রং** সৃষ্টি হয়। আবার **তিনটি প্রাথমিক বর্ণ** এবং **তিনটি মিশ্রবর্ণের সংযোগে** ছয়টি **প্রান্তিক বর্ণের** সৃষ্টি হয়। যেমন—**হরিদ্রাশ্যাম, নীলশ্যাম, নীলবেগুনী, রক্তবেগুনী, হরিদ্রা-কমলা**। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে আমরা ১২ টি রং পাইয়া থাকি। ইহার ভিতর **সাদা** ও **কালো রং নাই**। সূর্যের সাতটি রং-এর সংমিশ্রণে সাদা রং উৎপন্ন হয়; এর সাতটা রং-এর অভাবে কালো রং সৃষ্টি হয়। যে-কোনও রং-এর সহিত **সাদা** রং মিশাইলে **হাল্কা রং** হয়, আবার **কালো** রং মিশাইলে **ঘন বর্ণ হয়**। লাল বর্ণের সহিত সাদা রং মিশ্রিত করিলে **গোলাপী রং** হয়। এইভাবে ইচ্ছামত মিশাইয়া নূতন নূতন রং-এর সৃষ্টি হইতে পারে।

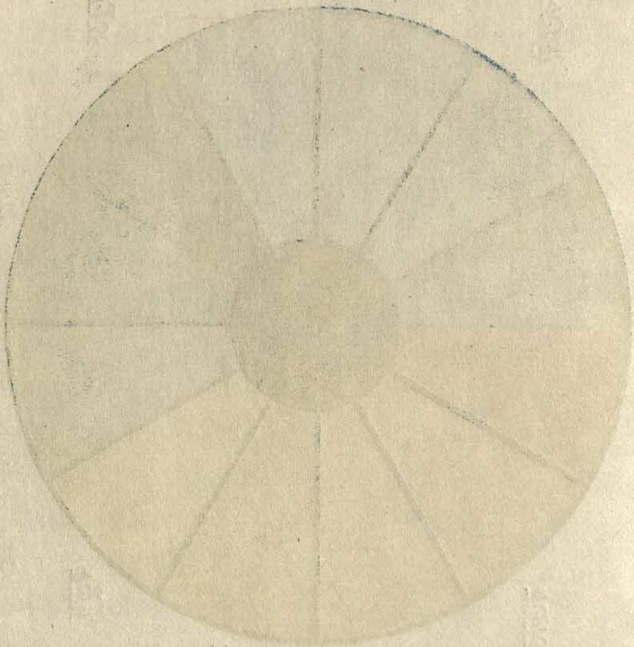
রং-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে লাল, কালো, সাদা, হলুদ, নীল প্রভৃতি রংগুলির সংমিশ্রণে

খয়েরী, গোলাপী, ছাই, ফিকা হলুদ, বাদামী, আসমানী প্রভৃতি রংগুলি পাওয়া যায়। বর্ণচক্রের **বিপরীত-ধর্মী** রংগুলিকে উহাদের **সম্পূরক** রং বলে। যেমন, মূল রং যদি সবুজ হয় তবে উহার বিপরীত লাল অথবা বাদামী রংকে সম্পূরক রং বলা যাইতে পারে। আর যে-সব রং মূল রং-এর সহিত নিকট-সম্পর্ক যুক্ত উহাদের **সমধর্মী** রং বলা যায়। যেমন **সবুজ** রং-এর সমধর্মী হইল অন্যান্য **যত রকমের হাল্কা** বা **গাঢ় সবুজ রংগুলি**। ইহা ছাড়া হলুদ, ধূসর এবং নীল রংও **উহার সমধর্মী**। রং-এর ঘনত্ব হইতেছে রং-এর মান। রং-এর মানের পার্থক্য আছে, আবার ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্যও আছে। একটি **ঘন রং** একক ভাবে থাকিলে চোখ ঝলসাইয়া যায় কিন্তু একটি সম্পূরক রং কাছে থাকিলে রং-এর তীব্রতা অনেক কমিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, লাল রং-এর সঙ্গে **সম্পূরক** রং সবুজ একসঙ্গে থাকিলে-দুইটি রং-এর ঔজ্জ্বল্যই কমিয়া যাইবে। ধূসর রংও ঔজ্জ্বল্য কমাইবার সহায়ক।

ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের মনের উপর বিভিন্ন রং-এর প্রতিক্রিয়া হয়। **নীল ও সবুজ** রং স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয় কিন্তু **লাল রং** নার্ভগুলিকে উত্তেজিত করে। **বসিবার ঘরের** এবং **শয়ন-ঘরের** রং হওয়া উচিত **নীল** অথবা **সবুজ**। তবে বৈঠকখানা ঘরের মত শয়ন-ঘরের রং অতো ঘন না হইয়া হাল্কা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

লাল, কমলা এবং হলুদ রং সাধারণতঃ **উত্তেজক**, অপর পক্ষে **নীল, সবুজ, বেগুনী** এইগুলি **মৃদু ও স্নিগ্ধ** বলিয়া ধরা হয়। গভীর ঘন রং অর্থাৎ উত্তেজক রংগুলি দূরবর্তী হইলেও কাছে মনে হয়, আবার হাল্কা রং নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও দূরের বলিয়া মনে হয়। **দেওয়ালের** রং যদি **ঘন উজ্জ্বল** হয় তাহা হইলে ঐ দেওয়ালকে বড় বলিয়া মনে হইবে এবং **ঘরের আকৃতিটি** যেন ছোট হইয়া গিয়াছে মনে হইবে। দেওয়ালে সংযুক্ত ছবি, দরজা-জানলার পর্দা সমস্তই আকারে বড় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এইভাবে **হাল্কা রং-এর** একখানি **কার্পেট** মেঝেতে আচ্ছাদিত থাকিলে ঘরটি অপেক্ষাকৃত **বড় মনে** হইবে। যে-সব **আসবাবপত্র** আকারে **ছোট** এবং ঘরের কম জায়গার প্রয়োজন হয়, সে-সব ক্ষেত্রে দেওয়ালের **উজ্জ্বল বা উষ্ণ রং** ব্যবহার করা সঙ্গত। উজ্জ্বল আলোকে উষ্ণ রং এবং মিশ্র বর্ণকে অনুজ্জ্বল বা স্নিগ্ধ রং বলা হয়। ছোট ঘরে উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ ঘটাইলে ঘরটিকে আরও ছোট বলিয়া মনে হইবে কাজেই সেখানে হাল্কা বর্ণ সমাবেশ করাই উচিত। **উত্তর দিকের ঘরগুলিতে** কখনই **সূর্যের আলো** পড়ে না, সেই কারণে ঐ দিকের ঘরগুলির রং হওয়া উচিত উত্তেজক অর্থাৎ **লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপী** প্রভৃতি **উষ্ণ রং**। ইহাতে ঘরটি আরামপ্রদ হইবে। আবার যে ঘরে **সূর্যালোকের অভাব নাই,**


সবুজ
হরিদ্রাভ-সবুজ
নীলাভ-সবুজ
হলুদ
নীল
হরিদ্রাভ-কমলা
নীলাভ-বেগুনী
কমলা
বেগুনী
রক্তাভ-কমলা
রক্তাভ-বেগুনী
লাল



সেখানে ঘরের রং হওয়া উচিত **হাল্কা ও স্নিগ্ধ**। গৃহের সমন্বয় অনুযায়ী বর্ণ নির্বাচন করা আবশ্যক।

দেওয়ালের রং প্রতিদিন পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু ঘরের পর্দা, আসবাব-পত্রের **ঢাকনা, কার্পেট** প্রভৃতির রং পাল্টাইয়া মাঝে মাঝে অদল-বদল করিয়া সন্নিবেশ করিলে ঘরের একঘেয়েমী দূর হইয়া **বৈচিত্র্যের সৃষ্টি** হয়। মনের উপর এবং চোখের উপর ইহার প্রভাব শুভজনক। দেওয়াল-কাগজ দ্বারাও রং-এর বৈচিত্র্য আনা যায়। তবে দেওয়াল-কাগজ ব্যবহার করিলে বিবর্ণ হইবার পূর্বেই পাল্টানো উচিত। গৃহ-প্রসাধনে উপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাস করিতে পারিলে উহা মনকে আকর্ষণ করে এবং মনের **প্রফুল্লতা ও সজীবতা** ফিরাইয়া আনে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুগৃহিণী

পুরুষের কর্তব্য বাহিরে, স্ত্রীলোকের কর্তব্য অন্দরে। কিন্তু এই কথা হইতে এইরূপ সাব্যস্ত করা উচিত নয় যে, এই ক্ষুদ্র অন্দরটিতে যে কর্তব্য পালন করিতে হইবে তাহাও ক্ষুদ্র। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই **অন্দরই** মানুষের একমাত্র **শান্তির স্থান**। এইখানে শৃঙ্খলা থাকিলে মানুষ সমস্ত জগতে নিগৃহীত হইয়াও **সুখী**; এইখানে শান্তি না থাকিলে মানুষ সমস্ত জগতে সম্মানিত হইয়াও **অসুখী**। সুগৃহিণী মাত্রই গৃহে **সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি** করিতে প্রয়াসী হন। অনাদি কাল হইতে নারী যখনই মাতৃত্বের অধিকার পাইয়াছে তখনই এমন সকল হৃদয়বৃত্তি লাভ করিয়াছে যাহার ফলে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন তাহার পক্ষে সহজ হইয়া ওঠে। এই জন্য যে নারীর মধ্যে ঐ সকল **হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ** আছে, সে আপনার সংসারকে সৃষ্টি করিয়া তোলে; ইহাতে কত '**বুদ্ধিমত্তা**, কত **নৈপুণ্য**, কত **ত্যাগ**, কত **আত্মসংযম**' পরিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হইয়া অপরূপ সুসঙ্গতি লাভ করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই কারণেই ঘরকন্নার কাজ একান্ত ভাবে নারীর। গৃহিণীই গৃহের শ্রী, গৃহের সৌন্দর্য।

গৃহিণী গৃহের স্ত্রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহকর্ত্রীর দৈনন্দিন কার্যের পরিকল্পনা ও প্রণালী

গৃহকর্ত্রীর উপরই সমস্ত কাজের দায়িত্ব থাকে। উপযুক্ত গৃহিণীর অভাবে সংসারে নানাপ্রকার **বিশৃঙ্খলা** দেখা দেয়—পক্ষান্তরে একটি সুগৃহিণী গৃহটিকে একটি **সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের** আকর করিয়া তুলিতে পারে। এই সুষ্ঠু গৃহপরিচালনায় পরিকল্পনার একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক গৃহিণীকেই নির্দিষ্ট আয়ের ভিতর সংসারের সমস্ত দাবি মিটাইতে হয়। যথেষ্ট **বিচারবুদ্ধি** ও বিবেচনা দ্বারা একটি **খসড়া** প্রস্তুত করিয়া সংসারের যাবতীয় কর্তব্যগুলি সমাপন করিতে হয়। যে-কোনও ক্ষেত্রে যে-কোনও দায়িত্বসম্পন্ন কাজেই **পূর্বপরিকল্পনা** অনুযায়ী একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। পরিকল্পনাটি যথেষ্ট **বিচক্ষণতার সহিত** না করিতে পারিলে গৃহ-পরিচালনার কাজটি **ব্যর্থ** হইয়া যায়,—সেই কারণেই অনেক গৃহকর্ত্রী আছেন **আর্থিক সঙ্গতি** থাকা সত্ত্বেও গৃহের সমস্ত রকম ব্যয় যথাযথ ভাবে সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারে না। **শ্রমশীলতা**, **বুদ্ধিমত্তা**, **কর্তব্যনিষ্ঠা** ও **মিতব্যয়িতা** প্রভৃতি গুণগুলির ভিতর দিয়াই এই **কর্মদক্ষতা** সৃষ্টি হয়। সুতরাং কর্তব্য সাধনে সুষ্ঠু গৃহপরিচালনায় সুগৃহিণীর ঐ সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গৃহকর্ত্রীর গুণাবলী

গৃহের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই খাদ্যরচনা, বস্ত্রধৌতি, রোগীর সেবা, সংসারের আয়-ব্যয় ও সঞ্চয় প্রভৃতি বিষয়গুলির সুষ্ঠু পরিচালনা প্রয়োজন। কাজের সুবিধার জন্য গৃহিণী সর্বপ্রথমেই একটা **ছক** করিয়া নিবে। এই বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী কাজ করিতে পারিলে **বিশৃঙ্খলার** সম্ভাবনা খুবই কম। ছক তৈয়ারীর সময় কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। **সময়ের তালিকা**, **শ্রমবিভাগ**, এবং **কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ**। এই কৌশলগুলি পূর্বেই চিন্তা করিয়া লইলে একদিকে যেমন কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় অপরদিকে গৃহকর্ত্রীর **পরিশ্রম** কম হয় এবং অল্প পরিশ্রমে বেশি কাজ পাইতে পারে।

বিভিন্ন পরিকল্পনা

সুষ্ঠু কাজে সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা

গৃহ-পরিচালনার কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য **সময়-তালিকা** একান্ত আবশ্যক। সমগ্র কাজগুলিকে মোটামুটি ভাবে তিনটি সময়ের শ্রেণীতে ভাগ করিতে

হয়। যেমন **দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক** ও **মাসিক**। আবার অনেক সময় এমন কতকগুলি কাজ আছে যাহা বৎসরে একবার করিবার প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন কার্যের কুশলতা নির্ভর করে কার্যের শৃঙ্খলার উপর। শৃঙ্খলা হইতেছে এই যে আগের কাজ আগে, পরের কাজ পরে করা। এই শৃঙ্খলা-বোধটি না থাকিলে পরিবারস্থ অন্য সকলেরই যে কেবলমাত্র কষ্ট হয় তাহা নহে গৃহকর্ত্রীর নিজেরও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রতিদিন সকাল বেলা অতি প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া **প্রাতঃকৃত্য** সারিয়া লইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ ও চারিদিক **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** করা কর্তব্য। দাস-দাসী থাকিলে গৃহকর্ত্রী অবশ্যই তাহাদের সাহায্য লইবে। ইহার পরই আসে **রন্ধন** বা **রন্ধন-ব্যবস্থার** কথা। রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া পরিবার-পরিজনবর্গকে **তৃপ্তিসাধন** করার মত স্ত্রীজাতির উত্তম কার্য আর নাই। আধুনিক যুগে ধনী পরিবারেও এই কাজটি গৃহকর্ত্রীকে নিজ হস্তে করিতে দেখা যায়। আবার এমন পরিবারও আছে **আলস্য** ও **বিলাসিতা বশতঃ** নিজে রন্ধন না করিয়া **পাচক-পাচিকার** সাহায্য গ্রহণ করেন।

দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত বিভিন্ন কাজ

খাওয়া-দাওয়ার কাজ শেষ করিয়া দুপুরে সামান্য বিশ্রাম করিয়া শিল্পচর্চার জন্য কিছু সময় ব্যয় করিতে হইবে। **লেস তৈয়ারী, এমব্রয়ডারীর** কাজ, কাঁটার সাহায্যে **উলের পোশাক তৈয়ারী** এবং সেলাই কলের সাহায্যে নানা প্রকার পোশাক তৈয়ারী—এই সকল বিবিধ সেলাই প্রত্যেক গৃহকর্ত্রীরই অতি প্রয়োজনীয় কার্য। আবার বিকাল হইলে গৃহ-সজ্জার টুকিটাকি কাজের ভিতর রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা। গৃহস্থালীর এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের পর নিজের **বেশভূষা ও পারিপাট্যের** প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ যে স্ত্রীলোক দাসী এবং বাঁদী, সেই প্রকৃতপক্ষে গৃহের লক্ষ্মী। অতএব নিজের দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বেশভূষার পারিপাট্য—ইহার কোনটাই অবহেলা করা উচিত নয়। বিকালবেলা সাধারণতঃ **অতিথি, অভ্যাগত** ও **আত্মীয়-স্বজনের** আগমন ঘটে—তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য সময় হাতে রাখা দরকার। তাহাদের উপস্থিতিতে বাড়ীর কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহা অতি অশোভনীয় দেখায়। রাত্রে বাড়ীর **ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার** তদারক করা এবং প্রয়োজন স্থলে সাহায্য করা দরকার। সংসারের **দৈনন্দিন হিসাব রক্ষার** ব্যাপারটিও এই সময় তালিকার ভিতর রাখিতে হইবে। দিনান্তে সমস্ত ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইবার পর শয়ন করিবার পূর্বে রাত্রে এই কাজটি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করা উচিত। এই **সময় তালিকার** যে মাঝে মাঝে **পরিবর্তন** হইবে না একথা মনে করা ভুল। বাড়ীতে কোনও কঠিন **রোগে আক্রান্ত রোগী থাকিলে** প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ ফেলিয়া

রাখিয়াও **সর্বপ্রথম রোগীর সুশ্রূষার** প্রতিই বেশি মনোযোগী হইতে হইবে। গৃহে **অতিথির সমাগম** ঘটিলে তাহার **অভ্যর্থনার জন্য** গৃহের অন্যান্য কাজের কিছু কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ কমবেশি সময় তালিকার হেরফের হওয়ায় কিছুই যায় আসে না—উপযুক্ত গৃহিণী অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত গৃহপরিচালনার এই ক্ষতিগুলি বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পূরণ করিয়া লইতে পারে।

গৃহ-পরিচালনায় কর্মবিভাগের প্রয়োজনীয়তা

প্রাচীন যুগের কর্মবিভাগ

মানব সমাজে কর্মবিভাগ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। **সামাজিক কাজের সুবিধার** জন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন হয়। সামাজিক কার্য **শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনার** জন্য **উপযুক্ত কর্মীর** প্রয়োজন। তাই আসিল কর্মে বাছাই করার তাগিদ। একই সমাজের অন্তর্গত সকলেরই আর সকল কার্যের **যোগ্যতা** থাকে না ; সমান **রুচিও** হয় না। তাই **যার যে কাজে ঝোঁক** বেশি, আর যে কাজের যোগ্যতা থাকে, তার জন্যই হয় সেই কাজ নির্ধারিত। এইরূপে **ব্যক্তিগত রুচি এবং কর্মপটুতার** জন্যই সমাজে কর্ম-বিভাগের সৃষ্টি হয়।

পরিবারে শ্রমবিভাগ

প্রত্যেক পরিবারেও **যোগ্যতা** অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন লোককে কার্য বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সুষ্ঠু গৃপরিচালনার জন্য **বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য** অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিতর ভাগ করিয়া দিতে হয়। এবং ইহাদের প্রত্যেকেই যদি কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তাহা হইলে **বিশৃঙ্খলা** দেখা দিতে পারে না। কিন্তু এই কর্ম-বিভাগের **সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৃহকর্ত্রীর**। ছোটবড় কোনও পরিবারের পক্ষেই **সমস্ত কাজ একা করা** কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব হইয়া উঠে না। এই শ্রম-বিভাগে কাহারও উপরই বেশি চাপ পড়ে না। ফলে গৃহিণী ও বাড়ীর প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরাই কিছু কিছু অবসর লাভ করিতে পারে। গৃহকর্ত্রী একা সব কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করিলে পরিবারের অন্যান্য লোকের **পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য** সম্বন্ধে কোনও **চেতনা** আসে না। সংসারের বৃহৎ কাজ ছোট ছোট অংশে ভাগ করার ফলে একের অপরের সহিত একটি যোগাযোগ ঘটে এবং এই **সহযোগিতার** ফলে পরিবারের কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিতর কিছু কিছু কাজ ভাগ করিয়া দেওয়ার ফলে উহাদের **শারীরিক গঠনের** উন্নতি হয়, **মনের প্রসারতাও** বৃদ্ধি পায় এবং

মানসিক বৃত্তিগুলি পূর্ণ-বিকাশের সুযোগ ঘটে। একটি কথা আছে "অলস মস্তিষ্ক সয়তানের কারখানা"। অতএব বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ঘরের এবং বাইরের কাজ ভাগ করিয়া দিলে তাহাদের মনের ভিতর কখনও খারাপ ও অন্যায় কাজের চিন্তা আসিতে পারে না এবং শৈশব হইতেই তাহারা কর্তব্য-পরায়ণ ও দায়িত্বশীল হইয়া উঠিতে পারে। কর্ম ভাগের ফলে কর্মে দক্ষতা সৃষ্টি হয়, একই কাজ দিনের পর দিন করিতে করিতে কাজটি সহজ হয় এবং নিপুণভাবে কাজটি সমাধা হয়।

কর্মভাগের ফলে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন

আমাদের দেশে পূর্বে যে সমাজ-ব্যবস্থা ছিল তাহাতে বাঙালী সমাজের এক একটি পরিবার ছিল বিরাট আকৃতির। পরিবারগুলি পুরুষানুক্রমিক হওয়ায় পরিবারে পিতামহ, পিতামহী, পিতামাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত এবং তাহাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতিকে লইয়া পরিবারগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করে। এই সকল পরিবারকে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার বলে। এই সমস্ত পরিবারে আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী ও আশ্রিত ব্যক্তিও স্থান পায়। আধুনিক যুগে ক্ষুদ্র পরিবার গঠনের দিকেই প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সংসারেও অনেক সময় শ্বশুর, শাশুড়ী ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপস্থিতি দেখা যায়। এইরূপ সংসারে কর্মবণ্টনের সময় গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যথেষ্ট সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত শ্রম-বিভাগের কাজটি করিতে না পারিলে এই সমস্ত পরিবারে ঘোর অশান্তির কালিমা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে।

বৃহৎ পরিবার ও ক্ষুদ্র পরিবার

সাধারণতঃ শ্বশুর-শাশুড়ী এবং ঐ স্থানীয় কোনও বয়োজ্যেষ্ঠদের কাজের ভার দিতে হইলে কখনই তাহাদের কোনও গুরুদায়িত্ব বা কঠিন কাজ দিতে হয় না। শ্রমসাধ্য কাজ দিলে তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহা ছাড়া এই অবিচারে তাহাদের মনোঃকষ্টের উদ্রেক হইতে পারে। আবার কোনও কিছুর দায়িত্ব থেকে তাহাদের দূরে সরাইয়া রাখিলে উহাদের অভিমান হয়। অতএব হাল্কা ধরনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাঁহাদের উপর বণ্টন করা আবশ্যক। আশ্রিতের কাজও শ্রমসাধ্য হইলে উহার মন আঘাতপ্রাপ্ত হয় আবার কোন রকম কাজ না দিয়া উহাদের শুধু শুধু বসাইয়া রাখাও যুক্তিযুক্ত নয়।

পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন কাজ

মধ্যবিত্ত পরিবারে নানা ধরনের কাজ থাকে। এইজন্য প্রতিদিনই কিছু কিছু কাজ বাড়ীর প্রত্যেকেরই করিতে হয়। ঘর-বাড়ী পরিষ্কার করা, গৃহ-প্রসাধন

করা, অতিথি-অভ্যাগতদের দেখাশুনা করা প্রভৃতি কাজ মেয়েদের ভিতর বণ্টন করা উচিত আবার ইলেক্‌ট্রিক বিষয়ের যাবতীয় মেরামতির টুকিটাকি কাজ, রেশন তোলা, দোকান-পাট করা, পোস্টাফিসে যাওয়া প্রভৃতি ছেলেদের উপর ভার থাকিলে ভাল হয়। বাজার করার কাজটি গৃহকর্তার নিজের গ্রহণ করা উচিত। এই কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বাজার করার দায়িত্ব ছোট ছেলেদের উপর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। গৃহকর্তার আরও কতকগুলি কাজ আছে, যেমন বাড়ীর ইলেক্‌ট্রিক বিল জমা দেওয়া, লাইফ-ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম পাঠানো, ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজ প্রভৃতি সমস্তই যথাসময়ে গৃহস্বামীরই করিতে হয়। এইভাবে বাড়ীর যাবতীয় কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব সুগৃহিণীর।

কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ ঃ—ইহার অর্থ কর্ম হ্রাস করা নয়। কর্মসম্পর্কিত সময় ও পরিশ্রম লাঘব করাকেই কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ বলা হইয়াছে। যে-কোনও কার্য সুষ্ঠু সম্পন্ন করার মস্ত বড় কৌশল এই কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ। অযথা সময় নষ্ট করিয়া একটি কাজে বেশি সময় লাগানো এখনকার যুগে মূর্খতার পরিচয়। এই সংক্ষিপ্তকরণ কাজের কৌশল দ্বারাও হইতে পারে আবার যান্ত্রিক উপায় প্রয়োগ করিয়াও সম্ভব হয়। যে-কোনও কাজ আরম্ভের পূর্বে যদি কাজটি সম্বন্ধে ভাল ভাবে চিন্তা করিয়া পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করা যায় তাহা হইলে কাজটি সম্পন্ন করিতে বেশি সময় লাগিবে না। একটি কাজ করিতে গেলে পূর্ব হইতে তাহার আবশ্যকীয় উপকরণগুলি হাতের কাছে গুচ্ছাইয়া লইতে হয়, অন্যথায় ছুটাছুটি করিয়া বৃথা সময় নষ্ট হয়। রন্ধন ক্রিয়ার এই পদ্ধতিটি একান্ত আবশ্যকীয়। সাধারণ চুল্লী যখন খুশী জ্বালানো যায় না, বা নিভানো যায় না। সেক্ষেত্রে উনুন ধরিবার আগে যদি চাল ধোওয়া, মাছ-তরকারী কাটা, মশলা বাঁটা, প্রভৃতি কাজ গুছানো না থাকে তাহা হইলে শুধু শুধুই আগুনের তাপের অপচয় ঘটে এবং ইহার জন্য অর্থ বেশি ব্যয় হয়। এই সাধারণ বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়া কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়।

কর্ম সংক্ষিপ্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

একই সময় বিভিন্ন কাজ করিয়া কাজ সংক্ষিপ্ত করা যায়। ইহাতে সময়েরও অপব্যয় হয় না। রান্না করিতে করিতে অনেক সময় বস্ত্রধৌতির কাজ সম্পন্ন করা যায়। রন্ধন কার্য শেষ হওয়ার পরই কাপড় ইস্ত্রির কাজ আরম্ভ করিতে হয় নচেৎ কয়লা খরচ বেশি হয়, সময়ও বেশি লাগে কেননা নতুন করিয়া চুল্লী জ্বালাইবার প্রয়োজন হয়।

গৃহের পরিকল্পনা যথাযথ হইলে সেই বাসগৃহে সংসারের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি ও অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন হয়। যেমন **রন্ধন-গৃহের সংলগ্ন যদি কাপড় কাচার গৃহটি অবস্থিত হয়** তাহা হইলে একই সময়ে দুইটি কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা যায়, **অযথা ছুটাছুটি** করিয়া হয়রানি হইতে হয় না। **রান্নাঘরের পরিকল্পনা** যদি এমন হয় যাহাতে এই ঘরের ভিতরেই **জলের ব্যবস্থা থাকে** অথবা একটি **সিঙ্ক** থাকে তাহা হইলেও এই কাজের খুব সুবিধা হয়।

রন্ধন-গৃহের **বাসনপত্র নির্বাচনেও** কাজের সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করে। **কাঁসা, পিতল, লোহা** প্রভৃতি বাসনপত্র পরিষ্কার করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, নাড়াচাড়া করিতেও অসুবিধা হয়। ইহার স্থলে যদি· **স্টেনলেস স্টীলের বাসন, অ্যালুমিনিয়ামের** বাসন, **চীনামাটির** বাসন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে উহা পরিষ্কার করার কাজটি **ঝি-চাকরের অনুপস্থিতিতেই** চালাইয়া নেওয়া যায়।

ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বণ্টন করিলে কাজটি অল্প সময়ে, কম পরিশ্রমে নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়। **আনাড়ী এবং অনিচ্ছুক** লোক দিয়া কখনও কোন কাজ ভালভাবে আদায় করা যায় না।

জিনিষ **যথাস্থানে** রাখিলে কাজের সুবিধা হয়। ইহাতে **সময় ও শ্রম** উভয়ই লাঘব করা যায়। ঠিকভাবে জিনিসপত্র সন্নিবেশ করার অভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসটি খুঁজিয়া বাহির করিতে গলদঘর্ম হইতে হয়। ইহাতে বৃথা পরিশ্রম হয় অধিকন্তু সময় নষ্ট হয়। যখন যে জিনিসটি স্থানচ্যুত করা হইবে কার্যান্তে তৎক্ষণাৎ উহা যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হইবে। এই নীতি পালন করিয়া চলিলে গৃহস্থালী কাজ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়। কোনও **কক্ষের উদ্দেশ্য অনুযায়ীও** সেই ঘরের **তৈজস-পত্রাদি** এবং **আসবাব-পত্রাদি সন্নিবেশ** করিতে হয়। এ ঘরের জিনিস ওঘরে রাখিলে কাজের **বিশৃঙ্খলা** দেখা দেয়।

সময় সংক্ষেপের জন্য **বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রাদি** ব্যবহারের প্রচলন আজকাল খুব দেখা যায়।

গৃহকার্যে শ্রম লাঘবে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার

গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য **নানাভাবে সময় নষ্ট হয়** এবং **অহেতুক শ্রমের প্রয়োজন** হয়। কিন্তু পরিকল্পনা করিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস যদি অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রয় করা যায় তবে গৃহকার্যের প্রকল্পটি খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রথমতঃ, রন্ধন কার্যের জন্য **গ্যাসচুল্লী, ইলেকট্রিক স্টোভ, হীটার** এইগুলি ব্যবহার করিলে **সময় কম** লাগে এবং **পরিশ্রমও** কম হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন রকম **প্রেসার কুকার** আজকাল অনেক পরিবারে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে অল্প সময়ে কম পরিশ্রমে রান্নার কাজ হইতেছে। খাদ্যগুণও ইহাতে ভালভাবে বজায় থাকে। সাধারণ চুল্লীতে বারে বারে কয়লা দেওয়াটা পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুলও বটে। রান্নায় সময়ও অনেক বেশি লাগে। সাধারণ কাজের জন্যও কতকগুলি সুবিধাজনক যন্ত্রপাতির প্রচলন আজকাল দেখা যায়; যেমন **আলুর খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র, ফলের রস বাহির করিবার যন্ত্র, ডিম ফাটাইবার ও মাখন তোলার যন্ত্র,** এমনকি **মাংসের কিমা কবিবার** যন্ত্রও বাহির হইয়াছে।

বস্ত্রধৌতির জন্য আমরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারি যাহা দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কাজ করার অনেক সুবিধা হয়। **ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ভ্যাকুয়াম কোন** এগুলি বস্ত্রধৌতির কাজে আমাদের অনেক সাহায্য করে।

দৈনন্দিন সেলাইয়ের জন্য যদি একটি **'সেলাইয়ের কল'** থাকে তাহা হইলে অল্প পরিশ্রমে কম সময়ে আমরা পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করিতে পারি। বস্ত্রাদির **এমব্রয়-ডারী করার কলও** আজকাল অনেক বাহির হইয়াছে। বর্তমান অর্থসঙ্কটের সময় **অনেক স্ত্রীলোক** অসহায় হইয়া এই যন্ত্রের দ্বারা **ভাল ভাল শাড়ী তৈরী করিয়া** বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে তাহার পরিবারের **জীবিকার সংস্থান** হইতেছে।

আধুনিক যুগে সমস্ত ক্ষেত্রেই যখন অল্প সময়ে : বেশি কাজের পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করা হইতেছে তখন গৃহকর্ত্রীরাও এ বিষয়ে অগ্রগামী হইয়া নানা সুযোগ-সুবিধা

সেকালের গৃহিণী ও একালের গৃহিণী

গ্রহণ করিতেছে। সেকালের গৃহিণীদের **সংসারের কাজকর্ম** ছাড়া আর কোনও কর্তব্য ছিল না। কিন্তু বর্তমান প্রগতির যুগে নারীরা আর পশ্চাতে পড়িয়া নাই; তাহাদেরও বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রহিয়াছে। জীবনযাত্রার মান বর্তমান যুগে রক্ষা করিতে গেলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উপার্জন করা প্রয়োজন। ফলে মেয়েরা এখন সংসারের **আর্থিক দিকেও সাহায্য করে, অফিস কাছারী করিয়া অর্থ উপার্জন করে; স্কুল, কলেজে শিক্ষকতা করে।** এমন কি **ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার** প্রভৃতি পেশাতেও নারীজাতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানঅধিকার করিয়া আছে। এক্ষেত্রে সেকালের কর্ম-পদ্ধতি অনুসারে একালের গৃহিণীরা জীবন যাপন করিলে তাহাদের **অগ্রগতিতে বাঁধার সৃষ্টি হইবে** সন্দেহ নাই। সেকালের

গৃহিণীদের সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু **রান্নাবাড়া, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা** প্রভৃতি কাজের ভিতর তাহাদের **আত্মতুষ্টি** ছিল। উহারা কোনও **ছন্দে বাঁধা পরিকল্পনার** ভিতর কাজ করিত না বলিয়া **দীর্ঘ সময় লইয়া** গৃহিণীপনার নানা কার্যে তাহাদের ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের যুগে, প্রগতির যুগে পরিকল্পনা ছাড়া কোনও কাজ হয় না। **অর্থ নৈতিক সমস্যাও আজ** প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত কারণে আধুনিক গৃহিণীরা নানাভাবে কাজের সময় সংক্ষেপ করিতেছে, শ্রম লাঘব করিতেছে এবং নানাভাবে **অর্থ নৈতিক অবস্থার** পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হইতেছে।

সুগৃহিণীর দৈনন্দিন কার্যাবলী

গৃহকর্ত্রীই গৃহের **প্রাণস্বরূপ**। উপযুক্ত গৃহিণীর অভাবে এক একটি সংসার **চরম বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত** হয়—আবার **বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, গৃহকর্ত্রী,** গৃহটিকে তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় একটি **সুন্দর ও শান্তির আকর হিসাবে** গড়িয়া তোলে। কেবলমাত্র একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিলেই হয় না, এই পরিকল্পনা প্রয়োগ করিবার জন্য **যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা, রুচি ও শ্রমশীলতার** প্রয়োজন হয়।

গৃহের কাজগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যাইতেছে ; যেমন, **খাদ্যব্যবস্থা, গৃহপ্রসাধন, পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা, শিশুশিক্ষা** ও **সংসারের আয়-ব্যয়ের** হিসাব রাখা ও **সঞ্চয়ের ব্যবস্থা** প্রভৃতি।

(১) **খাদ্য-ব্যবস্থা ঃ** বর্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে উপযুক্ত খাদ্য রচনা করা যে কি সমস্যার ব্যাপার গৃহী মাত্রই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। তবুও আদর্শ গৃহিণী তাহার বিচক্ষণতার ভিতর দিয়া বাড়ীর প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য **রুচি ও স্বাস্থ্য** অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া যায়। খাদ্যের উপরই প্রধানতঃ মানুষের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, কাজেই এই খাদ্যকে অবহেলা করিলে চলে না। সুগৃহিণী চেষ্টা করে যাহাতে প্রত্যেককে **সুষম খাদ্য** দেওয়া যায়। **খাদ্যে বৈচিত্র্য** আনাও তাহার কৃতিত্ব। এই গুরু দায়িত্বের জন্য রন্ধন কার্যের বিভিন্ন কাজ তাহাকে পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর বণ্টন করিতে হয়।

(২) **গৃহ-প্রসাধন ঃ** গৃহ-প্রসাধনের পূর্বে গৃহস্থিত যাবতীয় **আবর্জনা** আগে **দূরীকরণের** ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেননা বাড়ীতে আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া থাকিলে গৃহ-প্রসাধনের পরিকল্পনাটিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। গৃহ-প্রসাধনের কাজটি **বাড়ীর মেয়েদের** উপরে ন্যস্ত থাকিলেই ভাল হয়। গৃহকর্ত্রী কেবল পরিচালনা

করিবেন এবং তাহাদের **কর্মতৎপরতা** লক্ষ্য করিবেন। **পুষ্পবিন্যাস, পর্দা-সন্নিবেশ** ও **আলপনা** প্রভৃতির মাধ্যমে গৃহের প্রসাধন কাজটি সম্পন্ন করা যাইবে।

(৩) **পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা :** খাদ্য ও বাসস্থানের মতই সভ্যজগতে মানুষের **পক্ষে পোশাক-পরিচ্ছদও** অপরিহার্য। **ব্যক্তিগত রুচি, দৈহিক গঠন** ও **আবহাওয়া অনুযায়ী** পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহিণীর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য পরিচ্ছদ নির্বাচন করা উচিত। বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের **অতিরিক্ত দামী পোশাকের** ব্যবস্থা করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়; ইহা ছাড়া **আর্থিক ক্ষমতার সীমা** ছাড়াইয়াও কখনও অতিরিক্ত পোষাকের ব্যবস্থা করা গৃহকর্ত্রীর নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। বিচক্ষণ গৃহিণী সামান্য ছেঁড়া-ফাঁটা পরিচ্ছদগুলি সময় মত সেলাই করিয়া মেরামত করিয়া লইতে পারে, ইহাতে ছেলেমেয়েদের জন্য সব সময় নূতন পরিচ্ছদ কেনার প্রয়োজন হয় না। দামী পোশাকগুলি অব্যবহার্য হইলে **কিছু খরচ করিয়া** দোকানে দিলে **আবার নূতনের মত** ব্যবহার করা যায়। সমস্তই গৃহকর্ত্রীর পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে।

(৪) **শিশু-শিক্ষা :** সংসারের সকল রকমের কাজের ভিতর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইল শিশু-পালন ও শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা। শৈশবের শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। শিশুর **শিক্ষা, স্নান, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা** প্রতিটি বিষয়ের প্রতি গৃহকর্ত্রীর নিজের যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। সুগৃহিণী শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করিয়া কখনই এ বিষয়টিকে অবহেলা করে না।

(৫) **আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা :** সুগৃহিণী মাত্রই সংসারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রাখিয়া একটি **বাজেটের** পরিকল্পনা করিয়া লয়। বাজেট করিয়া না লইলে মাসের প্রথম দিকেই সমস্ত টাকা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। মানুষের চাহিদার সীমা নাই। সেই কারণে গৃহকর্ত্রী যদি সংসারের প্রত্যেকের দাবিগুলি সুষ্ঠুভাবে মিটাইতে যায় তবে তাহার সংসার পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। গৃহকর্ত্রী কখনই বাড়ীর **ছেলেমেয়েদের** এমনকি **বয়স্কদেরও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা** মিটাইবার জন্য আগ্রহী হইবে না। উপযুক্ত সুগৃহিণী তাহার **ব্যক্তিত্বের মহিমায়** যাবতীয় বাজে খরচের কল্পনা বন্ধ করিয়া দিতে পারে। **দৈনিক হিসাব লেখার** দায়িত্ব সম্পূর্ণ **গৃহিণীর** উপর। গৃহিণী এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে ব্যয় সম্বন্ধে তাহার যথাযথ ধারণা জন্মিবে না। এক মাসের ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া আগামী মাসের ব্যয়ের একটি খসড়া অনুমান করা যায়।

এই কারণে হিসাব রাখার কাজটি সুগৃহিণীর একটি প্রধান কাজ। গৃহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচ সঙ্কুলান করিয়া গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য কিছু অর্থ সঞ্চয়ের জন্য পৃথক রাখা। এই অর্থ **মাসের প্রথমেই** কোনও ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসের-এর সাহায্যে জমা রাখিতে হয়, ইহাতে সুদও জমা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহের যত্ন ও পরিষ্করণ, গার্হস্থ্য পরিষ্করণ, আসবাব-পত্রাদি ও গৃহের অন্যান্য জিনিস পরিষ্করণ

গৃহের যত্নঃ গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং গৃহের প্রসাধন এই দুইয়ের সমন্বয়কেই গৃহের যত্ন বলে। গৃহের যত্নের উপর গার্হস্থ্য জীবনের **সুখ-শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করে।** গৃহের প্রত্যেকটি কক্ষ, গৃহের আঙিনা এবং চতুর্দিক এমনভাবে পরিষ্কার করা দরকার যাহার ফলে গৃহের শ্রী আপনিই ফুটিয়া ওঠে। **অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন** গৃহকে **লক্ষ্মীছাড়া পুরীর** সঙ্গে তুলনা করা হয়। গৃহের আবর্জনা অপসারণের কাজ গৃহিণীর পরিকল্পনা অনুযায়ী দাস-দাসীর সাহায্যে নিজের তত্ত্বাবধানে করাইয়া লইতে পারে। দৈনন্দিন কার্যের তালিকায় ব্যাপকভাবে গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ কখনই সম্ভব হয় না। এজন্য গৃহকর্ত্রীর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক হিসাবে ভাগ করিয়া লইতে হয়। এবং ইহার কিছু কিছু কাজ পরিবারের বিভিন্ন **ব্যক্তির ভিতর বণ্টন** করিয়া লইতে হয়। প্রতিদিন প্রত্যেকটি ঘর **ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে** হয়। সব সময় এই কাজ **ঝি চাকরের** উপর ছাড়িয়া দিলে উহারা যত্ন নিয়া করিবে না ; ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিবে। সেই জন্য গৃহিণীর নিজের হাতে মাঝে মাঝে এই কাজটির দায়িত্ব লইতে হইবে। কাজের কাছে নিজে অগ্রসর হইয়া আসিলে **দাস-দাসীরাও** ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিবে না। সপ্তাহে একবার যদি **মৌ-মোম** এবং **তার্পিন তৈলের** সাহায্যে মেঝে পরিষ্কার করা হয় তাহা হইলে দৈনন্দিন পরিষ্কারের কাজটিও অধিকতর সহজ ও সময়সংক্ষেপ হয়। ঝুল ঝাড়ার কাজ ও **দেওয়ালের ছবির ধুলা** পরিষ্কার করার কাজ মাসে একবার করিলেও হয়। আমাদের দেশে প্রথামত বৎসরে দুইবার ব্যাপকভাবে গৃহ পরিষ্কারের প্রচলন আছে।

একবার শারদীয় পূজার পূর্বে আশ্বিন মাসে আর একবার বৎসরের শেষে চৈত্র মাসে। বাড়ীটিকে সুন্দর ও মজবুত রাখিতে হইলে বৎসরে একবার রং করানো, নূতন প্লাস্টার করা, চূণকাম করা প্রভৃতি কাজ অবশ্যই করাইয়া লইতে হয়। ইহার পর আসে গৃহ-প্রসাধনের কথা। বাড়ীটিকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলে স্বভাবতঃ বাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। শয্যা তৈরী করা, পর্দা সন্নিবেশ, পুষ্পবিন্যাস, আলপনা দেওয়া প্রভৃতি গৃহ-প্রসাধনের প্রথম ও প্রধান কাজ। দৈনিক গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পর গৃহ-প্রসাধনের দৈনিক এই কাজগুলিই যথেষ্ট। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি বাড়ীর মেয়েদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায়। আজকাল প্রায় সকল মেয়েরাই রুচি-সম্পন্নভাবে ঘর সাজাইবার নীতি আয়ত্ত করিয়াছে।

বসন্তকালীন পরিষ্কার

দৈনিক পরিষ্করণ

বসিবার ঘর পরিষ্করণ : বসিবার ঘরের চেয়ার টেবিল, ও অন্যান্য আসবাব-পত্রাদি প্রথমে একটি ঝাড়নের সাহায্যে ঝাড়িয়া পুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আসবাব-পত্রের যাবতীয় ঢাকনা ঝাড়িয়া এক জায়গায় একত্র করিয়া রাখিতে হয়। আসবাব-পত্রের যে স্থানে ময়লা ও ধূলাবালি আটকাইয়া থাকে সেখানকার ময়লা এক টুকরা কাপড়ে প্যারাফিন লাগাইয়া উহার সাহায্যে ঘষিয়া তোলা যায়। মেঝের যাবতীয় কাগজের টুকরা, ফুলদানির বাসি ফুলপাতা সমস্ত ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ইহার পর মেঝে পরিষ্কার করিবার পালা। মেঝে ভাল করিয়া নরম ঝাঁড়ুর সাহায্যে ঝাঁট দিয়া জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া উত্তম-রূপে পরিষ্কার ন্যাতার সাহায্যে সমগ্র ঘরখানি মুছিয়া ফেলিতে হয়। ঘরের মেঝেতে যদি কার্পেট পাতা থাকে তাহা হইলে উহা কার্পেট ঝাঁড়ার স্বতন্ত্র ঝাড়নের সাহায্যে উহার ধূলা অপসারণ করিয়া লইতে হয়। তারপর উহা বিছাইয়া পরিষ্কারের কাজ সমাপ্ত করিতে হয়। ইহার পর আসবাবপত্রের নির্দিষ্ট ঢাকনা দ্বারা এক একটি আসবাবপত্র আচ্ছাদন করিয়া সুষ্ঠুভাবে পর্দা সংযোজনার কাজে মনোযোগী হইতে হইবে। টাটকা ও সতেজ পুষ্পস্তবকের সাহায্যে ফুলদানি ভরিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ সুপরিকল্পনা সহকারে বসিবার ঘরটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শ্রী বজায় রাখা যায়।

শয়নঘর পরিষ্করণ : শয়ন কক্ষ পরিষ্কার করিবার পূর্বে প্রথমে বিছানাপত্রগুলির সুষ্ঠু বিন্যাসের প্রয়োজন। শীতকাল হইলে শয্যার উপকরণগুলি অর্থাৎ লেপ, তোষক,

বালিশ সমস্ত বাইরে রৌদ্রে রাখা উচিত। বিছানা পত্র রৌদ্রে দিলে শীতের সময় ঐ বিছানায় শয়ন করা আরামপ্রদ হয়। তাছাড়া বিছানায় সহজে ছারপোকা হইতে পারে না। বিছানা তুলিয়া খাটের গদী ঝাড়িয়া ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। জানালা, দরজা ভাল করিয়া উন্মুক্ত করিয়া আলোবাতাসের পথ সহজ করিয়া তুলিতে হয়। ইহার পর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া জিনিসগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে হয়। মেঝেতে যদি কার্পেট থাকে তাহা হইলে বসিবার ঘরের মত কার্পেটটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সমস্ত ধুলা-বালি পরিষ্কারের পর ঘরটি ধোওয়াইয়া পরিষ্কার ন্যাতার সাহায্যে পুছিয়া শুকনা করিয়া লইতে হয়। প্রতিদিন ঘর ধোয়ানো সম্ভব না হইলে বড় একটি গামলা বা বালতিতে জল লইয়া ন্যাতার সাহায্যে ঘরটি পুছিয়া ফেলা আবশ্যক। মাঝে মাঝে ন্যাকড়ায় প্যারাফিন লইয়া তাহা দ্বারা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিলে মেঝে চকচকে হয়। এইবার সমস্ত শয্যাটি খাটের উপর শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশ করিয়া সুন্দর একটি বেড-কভার দ্বারা বিছানাটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। দেওয়াল ও পর্দার রং-এর সহিত বেড-কভারটির-রং এর সামঞ্জস্য থাকিলে ঘরের শ্রী অধিকতর বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আসবাবপত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হয়। ফুলদানিতে নূতন করিয়া পুষ্প-বিন্যাস করিতে হয়। বাড়ীর মেয়েরা ঘরের মেঝেতে দৈনিক একখানি আলপনা দিতে পারিলে ঐ পরিবারের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

খাইবার ঘর ও রান্নাঘর পরিষ্করণ: ভোজন কার্যটি সমাপনের সঙ্গে সঙ্গেই খাইবার টেবিলটি ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। খাইবার ঘরের চেয়ারগুলির ধূলা ঝাড়িয়া মেঝেটি পরিষ্কার করিতে হয়। প্রতিদিন এই কক্ষের মেঝে ফিনাইলের সাহায্যে ধুইয়া পুছিয়া ফেলিতে হয়। খাওয়ার থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ধোয়া-মোছার পর তাকে সাজাইয়া রাখিতে হয়। রেফ্রিজারেটার থাকিলে উহা প্রতিদিন শুক্না নরম ঝাঁড়নের সাহায্যে উহার ধূলাবালি পরিষ্কার করিতে হয়।

রান্নাঘরটি রান্নার পর দুই বেলাই প্রচুর জলের সাহায্যে ধুইয়া পুছিয়া ফেলিতে হয়। ঘর ধোয়ার পর বাসনপত্র ধুইয়া মুছিয়া ঐ ঘরের তাকে শৃঙ্খলা-মত সাজাইয়া রাখিতে হয়। রান্নাঘর নোংরা থাকিলে মাছি, পিপড়া, আরশুলা প্রভৃতির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় খাদ্যদ্রব্যাদিও জীবাণু-দুষ্ট হয়।

সাপ্তাহিক পরিষ্করণ

বসিবার ঘর পরিষ্করণঃ প্রতিদিন নিয়মমত পরিষ্কার করার পরও মাঝে মাঝে বিশেষভাবে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। বসিবার ঘর সপ্তাহে যে-কোনও একদিন পরিষ্কার করিতে গেলে প্রথমেই **দেওয়াল হইতে টাঙ্গানো** ছবিগুলি খুলিয়া ভালভাবে ঝাড়িয়া মুছিয়া ধূলা **পরিষ্কার করিতে হইবে।** পর্দাগুলি খুলিয়া **কাঁচিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে।** আসবারপত্রের ঢাকনাগুলিও কাঁচিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। এইবার আসবাবপত্রাদি ঝাড়নের সাহায্যে ঝাঁড়িয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। টেবিল বা আলমারীতে সাজানো **বইগুলির ধূলা** ঝাড়িয়া মেঝে পরিষ্কারের পর পুনরায় টেবিলে গুছাইয়া রাখিতে হয়। **ছাইদান, ফুলদানি** প্রভৃতি সরঞ্জাম পিতলের হইলে যথাযথ পরিষ্কার করিয়া **চাকচিক্যের জন্য ব্রাসোর পালিশ** লাগাইয়া ঘষিয়া লইতে হয়। জানালার **সার্শি ও কাচগুলি** ভিজানো **খবরের কাগজের** সাহায্যে চকচকে করিয়া লওয়া যায়। আলোর বাল্ব্-গুলি নরম ন্যাকড়ার সাহায্যে সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করিতে হয়। সমস্ত পরিষ্কার করার কাজটি শেষ হইয়া গেলে প্রত্যেকটি আসবাব ও সরঞ্জাম শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশ করিয়া রাখিতে হয়।

শয়ন-ঘর পরিষ্করণঃ প্রতিদিন সমস্ত সরঞ্জাম পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য শয়ন-ঘরের আসবাবপত্রাদি ও বিছানাপত্র সমস্তই সপ্তাহের যে-কোনও একটি দিনে বিশেষভাবে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই কার্যে ছেলেমেয়েদের ও বাড়ীর ঝি চাকরের সাহায্য লওয়া যায়। পরিষ্কার করার পদ্ধতি উপর হইতে ক্রমশঃ নীচে আসিতে হয়। প্রথমে লম্বা বাঁশের মাথায় পাটের গুচ্ছ লাগানো ঝাঁড়ন দ্বারা দেওয়াল ও সিলিং-এর ঝুল ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। ইহার পূর্বে **দেওয়ালের ছবি বা ফটো খুলিয়া** পরিষ্কার করিয়া একটি পৃথক স্থানে রাখিতে হয়। দেওয়াল ও জানালা-দরজার ময়লা পরিষ্কার করা হইয়া গেলে **মেঝে পরিষ্কারে মনোযোগী** হইতে হয়। মেঝেতে কার্পেট থাকিলে উহা **স্বতন্ত্র ব্রাশের সাহায্যে** পরিষ্কার করিতে হয়। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, বালিশের আচ্ছাদন, পর্দা, **আসবাব-পত্রাদির ঢাকনা** সমস্তই খুলিয়া কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। **খাট, খাটের গদী, বড় বড় আসবাবপত্র** প্রভৃতি **ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের** সাহায্যে পরিষ্কার করিলে অধিক সুবিধাজনক হয় এবং ইহাতে **ধূলিকণা** একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ড্রেসিং টেবিলের আয়না, **শোকেসের কাচ,** প্রভৃতি **স্পিরিট** অথবা **আর্দ্র খবরের কাগজের** টুকরার সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেলে

যাবতীয় ঢাকনাগুলি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট আসবাবপত্রাদিতে লাগাইয়া রাখিতে হয়। এইজন্য **আর এক প্রস্থ পর্দা ও ঢাকনা** সমূহের প্রয়োজন হয়।

খাইবার ঘর ও রন্ধন গৃহ : লম্বা হাতল-যুক্ত ঝাঁড়নের সাহায্যে এই দুই ঘরের ঝুল ঝাড়িতে হয়। **রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়িবার** জন্য পৃথক **ঝাঁড়নের প্রয়োজন হয়।** কেননা রান্নাঘরের ঝুলে কালি মাখানো থাকে। সমস্ত **তাক সিঙ্ক ভালভাবে পরিষ্কার** করিয়া ভিজা ন্যাকরার সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতে হয়। টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র সম্ভব হলে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিতে হয়। প্রচুর জলের সাহায্যে **সমস্ত ঘরের আনাচ-কানাচ** সমস্তই **ফিনাইল অথবা** অন্য কোনও জীবাণুনাশক ও দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য জলের সহিত মিশাইয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। তারপর নিপুণভাবে ঘরখানিকে শুকাইয়া লইতে হয়। ঘরের মিটসেফের জিনিসপত্র বাইরে আনিয়া ঝাড়িয়া-পুছিয়া আবার ঘরে নিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হয়। যে-কোনও ঘর পরিষ্কার করিতে গেলে **অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহার্য** জিনিসগুলি ফেলিয়া দিতে হয় অথবা দূরীকরণ করিতে হয়। যেমন, **শিশি, বোতল, ভাঙ্গা কৌটা, পুরাতন কৌটা ইত্যাদি** ঘরে জমা না করিয়া সরাইয়া ফেলাই যুক্তিযুক্ত।

বার্ষিক পরিষ্করণ

চৈত্র সংক্রান্তি, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, ঈদ, বড়দিনের পূর্বে সাধারণতঃ সমগ্র গৃহটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটি ব্যাপক ভাবে হইয়া থাকে। সমস্ত ঘরের **চুণকাম করা, রং করা** বৎসরে একবার করিলে বাড়ীঘর ভাল থাকে। প্রয়োজন স্থলে একবার নূতন করিয়া **প্লাস্টার** করিয়াও লওয়া যায়। বৎসরে একবার বাড়ীর পিছনে অর্থ ব্যয় না করিলে বাড়ী তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। চূণকাম ও রং-এর সঙ্গে সঙ্গে দরজা-জানালারও রং-এর প্রয়োজন হয়। বাজার হইতে রং কিনিয়া আনিয়া তুলির সাহায্যে **দরজা জানালাগুলি নিজেরাই রং করিয়া** লইতে পারে দেওয়ালের চিত্র সন্নিবেশের পূর্বে প্রত্যেকটি দেওয়াল হইতে খুলিয়া খুব ভালভাবে পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে নূতন **আর এক প্রস্থ ছবি** দেওয়ালে সন্নিবেশ করা যায়। পর্দা ও **ঢাকনাও নূতন আর এক** প্রস্থ হইলে ভাল হয়। ইহাতে **বৈচিত্র্য বজায়** রাখা যায়। যত সুন্দর ভাবেই ঘর সাজানো হউক না কেন—**নূতনত্ব সৃষ্টি করিতে** না পারিলে উহা **একঘেয়েমীর** পর্যায় পড়ে।

বিভিন্ন জিনিষের সাহায্যে ঘর পরিষ্কার করণ

ঘরের দেওয়াল ও সিলিং-এর ধূলা পরিষ্কার করিবার জন্য বড় আকারের

ঝাড়ন ব্যবহৃত হয়। এইগুলি সাধারণতঃ **লম্বা বাঁশের মাথায় একগুচ্ছ** পাট **লাগানো থাকে।**

বাইরের সীমানা ও আঙ্গিনা ঝাঁটপাট দেওয়ার জন্য নারিকেলের ঝাঁড়ু ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঘরের মেঝে পরিষ্কারের জন্য ফুল ঝাঁড়ু বা অন্য কোনও নরম ঝাঁড়ুর সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়। কোনও মেঝে জল দিয়া ধোয়াইবার সময় **নারিকেলের ঝাঁটাই ব্যবহার** করা ভাল, উহাতে তাড়াতাড়ি **জল সরিয়া যায়।** মেঝে পরিষ্কারের জন্য আমরা সাধারণতঃ ন্যাতা ব্যবহার করি। কিন্তু লম্বা হাতল-যুক্ত পাট লাগানো ঝাড়ন ভিজাইয়া উহার সাহায্যে ঘর মোছা অত্যন্ত সহজ উপায়। ইহাতে পরিশ্রমও কম হয়, সময়ও কম লাগে। তাহা ছাড়া বসিয়া কাজ করিবার ফলে **মেরুদণ্ড বাঁকিয়া** যায়। লম্বা হাতল-যুক্ত ঝাঁড়নের সাহায্যে ঘর মুছিবার সময় **দাঁড়াইয়া লইতে** হয়, ফলে **শরীরের গঠন-বিন্যাস সুন্দর হয়।** কার্পেট পরিষ্কারের জন্য কার্পেট বীটার (Carpet beater) পাওয়া যায় ; ইহার অভাবে সাধারণ **ব্রাশ দ্বারাও কার্পেট** পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

ব্যবহৃত চায়ের পাতা মেঝেতে ছড়াইয়া দিলে মেঝের ধূলাবালি পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর ঐ পাতাগুলি ন্যাকড়ার সাহায্যে গোছ করিয়া তুলিয়া নিলেই হয়। কার্পেটও **চায়ের পাতার সাহায্যে** পরিষ্কার করা যায়। চায়ের পাতা ন্যাকড়ার পুটুলীতে ভরিয়া কার্পেটের উপর বুলাইয়া নিলে উহা সহজেই পরিষ্কার হয়। তবে ইহাতে অনেক চায়ের পাতার প্রয়োজন হয়। **জানালার কাচ, আলমারীর কাচ, ড্রেসিং-টেবিলের আয়না** প্রভৃতিতে অনেক সময় এমনভাবে ময়লা পড়ে যে সহজে সেগুলি পরিষ্কার হয় না। অনেকে **স্পিরিটের সাহায্যে** এই কাচ ও আয়না পরিষ্কার করে কিন্তু তাহাতেও দেখা যায় একদিকের ময়লা আর একদিকে সরিয়া যায়। এইজন্য অত্যন্ত সহজ ও বিনা অর্থব্যয়ে একটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রায় সব বাড়ীতেই খবরের কাগজ কেনা হয়। **পুরাতন খবরের কাগজের টুকরা** জলে **ভিজাইয়া লইয়া উহার সাহায্যে** বেশ করিয়া উপর হইতে নীচ পর্যন্ত ঘষিয়া লইলে আয়নাটি বেশ চকচকে হইবে। কোনও রকম ধূলা **বা তৈলাক্ত ময়লা সহজেই** কাগজের সাথে উঠিয়া আসে। কাগজ টুকরা টুকরা হইয়া হাত হইতে পড়িয়া গেলে আবার নূতন করিয়া ভিজা কাগজ লইয়া কাজটি শেষকরিতে হয়।

পাশ্চাত্য দেশে ঘরের ধূলা ও আসবাবপত্রের ধূলা-বালি পরিষ্কার করার জন্য **ভ্যাকুয়াম ক্লীনার** ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে এখনও ইহা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন হয় নাই।

(২) **গার্হস্থ্য পরিষ্করণ :** গৃহের সমস্ত অংশ এবং গৃহস্থালীর আসবাবপত্রাদি ও বাসনপত্রের পরিষ্করণের নাম গার্হস্থ্য পরিষ্করণ।

গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইলে উহার প্রতিটি অংশই পৃথক ভাবে পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয়। প্রথমে গৃহের দেওয়াল পরিষ্কারের কথাই চিন্তা করিতে হয়। লম্বা বাঁশের মাথায় পাটের গুচ্ছ বাঁধিয়া দেওয়াল এবং সিলিং পরিষ্কারের ঝাঁড়ন প্রস্তুত করা যায়। এই ঝাঁড়নের সাহায্যে দেওয়ালের সমস্ত ধূলা-ময়লা ঝাঁড়িয়া পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু এই পরিষ্কার করার পদ্ধতি সাধারণতঃ **সাপ্তাহিক পরিষ্করণের পর্যায়ে** পড়ে। কিন্তু ব্যাপকভাবে পরিষ্কার করিতে গেলে দেওয়ালের বিবর্ণ রং তুলিয়া নূতন করিয়া চূনকাম ও রং করিতে হয়। ধূলা-বালিতে দেওয়ালের রং নষ্ট হইয়া গেলে ভিজা ন্যাকড়ার দ্বারা আলতোভাবে দেওয়াল মুছিয়া নিলে দেওয়াল পরিষ্কার হইয়া যায়। তেল রং-এর বেলাতে গরম সাবান-জলের সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। এইরূপ পরিষ্কার-প্রণালী বৎসরে একবারের বেশী করা সম্ভব হয় না। দেওয়ালে যদি নক্সাকরা কাগজ লাগানো থাকে তবে উহা পরিষ্কার করার জন্য নরম ব্রাশ ব্যবহার করিতে হয়। কোনও দাগ থাকিলে ভিজা ন্যাকড়ার সাহায্যে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঐ দাগ তুলিতে হয়।

দেওয়াল পরিষ্কার করণ

ঘরের দরজা-জানালা পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে ঝাঁড়নের সাহায্যে উহার ধূলা ঝাঁড়িয়া ফেলিতে হয়। ইহার পর গরম সাবান-জলে এক টুকরা ন্যাকড়া ভিজাইয়া জানালার সার্শির কাচ পরিষ্কার করিতে হয়। ভিজা থাকিলে শীঘ্রই আবার ধূলা আটকাইয়া যাইবে। সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বড় এক টুকরা ন্যাকড়ার সাহায্যে পুছিয়া লইতে হয়। পর্দা না খুলিয়া কখনই জানালা-দরজা পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ করিতে হয় না। সমস্ত পরিষ্কার করিবার পর পর্দাগুলি যথাযথভাবে আবার সন্নিবেশ করিতে হয়।

জানালা-দরজা পরিষ্কার করণ

(বিভিন্ন কক্ষ পরিষ্কার করণ প্রসঙ্গে মেঝে পরিষ্কার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে)

সিঁড়ি পরিষ্কার করণ : সিঁড়ি পরিষ্কার করিবার সময় **উহার সংলগ্ন কক্ষ-গুলির দরজা এবং জানালা বন্ধ করিয়া লইতে হয়,** তাহা না হইলে **সমস্ত ধূলা উড়িয়া** ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবে। ছোট ঝাঁটা বা ব্রাশের সাহায্যে ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সব সময় **উপর হইতে নীচ পর্যন্ত** পরিষ্কার করিয়া যাইতে হয়। সিঁড়ির ময়লা **ডান দিক হইতে বাম দিকে** সরাইয়া ঝাঁটা চালাইতে হয়। পরে আবর্জনা ও ধূলিকণাগুলি তুলিয়া বাইরের ডাস্টবিনে ফেলিয়া দিতে হয়। সিঁড়ি ধোয়াইতে হইলে ঝাঁটা বা ব্রাশের সাহায্যে রগড়াইয়া প্রচুর জলের

সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে সিঁড়ি সোডা ও গরম জলের সাহায্যে তেল-ময়লা তোলার ব্যবস্থা করিতে হয়। সিঁড়ি ধোয়াইবার পরক্ষণেই শুকনা ন্যাতার সাহায্যে জল মুছিয়া ফেলিতে হয়।

গৃহের কক্ষ-সংলগ্ন ছাদের কোনও অংশ থাকিলে উহা **অন্ততঃ সপ্তাহে একবার** করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা ছাড়া প্রতিদিনই ঐ ছাদ শক্ত ঝাঁটার সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়। **ছাদের কোণায় কখনই ময়লা বা আবর্জনা জমা করিয়া রাখিতে** নাই। ছাদের একপাশে কয়েকটি **জলের টব সন্নিবেশ** করিলে গোটা ছাদের একটা আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং গৃহের সৌন্দর্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ছাদ পরিষ্কার করার পদ্ধতি

(৩) **আসবাবপত্র পরিষ্করণ :** গৃহের নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয়। গৃহপ্রসাধনে যে সকল জিনিসের দরকার, তাহার ভিতর আসবাবপত্রই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক গৃহেই কিছু কিছু আসবাবপত্র থাকে। এইগুলি যত্নপূর্বক ব্যবহার না করিলে শীঘ্রই উহা নষ্ট হইয়া যায়। ভাঙাচোরা, বিবর্ণ আসবাবপত্র গৃহের কোনও প্রয়োজনে আসে না উপরন্তু ইহা গৃহের শ্রী নষ্ট করে। আসবাবপত্র ব্যবহারে যথেষ্ট যত্নের প্রয়োজন। আসবাবপত্রগুলির ধূলা ঝাড়িয়া প্রত্যেক দিনই পরিষ্কার করিতে হয়। **বেশি ধূলা জমিয়া** গেলে উহা দেখিতেও খারাপ লাগে, তাছাড়া ঐ ময়লা দূর করা খুবই **কষ্টসাধ্য** হইয়া পড়ে। ধূলা পরিষ্কার করিয়া মাঝে মাঝে উহাতে **ক্রীম বা বার্নিস** লাগাইতে হয়, ইহাতে আসবাব-পত্রের চাকচিক্য বৃদ্ধি পায়। কারুকার্য-খচিত আসবাবপত্রে ধূলা বেশি জমে, উহা পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট ব্রাশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ষ্টীলের আসবাবপত্র পরিষ্কার করিতে গেলে **সাবান-জল দ্বারা ভাল** করিয়া **ধুইয়া লইতে হয়, পরে ন্যাকড়ায় প্যারাফিন** মিশ্রিত করিয়া পুছিয়া নিলে চাকচিক্য হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, সাবান-জলের দ্বারা ধোয়ার পর উহা বেশ করিয়া পুছিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ ষ্টীলের চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি আসবাবপত্র গৃহে ব্যবহৃত হয়। নানা রকম বেতের আসবাবপত্রও আমাদের অনেক পরিবারে ব্যবহৃত হয়। বেতের টিপয়, চেয়ার, মোড়া প্রভৃতি ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক। ইহা এতো হাল্কা যে একস্থান হইতে আর **এক স্থানে নাড়াচাড়া করা যায়**। বেতের আসবাব সাধারণভাবে পরিষ্কার করিতে গেলে ঝাড়নের সাহায্যে ময়লা দূর করিতে হয়। বেতের জিনিসে তেল ময়লার দাগ ধরিয়া গেলে গরম জলে সাবান মিশাইয়া ঐ আসবাবপত্র পরিষ্কার করিতে হয়। পরে **পালিশ ব্যবহার** করিয়া **চাকচিক্য**

বজায় রাখিতে হয়। রঙীন বেত হইলে **সাবান-জলে রং উঠিয়া যাইবে**, সেক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া রং-এর পোঁচ দিতে হয়।

সাধারণতঃ **চামড়ার স্যুটকেস, চামড়ার ব্যাগ** প্রয়োজনীয় জিনিস রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চামড়া ব্যবহার করিতে করিতে উহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হইয়া যায়।

চামড়া পরিষ্কার করণ

চামড়ার জিনিস পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে ব্রাশের সাহায্যে ধুলা ঝাঁড়িয়া ফেলিতে হয়; ইহার পর নরম একটি ভেলভেটের কাপড়ের টুকরার **সাহায্যে জুতার পালিশ** ভালভাবে লাগাইয়া বেশ করিয়া ঘষিতে হয়। ইহাতে চামড়ার জিনিসের **চাকচিক্য** ফিরিয়া আসে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হয় চামড়ার **রং অনুযায়ী জুতার পালিশের রং নির্বাচন করিতে** হয়। চামড়ার রং বিবর্ণ হইয়া গেলে বিশেষ উপায়ে উহার রং ও চাকচিক্য ফিরাইয়া আনিতে হয়। **এক চামচ অ্যামোনিয়া ও চার চামচ ভিনিগার এক কোয়ার্ট জলের সহিত মিশ্রিত** করিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থটি চামড়ার জিনিসে লাগাইতে হয়। এইবার একটি কাপড়ের টুকরায় কিছুটা **রেড়ীর তেল লাগাইয়া** চামড়ার জিনিসটির উপর আস্তে আস্তে প্রলেপ লাগাইতে হয়, ইহার পর উহা ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। শুকাইবার পর **ক্রীম ও পালিশ লাগাইলে** জিনিষটি চকচকে হইয়া নূতনের মত মনে হইবে। কোনও আসবাবপত্রাদি কখনও **অতিরিক্ত রৌদ্রে** অথবা **অতিরিক্ত জলে বেশি** সময় রাখিতে নাই, উহাতে আসবাবপত্রের **স্থায়িত্ব** কমিয়া যায়।

গৃহের অন্যান্য জিনিস ও তৈজসপত্রাদি পরিষ্করণঃ

গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জামাদি ব্যবহার করিতে গেলে উহার যত্ন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হইতে হয়। যত্ন না করিলে উহা শীঘ্রই **অকেজো হইয়া যায়** অথবা **ভাঙ্গিয়া যায়**। গৃহস্থালীর বাসনপত্র কেবলমাত্র মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিলেই চলিবে না, উহা কিভাবে সংরক্ষণ করিতে হয় সে পদ্ধতিও জানিয়া রাখা দরকার। অনেকে আছে বাসন মাজিয়াই ফেলিয়া রাখে, তাহার ফলে উহাতে জলের **দাগ ধরিয়া**

বাসনের যত্ন

যায় এবং ব্যবহারের পক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব ঘটে। **লোহার কড়াই** প্রভৃতি ধোয়ার পর ফেলিয়া রাখিলে **মরিচা** পড়িয়া যায় এবং বেশিদিন এই অবস্থায় রাখিলে উহার **চাকলা উঠিয়া** তাড়াতাড়ি ছিদ্র **হইয়া যায়**। সেই কারণে যে কোনও ধাতু বা অধাতব বাসন-পত্রাদি পরিষ্কার করিয়া উহা উত্তমরূপে শুকনা ন্যাকড়ার সাহায্যে পুছিয়া

ফেলিতে হয় যাহাতে জল জমিয়া না থাকে। লোহার বাসন মুছিয়া **সরিষার তেল** মাখিয়া রাখিতে হয়, ইহাতে লোহার জিনিস অনেক দিন ভাল থাকে, নূতন একটা কেনার প্রয়োজন হয় না। যে সমস্ত বাসন তুলিয়া রাখার প্রয়োজন হয় সেগুলি পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া নেওয়ার পর **ব্রাসোর সাহায্যে পালিশ** লাগাইতে হয়। উহাতে নূতনের মত বাসন চকচকে হয়।

পিতল : পিতল একটি সংকর ধাতু। ইহা তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে গঠিত। পিতলের বাসন সাধারণতঃ পূজার ঘরে ব্যবহৃত হয়। রান্নাঘরের বাসনের ভিতর **হাড়ি, কলসি, গামলা, গ্লাস, হাতা, খুন্তি** প্রভৃতি পিতলের নির্মিত। এই সমস্ত বাসনপত্র বাড়ী ঘরে **ছাই-এর সহিত তেঁতুল মিশাইয়া** পরিষ্কার করা হয়। বাসনপত্র ছাড়া নানারকম **ফুলদানী, ছাইদান, পাউডার-কেস্, সিন্দুরের কৌটা** এমনকি **দরজা-জানালার হাতল পিতলের** হইয়া থাকে। এই সমস্ত জিনিসপত্র পরিষ্কার করিবার প্রণালী একটু ভিন্নরূপ ; **ঈষদ্ উষ্ণ জলে সাবান গুলিয়া** প্রথমে জিনিসটি ধুইয়া লইতে হয়, ইহার পর **ধাতুর পালিশ লাগাইয়া** কিছুক্ষণ শুকাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ইহার পর **নরম কাপড়ের টুকরার সাহায্যে বার বার ঘষিতে হয়।** এই ভাবে পিতলের জিনিস পরিষ্কার করা হয়। বেশি দাগযুক্ত পিতল নির্মিত জিনিস পরিষ্কার করিতে হইলে **৬ ভাগ জলের সহিত ১ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইয়া দ্রবণ** প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর এক টুকরা **ন্যাকড়া ঐ দ্রবণে ভিজাইয়া জিনিসটির উপর ঘষিতে হয়।** এইবারে ভাল করিয়া জলে ধুইয়া **অম্ল তুলিয়া ফেলিতে হয়।** এক্ষণে সাবান-জল দ্বারা ধুইয়া **শুকনা ন্যাকড়ার সাহায্যে** পুছিয়া ফেলিলে পাত্রটি নূতনের মত চকচকে হইবে।

কাঁসা : কাঁসাও একটি **সংকর ধাতু। ৭ ভাগ তামা এবং ১ ভাগ টিন মিশাইয়া কাঁসা** তৈরী করা হয়। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত রন্ধন-গৃহে **কাঁসার** বাসনের খুব সমাদর, তবে আধুনিক যুগের অবস্থাপন্ন পরিবারে কাঁসার ব্যবহার **খুব** কমিয়া গিয়াছে। কাঁসার স্থলে এখন **স্টেনলেস স্টীলের বাসনের** চল হইয়াছে। গৃহস্থ পরিবারে কাঁসার বাসন পরিষ্কার করিতে হইলে সাধারণতঃ **ছাই এবং তেঁতুল, লেবু প্রভৃতির** ব্যবহার করিতে হয়। পিতল অপেক্ষা **কাঁসার চাকচিক্য** বেশি, এবং রন্ধন-গৃহের পাত্র হিসাবে ইহা খুবই প্রশস্ত। **সামান্য দস্তা এই বাসনে মিশ্রিত হয় বলিয়া ইহা পিতল অপেক্ষা চকচকে।** কাঁসার বাসনে অতিরিক্ত দাগ থাকিলে **পিতল পরিষ্কার-পদ্ধতি** অবলম্বন করিতে হয়।

অ্যালুমিনিয়াম ঃ অ্যালুমিনিয়ামের প্রচলন এখন দেশে খুব বেশি। রন্ধন-গৃহের পক্ষে ইহার কদর খুব বেশি। অন্যান্য বাসনের তুলনায় ইহার দাম কম, তাহাছাড়া হাল্কা বলিয়া নাড়াচাড়া করিতে সুবিধা হয়। রন্ধন দ্রব্যাদি সমস্তই রাখা যায় এবং ইহা **চুল্লীতে বসাইয়া খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করার খুব সুবিধা**—ইহা তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হওয়ার ফলে **রন্ধন কার্য তাড়াতাড়ি সমাপন হয়**। এই সমস্ত কারণে এখন ইহার প্রচলন খুব বেশি। ইহা পরিষ্কার করিতে হইলে সাদা পরিষ্কার **ছাই দিয়া নারিকেলের ছোবড়ার সাহায্যে** ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। **ভিম পাউডার** দিয়াও ইহা ভাল পরিষ্কার হয়। ইহা কখনও ক্ষার জাতীয় পদার্থ দ্বারা পরিষ্কার করিতে হয় না, এইজন্য **সোডা দিয়া মাজিলে ইহা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইয়া** কালো কালো ছিদ্র হইয়া যায়। দাগযুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ভিম দ্বারা **স্টীল উলের** সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়। অ্যালুমিনিয়ামের বাসনে কখনও **অম্লদ্রব্য রাখিতে** নাই, উহাতে বাসন তাড়াতাড়ি **ছিদ্র** হইয়া যায়।

অ্যালুমিনিয়াম পাত্র ব্যবহারে সুবিধা

তামা ঃ তাম্র পাত্র সাধারণতঃ আমাদের **পূজার ঘরের** বাসনের জন্য ক্রয় করা হয়। তামা মাজিয়া খুব পরিষ্কার করিলে দেখিতে অতীব সুন্দর লাগে। ইহা পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি কাঁসার বাসনের মতই। তামার পাত্রে অতিরিক্ত দাগ পড়িলে উহা গরম জলের **সহিত লবণ মাখিয়া খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়**, পরে **তেঁতুল, লেবু বা ভিনিগারের সাহায্যে** বেশ করিয়া ঘষিয়া মাজিতে হয়। ভাল করিয়া ধোয়ার পর শুকনা কাপড়ে মুছিয়া লইয়া **ব্রাসো লাগাইতে** হয়। **মীনা করা তামার** জিনিস পরিষ্কার করিতে হইলে গরম জলের ভিতর **হোয়াইটিং মিশাইয়া পরিষ্কার করিতে** হয়। ইহাতে কোনও অম্ল পদার্থ দেওয়া চলে না।

লোহ ঃ রান্নাঘরের **কড়াই, চাটু, হাতা, খুন্তী, সাঁড়াশী** প্রভৃতি সাজ-সরঞ্জামগুলি প্রায় সবই **লোহ দ্বারা** নির্মিত। লৌহের চল আজকাল বেশি নাই। ইহা অত্যন্ত ভারী, ব্যবহার করিতে খুব অসুবিধা। **ছাঁচে ঢালা, পিটানো** এবং **ঢালাই** যে রকম লোহাই হউক না কেন উহা পরিষ্কার করা খুব অসুবিধাজনক নহে। লোহা পরিষ্কার করিতে হইলে **ছাই বা বালির সাহায্যে ভাল** করিয়া ঘষিয়া নিলেই চলিবে। **তৈলাক্ত পদার্থ তুলিবার জন্য প্রথমে সোডা বা সাবান দিয়া ধুইয়া লইলে ভাল হয়**। ধোয়ার পর বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুছিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। ইহার পর তৈল অথবা **ভেসেলীন** মাখিয়া টানাইয়া রাখিতে হয়। বায়ুতে **জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকিলে** এবং **আর্দ্রতার ফলে** লোহায়

মরিচা ধরে। এই কারণে বর্ষাকালে লোহার বাসন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

এনামেল : সাধারণ পরিবারে এনামেলের ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায়। রন্ধন দ্রব্যাদি রাখিবার পক্ষে এনামেলের বাসন খুবই ভাল। সাধারণতঃ থালা, বাটি, গামলা এনামেলের হয়। ইহা পরিষ্কারের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। যতদিন চাকলা উঠিয়া ভিতরের লোহা বাহির হয় না, ততদিন পর্যন্ত এনামেলের বাসন ব্যবহার করা চলে কিন্তু একবার চাকলা উঠিতে আরম্ভ করিলে ইহা ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিতে হয়।

ইস্পাত : ভোজনের টেবিলে ইস্পাতের ছুরি ও চামচ দেখা যায়। ইহা ব্রিক ডাস্টের সাহায্যে মিহি স্টীল উল দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিলে সুন্দর পরিষ্কার হয়। তাহা ছাড়া এমেরি কাগজ ঘষিয়াও পরিষ্কার করা চলে।

স্টেনলেস স্টীল : অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইলেও এখন প্রায় ঘরে ঘরে এই বাসনের খুব প্রচলন। ইহা সহজে ভাঙ্গে না তাহাছাড়া পরিষ্কার করিতে খুবই সুবিধা। ইহার তাপ সহ করার ক্ষমতাও আছে, সেইজন্য স্টেনলেস স্টীলের সসপ্যান, কড়াই প্রভৃতি বাসন রন্ধনের জন্য খুবই ব্যবহার হইতেছে। তাহাছাড়া হাতা, চামচ, খুন্তি, ঢাকনি প্রভৃতি সবই স্টেনলেস স্টীলের তৈরী পাওয়া যায়। ভিম পাউডার, সাবান জল দ্বারা পরিষ্কার করিলে ইহা সহজেই চকচকে হয়।

রৌপ্য : ইহা অত্যন্ত দামী ধাতু। রন্ধনগৃহের বাসনপত্র হিসাবে খুব ব্যবহার হয় না। সৌখীন বাসন হিসাবে রৌপ্যের রেকাবী, বাটি, গ্লাস, চামচ প্রভৃতি যত্ন সহকারে গৃহকর্ত্রী ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দেয়। বাসনপত্র ছাড়া রূপার পাউডার কেস, সিন্দুরের কৌটা, ফুলদানী প্রভৃতিও নির্মিত হয়। আজকাল অনেকে আবার রূপার গহনা ব্যবহার করিয়া থাকে। রূপার পাত্র পরিষ্কার করা খুব সহজ ব্যাপার। গরম সাবান-জলের ভিতর কিছুক্ষণ বাসনগুলি ডুবাইয়া রাখিলে পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর শুকনা কাপড়ের সাহায্যে আলগাভাবে মুছিয়া শুষ্ক করিয়া রাখা হয়।

কাচ : গৃহ-নির্মাণের ব্যাপারে কাচের প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার আসবাবপত্রাদিতেও কাচের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। চিরদিনই কাচের বাসনপত্রের আদর দেখা যায়। কিন্তু ইহা ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া এই বাসন ব্যবহারে খরচ বেশি হয়। অনেক সময় কাচের গ্লাসে গরম জল, গরম দুধ ঢালিলে উহা ফাটিয়া যায়। সাবান-জল দ্বারা কাচ সুন্দর পরিষ্কার হয়। গৃহের সার্শির কাচ এবং আসবাব-

পত্রের কাচ সাধারণতঃ চাখড়ির গুঁড়া, স্পিরিট ও খবরের কাগজের টুকরার সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়।

চীনামাটি : আভিজাত্য পরিবারে কাচের এবং চীনামাটি বাসনের খুব কদর। দৈনন্দিন জীবনে আমরা চীনামাটির কাপ, ডিস প্রভৃতি বাসন ব্যবহার করি। চীনামাটির বয়মও খুব কাজে লাগে। আচার, লবণ, ঘি রাখিবার পক্ষে চীনামাটির বয়ম খুবই প্রশস্ত। এই বাসন কাচের মতই সাবান-জলের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়। চাটনী, দই, টক, মাংস প্রভৃতি রাখিবার জন্ম চীনামাটির বাসন খুবই ভাল। সাবধানে ব্যবহার না করিলে ইহাতে চিড় ধরে। দামী কোনও চীনামাটির বাসন ভাঙ্গিয়া গেলে উহা কেবিকল নামে একপ্রকার সলিউসনের সাহায্যে জোড়া লাগানো যায়।

মাটির ও পাথরের বাসন

আদিম যুগের লোকেরা প্রথমে মাটির বাসনই ব্যবহার করিতে জানিত। কোনও ধাতব পদার্থের আবিষ্কার তখন পর্যন্তও হয় নাই। আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে মাটির হাঁড়ি ব্যবহারের খুব চল ছিল। মাটির পাত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া এখন আর কেহ ব্যবহার করিতে চান না। তবে মাটির তৈরী জলের কলসী বা কুঁজা এখনও আমরা ব্যবহার করি। মাটির কুঁজার জল গরমের দিনে খুব ঠাণ্ডা থাকে বলিয়া খুব আরামদায়ক। আজও নিমন্ত্রণ বাড়ীতে মাটির গ্লাস ব্যবহৃত হয়। মাটির জিনিষ বেশিদিন ব্যবহার করিতে নাই। একটি জলের কুঁজা বা কলসী বেশিদিন একসঙ্গে ব্যবহার না করিয়া আবার নূতন করিয়া ক্রয় করিতে হয়। মাঝে মাঝে ভিতর এবং বাহির ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তাহাছাড়া পরিষ্কার করার অন্য কোনও উপায়ের প্রয়োজনীয়তা নাই।

পাথরের বাসনের ব্যবহার

আমাদের দেশের হিন্দু বিধবা মহিলারা পাথরের বাসনে খাইয়া থাকেন। আদিম যুগে এই পাথরের ব্যবহার হইত। কাচ বা চীনামাটির মত ইহাও ক্ষণভঙ্গুর। আজকাল ইহার চল খুবই কম। সাধারণতঃ থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি পাথর দ্বারা তৈরী হয়। পাথরের থালা আচার, আমসত্ত্ব দেওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহা সাবান ও জলের সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাসগৃহের উপদ্রবকারী কীটপতঙ্গ, উহাদের নিবারণ ও দমনের উপায়

বাসগৃহে সব সময়ই কিছু **ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের** উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়গুলি সব সময়ই **অনিষ্ট সাধন** করিয়া আমাদের নানাবিধ ক্ষতিসাধন করে। সাধারণতঃ **মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন, ইঁদুর, আরশোলা, মাকড়শা ও উইপোকা** বাসগৃহে আশ্রয় নেয়। ইহাদের ভিতর কতকগুলি আছে যাহারা **দংশন** করিলে আমাদের রক্তের সঙ্গে **রোগজীবাণু দেহের** ভিতর প্রবেশ করে। আবার কতকগুলি **খাদ্যদ্রব্যের ভিতর** থাকিয়া খাদ্যকে **জীবাণু-দুষ্ট** করিয়া তোলে। ঐ খাদ্য আহার করিলে আমরা **নানাবিধ রোগে** আক্রান্ত হই। আবার কতকগুলি আছে যাহারা খাদ্যের ভিতর পড়িলে খাদ্য বিষাক্ত হয় এবং উহা আহারের ফলে **মানুষের মৃত্যু ঘটে**। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি পোকা আছে যেগুলি আমাদের **জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া** একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ

নানাভাবে কীটপতঙ্গগুলি ক্ষতি করে

এই সমস্ত পোকামাকড়ের আবাসস্থল হইতেছে **অন্ধকারময়, স্যাঁতসেঁতে আবর্জনাবহুল স্থান**। অতিরিক্ত আসবাব বহুল স্থানেও কীটপতঙ্গের আশ্রয় লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে **ঘরে প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশের** ব্যবস্থা রাখিতে হয়। কোনও **জিনিস জড় করিয়া বেশি দিন একস্থানে রাখিতে** হয় না। খাদ্যদ্রব্য এক স্থানে বেশি সময় ফেলিয়া রাখিতে নাই। বসতবাড়ীর কোনও স্থানে **জল জমাইয়া রাখা উচিত** নয়। **আম-কাঁঠালের খোসা, মাছের আঁইশ** প্রভৃতি বাড়ী হইতে **বহুদূরে অপসারণ করা** উচিত। নালা **নর্দমা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** রাখিতে হয়। মাঝে মাঝে বাড়ীতে **ডি. ডি. টি.** স্প্রে করিতে হয়। **ফিনাইল দ্বারা** রান্নাঘর, খাবার ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

পোকা-মাকড়ের আবাসস্থল

এই সমস্ত পোকা-মাকড়গুলিকে আমরা সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। (ক) **জীবাণু-বহনকারী**—যেমন, **মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন** ইত্যাদি। (খ) **খাদ্য দুষ্টিকারক প্রাণী**—যেমন, **মাছি, আরশুলা, পিঁপড়া**। ইহা

ছাড়া উই, ইঁদুর, ঘুণ, মথ প্রভৃতি কতকগুলি কীটপতঙ্গ জামাকাপড়, বই, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কাটিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

ইহাদের ভিতর বেশির ভাগ কীটপতঙ্গ আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। গৃহের পরিবেশ আবর্জনাশূন্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে এই সকল কীটপতঙ্গ দ্বারা আমাদের কোনও ক্ষতি হইবার ভয় থাকে না। এই সকল কীটপতঙ্গের কবলে পড়িয়া যে সমস্ত রোগে আমরা আক্রান্ত হই তাহার চিকিৎসা করিয়া সারানোর উপায় অপেক্ষা যাহাতে ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহাই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইলে খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখিতে হয়। কখনও খাবার-দাবার আঢাকা অবস্থায় রাখিতে হয় না। এই সকল কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার চেষ্টার পূর্বেই ইহারা যাহাতে গৃহে আশ্রয় লাভ করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কীটপতঙ্গের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

মাছি: গরমের সময় একটু আবর্জনাবহুল স্থানেই মাছির প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়। ইহারা যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। গায় মাছি পড়িলেও একটা বিরক্তি-জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। মাছি খাদ্যের ভিতর পড়িয়াই মলত্যাগ করে। উহাদের মলের ভিতর নানারকম রোগ-জীবাণু থাকে। এই সকল জীবাণু-দুষ্ট খাদ্য আহার করিলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। মৃত, গলিত, নানাকরম পচা খাদ্যদ্রব্য, মল, মূত্র, বমি প্রভৃতির ভিতর স্ত্রীজাতীয় মাছি বসিয়া ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলি সাদা এবং ক্ষুদ্র। আট হইতে দশ ঘণ্টার ভিতর ডিমগুলি ফুটিয়া শূককীটে পরিণত হয়। আবার আট নয় দিনের ভিতর মূক কীটে পরিণত হইয়া পরে পূর্ণাঙ্গ মাছিতে পরিণত হয়। এইভাবে একটি স্ত্রী-জাতীয় মাছি হইতে অনেকগুলি মাছির জন্ম হয়।

মাছির উপদ্রব হইতে রেহাই পাইতে হইলে প্রথমেই মাছি যে সমস্ত স্থানে জন্মায় সেই সমস্ত অঞ্চল আর্দ্রহীন, শুষ্ক, আবর্জনাশূন্য ও আলোবাতাস-যুক্ত করিয়া তুলিতে হয়। বাড়ীর যাবতীয় আবর্জনা একটি ঢাকনা যুক্ত টিনে জমাট করিয়া দিনান্তে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলিয়া দিতে হয়। ড্রেন ও নালা-নর্দমাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিয়া মাঝে মাঝে ব্লিচিং পাউডার, চুণ প্রভৃতি ছড়াইয়া দিতে হয়। খাদ্যে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে সেজন্য রন্ধন দ্রব্যাদি, দুধ প্রভৃতি

মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া

জালের আলমারীতে রাখিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য সব সময় ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এঁটো-কাঁটার বাসন বেশি সময় জড় করিয়া রাখিতে হয় না। রান্নাঘর, খাবার ঘর ও ভাঁড়ার ঘর প্রতিদিন ফিনাইল জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

মাছি ধ্বংসের উপায়

মাছি ধ্বংস করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। ঘরের মাঝখানে ½ লিটার চুণের জলের সহিত ১৫০ গ্রামের মত চিনি মিশাইয়া উহার ভিতর দুই চামচ ফরম্যালিন মিশাইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিলে উহার উপর মাছি পড়িলে আর নড়াচড়া করিতে পারে না। ফ্লাই-ট্র্যাপ নামক কাগজ পাতিয়াও মাছির উপদ্রব কমানো যায়।

উপমক্ষিকা ঃ ইহা একপ্রকারের পতঙ্গ। গৃহপালিত জন্তু বা প্রাণীর গায়ে সাধারণতঃ ইহারা বাস করে। ইহারা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। ইঁদুরের উপর যে সকল উপমক্ষিকা বসে, উহারা সাধারণতঃ প্লেগরোগ ছড়ায়। ইহাদের দংশনও খুব যন্ত্রণাদায়ক।

বিস্তৃতি রোধ

উপমক্ষিকার বিস্তৃতি রোধ করিবার জন্য চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-রাখিতে হয়। গোয়াল ঘর, মুরগীর ঘর প্রভৃতি বাসগৃহ থেকে অনেক দূরে নির্মাণ করিতে হয়। বিছানাপত্র মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। বাড়ীর মেঝে ফিনাইল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মশা ঃ মশা আমাদের জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। ইহা রোগ-জীবাণু বাহক কীট। মানুষের শরীরে বসিয়া হুল ফুটাইয়া উহারা মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া লয়, তখন উহাদের শরীরস্থিত রোগজীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে। অ্যানোফেলিস নামক স্ত্রীজাতীয় মশা এইভাবে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করিয়া মানুষের ভিতর ছড়ায়।

অল্প জমা জলে, ডোবা, নালা, নর্দমা, মরানদী প্রভৃতি অগভীর বদ্ধ জলে মশা একসঙ্গে একশত হইতে পাঁচশত পর্যন্ত ডিম পাড়ে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমগুলি জলে ভাসিয়া বেড়ায়। ২।৩ দিন পর ডিমগুলি ফুটিয়া বাচ্চা হয়। এই বাচ্চাগুলিই শূককীট, আবার আট-দশ দিনের ভিতর এই সকল শূককীট হইতে মূককীট বাহির হয় ; মূককীট অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া দুই-তিন দিনের ভিতর পূর্ণ মশাতে পরিণত হইয়া উড়িয়া বেড়ায়। নানাজাতীয় মশা দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন—এনোফিলিস, কিউলেক্স ও ইডিস। এই সকল

বিভিন্ন মশা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। এনোফিলিস জাতীয় মশা **ম্যালেরিয়া**, **কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া** এবং ইডিস মশা ডেঙ্গু জ্বর বিস্তার করিয়া থাকে।



বিভিন্ন জাতীয় মশা

বাংলাদেশে মশার উপদ্রব খুব বেশি। শহরে ও গ্রামে সর্বত্রই মশা আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। **পূর্ণাঙ্গ মশার বংশ ধ্বংস করা** অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, সেই কারণে **মশার ডিম ধ্বংস করিতে** পারিলে মশার কবল হইতে মোটামুটি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। মশা যেখানে ডিম পাড়ে অর্থাৎ **ডোবা, নালা, গর্ত** প্রভৃতি সম্ভব হইলে **বুজাইয়া ফেলা** উচিত কিংবা কোথায়ও জল জমিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহা ছাড়া **কীটনাশক ঔষধ, কেরোসিন** প্রভৃতি **নর্দমা, নালায় পিচকারীর সাহায্যে** দিতে পারিলে মশার ডিম মরিয়া যায়।

মশা বন্ধ করার বিভিন্ন উপায়

মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য **মশারী টাঙ্গাইয়া** শয়ন করা উচিত, গৃহে ধূপ ধূনা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়; মাঝে মাঝে **মশার বিস্তৃতিনাশক** বিভিন্ন

তরল ঔষধ, ডি. ডি.টি. প্রভৃতি ঘরে স্প্রে করিতে হয়। ছোট ঘরে বেশি **আসবাব-পত্রের সংস্থান করিতে** হয় না, ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্ধকার আসবাববহুল স্থানে মশার প্রকোপ বেশি হয়। **ছোট ছোট পুকুরে মাছ ছাড়িয়া দিলে উহারা মশার শূককীট ভক্ষণ করিয়া ফেলে।** এইরূপ ব্যাপকভাবে মশা নিধনের চেষ্টা চলিলে মশার অত্যাচার হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

ছারপোকা ঃ বেশ ক্ষুদ্র হইলেও ছারপোকা আমাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ছারপোকার উপদ্রব **অত্যন্ত ঘৃণিত,** এইজন্য ছারপোকার নাম শুনিলে রুচিসম্পন্ন মানুষ দূরে সরিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। ছারপোকা সাধারণতঃ **দেহের রক্ত পান করিয়া** বাঁচিয়া থাকে। ঘরের **যাবতীয় ফাটলের ভিতর, খাট, চেয়ার, চৌকি, বিছানাপত্র, স্তূপীকৃত জামা-কাপড়, ট্রামে, বাসের সীটে, রেলগাড়ীর বেঞ্চিতে, বইপত্র** সর্বত্রই ইহাদের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খুব **দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়** বলিয়া ইহাদের ধ্বংস করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। তবে **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** স্থানে ইহাদের বাস সচরাচর দেখা যায় না। **আসবাব-পত্র রোজ ঝাড়িয়া পুছিয়া পরিষ্কার** করিলে, **বিছানার গদী** ঝাড়িয়া মাঝে মাঝে **রৌদ্রে দিলে, পরিষ্কার বিছানাপত্রের** ব্যবস্থা রাখিলে এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিলে ছারপোকার কবল থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। **বৎসরে একবার করিয়া খাটের অংশগুলি খুলিয়া উহাতে ফ্লিট বা ডি. ডি. টি. স্প্রে করিয়া দিলে ছারপোকা জন্মিতে পারে না।**

ছারপোকা বন্ধ করার উপায়

ছারপোকার কামড় কেবলমাত্র বিরক্তিজনক নয়, ইহাতে রক্ত দূষিতজনিত ব্যাধি হয়। আজকাল ছারপোকা মারিবার জন্য **বিষাক্ত 'টীক ২০' কীটনাশক ঔষধ** বাহির হইয়াছে, তবে খুব সাবধানতার সহিত এই ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে হয়।

উকুন ঃ ছারপোকার মত ইহাও এক প্রকার **ঘৃণিত কীট।** মাথায় **চুলের ভিতর** ইহাদের **আবাসস্থল। নোংরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ভিজা চুলে উকুনের** জন্ম হয়। দেখিতে দেখিতে সমস্ত চুলে ছড়াইয়া পড়ে এবং এইভাবে এক ব্যক্তি হইতে আর এক ব্যক্তির মাথায় বিস্তৃতি লাভ করে। একই বিছানায় শয়ন করিলে, বিদ্যালয়ে **এক বেঞ্চিতে বসিলে,** এক **চিরুনী ব্যবহার** করিলে এক মাথা হইতে আর এক মাথায় উকুন বাসা বাঁধে। উকুন হইতে অনেক সময় এক প্রকার **জ্বর হয়, ইহাকে পৌনঃপুনিক** জ্বর বলে।

উকুনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে **মাথার চুল পরিষ্কার রাখিতে** হয়। নিয়মিত তেল ব্যবহার করিয়া মাঝে মাঝে চুলে **সাবান দিতে** হয়। **চিরুনী দ্বারা চুল প্রতিদিন দুই-তিন বার আঁচড়াইতে হয়।** চুলে কিছু সময় রৌদ্র লাগানো ভাল, **চুল কখনও ভিজা অবস্থায় বেশি সময় রাখিতে নাই।** এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চুলে সহজে উকুন হইতে পারে না।

উকুন জন্মাইতে না পারার উপায়

একবার মাথায় উকুন জন্মাইলে উহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে **সরু চিরুনীর সাহায্যে বার বার চুল আঁচড়াইতে** হয়। ইহা ছাড়া এক নাগারে **দুই-তিন দিন ডেটল, লাইজল প্রভৃতি উকুন-ধ্বংসকারী ঔষধ জলের সহিত মিশাইয়া মাথায় মাখাইয়া রাখিতে হয়**; তারপর কিছুক্ষণ চুল তোয়ালে বা গামছার সাহায্যে বাঁধিয়া ৭।৮ ঘণ্টা পর **ভাল করিয়া সাবান দিয়া** ধুইয়া স্নান করিতে হয়। পর পর কয়েকদিন এই উপায় অবলম্বন করিলে উকুনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

উকুন ধ্বংস করার প্রণালী

ইঁদুর ঃ ইঁদুর আমাদের পরম শত্রু। ইঁদুরের উপদ্রবে অনেক সময় **বাড়ীঘর তছনছ** হইয়া যায়। **ধেঁড়ে ইঁদুর** সাধারণতঃ বাইরে থাকে কিন্তু **নেংটি ইঁদুর**গুলি অনেক সময় বাড়ীতে চলাফেরা করিয়া নানাভাবে **বিরক্তির সৃষ্টি করে।** সাধারণতঃ **পুরাতন বাড়ীতে** ইঁদুর, **আরশোলা** ও **ছারপোকার** উপদ্রব বেশি। ইঁদুর অনেক সময় **প্লেগ** রোগ ছড়ায়। ইঁদুরের কামড়ে একপ্রকার জ্বরও হয়। অনেক **সময় জামা, কাপড়, বিছানাপত্র, বই-খাতা কাটিয়া** ইঁদুর আমাদের অশেষ ক্ষতি সাধন করে।

বেশি **আসবাববহুল স্থানে ইঁদুরের প্রবেশ** বেশি দেখা যায়। বাড়ীঘর **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিলে,** বাড়ীর কোনও **গর্ত বুজাইয়া ফেলিলে** এবং **বিড়াল পুষিলে ইহার** অত্যাচারের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

ইঁদুর মারিবার জন্য কলের ভিতর খাবার দিয়া পাতিয়া রাখিলে উহাতে **ইঁদুর আটক পড়িয়া মরিয়া যায়।** খাদ্যের ভিতর বিষ মিশাইয়া ফেলিয়া রাখিলেও ইঁদুর মরিয়া যায়। এমন অনেক বিষ আছে যে **ঐ বিষ-মিশ্রিত খাদ্য খাইবামাত্র ইঁদুর মরিয়া যায়।** কিন্তু এই বিষ ব্যবহারে খুবই সতর্ক হইতে হইবে। ঐ জন্য পরে ঐ জায়গা **ডেটল মিশ্রিত প্রচুর জলে** ধুইয়া ফেলা উচিত।

ইঁদুর মারিবার কল

আরশোলা ঃ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আরশোলা একটি **অনিষ্ট-কারী পতঙ্গ।** ইহারাও **অন্ধকার, আসবাববহুল** এবং **অব্যবহার্য বাক্স-**

পেটরার ভিতর আশ্রয় নেয়। ঘরের আনাচে-কানাচে প্রায় সময়ই ইহারা **দল বাঁধিয়া** লুকাইয়া থাকে। **পায়খানা, বাথরুমেও** ইহাদের আধিপত্য খুব দেখা যায়। ইহারা জীবাণু বহন করিয়া খাদ্যের'ভিতর পড়িয়া খাদ্যদ্রব্য দূষিত করিয়া তোলে। তাহাছাড়া উহারা খাদ্যের ভিতর পড়িয়া **কালো কালো বিষ্ঠা ত্যাগ** করে। আরশোলা খাদ্যের ভিতর এবং রোগীর **মলমূত্র, কফ, থুথু** প্রভৃতির উপর পড়িয়া **আমাশয়, টাইফয়েড, ডিপ্‌থেরিয়া, হামজ্বর, যক্ষ্মা** প্রভৃতি রোগ এক দেহ থেকে আর এক দেহে ছড়ায়।

আরশোলার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গৃহের পরিবেশটি **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** রাখিতে হয়। বাড়ীর চারিপাশে এবং **নালা-নর্দমার নিকট, পায়খানা, স্নানের ঘর প্রভৃতি** স্থানে **গ্যামাক্সিন পাউডার, ব্লিচিং পাউডার** ছড়াইতে হয় এবং মাঝে মাছে **ডি. ডি. টি. স্প্রে** করিতে হয়।

মথ : পশমের কাপড়, সিল্কের কাপড়-জামা কাটিয়া এই সকল কীটগুলি আমাদের **মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদের** ক্ষতি সাধন করে। ইহা একপ্রকার ছোট ছোট পোকা। **কাপড়ে পোশাকে কোনও দাগ না** থাকিলে এবং পরিষ্কার থাকিলে সহজে এগুলি **জামা-কাপড়ে আশ্রয় নিতে পারে না**। সেই-জন্য মাঝে মাঝে জামা-কাপড় রৌদ্রে দিয়া, **ন্যাপথালিন** দিয়া **খবরের কাগজে জড়াইয়া রাখিলে** ইহার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। **তামাক পাতা, নিম-পাতা, কর্পূর** প্রভৃতি কাপড়ের ভিতর দিয়া রাখিলে এই পোকা কাপড় কাটিতে পারে না। দেখা গিয়াছে, **মার্কিণ কাপড়ে** এই সকল জামা-কাপড় জড়াইয়া রাখিলেও **মথ** কাপড় কাটিতে পারে না। **মার্কিণ কাপড়ের গন্ধে ইহারা** গরম বা সিল্কের জামা-কাপড়ে আশ্রয় নেয় না।

উই : অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও ইহারা আমাদের পরম শত্রু—ইহারা এত দ্রুত ক্ষতি-সাধন করে যে অনেক সময় আর কোনও ক্ষুদ্র কীট অল্প সময়ে এতো ক্ষতি করিতে পারে না। **পিঁপড়ার মতই** ইহারা ক্ষুদ্র এবং পিঁপড়ার মতই **দলবদ্ধ ভাবে বাস করে**। সাধারণতঃ ইহারা মাটির তলায় বাসা বাঁধে। **দরজা-জানালা, বইপত্র, কাঠের আসবাব**, জামা-কাপড় যাহা নিকটে পায় তাহাই উহারা ছারখার করিয়া ফেলে।

ইহাদের ধ্বংস করিতে হইলে সর্বপ্রথম ইহার **বাসা ধ্বংস করিতে হয়**। সাধারণতঃ ভিজা **স্যাঁতসেঁতে স্থানে** ইহাদের বাস। ইহাদের বাসা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে **আলকাতরা,** ঢালিয়া অথবা **কেরোসীন বা ডি. ডি. টি. স্প্রে**

করিয়া উহাদের বংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ করিয়া উহাদের বিস্তৃতি বন্ধ করা যায়। কাঠের আসবাবপত্র মাঝে মাঝে ক্রিয়োযোট মাখাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে সহজে উইপোকা ধরিতে পারে না। বইপত্র যাহাতে উইপোকা না ধরে সেইজন্য অব্যবহার্য বই বর্ষার পর মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়। বন্ধ ট্রাঙ্কের জামা-কাপড়, চাদর, মশারী প্রভৃতিও বর্ষা ঋতুর পর কড়া রৌদ্রে ভালভাবে শুকাইয়া লইতে হয়।

বই কাটার বা ফুটা ফুটা করিবার আর এক প্রকার সাদা লম্বা অনেকটা মাছের মত পোকা আছে, ইহাদিগকে ইংরাজীতে সিলভার ফিস পোকা বলে। রূপালী রং-এর এই পোকাগুলি পুরাতন অব্যবহার্য বইগুলি কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাদের হাত হইতে বইগুলিকে বাঁচাইতে হইলে বইগুলি রৌদ্রে দিয়া শুকাইতে হয় এবং মাঝে মাঝে অব্যবহার্য বই-এর পাতা খুলিয়া খুলিয়া ডি. ডি. টি. স্প্রে করা আবশ্যক। বই-এর পাতার ভিতর নিমপাতা, কালো জিরা ইত্যাদি ছড়াইয়া রাখা যায়। দামী দামী বইগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য এই নীতিগুলি পালন করিয়া কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দেহসৌষ্ঠবের কলাকৌশল ও গৃহরচয়িত্রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের লজ্জা নিবারণ, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ও বিভিন্ন আবহাওয়া হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্য যে কৃত্রিম আবরণ ব্যবহৃত হয় তাহাকেই পোশাক বা পরিচ্ছদ বলা হয়।

পোশাকের সংজ্ঞা

মানুষ সভ্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কারণে পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে। আদিম যুগে পরিচ্ছদের কোনও বালাই ছিল না। লতাপাতার আবরণ দ্বারা এবং চামড়া পরিধান করিয়া তাহারা লজ্জা নিবারণ করিত। আদিম যুগের লোকেরা কেবলমাত্র লজ্জা নিবারণের জন্য এবং আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার উদ্দেশ্যেই পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিত। কিন্তু বর্তমান

ভূমিকা

সভ্য মানুষ প্রাথমিক কারণগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি উদ্দেশ্যে পোশাকের মূল্যায়ন নির্ধারণ করে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মানুষ বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। আবার **সৌন্দর্যপ্রিয়তা** এবং **সৌন্দর্য জ্ঞানের** জন্য বিশেষ কোনও পোশাকের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। মানুষের **ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া** ওঠে এই পোশাকের মাধ্যমেই। **জাতীয়তাবোধের** পরিচয় দেয় এই পোশাক-পরিচ্ছদ। এর দৃষ্টান্ত আমরা বড় বড় মনীষীদের জীবন-চরিতে পাই। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইঁহারা কোনদিনই বিদেশীদের পোশাক পরিধান করিয়া জাতীয়তা-বোধ ক্ষুণ্ণ করেন নাই। অতএব মানব চরিত্র ফুটিয়া ওঠে এই পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া। **শীতাতাপ হইতে রক্ষা** পাওয়ার জন্য আমরা পোশাক ব্যবহার করি। কতকগুলি তন্তু **উত্তাপ সু-সঞ্চালক আবার** কতকগুলি **উত্তাপ অপরিচালক**। শীতের সময় আমরা উত্তাপ অপরিচালক অর্থাৎ **পশমের** বস্ত্র ব্যবহার করি, আবার গ্রীষ্মের সময় ব্যবহার করি উত্তাপ সুপরিচালক অর্থাৎ **সূতি, লিনেন** প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত পোশাক-পরিচ্ছদ।

বাইরের কোনও আঘাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারি, পরিহিত পোশাকের জন্য। ভূমণ্ডলে বায়ুর সহিত অহরহ **ধূলিকণা** উড়িয়া বেড়াইতেছে ; আমরা নানাপ্রকার বস্ত্র পরিধান করি বলিয়াই ধূলাবালি সরাসরি শরীরে প্রবেশ না করিয়া **পোশাকের ভিতর আটকাইয়া যায়**। আমরা যে **জুতা ব্যবহার** করি তাহাও পোশাকের পর্যায় পড়ে। বহু প্রাচীনকালে জুতা পরিধান করার কোনও রীতি ছিল না কিন্তু এখন প্রায় সমস্ত সমাজের ভিতরই জুতার প্রচলন দেখা যায়। হঠাৎ রাস্তায় **হোঁচট খাওয়া, ধূলাবালি, বর্ষায় রাস্তায় জলকাদা, সূর্যের প্রখর তাপ, রাস্তার কোনও অব্যবহার্য ধারাল ভাঙ্গা পুরাতন জিনিস** বা **মরিচাধরা পেরেকের আঘাত** প্রভৃতি অসুবিধাজনক পরিস্থিতির কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য জুতার একান্ত প্রয়োজন। তাহাছাড়া সভ্য সমাজে পোশাক-পচ্ছিদের একটি বড় অঙ্গ এই জুতা। বেশবিন্যাস **জুতা ছাড়া** অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

জুতার প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষে নানারকমের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখা যায়। যেমন বাঙালী পুরুষেরা **ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী, সার্ট, গেঞ্জী,** আবার যাহারা অফিস-কাছারীতি, এবং কারখানাতে কাজ করে তাহারা **সার্ট, প্যান্ট, কোট, জামা, টুপী, পাগড়ী, মোজা, টাই** প্রভৃতি পরিধান করে। ছোট ছোট ছেলেরা **সার্ট, প্যান্ট, পায়জামা, স্যুট হাফপ্যান্ট, হাফসার্ট**

বিভিন্ন রকম পোশাক

প্রভৃতি নানাবিধ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। মেয়েরা **শাড়ী, ব্লাউজ, সেমিজ, সায়া** ইত্যাদি পরিধানে অভ্যস্ত। আবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েরা **সালোয়ার, শাড়ী, ওড়না, সেলুকা, পেটিকোট** প্রভৃতি পরিধান করিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশের মেয়েরা **গাউন, স্কার্ট, ফ্রক, কোট, টুপী, মোজা, ব্রেস্ট-টাইট** প্রভৃতি নানারকম পোশাক ব্যবহার করে।

পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা ঃ

বিভিন্ন দেশের রুচি ও প্রথা অনুযায়ী সব দেশের পোশাকই শরীরের **আরাম ও সৌন্দর্য** বর্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করে। **শ্লীলতা রক্ষা** পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তার প্রথম ও প্রধান কারণ। **ভৌগোলিক কারণেও** পোশাক-পরিচ্ছদের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কতকগুলি দেশ শীত-প্রধান আবার কতকগুলি দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান। শীতকালে বা শীত-প্রধান দেশে একপ্রকারের পোশাকের প্রয়োজনীয়তা আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বা গ্রীষ্মকালে আর এক গুণসম্পন্ন তন্তু-নির্মিত পোশাকের প্রয়োজন। কতকগুলি তন্তু তাপ-সুপরিবাহী আবার কতকগুলি তন্তু তাপ-কুপরিবাহী। **সুপরিবাহী** অর্থ হইতেছে ইহার ভিতরের তাপ কিছু বাহির করিয়া দেয় এবং যে সমস্ত তন্তু কুপরিবাহী, ঐ সমস্ত পোশাক হইতে কোনও তাপ-মোচনের কাজ হয় না, তাপের সবটুকুই তন্তু ধরিয়া রাখে। সুতী, লিনেন, কৃত্রিম সিল্ক, পাট—এই জাতীয় সমস্ত উদ্ভিজ্জ তন্তুই উত্তাপ সুপরিবাহী। আবার পশম, রেশম এই **প্রাণীজ-তন্তুগুলি** সবই উত্তাপ কুপরিবাহী।

মানুষের **শারীরিক পরিশ্রমের** ফলে নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, ঘাম ও মলমূত্রের ভিতর দিয়া কিছু তাপ বাহির হইয়া যায় ; আবার শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় খাদ্য আহার করিলে দেহের ভিতর যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে তাহার ফলে দেহে তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপ ব্যয় ও সৃষ্টির কাজ খাদ্য ছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। শীতের সময় আমরা ভারী পোশাক এবং পশমের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া **শীত নিবারণ** করি এবং **আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য** বোধ করি।

দেহচর্ম ও পরিচ্ছদের ভিতরে একটি **সূক্ষ্ম বায়ুস্তর** থাকে। দেহ হইতে তাপ বাহিরে আসিয়া বায়ুস্তরটিকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। পোশাক-পরিচ্ছদ বায়ুস্তরটিকে আটকাইয়া রাখে। এই কারণে দেহ উত্তপ্ত হয়। পরিচ্ছদ উত্তাপ-সুপরিবাহী তন্তু দ্বারা নির্মিত হইলে তাপ বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ থাকে না, উহা বাহির হইয়া যায়, ফলে শরীরে গরম অনুভূত হয় না। শীতের সময় দরিদ্র লোকেরা পশমের জামা-কাপড় ব্যবহার করিতে পারে না; এইজন্য উহারা একসঙ্গে ২।৩টি বা তারও বেশী সুতী-বস্ত্র

ব্যবহার করিয়া দেহকে আচ্ছাদন করে। উহাতেও শীত কম লাগে এবং দেহে তাপ অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই যে বস্ত্রের **প্রতিটি আবরণের ফাঁকে বায়ুস্তর** সঞ্চিত থাকে। সেই প্রত্যেকটি স্তরই উষ্ণ হইয়া দেহকে আরাম দেয়। এই ভাবেই পরিচ্ছদ দেহের **উত্তাপ-সংরক্ষণ** ও **উত্তাপ-মোচনের** কাজটি করিয়া যাইতেছে।

গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যখন তাপ-মোচনের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন আমরা **উদ্ভিজ্জ তন্তু-নির্মিত** পোশাক অর্থাৎ **সূতী, লিনেন, রেয়ন** ও **অন্যান্য কৃত্রিম রেশম** ব্যবহার করিতে পারি। তাহা হইলে দেহের তাপ আর বস্ত্রের বায়ুস্তরে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ফলে তাপ-মোচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে হয় এবং আমরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি।

পশুর লোমে তৈরী বলিয়া পশমের আঁশগুলি খাঁজ-কাটা; ইহার বিভিন্ন স্তরে বায়ু আটকাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া পশমের ভিতর একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকে বলিয়া উহা সহজে ভিজে না। আবার পশম একবার **ভিজিয়া গেলে** উহা শুকাইতে সূতী অপেক্ষা **অনেক বেশী সময় লাগে**। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, পশম বস্ত্রের গায়ে সামান্য জল পড়িলে তাহা ঝাড়িয়া দূর করা যায়। উহাতে পরিচ্ছদটি আর্দ্র হয় না, কিন্তু সূতীর বস্ত্রে একটু জল লাগিলেই পোশাকটি সঙ্গে সঙ্গে ভিজিয়া যায়। পশমের এই **আর্দ্রতা-নিবারক** গুণ আছে বলিয়া **দেহ-নিঃসৃত ঘাম শোষণ** করিয়া লয়। ইহার ফলে দেহের তাপ ক্ষয় খুব তাড়াতাড়ি হইতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, পোশাক-পরিচ্ছদ যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা দেহের **তাপ-সংরক্ষণ** ও **তাপ-মোচন** কাজের সমতা বজায় রাখা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পোশাক ব্যবহারে ত্রুটি-বিচ্যুতি

পোশাক-পরিচ্ছদের অনেক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ইহার ব্যবহারের দোষে নানাভাবে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। **দেশ, কাল, পাত্র ও দেশের আবহাওয়া** অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার না করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রভূত ক্ষতি হয়, অধিকন্তু অনেক সময় মানুষের এই পোশাকের জন্যই জনসমাজের কাছে

হাস্যাস্পদ হইতে হয়। 'যস্মিন দেশে যদাচার'—সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে। দেশের **আচার, রীতি ও প্রথাকে** অগ্রাহ্য করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিলে উহা কখনও নীতিসম্মত হয় না। আমাদের দেশের বড় বড় মেয়েরা বা বিবাহিতা যুবতীরা যদি বিদেশী মহিলার অনুকরণে গাউন পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে উহা খুবই অশোভন ও বেমানান হয়। বাঙালী মেয়েরা স্বভাবতঃ কোমল ও নম্র। প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শাড়ীই উহাদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। এক্ষেত্রে তাহারা যদি অন্য প্রদেশকে অনুকরণ করিয়া সালোয়ার, পাঞ্জাবী, কামিজ, পাজামা, সেলুকা প্রভৃতি ব্যবহার করে তবে সে পোশাক রমণীয় না হইয়া বরং অশোভন মনে হইবে।

কাল অনুযায়ী পোশাক ব্যবহার না করিলে সেই পোশাক ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন, শীতপ্রধান দেশে **সাদা সূতী বা লিনেন** একেবারেই অচল, শীতের দেশে রঙীন রেশম, পশম প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছদই শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ হিসাবে পরিগণিত হয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূতীর পোশাক পরিত্যাগ করিয়া কেহ যদি **রেশমের পোশাকের** উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তবে সেটা খুবই অযৌক্তিক মনে হয়।

বিভিন্ন **কর্ম অনুযায়ী পোশাক** পরিধান না করিলে তাহা একদিকে যেমন অসুবিধা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে অশোভন ও দৃষ্টিকটু হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—যে লোক **কল-কারখানায়** কাজ করে, তাহার পক্ষে **প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট** উপযুক্ত পোশাক, কিন্তু তাহা না পরিয়া সে যদি ধুতি ও ঢিলা পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া কোনও কারখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ঐ পোশাক তাহার কর্মতৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করিবে। ধুতি-পাঞ্জাবী তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষে অনুপযোগী ও ত্রুটিপূর্ণ পোশাক হিসাবে পরিগণিত হয়।

পেশা অনুযায়ী পোশাক

আধুনিক যুগে **দেহ-বিন্যাস ও দেহ-সৌষ্ঠবের জন্য** মেয়েরা আঁটসাট পোশাক পরিধান করিতে পছন্দ করে। **অতিরিক্ত আঁটসাট-পোশাক** দেহ সৌষ্ঠবের পরিবর্তে **দৈহিক গঠনকে শ্রীহীন করিয়া** তোলে। ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, স্বাভাবিক রক্ত চলাচল হইতে পারে না। শরীরে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; অধিক উত্তাপ সৃষ্টি হওয়ায় ঘাম বাহির হইয়া শরীর আর্দ্র হয়। এই সকল কারণে অতিরিক্ত আঁটযুক্ত ভিতরের পোশাক সর্ব রকমে পরিত্যজ্য। অনেক ছেলেও এইরূপ আঁট-গেঞ্জী পরিতে অভ্যস্ত। জুতা **পরিধানেও আজকাল মেয়েরা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নীতি অনুসারে সুরুচির পরিচয় দেয় না।** এক্ষেত্রেও অনেক

আঁটসাট-পোশাকের কুফল

ত্রুটি লক্ষ্যণীয়। গোঁড়ালী উঁচু, অগ্রভাগ সূঁচালু, এইরূপ জুতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। এই জুতা পরিধানে স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। **মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়** এবং **পায়ের আকৃতি নষ্ট** হয়। বাল্যকাল হইতে মায়েরা ঐ সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিলে সন্তানদের আর ঐ ত্রুটিপূর্ণ পোশাকের দিকে ঝোঁক থাকিবে না।

পোশাক নির্বাচনে **বয়সকে গুরুত্ব না দিলে উহা সর্বস্তরেই বেমানান হয়।** বর্ষিয়সী কোনও মহিলা যদি তাহার বয়সের কথা চিন্তা না করিয়া **জমকালো রং-এর শাড়ী, ব্লাউজ** পরিধান করে, সে-পোশাক তাহার **বয়সোচিত গাম্ভীর্যকে নষ্ট করিয়া তুলিবে।** তাহার পক্ষে সাদা অথবা হাল্কা রং-এর শাড়ীই উপযুক্ত। পুরুষের বেলাতেও একজন বাঙালী **বয়স্ক ভদ্রলোকের** পক্ষে **ধুতি পাঞ্জাবীই** রুচিসম্মত পোশাক। তাহার পরিবর্তে তিনি যদি প্যাণ্ট ও হাফসার্ট পরিধান করিয়া সদা সর্বদা ঘোরা-ফেরা করেন, তবে উহা দৃষ্টিকটু হইবে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের সব সমাজে ঘটে। আমাদের দেশে গ্রামে মেয়েরা ফ্রকের পরিবর্তে শাড়ী পরিতে ভালবাসে এবং এই শাড়ীই উহাদের দৈনন্দিন পোশাক হইয়া দাঁড়ায়। **শাড়ী সামলানো ছোট ছোট মেয়ের পক্ষে খুবই কষ্টকর।** তাহা ছাড়া এই পরিচ্ছদের প্রভাবে তাহার মনের পরিবর্তন আসে। **বালিকা-সুলভ চপলতা নষ্ট হইয়া যায়।** বয়সের তুলনায় গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহাও পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের একটি ভুল পথ। গৃহকর্ত্রীর কখনই ঐ সকল পোশাক নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। একই উদাহরণ অপরিণত ছেলেদের ভিতরও অনেক সময় দেখা যায়। কোনও কোনও **অপরিণত বয়স্ক ছেলে** বাপ-ঠাকুরদার মত **ধুতি, পাঞ্জাবী** পরিতে অভ্যস্ত হয়। তাহার পক্ষে প্যাণ্ট ও হাফ সার্টই উপযুক্ত পোশাক।

বয়স অনুযায়ী পোশাক

আজকাল অনেক কৃত্রিম-তন্তু দ্বারা নির্মিত পোশাক বাহির হইয়াছে। ঐ সমস্ত কৃত্রিম-তন্তুর শাড়ীও খুব প্রচলিত। **নাইলন, টেরিলিন, শরণ** প্রভৃতি সিনথেটিক তন্তুর ভিতর দিয়া **বায়ু চলাচল করিতে পারে না।** ফলে অনেক সময় বেশী সময় পরিহিত অবস্থায় থাকিলে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। এই সকল জাতীয় পোশাক দেহের সৌন্দর্য বর্ধন করিলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ। ব্যক্তিবিশেষে এই সমস্ত পোশাকে শরীরে অনেক সময় **ছোট ছোট ফুস্কুরি উঠিয়া চুলকানীর মত হয়।** ডাক্তাররা ইহাকে **অ্যালার্জি** বলেন। পোশাক নির্বাচনে এই জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা যায়।

কৃত্রিম তন্তুর দোষ

পোশাক যুগপোযোগী না হইলে উহা একপ্রকার অচল হইয়া পড়ে। ছাঁট, কাট, নক্সা, আকৃতি সবই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাইয়া যায়। এ-যুগের লোক যদি সে-যুগের রুচি অনুযায়ী পোশাক পরিধান করে তাহা হইলে উহা উপযুক্ত পোশাক বলিয়া গণ্য হয় না। একালের পাঞ্জাবী, সার্ট, প্যাণ্ট, কোট, ফ্রক, শাড়ীর নক্সা সবই সেকালের পোশাক হইতে স্বতন্ত্র। এমনকি জুতার নক্সাও দিনে দিনে পরিবর্তন হইতেছে। তবে পরিবর্তনের জন্য যাহা **স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, সেই পরিচ্ছদ কখনই গৃহকর্ত্রী বাড়ীর পরিজনের জন্য নির্বাচন করিবে না।** সেকালে মেয়েদের পোশাকে সব রকম সামঞ্জস্য বিধানের কোনও বালাই ছিল না, কিন্তু আধুনিক যুগে সরল সহজ কাট-ছাঁটের ভিতর এবং **রং-এর ভিতর অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চলিতেছে।** ঘন ও হালকা বিভিন্ন রং-এর সমাবেশ ঘটাইয়া পোশাক-পরিচ্ছদে এক অপরূপ সমন্বয় সৃষ্টি করা হইতেছে। শাড়ী ব্লাউজের সমন্বয় না হইলে এখনকার সাজ-সজ্জা ব্যর্থ। বাস্তবিকই সাজ-সজ্জায় এই বর্ণের সমন্বয় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সৃষ্টি করিতেছে। বেশ-বিন্যাস এখন মস্ত বড় আর্ট। রুচিবোধ না থাকিলে এইরূপ সমন্বয় সৃষ্টি করা যায় না। প্রত্যেক গৃহকর্ত্রীর নিজের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা থাকা সমীচীন। **ঋতু অনুযায়ী** পোশাক-পরিচ্ছদের রং নির্বাচন করিলে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। গ্রীষ্মকালের পোশাক **গভীর কালো বা নীল হইলে আরও অধিক গরম বোধ হইবে।** ইহা পোশাক ব্যবহারের মস্ত বড় একটা ত্রুটি। কারণ কাল রং ও নীল রং সূর্যের আলোক ও উত্তাপ দুইই আত্মস্থ করে। ঐ কারণেই শীতের পোশাকের রং হওয়া উচিত গভীর কালো ও ঘন নীল। গ্রীষ্মের পোশাকের রং **হাল্কা ও ফিকা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।** মানুষের **দৈহিক গঠন, বর্ণ ও চেহারার উপরও রং-এর প্রভাব নির্ভর করে।** কাজেই বর্ণ-প্রকল্পকে বাদ দিয়া ত্রুটিহীন উপযুক্ত পোশাক হইতে পারে না।

যুগপোযোগী পোশাক

পরিচ্ছদে রং-এর স্থান

আজকাল অনেক মেয়ে এমন সব পোশাক পরিধান করে যাহা শালীনতার পরিচয় দেয় না। পোশাক-পরিচ্ছদের **মূল উদ্দেশ্যই শ্লীলতা রক্ষা করা**; মেয়েদের পোশাকের মাধ্যমে শালীনতা বজায় রাখিতে না পারিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অহেতুক পোশাকের বাহুল্যে দেহখানিকে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো যেমন রুচিবিরুদ্ধ আবার সুগঠিত অবয়বকে আচ্ছাদিত করার কার্পণ্যও রুচিবিরুদ্ধ। পরিবারে গৃহচরিত্রীর শিক্ষার মত বড় শিক্ষা

পোশাক ও শ্লীলতা রক্ষা

আর কেহ দিতে পারে না। অতএব গৃহকর্ত্রী এ বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনাপূর্বক পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় মনোযোগী হইবেন এবং সন্তানদিগকে সেইরূপ সুশিক্ষায় প্রভাবান্বিত করায় সচেষ্ট হইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়স, স্ত্রী-পুরুষভেদ, পেশা এবং ঋতু-বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপলক্ষে পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন

পোশাক-পরিচ্ছদের মূল উদ্দেশ্য শ্লীলতা রক্ষা হইলেও আধুনিক সভ্য যুগের মানুষ আরও বিভিন্নউদ্দেশ্যে নানা প্রকারের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। পরিচ্ছদ জগতে নানাবিধ তন্তু আবিষ্কৃত হইয়া মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের মান এখন অনেক উন্নত হইয়াছে। **পল্লীগ্রামেও এখন পোশাকের চটকদার দেখা যায়।** এমন অনেক পরিবার আছে যাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিলে উহাদের আর্থিক সঙ্কটের কথা কল্পনাই করা যায় না। আসল কথা ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা এখন একটা অভ্যাসের ভিতর দাঁড়াইয়াছে। পেট ভরিয়া ভালমন্দ খাওয়ার দিকে ঝোঁক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু পোশাকের আড়ম্বর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সামান্য একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহকর্তার মাসিক আয়ের অর্থ অর্ধেকের বেশী পোশাকের পিছনে চলিয়া যায়।

যে-ধরনের পোশাকই পরিধান করা হউক না কেন খুব সতর্কতার সহিত পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করা উচিত। কেননা পোশাকের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের প্রকৃতি ভালভাবে ফুটিয়া ওঠে। অতএব সর্ব স্তরেই পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনে যথেষ্ট রুচি-বোধ থাকা উচিত। কতকগুলি রীতিনীতি মানিয়া পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। বয়স, পুরুষজাতি কি নারীজাতি, পেশা, বিভিন্ন ঋতু প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আবার পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের তারতম্য ঘটে।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই মানব শিশুর পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়। সদ্যোজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর জামা **ঢিলাঢালা, বোতাম ছাড়া, বন্ধনীযুক্ত পিঠ খোলা হওয়া উচিত।** এই বয়সের শিশুদের জন্য

সূতীর পোশাক তৈরী করাই বাঞ্ছনীয়। কোনও রকম কৃত্রিম-তন্তুর পোশাক শিশুদের পরিধান করানো উচিত নয়। শীতকালে পশমের জামাই উৎকৃষ্ট। শিশু একটু বড় হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া উহার পোশাক নির্বাচন করা উচিত। রঙীন জিনিস শিশুর প্রিয় বস্তু, সুতরাং পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য শিশুর পোশাক উজ্জ্বল রং-এর হওয়া আবশ্যক। ছোট ছোট বালক-বালিকা এই বয়সে নানা রকমের পোশাক পরিধান করিতে পারে। শিশুকে সাদা পোশাক না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইজার, ফ্রক, নিকার—বোকার, ম্যাক্সি, মিনি, পেনি, সার্ট, হাওয়াই সার্ট, স্যুট প্রভৃতি নানা ছাটের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ এই বয়সের শিশুদের পরিতে দিতে হয়। বৈচিত্র্যের ভিতর তাহারা আনন্দ অনুভব করে। শিশুর পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে জুতা, মোজা, টুপিও রঙীন দেখিয়া ক্রয় করিতে হয়। পোশাকের উজ্জ্বল রং শিশুর সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টি করে এবং শিশুর মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে। শিশু কোথায়ও বেড়াইবার নাম শুনিলে নিজের পছন্দমত রং-এর পোশাকটিই টানিয়া বাহির করিয়া লয়। তাহার এই সৌন্দর্যপ্রিয়তায় কখনই বাধা দেওয়া উচিত নয়।

শিশুর পোশাক

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ বাড়ীতে ছেলেরা হাফ সার্ট, হাফ প্যান্ট, পায়জামা, গেঞ্জী প্রভৃতি পরিধান করে। বাড়ীতে পরার এই পোশাকগুলি সূতির হইলেই ভাল। মেয়েরা বাড়ীতে ফ্রক, ইজার, শাড়ী প্রভৃতি পরিধান করে। ছেলেদের পোশাকের তুলনায় মেয়েদের পোশাকের রং গভীর হওয়া আবশ্যক। সাধারণ বা আটপৌরে পোশাক সমস্তই সূতীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। সূতীর দাম কম, তাহাছাড়া আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সূতীর পোশাকের প্রচলন বেশী। ক্ষেত্রবিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করা উচিত, সুতরাং বাড়ীর পোশাক বাড়ীর জন্যই স্বতন্ত্র থাকিবে। বাড়ীর পোশাক বিদ্যালয়ে নীতিগত ভাবেই চলে না, কারণ বর্তমান যুগে বিদ্যালয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য একই রকম নির্বাচন করা হয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে ইউনিফর্মের জামা, প্যান্ট, শাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন স্কুলের বিভিন্ন রং-এর হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুধু সাদা পোশাকের ব্যবস্থাও দেখা যায়। বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন স্তরের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখিতে আসে, উহাদের পোশাক-পরিচ্ছদের শ্রেণীও পৃথক পৃথক। অতএব একের পোশাক অপরকে

ছেলেমেয়েদের পোশাক

বিদ্যালয়ের পোশাক

যাহাতে প্রভাবান্বিত করিতে না পারে, সেইকারণে ইউনিফর্ম পোশাকের প্রয়োজনীতার যথেষ্ট মূল্য আছে।

এই ছেলেমেয়েরাই যখন কোনও বিবাহ-অনুষ্ঠানে উহাদের পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যায় তখন উহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ আবার সামাজিক প্রতিপত্তি হিসাবে নির্বাচন করিতে হয়। খেয়ালের বশে কোনও বালিকা যদি একটি সাদা শাড়ী পরিধান করিয়া উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে তবে উহা কখনই আদর্শ বলিয়া মনে হইবে না। এই সব অনুষ্ঠানের জন্য সর্বাপেক্ষা সুন্দর পোশাকটি স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া দিতে হয়। এই ধরণের পোশাক টেকসইর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জাঁকজমক ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়।

শিশু ও ছেলেমেয়েদের পোশাক নির্বাচনে যেমন গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত সেইরূপ নিজের পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। একটি **বয়স্ক অপরিচিত লোকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় পোশাকের মাধ্যমে।** কোনও গৃহকর্ত্রী যদি তাহার কন্যা এবং পুত্রবধূর সঙ্গে একই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অভ্যস্ত হয় তবে তাহার বয়সোচিত চারিত্রিক বিকাশ ঘটে নাই ইহাই বোঝা যাইবে। রঙীন পোশাক তাহার চরিত্রকে অনেক হাল্কা করিয়া তুলিবে। তাহার পরিবর্তে তিনি যদি **সাদা শাড়ীর সঙ্গে সাদা অথবা হাল্কা রং-এর ব্লাউজ পরিধান করেন তবে অনেক শোভনীয় মনে হয়।** চওড়া পাড় যুক্ত সাদা পরিষ্কার শাড়ী নারী জাতির মনকে পবিত্র করিয়া তোলে এবং যে-কোনও ক্ষেত্রে তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে সক্ষম হইবেন। পক্ষান্তরে বাড়ীর গৃহকর্তারও পোশাক সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হইতে হয়। বাড়ীতে সাধারণতঃ উহারা ধুতি বা লুঙ্গি পরিধান করিয়া থাকে। অনেক গৃহকর্তা বাড়ীতে পায়জামা পরিধান করে। কিন্তু আমাদের বাঙালী সমাজে মধ্যবিত্ত পরিবারের বয়স্ক লোকের পায়জামা পরার চল খুব কমই দেখা যায়। অফিস কাছারীতে সাধারণতঃ ধুতি, পাঞ্জাবী, প্যাণ্ট, সার্ট ইত্যাদি পরিধান করে। এই সকল বয়স্ক ব্যক্তি যখন কোনও সভা-সমিতি, বা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তখন উহাদের পক্ষে ধুতি-পাঞ্জাবীই উপযুক্ত পোশাক। কোনও বিবাহ অনুষ্ঠানে উহারা সাধারণ পোশাক পরিধান না করিয়া ভাল মিহিধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবী ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপে বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পোশাক-পরিচ্ছদও বিভিন্ন হয়। অবস্থা ভেদে এই পোশাক-পরিচ্ছদের আবার গুণাগুণ হিসাবে ভাল মন্দ হয়।

বয়স্ক ব্যক্তিদের পোশাক

বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের ছবি

অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহস্বামী টেরিলিন, টেরিকটন, নাইলন, রেশম প্রভৃতি পোশাক ব্যবহার করেন, আবার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির দামী দামী পোশাক খুব কমই থাকে। উহাদের আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে সূতীই উহারা বেশী ব্যবহার করে। **রুচির দিক বিবেচনা করিলে সূতীর একটি সাদা পোশাক যে মার্জিত ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করে,** অপর কোনও তন্তু সেরূপ ফুটাইতে পারে না। তরুণ বা যুবকদের কৃত্রিম-তন্তু শোভনীয় হইতে পারে কিন্তু বয়স্ক প্রবীণ পুরুষের পক্ষে সূতীর পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট।

পেশা অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন হয়। **গ্রামে যাহারা কৃষিজীবী উহারা খাটো ধুতি, গামছা ব্যবহার করে**; আর মুসলমানেরা লুঙ্গি পরে। গ্রামে চাকুরীজীবি লোকেরা ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট ইত্যাদি পরিধান করে। শহর অঞ্চলে পেশা অনুসারে পোশাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন হয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রত্যেকেরই কাজ-কর্মের সুবিধা অনুযায়ী পৃথক পৃথক পোশাক। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারের প্যান্ট, সার্টই উপযুক্ত পোশাক। আবার **স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিধান করিলে অধিকতর শোভনীয় মনে হয়।** এই পোশাকে উহাদের ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য ফুটিয়া ওঠে। আইনজীবীদের এক বিশেষ পোশাক পরিধান করিতে হয়। প্যান্টের উপর তাহাদের কালো কোট বা কালো রং-এর গাউন পরিতে হয়। এই সকল তাহাদের ইউনিফর্ম পোশাক। কারখানার শ্রমিক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি উহাদের পক্ষে আবার হাফ প্যান্ট ও হাফ সার্টই উপযুক্ত পোশাক। দমকল-বাহিনীতে যাহারা কাজ করে তাহাদের পোশাকও স্বতন্ত্র। উহাদের মাথায় একটি অগ্নি-নিরোধক টুপি থাকে।

পেশা অনুযায়ী পোশাক

মেয়েরাও এখন ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হইয়া আছে। স্কুলে, কলেজে, সরকারী অফিসে এখন চাকুরে মেয়ের ছড়াছড়ি। আমাদের দেশে ঘরে-বাহিরে মেয়েদের প্রধান পোশাকই হইতেছে শাড়ী, ব্লাউজ। অফিসে যাঁহারা চাকুরী করেন তাঁহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিজস্ব রুচি অনুযায়ী জমকালো হইলে সমালোচনার কিছু নাই; কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের পোশাক **একদিকে মার্জিত অপর দিকে সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন হওয়া উচিত।** প্রত্যেক শিক্ষিকার পোশাক হওয়া উচিত সাদা শাড়ী এবং সাদা অথবা রঙীন ব্লাউজ। উহাদের পোশাকের পারিপাট্য থাকিবে কিন্তু জাঁকজমক হইবে না। যে পোশাক অপরিণত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে সেরূপ পোশাক কখনও একজন শিক্ষিকার পরিধান করা উচিত নয়। যে-সমস্ত মেয়ে **ডাক্তারী পেশায়** নিযুক্ত, **কর্মরত**

অবস্থায় শাড়ার উপর উহাদের একটি অ্যাপ্রণ পরিধান করিতে হয়। হাসপাতালে নার্সদের পোশাকেরও বৈশিষ্ট্য আছে। নার্সের টুপী, নার্সের বেল্ট আঁটসাট কাজের পরিচয় দেয়।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত ভাবে যে পরিচ্ছদই পরিধান করা হউক না কেন, পোশাক-পরিচ্ছদে আবহাওয়ার গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের দেশের ঋতু-বৈচিত্র্যের ভিতর সাধারণতঃ তিনটি আবহাওয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ; যেমন, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত।

গ্রীষ্মের পোশাক হওয়া উচিত হাল্কা ও সাদাসিধা। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া বছরের বেশীর ভাগ সময় আমরা গরমের কষ্টে দিন কাটাই। সূতী আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রধান তন্তু। সূতী তাপ-সুপরিবাহী। সুতরাং গরমে সূতীর পোশাক পরিধান করিয়া আরাম বোধ হয়। বর্তমানে লিনেন-তন্তুর ব্যবহারও খুব চলে। ছেলে-মেয়ে, শিশু, বয়স্ক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই গ্রীষ্ম ঋতুতে সূতী ও লিনেনের বস্ত্র পরিধান করে। জামা, প্যান্ট, সার্ট, ধুতি, পাঞ্জাবী, শাড়ী প্রভৃতি সবই সূতী তন্তুর তৈরী। বাড়ীতে পুরুষ লোকেরা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খালি গায়েও সময় কাটায়। অনেক সময় শুধু মাত্র একটি গেঞ্জী পরে। ধুতি বাঙালীর জাতীয় পোশাক হইলেও পুরুষ লোকেরা বাড়ীতে লুঙ্গি পরিয়া সময় কাটায়।

গ্রীষ্মের পোশাক

গ্রীষ্ম শেষ হইতে না হইতে বর্ষা আসিয়া পড়ে। বর্ষার সময় আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের নিম্ন বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদের খুবই অসুবিধায় দিন কাটে। কাপড়-চোপড়ের সংখ্যা খুবই কম থাকে। বর্ষার ভিজিয়া গেলে উহাদের অনেক সময় ভিজা কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার পোশাকের সহিত বিশেষ একটা পার্থক্য নাই। বর্ষায় সময়ও আমরা প্রধানতঃ সূতীর পোশাক ব্যবহার করি। যে-সমস্ত মেয়েরা বাইরে চাকুরী করে উহাদের পক্ষে সূতী অপেক্ষা নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন প্রভৃতির শাড়ী বর্ষার সময় ব্যবহার করা ভাল। উহাতে সহজে জল শোষণ করিতে পারে না। সুতরাং সহজেই ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না। বর্ষার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বর্ষাতি, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। নানা রং বেরং-এর পলিথিনের ছাতার বর্ষাতি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা না থাকিলে সাধারণ কাপড়ের ছাতা ক্রয় করাই যুক্তিযুক্ত। বর্ষায় কখনও চামড়ার স্যাণ্ডেল বা চটি ব্যবহার করা উচিত নয়। চামড়া ভিজিয়া পায়ে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা

বর্ষার পোশাক

থাকে। সুতরাং **রবারের চটি, রবারের জুতা বর্ষায় ব্যবহার করা হয়।** পল্লী-গ্রামে কৃষকেরা ক্ষেতে কাজ করার সময় একপ্রকারের টোকা মাথায় পরিয়া লয়।

বর্ষার পরেই শারদীয় উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। বাঙালী তাহার আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্য জামা-কাপড় কেনা-কাটা করে। নূতন পোশাকের কল্পনায় শিশুদের মনে আনন্দ আর ধরে না। পূজার পর অল্প অল্প শীতের আমেজে পসারী তার শীতের পসরা সাজাইয়া রাখে ক্রেতাদের জন্য। প্যাণ্ট, সার্ট, কোট,

শীতকালীন পরিচ্ছদ

সোয়েটার, কার্ডিগ্যান, পুলওভার, মাফলার, আলোয়ান, শাল, মলিদা, তুষ আরও কত কী।

কিন্তু দামের অঙ্ক শুনিলে কেনার আগ্রহ আসে না। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী পশমের সাহায্যে তৈরী করে বিভিন্ন পোশাক। হাতে তৈরী এই পোশাকগুলি দেখিতেও সুন্দর, টেকসইও হয়। একখানা কাশ্মিরী শাল ক্রয় করিতে হইলে মোটা টাকার প্রয়োজন। অবশ্য কষ্ট করিয়া কিনিয়া রাখিলে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য কম পক্ষে দশ বছর আর চিন্তা করিতে হয় না। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা আটপৌরে হিসাবে খদ্দরের অথবা লিনেনের চাদর গায় দিয়া শীত নিবারণ করে। খদ্দরের জামাও শীতের উপযুক্ত পোশাক। বর্তমানে **পশমের সঙ্গে মিশ্রিত সূতার তন্তুর খুব প্রচলন** দেখা যায়। এইরূপ কটন উলের সার্ট, প্যাণ্ট, ব্লাউজ, চাদর প্রভৃতি পশম অপেক্ষা অনেক কম দামে বিক্রয় হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পোশাকের নক্সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত-প্রণালীর বিভিন্ন নীতি

প্রত্যেক পরিবারের গৃহকর্তাঁরই কিছু কিছু ছাঁট-কাট ও পোশাক প্রস্তুতের প্রণালী জানিয়া রাখা দরকার। কেনা পোশাকের অনেক দাম, তাহাছাড়া সেগুলির সেলাইও মজবুত থাকে না, দুই-একদিন পরেই সেলাই খুলিয়া যায়। দরজিকে তৈরী করিতে দিলে মজুরি এতো বেশী দিতে হয় যে তাহা খরচ করিলে আর একটি নূতন পোশাক ক্রয় করা যায়। এই সকল কারণে সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ বাড়ীতে তৈরী করিতে

পারিলে অনেক সমস্যা মিটানো যায়। এজন্য বাড়ীতে একটি সেলাইয়ের কল থাকিলে ভাল হয়। হাতে সেলাই সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ দুইই। পোশাক তৈরী করিতে হইলে আন্দাজের উপর নির্ভর না করিয়া মাপ লইয়া তৈরী করিতে পারিলে উহা শরীরের উপযুক্ত হইয়া মানানসই হয়। সেইজন্য প্রত্যেক গৃহকর্তীর এবং বাড়ীর বড় বড় মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের মাপ-জোখ শিখিয়া লইতে হয়।

লম্বা মাপের ফিতার সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ লইয়া খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। বিভিন্ন অংশের মাপের আবার বিভিন্ন নাম আছে। নীচে বিভিন্ন মাপের নাম দেওয়া হইল।

শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপের নাম

(১) **ঝুল :** জামার লম্বাকে বলা হয় ঝুল।

(২) **পুট :** মেরুদণ্ডের সবচেয়ে উপরের হাড় হইতে কাঁধের উপরের উঁচু হাড় পর্যন্ত মাপকে বলা হয় পুট।

(৩) **পুট-হাতা :** উপরে যে পুটের মাপের কথা বলা হইয়াছে তার সঙ্গে হাতের লম্বা জুড়িলেই পুট-হাতার মাপ পাওয়া যায়।

(৪) **হাতা :** কাঁধের উপরের উঁচু হাড় হইতে কব্জীর নীচে পর্যন্ত মাপকে 'হাতা' বলা হয়।

(৫) **ছাতি :** বুকের ঘেরের মাপকে বলা হয় ছাতি। এই মাপ সবচেয়ে চওড়া জায়গা অর্থাৎ ডান হাতের তলা হইতে বাঁ হাতের তলার নীচ দিয়া মাপটা হইতে হয়।

(৬) **গলা :** ফিতার শুরুর দিকের প্রান্তটি মেরুদণ্ডের সবচেয়ে উপরের হাড়ের উপর ধরিয়া সেখান থেকে শুরু করিয়া গলার বেড়ের এই মাপ নেওয়া হয়।

(৭) **মুহুরি :** কব্জীর মাপকে বলা হয় মুহরী। কব্জীর চারিপাশ ঘুরাইয়া এই মাপ লওয়া হয়।

(৮) **সেস্ত :** মেরুদণ্ডের উপরের হাড় থেকে কোমর পর্যন্ত মাপকে বলা হয় সেস্ত। এই মাপ পিঠের দিকে নেওয়া হয়।

(৯) **পাছা :** পাছার যে অংশ আকারে বড় সেই অংশকে ঘিরিয়া এই মাপকে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ প্যান্ট, পায়জামা ও হাফপ্যান্ট তৈরী করিতে এই মাপ নেওয়ার দরকার হয়।

(১০) **কোমর :** কোমরের চারি পাশ ঘুরাইয়া এই মাপ নেওয়া হয়।

মাপ লইবার প্রণালী : যে ব্যক্তির পোশাকের মাপ নেওয়া হইবে তাহাকে সামনে দাঁড় করাইয়া দাঁড়ানো অবস্থায় তাহার হাত দুইটি যাহাতে দুইপাশে সরল ভাবে ঝুলিয়া থাকে সেইদিকে নজর দিতে হইবে। মাপ নিতে হইবে ফিতার সাহায্যে। ফিতায় একদিকে থাকে ইঞ্চির মাপ, অপর দিকে সেন্টিমিটার মাপের দাগ দেওয়া থাকে। বর্তমানে মিটার মাপই চালু করা হইয়াছে। দেহের মাপ নেওয়ার সময় যাহাতে কোনও ভুল না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সামান্য ভুলের জন্য সম্পূর্ণ পোশাকটাই অকেজো হইয়া যাইবে। গলার মাপ নেওয়ার সময় ফিতা এবং গলার মাঝে একটি আঙুল রাখিয়া মাপ নিতে হইবে। ছাতি, কোমর ও পাছার মাপ নেওয়ার সময় চারিটি আঙুল ভিতরে রাখিয়া মাপ নিতে হইবে।

বয়স অনুসারে ছেলে ও মেয়েদের দেহের বিভিন্ন অংশের মাপগুলির কয়েকটি তালিকা দেওয়া হইল।

মাপগুলি ইঞ্চিতে দেওয়া হইল

বয়স (বছরে)	২-৩	৩-৪	৪-৭	৭-৮	৮-১০	১০-১২	১২-১৪	১৪-১৬
হাফ সার্টের ঝুল	১৪	১৮	২০	২২	২৪	২৬	২৮	৩০
হাফ প্যান্টের ঝুল	১২	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কোটের ঝুল	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
ছাতি	২০	২১	২২	২২	২৩	২৫	২৬	২৮
কোমর	১৯	২০	২১	২১	২২	২৪	২৫	২৭
পুট	৪½	৪¾	৫	৫½	৬	৬½	৭ -	৭½
পুট-হাতা	১৮	২০	২২	২৪	২৫	২৬	২৯	৩০
গলা	১০	১০½	১১	১১½	১১½	১২	১২½	১৩
মুহুরি	৫½	৬	৬½	৭	৭¼	৭½	৮	৮½
পাছা	২০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬

মেয়েদের ফ্রকের মাপ

(ইঞ্চিতে দেখানো হইল)

বয়স (বছরে)	২-৩	৩-৪	৪-৬	৬-৮	৮-১০	১০-১২	১২-১৪	১৪-১৬
ফ্রকের ঝুল	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৬	৩০	৩৬
ছাতি	১৯	২১	২২	২৪	২৬	২৮	৩২	৩৪
কোমর	১৮	২০	২১	২১	২২	২৩	২৫	২৭
পুট	৪	৪ $\frac{১}{৩}$	৪ $\frac{১}{২}$	৫	৫ $\frac{১}{৪}$	৬ $\frac{১}{৪}$	৬ $\frac{১}{২}$	৭ $\frac{১}{২}$
মুহুরি	৪ $\frac{১}{২}$	৫	৫ $\frac{১}{২}$	৬	৬ $\frac{১}{২}$	৭	৭ $\frac{১}{২}$	৮

কয়েকটি বিশেষ মাপের নাম ও বিবরণ

মাপের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আস্তিন	জামার দুই হাতাকে আস্তিন বলে।
প্লেট	পাঞ্জাবী অথবা সার্টের বুকের উপরে যে ভাঁজ-করা পটি সেলাই করিয়া লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং যাহার উপর বোতাম-ঘর তৈরী করা হয় তাহাকে বলা হয় প্লেট।
গজ	ফিতার ১ ইঞ্চি হইতে ৩৬ ইঞ্চি পর্যন্ত মাপ। ৩৬ ইঞ্চিতে ১ গজ হয়।
মুহুরি	হাতের কব্জীর কাছে জামার হাতার প্রান্ত অথবা প্যান্টের দুই পায়ের নীচের দিকের প্রান্তকে বলা হয় মুহুরি।
সামনা	জামার সামনের দিকের অংশ।
পিছনা	জামার পিছনের দিকের অংশ।
ডাউন	জামার নীচের অংশ।
পাশ	জামার ডাইন এবং বামের জোড়া অংশ।
দরজ	জামার উভয় পার্শ্বের সংযোগস্থল।

মাপের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
পিঠের দরজ	জামার পিছন দিকের ঠিক মাঝ বরাবর সেলাই করা অংশ।
লব	জামার শেষ প্রান্ত।
টেকিন	সার্ট অথবা প্যান্টের যে অংশ সেলাই করিয়া ভিতরে রাখিতে হয়।
পুঁতিন বা ফ্লাই	কখনও কখনও ফিতার মত আলগা পটিতে বোতাম জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই রকম পটিকে বলা হয় পুঁতিন বা ফ্লাই।
স্ট্র্যাপ	যাহার সঙ্গে বক্‌লেস্ আটকানো হয়।
জেব	পকেট
তাজ	পকেটের উপরের ঢাকনি।
ইস্তি	দুই খণ্ড কাপড়ের মধ্যে যে পৃথক কাপড় ঢুকাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে ইস্তি বলে।
ঠিক	প্যান্টের পাশের ঝুল।
ন্যাপোল	কোটের সামনের অংশের ভিতরে কোটের কাপড়ের এই অংশ জোড়া থাকে।
ম্যানা	প্যান্টের পিছন দিকের ঠিক মাঝ-বরাবর দুইটি জোড় সেলাই-এর নাম।
সিস্তি	প্যান্টের কোমরের সঙ্গে ফিতার মত যে আলাদা কাপড় সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয় তাহাকেই সিস্তি বলা হয়।
ফোল্ডিং	প্যান্টের দুই পায়ের মুখে কাপড়ের যে অংশ উল্টানো থাকে তাহাকে বলা হয় ফোল্ডিং।
সলক	জোড়শূন্য একখণ্ড কাপড়।
ল্যাপোট	প্রয়োজনীয় মাপ হইতে যতটুকু বেশি রাখা হয় সেই বাড়তি অংশকে ল্যাপোট বলা হয়।

মাপের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
হাই ও সেকম	প্যাণ্টের পাছার লাইনের উপরের অংশকে বলা হয় 'হাই', এবং নীচের অংশকে বলা লয় 'সেকম'।
হিপ পকেট	প্যাণ্টের পাছার উপরে যে পকেট থাকে তাহাকে বলা হয় হয় হিপ পকেট।
দাবাট	অঙ্কনের বাইরে যে বাড়তি কাপড় রাখা হয় তাহাকে বলা হয় দাবাট।

ব্লাউজ ঃ শাড়ী পরিতে হইলে ব্লাউজ অপরিহার্য। নিম্নে একটি ব্লাউজের মাপ, কাটিং এবং সেলাই-এর নিয়মাবলী বর্ণনা করা হইল।

মাপ

ছাতি = ৩৬ ইঞ্চি
সেস্ত = ১৪ ,,
পুট = ৭½ ,,
পুটহাতা = ১৬ ,,
কোমর = ৩০ ,,

ব্লাউজের পেছনের অংশ এবং সামনের অংশ পৃথক করিয়া কাটিতে হয়। চিত্র দেখিয়া বোঝা যাইবে যে ১৬ হইতে ৭ পর্যন্ত হইল পিছনের অংশ এবং ডান দিকের ১১ হইতে ১৬ পর্যন্ত সামনের অংশ। মার্কিং করার আগে সওয়া গজ লম্বা এবং এক গজ চওড়া একটি ব্লাউজের কাপড়কে চওড়া দিকে দুই ভাজ করিয়া নিতে হইবে।

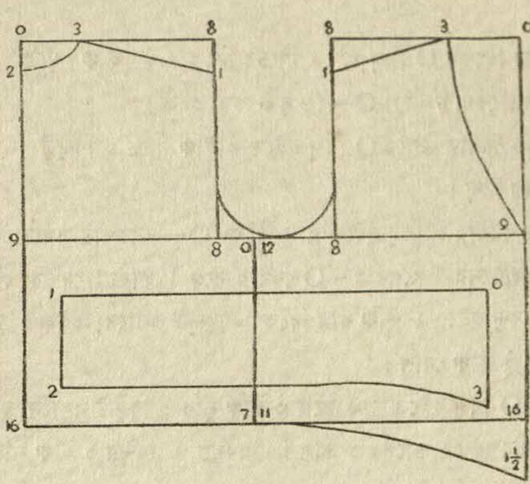
পিছনের অংশের মার্কিং

(১) O বিন্দু হইতে নীচের দিকে ১৬ ইঞ্চি দূরে ১৬ বিন্দুটি বসাইয়া স্কেলের সাহায্যে একটি রেখা টানিয়া উভয় বিন্দু যুক্ত করিতে হইবে। ইহা সেস্ত অপেক্ষা ২ ইঞ্চি বেশি।

(২) O—১৬ রেখার উপরে O বিন্দু হইতে ৯ ইঞ্চি নীচে ৯ বিন্দুটি বসাইতে হইবে। এই মাপ হইল ছাতির মাপের সিকি ভাগ।

(৩) O বিন্দু হইতে ডান দিকে ৮ ইঞ্চি দূরে ৮ বিন্দুটি বসান হইবে এবং রেখা টানিয়া উভয় বিন্দু যোগ করিলাম। এরপর O—৯-এর সমান্তরালে উপরের ৮ বিন্দু হইতে নীচের দিকে একটি সরল রেখা টানিয়া লওয়া হইল।

(৪) এক্ষণে O—৮ বিন্দুর সমান্তরাল ৯ বিন্দু হইতে বাম দিকে একটি সরলরেখা টানা হইল। এই সরলরেখা যেখানে ৮ বিন্দু থেকে নীচের দিকে টানা সরলরেখাকে



ব্লাউজ কাটিং

ছেদ করিয়াছে, সেখানে আরও একটি ৮ বিন্দু বসানো হইল। এই ৮ বিন্দুটি হইবে উপরের ৮ বিন্দু হইতে ৮ ইঞ্চি নীচে। এইটি হইল পুটের মাপ হইতে ½ ইঞ্চি বেশী।

(৫) ৯—৮ সরলরেখাটি ৮ বিন্দু থেকে বাড়াইয়া কাপড়ের ডান দিকের প্রান্ত পর্যন্ত নিতে হইবে। এবারে গলার মার্কিং করিতে হইবে।

(৬) O বিন্দু হইতে ডান দিকে ৩ ইঞ্চি দূরে ৩টি বিন্দু বসানো হইল। O—৩ হইল ছাতির মাপের ১২ ভাগের ১ ভাগ। এরপর O বিন্দু হইতে ২ ইঞ্চি নীচে ২ বিন্দুটি বসানো হইল। এবং ২—৩ চিত্রের মত যুক্ত করিতে হইবে। এইটাই হইল গলার পিছনের দিকের মার্কিং।

(৭) O—৮ রেখার ৮ বিন্দু হইতে ১ ইঞ্চি নীচে এক বিন্দুটি বসাইয়া ৩ এবং ১ চিত্রের মত রেখা টানিয়া যুক্ত করা হইল।

(৮) ৯—৮ রেখার উপরে ৯ হইতে ১০ ইঞ্চি দূরে O বিন্দুটি বসানো হইল। এর পর O বিন্দু হইতে ৯—১৬ রেখার সমান্তরালে একটি রেখা টানা হইল।

(৯) এখন ৯—১৬ রেখার ১৬ বিন্দু হইতে ৯—O রেখার সমান্তরালে একটি সরলরেখা টানা হইল। এই রেখার উপরে ১৬ হইতে ১০ ইঞ্চি দূরে ৭ বিন্দুটি বসানো হইল। ৭—O চিত্রের মত রেখা টানিয়া যুক্ত করা হইল।

কাটিং ঃ এবার ৪, ৩, ২ এবং ৫ বিন্দুগুলিকে চিত্রের মত রেখা টানিয়া যুক্ত করিতে হইবে এবং ঐ সকল রেখা বরাবর কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া যাইতে হইবে।

ইহার পর ১১ হইতে ১০ পর্যন্ত কাটিয়া আলাদা করিয়া নিতে হইবে। এই অংশে এমন ভাবে কুঁচি দিতে হইবে যাহাতে ১১ বিন্দুটি ঠিক ৫ বিন্দুর উপরে পড়ে এবং অপর অংশ ১০ বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।

সেলাই ঃ প্রথমে পাশ দুইটি সেলাই করিতে হইবে। এরপর সামনের অংশ হইতে গলা বরাবর কাটিয়া নিতে হইবে। ফ্রকের গলা ইচ্ছামত করা যায়। (V, চৌকো ও গোল) এখানে V গলার মার্কিং দেখানো হইয়াছে। গলার মাপ সাধারণতঃ ছাতির মাপের ১২ ভাগের ১ ভাগ থেকে ১ ইঞ্চি বেশি হয়। এখানে ছাতির মাপ ২৪ ইঞ্চি হওয়ায় গলার মাপ হইবে ২৪ ÷ ১২ + ১ = ৩।

সামনের অংশের ১ হইতে ৬ পর্যন্ত গলার জন্য খোলা রাখিতে হইবে। এইভাবে গলা ঠিক করিয়া নিয়া সেলাই করা হইবে।

বর্তমানে এই ফ্রকের কলারের প্রচলন নাই।

ছোট ছেলেমেয়েদের ইজার

ছোট মেয়েরা ইজার পরে, আবার ছেলেরাও হাফ প্যান্ট পরিতে আরম্ভ করার পূর্বে ইজারই পরে। ইহা নরম এবং পরিতে আরাম। হাফ প্যান্টের মত ইহা মোটা কাপড় দ্বারা তৈরী হয় না।

ইজারটির মাপ ঃ

ঝুল	১৮ ইঞ্চি
পাছা	৩০ "
কোমর	২২ "
মুহুরী	১৮ "

মাপ অনুসারে মার্কিং ঃ

(১) ১ হইতে ৩ ঝুলের মাপ হইতে ১ ইঞ্চি বেশি।

(২) ১ হইতে ২ হইল পাছার মাপের $\frac{1}{৪}$ ভাগ + ১$\frac{1}{২}$ ইঞ্চি

(৩) ২ হইতে ৫ এবং ১ হইতে ২ একই মাপের হইবে।

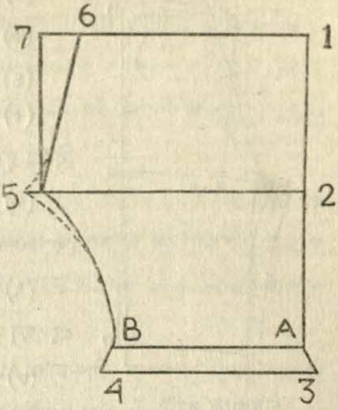
(৪) ১ হইতে ৬ হইল কোমরের মাপের $\frac{1}{৪}$ ভাগ + ২ ইঞ্চি

(৫) ১ হইতে ৭ এবং ২ হইতে ৫ সমান মাপের।

(৬) ৩ হইতে ৪ হইল মুহুরীর মাপের চারভাগের এক ভাগ। এবং আরও ২ ইঞ্চি।

A—B হইল মুহুরীর মাপ অপেক্ষা ½ ইঞ্চি বেশি। এক্ষণে বিভিন্ন বিন্দুগুলি চিত্র অনুযায়ী রেখা টানিয়া যুক্ত করিলেই মার্কিং হইয়া যাইবে।

এর পর কোমরের পটির জন্য ২½ ইঞ্চি চওড়া এবং কোমরের মাপ হইতে ½ ইঞ্চি বেশি এক টুকরা কাপড় লইয়া উহার লম্বা দিকের উভয় প্রান্ত ¼ ইঞ্চি হিসাবে মুড়ি ভাঙ্গিয়া আলাদা করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।



ইজার কাটিং

কাটিং ঃ ১-৭, ৭-৫, ৫-৪ এবং ৪-৩ কাটিয়া নিতে হইবে। কাটিং-এর সময় এক পাট কাপড়ে ৫-এর পাশে ডট্ ডট্ চিহ্নের মত সামান্য একটু বড় করিয়া কাটিতে হয়।

সেলাই ঃ কাটিং হইয়া গেলে ১-৭ অংশ বাদ দিয়া অন্যান্য অংশ পায়জামার মতো সেলাই করা হইবে। সেলাই হইয়া গেলে কোমড়ের অংশকে চুনন করিয়া কোমরের মাপ থেকে ½ ইঞ্চি বেশি রাখিয়া উহার উপরে পূর্বের তৈরী করিয়া রাখা ফিতাটা পায়জামার মত বসাইয়া সেলাই করা হইবে।

কোমর সেলাই হইয়া গেলে সরু করিয়া মুহুরীর মুড়ী ভাঙ্গিয়া সেলাই করার পর ১ ইঞ্চি বা ১½ ইঞ্চি উপরে মুহুরীর মাপ অপেক্ষা ½ ইঞ্চি বেশি রাখিয়া কুচি দিয়া কুচকানো অংশের উপর পূর্বোক্ত সরু ফিতাটা জুড়িয়া সেলাই করা হইবে। ইহার ফলে মুহুরীর নীচের অংশটা একটু বড় হইবে এবং দেখিতেও সুন্দর হইবে। দুই পায়েই এই ভাবে সেলাই করিয়া যাইতে হইবে।

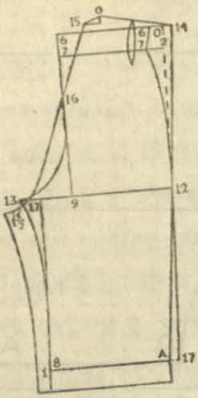
ছেলেদের হাফ্ প্যান্ট ঃ

মাপ ঃ	ঝুল—	১৭ ইঞ্চি
	পাছা—	৩০ ”
	কোমর—	২৪ ”
	হাঁটু—	২০ ”

সামনের অংশের মার্কিং ঃ

উপরের মাপ অনুযায়ী প্রথমে হাফ-প্যান্টের সামনের অংশের মাপ দেওয়া হইল।

(১) ০ হইতে ১৭ হইল লম্বার মাপ + ½ ইঞ্চি।



হাফপ্যান্ট কাটিং

(২) ০ হইতে ২ বিন্দুর প্রান্ত ২ ইঞ্চি নীচে।

(৩) ০ হইতে ১২ হইল পাছার ১/৬ ভাগ।

(৪) ১২ হইতে ১৩ পাছার ১/১৬ ভাগ + ১ ইঞ্চি।

(৫) ৯ হইতে ১৩ বিন্দুর মাপ হইবে ১২ হইতে ১৩ বিন্দুর দূরত্ব যতটা তাহার ১/৪ ভাগ।

(৬) ৯, ৭ এবং ৬ রেখাটি ১২—১৩ রেখার উপরে ৬ থেকে লম্ব।

(৭) ৭ হইতে ৭ হইল কোমরের চারভাগের এক ভাগ অপেক্ষা ½ ইঞ্চি বেশি।

(৮) ৬-৬ হইল ৭-৭ হইতে ½ ইঞ্চি বেশি।

(৯) ডান দিকের নীচের প্রান্তের ১৭ হইতে A বিন্দুর দূরত্ব হইল ½ ইঞ্চি।

(১০) 'A' হইতে ৮ হইল হাঁটুর মাপের অর্ধেক।

পিছনের অংশের মার্কিং : এই অংশ সামনের অংশ অপেক্ষা কিছুটা স্বতন্ত্র। (১) ১৩-৮ রেখার ৮ হইতে ১ ইঞ্চি দূরে ১ বিন্দুটি বসানো হইল। ইহার পর ৬-৯ সরলরেখার ৬ এবং ৯ বিন্দু দুইটির মাঝামাঝি জায়গা হইতে একটি বক্ররেখা চিত্রের মতো টানিয়া ১৩ বিন্দুর নীচে নিয়া যাওয়া হইবে এবং সেখানে ১½ বিন্দুটি বসানো হইবে। পরে ১½ এবং ১ বিন্দু ভিতর রেখা টানিয়া যুক্ত করা হইবে।

(২) উপরের ৬-৬ রেখার ডানদিকের ৬ হইতে ১½ ইঞ্চি দূরে ১৪ বিন্দুটি বসাইয়া চিত্রের মত রেখা টানিয়া ১৪ হইতে ১২ যুক্ত করিতে হইবে।

(৩) ১৪-১৫ রেখার মাপ কোমরের মাপের অর্ধেক হইতে ১ ইঞ্চি বেশি।

(৪) ১৫ হইতে ০ বিন্দুটি হইবে ২ ইঞ্চি দূরে।

(৫) ১৫ হইতে একটি সরলরেখা ডান দিকে টানা হইবে এবং ০ হইতে একটি সরলরেখা চিত্রের মত নীচের দিকে টানা হইবে। এই দুইটি রেখা যেখানে ছেদ করিয়াছে সেই ছেদবিন্দু হইতে ০ বিন্দুর দূরত্ব হইবে ১½ ইঞ্চি।

কাটিং : এই অংশ কাটিং করিবার সময় ১৪, ১২, ক এবং ৮ এবং ১৫, ১½, ১৬/২, এবং ১ রেখার পাশে ১ ইঞ্চি বেশি কাপড় রাখিতে হইবে।

সেলাই : একখানি সামনের এবং আর একখানি পিছনের অংশ লইয়া সেলাই আরম্ভ করিতে হইবে। ১৪—১২—A রেখাকে হাফ প্যাণ্টের পাশ বলা হয়। ১½ রেখাকে সেকম বলা হয় এবং ১৫-১½ রেখাকে বলা হয় ম্যানা।

সেলাই করিবার সময় প্রথমে পাশ, তারপর সেকম, তারপর আলাদা কাজপটি এবং বোতামপটি সেলাই করিতে হইবে। এরপর ম্যানা জুড়িয়া সেলাই করিতে হয়।

হাফ্ প্যান্ট কাটিবার সময় দুইভাগ সামনা এবং দুইভাগ পিছন পাওয়া গেল। এরপর পিছন দুইভাগ আলাদা করিয়া, বিছাইয়া নিয়া সেই দুই ভাগের উপরে সামনের ভাগ দুইখানি রাখিয়া সেলাই করিতে হইবে।

পাশ সেলাই করিবার সময় ৬-৭ আগে সেলাই করিতে হইবে। ইহার পর ৭-হইতে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ নীচের দিকে পকেটের মুখ খোলা রাখিয়া বাকি অংশ সেলাই করিয়া ফেলিতে হয়। সামনের ভাগের ১৩-৮ রেখা পিছন ভাগের ১২-১ রেখার উপরে রাখিয়া সেলাই করিতে হইবে।

ইহার পর সামনের ভাগের ডান দিকের অংশে বোতাম-পটি ও বামদিকের অংশে কাজ-পটি বসাইতে হয়। এক্ষণে দুইটি ম্যানা একত্র করিয়া দাগ বরাবর সেলাই করিয়া যাইতে হইবে। ম্যানা জুড়িবার আগে কোমরের উপরকার জায়গায় ২ ইঞ্চি বা ২½ ইঞ্চি চওড়া একটি লংক্লথের পটি জুড়িয়া দিতে হইবে। ইহাকে বলা হয় সিন্থির পটি।

ম্যানা জুড়িবার পরে ফোল্ডিং উল্টাইয়া সেলাই করিতে হইবে। এই সময় পা দুইটি যাহাতে সমান লম্বা থাকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজধৌতি, স্থায়িত্ব এবং পরিধানের সহজসাধ্যতা,—এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি জোর দিয়া পোশাক-পরিচ্ছদের তন্তু নির্বাচন

আমাদের ব্যবহারের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণতঃ আঁশ বা তন্তু দ্বারা তৈরী হইয়া থাকে। তন্তুগুলি আবার নানাভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ তন্তুগুলি **প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম** এই দুই শ্রেণীর পর্যায় পড়ে। প্রাকৃতিক তন্তু হইল **উদ্ভিদ-জাত ও প্রাণী-জাত**। **সূতী, লিনেন, পাট ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ-তন্তু** দ্বারা নানাপ্রকার বস্ত্র তৈয়ারী হয়, আবার প্রাণী-জাত তন্তু দ্বারা **রেশম ও পশমের পোশাক** তৈরী হয়। ইহা ছাড়া কৃত্রিম তন্তুও আজকাল পরিচ্ছদ-পরিকল্পনায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। **রেয়ন, নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন এই সকলকে কৃত্রিম তন্তু বলা হয়।** গৃহকর্ত্রী গৃহের সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনের পোশাক

নির্বাচনের সময় দেশ, কাল, পেশা, আবহাওয়া প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পোশাক নির্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু পোশাক নির্বাচনে আরও কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে; সেই সমস্ত বিষয়ে গৃহকর্ত্রীর প্রকৃত ধারণা না থাকিলে তাহার পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রত্যেক পোশাক ব্যবহার করিবার পূর্বে উহার তন্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তন্তুর উপর পোশাকের গুণাগুণ বিচার হয়। এই কারণে তন্তুর **সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজধৌতি, স্থায়িত্ব, পরিধানের সহজ-সাধ্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিয়া পোশাক-পরিচ্ছদের তন্তু নির্বাচন করিতে হয়।**

সৌন্দর্য ঃ রেশম তন্তু দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। ইহা যেমন চকচকে তেমন মোলায়েম। পশম-তন্তু রেশমের মত প্রাণীজ তন্তু হইলেও রেশমের মত এতো **চাকচিক্য** দেখা যায় না, তাহাছাড়া সৌন্দর্যের দিক থেকেও উহা রেশমের সহিত তুলনা হইতে পারে না। সুতি আমাদের সাধারণ পোশাকের অভাব দূর করে। সভ্য জগতে সুতির পোশাক একান্ত ভাবেই অপরিহার্য। কিন্তু ইহার দ্বারা নির্মিত পোশাক **জমকালো** হয় না। চাকচিক্য ও মসৃণতার অভাবে ইহা উচ্চ শ্রেণীর পোশাক হিসাবে পরিগণিত হয় না। তবে ইতিহাসে নজির পাওয়া যায় এমন একদিন ছিল যখন সূক্ষ্মতায়, শিল্পে, মনোহারিত্বে জগৎবাসীর মন কাড়িয়া নিয়াছিল বাংলার ঢাকাই মসলিন্; ইহা এতো নমনীয় এবং মোলায়েম ছিল যে হাতের মুঠায় একখানি শাড়ী অনায়াসেই রাখা সম্ভব হইত। সেই শিল্পের অভাবে সুতী এখন তন্তু প্রতিযোগিতায় সৌন্দর্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না। সুতী অপেক্ষা **লিনেনের চাকচিক্য অনেক**। লিনেন দ্বারা অনেক সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরী হয়। সৌন্দর্যের দিক থেকে **নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন প্রভৃতি** কৃত্রিম তন্তুর আভিজাত্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। আজকাল নাইলনের নানা রকম সৌখীন পোশাক দেখা যায়। নাইলনও টেরিলিনের শাড়ী ও জামা, সার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের পোশাক বাজারে ছড়াইয়া আছে। **বিবাহ অনুষ্ঠানে বেনারসী শাড়ী, অন্যান্য সিল্কের শাড়ীর পরেই নাইলন, টেরিলিনের স্থান লক্ষ্য করা যায়।** আটপৌরে হিসাবে আমরা সুতীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ তন্তু হিসাবে গ্রহণ করি কিন্তু বিশেষ বিশেষ আনন্দানুষ্ঠানে আমরা রেশম, নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতিই ব্যবহার করিয়া থাকি। পুরুষের পোশাকে আজকাল একচেটিয়া ভাবে টেরিলিন ও নাইলন স্থান লাভ করিয়াছে। নানা প্রকারের রেশম দেখা যায়, যেমন, **তসর, গরদ, মটকা, মুগা প্রভৃতি**। রেশম হিসাবে এই জাতীয় রেশমই আভিজাত্যপূর্ণ। শিল্কের পাঞ্জাবী একটি উচ্চাঙ্গের সৌখীন পোশাক।

স্বাচ্ছন্দ্য ঃ পোশাক-পরিচ্ছদের **আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য একটা অপরিহার্য বিষয়।** পোশাক পরিধান করিয়া যদি আরামের পরিবর্তে অস্বস্তি বোধ হয় তাহা হইলে সেই পোশাককে আমরা উপযুক্ত পোশাক বলিয়া মনে করি না। আমরা অনেক রকম পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করি কিন্তু সব সময় স্বাচ্ছন্দ্য বিচার করিয়া নির্বাচন করা হয় না। পোশাকের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে প্রধানতঃ **তাপ সুপরিবাহী ও কুপরিবাহীর উপর।** শীতকালে তাপ কুপরিবাহী পোশাক অর্থাৎ পশম, রেশম প্রভৃতি তন্তুর পোশাক ব্যবহার করিতে হয়। আবার গ্রীষ্মকালে সুতী, লিনেন এই সকলই প্রশস্ত কারণ এই তন্তুগুলি তাপ সুপরিবাহী। গ্রীষ্মের সময় কৃত্রিম তন্তু অর্থাৎ **নাইলন, ডেক্রন, টেরিলিন** এগুলি ব্যবহার করা কখনই উচিত নয়। ঐ তন্তুর ভিতর **বায়ুর স্তর থাকে না,** ফলে আরও গরম মনে হয় এবং শারীরিক অস্বস্তি অনুভূত হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ, অনেক সময় এই পোশাক ব্যবহারে গরমের দিনে চর্মরোগ হয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এখানে সুতীর তন্তু দ্বারা নির্মিত পোশাক সার্বজনীন ভাবে ব্যবহৃত হয়। লিনেনও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে উপযুক্ত তন্তু। **লিনেনও উত্তাপের সুপরিচালক।** ইহার ভিতর দিয়া দেহের তাপ সহজেই বাহির হইয়া যায় এবং গরমের সময় লিনেন কাপড় সেজন্য খুব ঠাণ্ডা বোধ হয়। উত্তাপ কুপরি-বাহীর কথা ছাড়িয়া দিলেও সুতীর পোশাকের মত স্বাচ্ছন্দ্য আর কোনও তন্তু সৃষ্টি করিতে পারে না। একটি সুতীর কাপড় পরিধান করিয়া যে-কোনও কাজ আমরা স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সম্পন্ন করিতে পারি কিন্তু রেশম, পশম, নাইলন, টেরিলিন এমনকি লিনেন-এর কোন তন্তুই পোশাকের আঁট-সাট সৃষ্টি করিয়া সুবিন্যস্ত ভাবে কাজ সম্পন্ন করার সহায়ক হয় না। **ভারী পোশাক অপেক্ষা হাল্কা পোশাক সর্বতোভাবে আরামপ্রদ।** লিনেন তন্তু উদ্ভিদ্ জাত হইলেও সুতী অপেক্ষা অনেক ভারী। কৃত্রিম রেশম তাপের সুপরিবাহক এবং গায়ে দিলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়। সেই জন্য ইহা গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক। ইহাদের তাপ-সঞ্চয়ের কোনও ক্ষমতা নাই। ইহা ধীরে ধীরে জল শোষণ করে, সেই জন্য সামান্য বর্ষার জলে এই তন্তু আমাদের ভিজাইতে পারে না।

সহজধৌতি ঃ সহজে ধোয়া-কাচা না করিতে পারিলে সেই তন্তু দ্বারানির্মিত পোশাক কখনই স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে পারে না। **গ্রীষ্মপ্রান দেশে বস্ত্রাদি বেশি মলিন হয়।** ফলে সব সময়ই ধৌতির প্রয়োজন দেখা যায়। সুতীর তন্তু ধোয়ার কোনও অসুবিধা নাই। আমরা সর্বদা সুতীর জামা-কাপড় পরিধান করি এবং ইচ্ছামত সেগুলি ধুইয়া কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লই। তন্তুর এই সুবিধা না থাকিলে উহা

গ্রহণের পক্ষে অসুবিধাজনক। শীতপ্রধান দেশে ময়লা কম হয়, তাই উহারা আমাদের মত দৈনিক বস্ত্র ধৌত করার প্রয়োজন মনে করে না—তাই উহাদের **রেশম ও পশম নির্মিত পোশাক ব্যবহারে কোনও সমস্যা দেখা যায় না।** রেশম ও পশমে সূতীর মত ময়লা গভীর ভাবে বসে না, সেই জন্য ঐ পোশাক অতি সহজেই ময়লা হইতে পারে না। **সূতা বা লিনেনের মত রেশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই।** সেই জন্য ঐ কাপড় অত্যধিক রগড়ানো একেবারেই নিষিদ্ধ। রেশম বস্ত্র সূতী বস্ত্রের মত সহজ ভাবে পরিষ্কার করা যায় না, অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক এই কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। প্রাণীজ তন্তু বলিয়া পশমেরও প্রতিরোধ-ক্ষমতা নাই। ধুইবার দোষে অনেক সময় পশমের কাপড় কুচকাইয়া ছোট হইয়া যায়। নাইলন তন্তু ধোয়ার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। **ইহা দ্রুত শুকায় এবং ইস্ত্রি করারও প্রয়োজন হয় না।** সেইজন্য নাইলনের ব্যবহার আজকাল ব্যাপক ভাবেই দেখা যায়। **নাইলনের কাপড় রৌদ্রে নষ্ট হয় বলিয়া ইহা ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হয়।** নাইলনের মত টেরিলিনও ধুইবার পক্ষে সহজসাধ্য।

সূতীর মত লিনেনের পোশাকও অতি সহজেই ধোওয়া, কাচা করা যায়। অতিরিক্ত রগড়ানো, ক্ষার পদার্থের প্রয়োগ এই তন্তুকে নষ্ট করিতে পারে না। ধুইবার পরও লিনেন কাপড় কুচকাইয়া যায় না। সকল দিক আলোচনা করিয়া দেখা গেল সূতি, লিনেন ও কৃত্রিম রেশমের ভিতর নাইলন ও টেরিলিন সহজ ধৌতির পক্ষে উপযুক্ত তন্তু।

স্থায়িত্ব ঃ কাপড়ের স্থায়িত্ব সাধারণতঃ কাপড় যে তন্তুতে প্রস্তুত হয় তাহার উপরই নির্ভর করে। নূতন তন্তু দ্বারা প্রস্তুত কাপড় অধিক টেকসই হয়। আবার কিছু কিছু কাপড়ের **বুনটের উপরেও উহার স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে।** পুরানো সূতা, অথবা ভেজাল দেওয়া সূতার তন্তু সহজেই ছিড়ে। **রেশম ও পশম খুব টেকসই** হয় কিন্তু অনেক সময় উহাদের তন্তুর দোষে তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া যায়। অত্যধিক ঠাঁস বুনটের কাপড় আবার অনেক সময় ভাঁজের মুখে কাটিয়া যায়, সেই কারণে কম টেকসই হয়। সাধারণ **কৃত্রিম রেশম অত্যন্ত শক্ত,** কিন্তু অতিরিক্ত উত্তাপ, গরম জল, গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে কৃত্রিম রেশম সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। যত্ন সহকারে ব্যবহার করিলে ইহা অনেকদিন টেকসই হয়। নাইলন প্রভৃতি কৃত্রিম রেশম প্রকৃত রেশম অপেক্ষা দ্বিগুণ মজবুত। মথ বা কোন প্রকার পোকা নাইলন কাটিতে পারে না।

রেশম, পশম, নাইলন দেখিতে যতই সুন্দর হউক সর্বসাধারণের পরিধানের যোগ্য

নহে। আমাদের দরিদ্র ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বস্ত্রাদি ব্যবহারের প্রধান তন্তুই হইল স্থতী। অতএব স্থতী অন্যান্য তন্তু অপেক্ষা টেকসই কম হইলেও স্থতীর তন্তু দ্বারাই সাধারণতঃ আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী হয়। তন্তুর শক্তি বাড়াইবার জন্য স্থতীর কাপড় মার্সারাইজ করা হইয়া থাকে। মার্সার নামে এক বৈজ্ঞানিক স্থতা ও কাপড়ের উপর এক বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন ; তাঁহার নামানুসারে ইহাকে মার্সারাইজেশন এবং ঐ কাপড়কে মার্সারাইজড্ কাপড় বলা হয়। **লিনেন মসিনা গাছের আঁশ হইতে তৈরী। ইহা স্থতী অপেক্ষা অনেক বেশী টেকসই।** কাজেই পোশাক-পরিচ্ছদের তন্তু হিসাবে লিনেন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পরিধানের সহজসাধ্যতা ঃ অনেক সময় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানকারীর আড়ষ্টভাব সৃষ্টি করে। পোশাক প্রস্তুতির ত্রুটির জন্য সাধারণতঃ এই আড়ষ্টতা দেখা যায়। উপযুক্ত তন্তু যথাযথভাবে নির্বাচন করিতে না পারিলে পরিচ্ছদ পরিধানের সহজসাধ্যতা নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় বহু মূল্যবান তন্তুর দ্বারা তৈরী পোশাকও সহজে পরিধান করার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। বিবাহ-অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ বেনারসী শাড়ী পরিধান করিয়া মেয়েরা তাহাদের বেশ বিন্যাসের পরিকল্পনাটি সার্থক করিয়া তোলে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা দ্বারা উহাদের পরিচ্ছদ পরিধানের সহজসাধ্যতা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে আবার সেই স্থতীর মিহি শাড়ীখানা পরিধান করিয়া সহজ ভাব ফিরাইয়া আনে। রেশমের নমনীয়তার জন্য উহা অবশ্য ব্যবহারের পক্ষে সহজ, কিন্তু বেনারসী শাড়ী রেশমতন্তু দ্বারা নির্মিত হইয়াও জরী দ্বারা ভারাক্রান্ত বলিয়া উহা ব্যবহারের পক্ষে সহজভাব নষ্ট করিয়া দেয়। নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতি পরিধানের পক্ষে অত্যন্ত স্থবিধাজনক। কোনও রকম নূতন ভাজ বা কুচকানো দেখা যায় না। ইহা ধুইবার পক্ষে এতো সহজ যে ব্যবহারের পর সব সময়ই অতি সহজেই ধোয়া কাঁচা যায়। কোনও রকম কলপ দিবার বা ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না। এই সমস্ত গুণ থাকার জন্য বর্তমানে নাইলন ও টেরিলিন পরিচ্ছদ জগতে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ছাড়া টেরিলিনের সহিত স্থতার সংমিশ্রণে টেরিকটের পোশাক আজকাল ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

পশম বার বার ধুইলে বা **ধোয়ার দোষে ইহা কুচকাইয়া যায়**—এ অবস্থায় পশমের জামা পরিধান করা বেশ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া পশম খাঁজকাটা থাকে বলিয়া উহার আঁশগুলি পরিধানের সময় অস্থবিধার সৃষ্টি করে। যেখানে শীতের প্রকোপ কম সেই সমস্ত অঞ্চলে পশম-মিশ্রিত স্থতার ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। ইহাকে **'কটনউল' বলা হয়।** এই তন্তু খাঁটি পশম অপেক্ষা অনেক আরামদায়ক ;

তাহা ছাড়া সহজেই খোলা যায় এবং পরিধান করাও সহজসাধ্য হয়। খাটি পশম পরিধান করা এক বিরক্তিকর অবস্থা।

সূতী অপেক্ষা লিনেন পরিধানের পক্ষে অতিকতর সুবিধাজনক। ইহা সূতী অপেক্ষা কোমল ও মোলায়েম। সাধারণ সূতী হইতে নানাবিধ তন্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উহাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। যেমন—**ক্যাম্ব্রিক, পপলিন, ভেলভেট, ক্যালিকো, আদ্দি, মলমল প্রভৃতি।** এই সকল বিভিন্ন প্রকার সূতীর তন্তু প্রত্যেকটিই ব্যবহারের পক্ষে সহজসাধ্য। এই সকল তন্তু **ফ্রক, সার্ট, পাঞ্জাবী ও ব্লাউজ তৈরীর পক্ষে উপযোগী।** হাতে-কাটা সূতা দিয়া খদ্দর তৈরী হয়। এই সূতাগুলি কোথাও কোথাও মোটা আবার কোথাও কোথাও সরু, এই কারণে খদ্দর মোটা হয় এবং তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায়; মোটা ও ভারী বলিয়া সহজভাবে পরিধান করা যায় না এবং ধৌত করার সময় নিঙ্গরানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুরাতন বস্ত্রের সংস্কার ও নবরূপদান

কোনও নূতন জিনিসই চিরদিন নূতন থাকে না। ব্যবহারের পর নানাভাবে উহা ক্ষয় হইয়া যায়। জামা-কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ এইরূপ সদা সর্বদাই পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। এই দুর্মূল্যের বাজারে নূতন একটা ক্রয় করিবার পরিবর্তে **যদি পুরাতন ছেঁড়াটাই সংস্কার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আবার কিছুদিন সেই পোশাকটি ব্যবহারের যোগ্য হইয়া উঠে।** জামা-কাপড় নানা কারণে ছিঁড়িয়া যায়। পুরাতন বস্ত্র একটু টান লাগিলে বা ঘষা পড়িলে ছিঁড়িয়া যায়। অনেক সময় অসাবধানতা বশতঃ ধুতি ও শাড়ী কোনও কিছুতে খোঁচা লাগিলে ছিঁড়িয়া যায়, আবার বসিবার স্থানটিতে অর্থাৎ চেয়ার, বেঞ্চি অথবা চৌকিতে অসমান ভাবে পেরেক উঁচু হইয়া থাকিলে তাহা দ্বারাও কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া শুকাইতে দেওয়া **অবস্থায় গরুবাছুরে কাপড় কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। আগুনে পুড়িয়া কাপড়ের কিছুটা অংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়; রাসায়নিক কোনও পদার্থের প্রয়োগ ঘটিলে ফুটা ফুটা হইয়া বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়**—এইরূপে নানা কারণে কাপড় জীর্ণ হইয়া যায়।

নানা কারণে পোশাক ছিঁড়িয়া যায়

ছেঁড়ার রকম অনুযায়ী কাপড়ের সংস্কার-রীতি পৃথক। একই প্রণালীতে সংস্কার সাধন সম্ভব হয় না।

অসাবধানতা বশতঃ কাপড়ে খোঁচা লাগিলে বা পোকায় কাটিলে রিফু করিয়া উহা সংস্কার করিতে হয়। কাপড়ের সুতা অনুযায়ী ঠিক ঐ রকমের সুতা লইয়া ছেঁড়া অংশটিতে সূচের সাহায্যে টানা পোড়েনে সুতার টানা দিতে হয়। ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ। ইহার জন্য খুব সরু সূচ ও সরু সুতা ব্যবহার করিতে হয়। অবশ্য পোশাকটি যদি শাড়ী বা ধুতি না হইয়া মোটা কোনও পরিচ্ছদ হয় তবে মোটা সুতাতেও চলে। রঙীন পোশাক হইলে সুতার রংও সেই রং-এর হইবে। অভিজ্ঞ সীবন-শিল্পী শাড়ী বা ধুতি রিফু করিতে হইলে উহার আঁচল হইতে সুতা তুলিয়া সেই সুতার সাহায্যে রিফু করিয়া লয়। পাকা হাতের এই সংস্কার দেখিলে কাপড়ের যে কোন জায়গায় পূর্বে ছেঁড়া ছিল তাহা মনেই হয় না।

রিফুর প্রণালী

কাপড়ের যে ছেঁড়া জায়গাটি রিফু করিতে হইবে উহা চারিপাশ পেন্সিল দিয়া চৌকা দাগ কাটিয়া লইতে হয়। ছিন্ন অংশ হইতে বেশ কিছুটা বাড়তি জায়গা লইয়া এই দাগ চিহ্নিত করা হইবে। ইহার পর সূঁচের সাহায্যে একটি একটি করিয়া টানার সুতা তুলিতে হইবে। টানার সুতার ভরাটের কাজ শেষ হইলে ঐ পদ্ধতিতে পোড়েনের সুতা তুলিতে হইবে। একটি একটি করিয়া টানা পোড়েনে সুতা ভর্তি করাতে কাপড়ের জমিনের সঙ্গে উহা মিশিয়া যায়। পাকা হাত না হইলে কাপড়ের জমিনের সঙ্গে মিশিবে না। এই কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে মনোনিবেশ ও ধৈর্যশীলতার একান্ত প্রয়োজন।

যে সমস্ত ছেড়া ইংরাজীর L এবং I আকৃতির হয় সেগুলি রিফু করার নিয়ম একটু স্বতন্ত্র। প্রথমে ছেঁড়ার দুইটি মুখ একসঙ্গে করিয়া তারপর সুতার টানা দিয়া ভরাট করিতে হইবে। L আকৃতির ছেড়া রিফু করার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে সূঁচ ঘুরাইবার সময় কাপড় কুচকাইয়া না যায়। রিফু করার সময় যাহাতে কাপড় কুচকাইয়া না যায় সেজন্য কাঠের গোলাকার ফ্রেম ব্যবহার করিতে হয়। ফ্রেমের অভাবে ধুতি বা শাড়ী রিফু করিবার সময় কাপড়ের ছেঁড়া অংশটি টান টান করিয়া একটি বাটির উপর রাখিয়া নীচ পর্যন্ত কাপড় জড় করিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়—ইহাতে ফ্রেমের কাজ হয়, কাপড় কুচকাইতে পারে না।

এলোমেলো ভাবে বড় রকমের ছেঁড়া কখনও রিফু করিয়া সেলাই সম্ভব হয় না; সেক্ষেত্রে তালির প্রয়োজন হয়। রিফু অপেক্ষা তালির প্রক্রিয়াটি সহজ। ছেঁড়া

পোশাকের উপর অপর একটি টুকরা কাপড় পাতিয়া চারিধার সেলাই করিয়া লইলেই উহাকে তালি বলে। সব তালির সেলাই এক নয়।

তালি দিতে হইলে পোশাকের রং অনুযায়ী সুতা ও কাপড়ের টুকরাটি লইতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে পোশাকের বড় একটি অংশ ছিঁড়িয়া গেলে, পুড়িয়া গেলে বা কোনও জন্তু-জানোয়ার কামড়াইয়া ফেলিলে তালির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রকারের পোশাক ও মশারীর তালি দিবার প্রয়োজন হয়। তবে তালি সহজেই ধরা যায় সেইজন্য শাড়ী বা ধুতি ছাড়া তালি দিতে গেলে পোশাকটি বাইরে পরিধান করার অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

তালির প্রক্রিয়া ঃ পোশাকের যে অংশ ছেঁড়া উহার পরিমাপ চৌকোনা করিয়া কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইতে হয় ; এইবার ঐ কাটা অংশটি হইতে সামান্য বড় একটি কাপড়ের টুকরা সমান ভাবে পাতিয়া চারিধার মুড়িয়া একটি টাক সেলাই দিয়া যাইতে হইবে। কাপড় যাহাতে সরিয়া না যায় সেইজন্য এই টাকের ব্যবহার। এক্ষণে এই মুড়িয়া দেওয়া কাপড়ের চারিদিক হেম সেলাই দিয়া যাইতে হয়।

তালি দিবার নিয়ম

পোশাকটির বিপরীত দিকে কাপড়ের যে অংশ চৌকা করিয়া কাটা হইয়াছে এইবারে উহার চারিপাশ মুড়িয়া এখানেও একটা টাক সেলাই দিতে হইবে। তাহার পর হেম-সেলাই দিয়া তালি শেষ করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তালির প্রত্যেকটি হেম যেন সমান দূরত্বের ছোট ছোট সেলাই হয়। যে টুকরার সাহায্যে তালি দেওয়া হইবে উহা যতদূর সম্ভব আসল পোশাকটির কাপড়ের রং ও জমিন অনুযায়ী হওয়া চাই। ছোট মেয়েদের কোনও জামা ছিঁড়িয়া গেলে তালির স্থলে অ্যাপ্লিকের কাজ করা যায়।

তালি ও রিফু ছাড়া আরও কয়েক প্রকার প্রক্রিয়ায় পোশাক-পরিচ্ছদ সংস্কার করা যায়। অনেক সময় ভাল ভাল ফ্রক, সার্ট, প্যান্ট প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ ছিঁড়িবার বা নষ্ট হইবার আগেই ছোট হইয়া যায়, এক্ষেত্রে পোশাকের নীচের ভাজ চওড়া থাকিলে তাহা খুলিয়া পুনরায় সেলাই করিলে পোশাকটি অপেক্ষাকৃত বড় হইবে। ফ্রকের পাশের সেলাই খুলিয়া দিয়া সামান্য কাপড় জোড়া দিয়া পাশ বাড়ানো যায়। নিপুণ হস্তে এই সংস্কারগুলি সাধিত হইলে পোশাক-পরিচ্ছদ পুনরায় ব্যবহার করা যায়। সার্টের সাধারণতঃ কলার আগে ছেঁড়ে। কলার ছিঁড়িলে কলারটির সেলাই খুলিয়া কলারটি ফিরাইয়া উল্টাদিকে লাগাইলে ছেঁড়া দেখা যায় না। আবার অনেকে নূতন একটি কলার লাগাইবার ব্যবস্থা করে। ফুল সার্ট কাটিয়া অনেক সময় হাফ সার্ট

তৈরী করিতে পারে, পুরাতন ফুল প্যাণ্ট কাটিয়া ছোট হাফ প্যাণ্ট তৈরী করা যাইতে পারে। গৃহকর্ত্রী এইভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয়-বহুলতা অনেক কমাইয়া দিতে পারেন।

পশমের জামার সংস্কার প্রক্রিয়া: কোনও পশমের অর্থাৎ গরম সার্ট বা পাঞ্জাবী, ফ্রক প্রভৃতি তালি দিতে গেলে সুতীর বস্ত্রের প্রণালী অবলম্বন করিলে চলিবে না। গরম কাপড়ে তালির টুকরা অংশটি মূল পোশাকটিতে পাতিয়া হেম সেলাইর পরিবর্তে দুইটি কাপড়ের অংশের মাঝখানটাতে চারিদিক ঘুরাইয়া কেদার স্টীচ্ দিতে হয়। ইহাতে তালির কাপড়টি মুড়িতে হয় না। পশমের সোয়েটার, কার্ডিগান, ব্লাউজ, জ্যাকেট প্রভৃতির অনেকটা জায়গার বুনন খুলিয়া গেলে অনেক সময় বড় রকমের গর্ত দেখা যায়। এইভাবে গর্ত হওয়া মানে কিছু অংশের ঘর খুলিয়া যাওয়া ; ইহা সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার সাধন না করিলে ঘর খুলিতে খুলিতে ক্রমশঃ বড় আকারের অনেকটা জায়গা ফাঁকা হইয়া যায়। এরূপ হওয়ার পূর্বেই প্রথম অবস্থায় কুরুশের সাহায্যে ঠিক ঐ রং-এর উল দিয়া ঘর বুনিয়া জায়গাটা ভরাট করিয়া দিতে হইবে। কখনও কখনও ইহা উলের কাটার সাহায্যে ঐ সংস্কার করা যায়।

পশমের জামা সহজে নষ্ট হয় না বা ছেঁড়ে না। সেইজন্য ইহা অনেক সময় ছোট হইয়া যায়। পরিবারে পরবর্তী ছোট ছেলেমেয়ে না থাকিলে ঐ সকল পোশাক অব্যবহার্য হিসাবে ফেলিয়া রাখারও কোনও যুক্তি নাই। সেই কারণে এইগুলি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাড়াইবার প্রণালী অনুসরণ করিতে হয়। উলের জামার কোনও পাশ ছোট হইয়া গেলে, পাশের জোড়া সেলাই খুলিয়া দুই পাশের অংশ হইতেই ঘর তুলিয়া প্রয়োজন মত কিছু অংশ বাড়াইয়া যাইতে হয়। তারপর আবার জুড়িয়া দিলেই পাশ বাড়িয়া যায়। ফুল হাতা হইলে, হাতার পাশও এইভাবে বাড়াইয়া পুনরায় জুড়িতে হয়। লম্বায় বাড়াইতে হইলে কাঁধ খুলিয়া বা নীচের অংশের দিকে উভয় দিক থেকেই কিছুবাড়ানো যায়। সর্বাপেক্ষা ভাল উপায় হইল, সম্পূর্ণ পোশাকটির পশম খুলিয়া ফেলিয়া কয়েকটি লাচি তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে, এইবার লাচি-গুলি রিঠার জলে ধুইয়া, ছায়ায় টানা দিয়া শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে বা অল্প ভিজা থাকিতে থাকিতে উহা গরম জলে ভাঁপাইয়া নিতে হয়। ধোয়া এবং ভাঁপানো পশম হুবহু নতুন পশমের মত মনে হয়। রং-এর চাকচিক্যে ইহা পুরাতন পশম বলিয়া ধরা যায় না।

পশম ভাঁপাইবার প্রণালী: উনানের উপর একটি বড় হাঁড়ি চাপাইয়া উহাতে জল ফুটাইতে হইবে। ঐ হাঁড়ির উপর একখানি বাঁশের ফাঁকা ফাঁকা ঝুড়ি

অথবা আটা-চালুনী রাখা হইবে, এবং ঐ ঝুড়ি বা চালুনীর উপর পশমের লাচিগুলি রাখিতে হইবে ; মাঝে মাঝে উপর নীচ করিয়া লাচিগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, জল বাষ্প হইয়া চালুনীর ছিদ্রপথ দিয়া বাষ্পের ধোঁয়া বাহির হইতেছে, ঐ বাষ্প পশমের গায় লাগিয়া পশম নতুনের মত ফুলিয়া উঠিতেছে। এইভাবে ভাঁপানো হইয়া গেলে পুনরায় উলের লাচি ছায়ায় শুকাইতে হইবে। এই পশমের সহিত নূতন পশম যোগ করিয়া একটি উপযুক্ত মাপের ভাল পোশাক তৈরী হইতে পারে। গৃহকর্ত্রীর পরিশ্রম ও কলাকৌশল প্রয়োগ দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ অনেকাংশে কমানো যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবার ও তন্তু পরিচয়

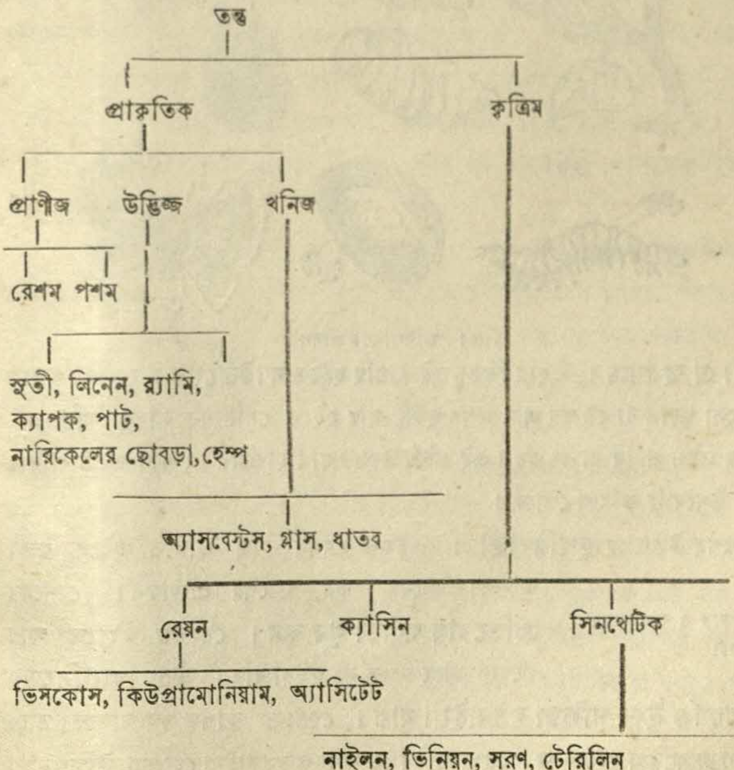
প্রথম পরিচ্ছেদ

সভ্যজগতে পোশাক-পরিচ্ছদ একটি অপরিহার্য বস্তু। বিভিন্ন প্রকার তন্তু দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদ নির্মিত হয়। আধুনিক যুগে নানা রকমের তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন তন্তু সম্বন্ধে যদি কিছু পরিচয় লাভ করা যায় তাহা হইলে গৃহিণী সুবিবেচনার সহিত পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করিতে পারিবে। বয়নতন্তুর গুণগুলি জানা না থাকিলে গৃহকর্ত্রী উহার ধৌত-প্রণালীও সঠিক ভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। সাধারণতঃ আমরা **সুতি, পশম ও রেশম তন্তু** ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া অনেক **কৃত্রিম তন্তুর কাপড় পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। প্রত্যেক তন্তুরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে।** তন্তুর পার্থক্যের জন্য কাপড়ও পার্থক্য হয়। যে কোনও বস্ত্রের নমুনা দেখিয়াই উহার তন্তুর প্রকৃতি সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক সুগৃহিণীর বয়ন তন্তু সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক।

বিভিন্ন বয়ন তন্তু ও কৃত্রিম তন্তু

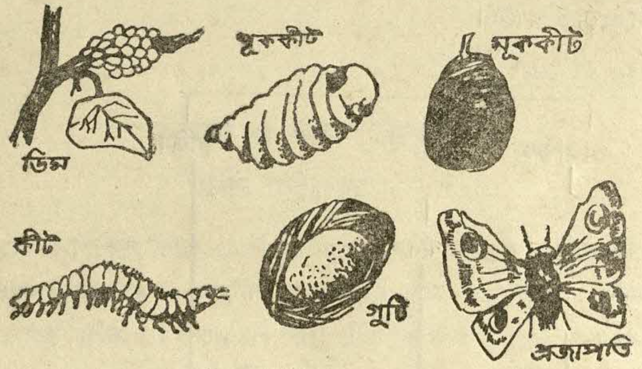
তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ইহার একটি শ্রেণীবিভাগ করিয়া লওয়া দরকার। বিভিন্ন প্রকারের তন্তুকে প্রথমে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি, যেমন

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক তন্তুগুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—**প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ।** **রেশম ও পশমকে** আমরা প্রাণীজ তন্তু বলিব কারণ এই সকল তন্তু প্রাণীজগৎ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ গাছপালার আঁশ হইতে **সুতী, লিনেন, র‍্যামি, ক্যাপক, পাট, নারিকেলের ছোবড়া, হেম্প** প্রভৃতি তন্তু প্রস্তুত হইয়াছে। খনিজ তন্তু হইতে পোশাক-পরিচ্ছদ খুব কমই তৈরী হয়। **অ্যাসবেস্টস্, গ্লাস, ধাতব** প্রভৃতি তন্তুকে ধাতব তন্তু বলা হয়। কৃত্রিম তন্তু বলিতে পূর্বে কেবলমাত্র রেয়ন তন্তুই ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে অনেক কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে নানা উপকরণের সাহায্যে এই তন্তু তৈয়ারী করিয়াছে বলিয়া এই সকল তন্তুকে কৃত্রিম তন্তু বলা হয়। ইহাদের ভিতর ভিসকোস, কিউপ্রামোনিয়াম, অ্যাসিটেট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রেয়ন, ক্যাসিন এবং অন্যান্য সিনথেটিক তন্তু যেমন নাইলন, ভেনিয়ন, সরণ, টেরিলিন প্রভৃতি প্রধান।



প্রাণিজ-তন্তু : প্রাণীদেহের বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা যে সকল তন্তু তৈরী হয় তাহাদিগকে প্রাণিজ তন্তু বলা হয়। প্রাণিজ তন্তু বলিতে আমরা রেশম ও পশম তন্তুকেই বুঝি।

রেশম : রেশম তৈরী হয় গুটিপোকা থেকে। প্রাণিজ-তন্তু বলিয়া ইহার রাসায়নিক উপাদান প্রোটিনেরই মত অর্থাৎ **কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন**। রেশম উৎপাদনকারী এই সকল গুটিপোকা তুঁত, ভেরেণ্ডা, কুল প্রভৃতি গাছে বাসা বাঁধে বলিয়া গুটিপোকার চাষের জন্য এই সকল গাছে গুটিপোকা লালন-পালন করা হয়। একপ্রকার **প্রজাপতি** এই সকল গাছের পাতায় সাবুদানার মত ডিম পাড়ে। ঐ ডিম হইতে শুঁয়াপোকা বাহির হয়। এই পোকাগুলি নিজেদের দেহের গায়ে এক তন্তুর আবরণ সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকিয়া উহারা মূক কীট (কোকুন) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পোকাগুলির মাথায় ৪টি রস-



চিত্র: গুটিপোকার জীবন

স্রাবী গ্রন্থি আছে। ইহার ভিতর দুইটি গ্রন্থি হইতে **ফাইব্রয়েন** নামে একপ্রকার আঁঠালো পদার্থ বাহির হয় এবং অপর দুইটি গ্রন্থি হইতে সেরিসিন নামক আর এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হয়। এই দুইটি তরল পদার্থ হাওয়ার সংস্পর্শে জমাট বাধিয়া তন্তুর উপযোগী করিয়া তোলে।

রেশম উত্তাপের **কুপরিবাহী**। এইজন্য রেশম ইস্ত্রি করিতে হইলে সুতী অপেক্ষা অনেক কম তাপের প্রয়োজন। রেশমের

রেশমে ক্ষার ও অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া

প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম। সেইজন্য ইহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিলে তন্তু নষ্ট হইয়া যায়। **উগ্র অ্যাসিডের সংস্পর্শেও ইহা গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়**। রেশমের কাপড় খুব আলতো ভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ধুইতে হয়। রেশমের কাপড় কখনও রগড়াইয়া ধোওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন প্রকারের রেশম ঃ গুটিপোকা হইতে রেশম-তন্তু তৈরী হয়। গাছে থাকাকালীন অবস্থায় ঐ গুটিগুলির ভিতর প্রজাপতি থাকে। রেশমের সুতা পাইতে হইলে গুটিগুলি গরম জলে ফেলিতে হয়—ইহাতে প্রজাপতি মরিয়া যায়। ইহার পর ঐ গুটিপোকার আঁশ স্তা তৈরীর উপযোগী করিয়া কাপড় বোনা হয়। বিভিন্ন দেশের গুটিপোকা বিভিন্ন গাছের ফল খায়, এই জন্য এক এক দেশের রেশম এক এক প্রকারের হইয়া থাকে। আমাদের ভারতীয় রেশমের ভিতর **গরদ, তসর, মটকা, এণ্ডি, মুগা** এইগুলিই উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যের দিক থেকে ছাড়িয়া দিলেও ইহা টেকসইও খুব। সৌখীন পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও আমাদের দেশের সাধারণ লোকে ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। অত্যন্ত মূল্যবান তন্তু বলিয়া ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

পশম ঃ ভেড়ার লোম হইতে সাধারণতঃ পশম তৈরী হইয়া থাকে। উট এবং অন্যান্য পশুর লোম হইতেও পশম প্রস্তুত হয় কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। এমনকি নিহত ভেড়ার লোমেও উচ্চ শ্রেণীর পশম তৈরী হয় না। পশমের প্রধান উপাদান কেরাটিন। ইহা এক প্রকারের প্রোটিন। পশমের রাসায়নিক উপাদান এইরূপ—কার্বন ৫০%, অক্সিজেন ২৬%, হাইড্রোজেন ৭%, নাইট্রোজন ১৫%, সালফার ২%। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া **কিছু তৈলাক্ত পদার্থও পশমের ভিতর রহিয়াছে।**

রেশমের মত পশমও তাপের **কু-পরিবাহী**। পশম-তন্তু রেশমের মত উজ্জ্বল ও মসৃণ হয় না। পশমের গায়ে খাঁজ-কাটা আছে এবং উহার উপর মাছের আঁশের মত এক প্রকার পদার্থ থাকে। তাপের সংস্পর্শে পশম সংকুচিত হয় তখন তন্তুর গায়ে যে মাছের আঁশের মত থাকে তাহা পরস্পর জড়াইয়া যায়। **এই আবদ্ধ ভাবে জমাট বাঁধাকে ফেল্টিং বলে।** পশমের এই ফেল্টিং গুণ আছে বলিয়া পশম পরিধান করিলে গরম অনুভব করা যায়। রেশমের মত **পশমেও ক্ষার প্রয়োগ চলে না।** লঘু অ্যাসিড প্রয়োগে পশমের বিশেষ ক্ষতি হয় না। **ক্ষার প্রয়োগে ইহা কুচকাইয়া যায় ও খসখসে হয় এবং উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়।** প্রাণিজ-তন্তু হিসাবে চামড়া, ফার, সার্জ প্রভৃতি তন্তুও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে রেশমের মত পশম তন্তু দ্বারা নির্মিত পোশাক-পরিচ্ছদেরও অত্যাধিক মূল্য। নিম্ন বিত্তসম্পন্ন লোকেরা এই পোশাক ব্যবহার করিতে পারে না। সেইজন্য শীতের সময় উহারা খদ্দর, বা সুতী মিশ্রিত পশম, মোটা সুতী প্রভৃতি পোশাক ব্যবহার করিয়া শীত নিবারণ করে।

উদ্ভিজ্জ-তন্তু ঃ উদ্ভিদ হইতে যে সমস্ত তন্তু পাওয়া যায়, উহারাই উদ্ভিজ্জ তন্তু।

উদ্ভিজ্জ-তন্তুর ভিতর সুতাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের সমস্ত শ্রেণীর ভিতর ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

সুতী ঃ কার্পাস গাছের ফল হইতে সুতা তৈরী হয়। তুলা ফল পাকিলে উহা ফাটিয়া তুলা বাহির হইয়া পড়ে। এই তুলা সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ, এই জন্য তুলার রাসায়নিক পদার্থ হইতেছে **কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন**। তুলার আঁশ শক্ত; ভিজাইয়া রাখিলে বা রগড়াইলে কোনও ক্ষতি হয় না। এমনকি ক্ষার প্রয়োগেও ইহার কোনও ক্ষতি হয় না। তবে অ্যাসিড প্রয়োগে সুতা ক্ষয় হইয়া ফুটা হইয়া যায়। অতিরিক্ত ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারেও সুতার তন্তু নষ্ট হইয়া যায়। সুতা উত্তাপ সুপরিবাহক। সেই জন্য ইহা ইস্ত্রি করিতে গেলে ইস্ত্রীর তাপ বেশি হওয়া উচিত। তাপের প্রভাবে এই সুতি তন্তু নষ্ট হয় না। সেই কারণে সাবান জলে ফুটাইলে ইহার কোনও খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।


চিত্রঃ তুলাগাছ

সুতার খুব সূক্ষ্ম আঁশ হইতে বিভিন্ন প্রকারের মিহি বস্ত্র তৈরী হইয়া থাকে। মলমল, ভয়েল এই সমস্ত কাপড় খুব মিহি হয়।

লিনেন ঃ ইহাও একটি উদ্ভিজ্জ-তন্তু; **মসিনা গাছের আঁশ হইতে লিনেন তন্তু প্রস্তুত হয়**। জংলা বিছুটি গাছের আঁশ হইতে একপ্রকার লিনেন তৈরী হয়। লিনেনের আঁশগুলি কতকগুলি সেলের সমষ্টি। ইহার মাঝে মাঝে একটি করিয়া গাঁট থাকে। সুতীর মত গরম দেশে লিনেন তন্তুর ব্যবহার দেখা যায়। **ইহা উত্তাপ-সুপরিচালক এবং সুতী অপেক্ষাও ইহা ঠাণ্ডা**। ইহা তাড়াতাড়ি জল শোষণ করিয়া লয়। সুতীর মত ইহা শক্ত। সুতী চকচকে হয় না, কিন্তু লিনেন তন্তু খুব চকচকে। লিনেনে ময়লা সহজে বসিতে পারে না। ইহাতে ক্ষার প্রয়োগে ক্ষতি হয় না, আবার অ্যাসিড প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সুতী অপেক্ষা অনেক বেশী। চাকচিক্য আছে বলিয়া দরিদ্র পরিবারে রেশমের অভাব লিনেন তন্তু দ্বারা পূরণ করা হয়। বাস্তবিকই লিনেন তন্তু দ্বারা তৈরী পোশাক দেখিতে খুবই সুন্দর হয়।

র‍্যামি ঃ চীনা ঘাস নামে একপ্রকার চারা গাছ হইতে র‍্যামি প্রস্তুত হয়। ইহার ডাঁটার ছাল থেকে এই তন্তু তৈরী হয়। এই আঁশগুলিও লিনেনের মত চকচকে, ইহার তন্তুগুলি অনেকটা চুলের মত। এই তন্তুর দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর টেবিল ঢাকনা তৈরী হয়।

ক্যাপক : আমরা যাহাকে সিমূল গাছ বলি, উহাই ক্যাপক। **সিমূল তুলা হইতেই ক্যাপক-তন্তু তৈরী হয়।** এই গাছের তুলা বালিশে দেওয়া হয়।

পাট : পাট ভারতের সর্বজন-পরিচিত। পাট-শিল্প পশ্চিমবঙ্গে এখন একটি প্রধান শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাট গাছের আঁশ হইতে পাট-তন্তু পাওয়া যায়। এই তন্তু হইতে নানা প্রকার দ্রব্য তৈরী হয়। ইহার ভিতর চটই প্রধান। পাট হইতে দড়িদড়া, কাছি, আসন, শতরঞ্চি, থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পাটের তন্তু হইতে সূক্ষ্ম সূতা বাহির করিয়া নানা রকম কাপড়ও তৈরী হয়। পাটের সূক্ষ্ম কাপড় বা পট্টবস্ত্রকে প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে পবিত্র মনে করা হয়। নানা প্রকারের মোটা কাপড়ও পাট হইতে তৈরী হয়।

হেম্প : ইহাকে বাংলায় শণ বলা হয়। অনেকটা পাটগাছের মতই এই গাছ। **শণ পাট অপেক্ষা শক্ত ও ভারী।** এই তন্তু দ্বারা দড়ি এবং জাহাজের পালের কাপড় তৈরী হয়। **ইহা লিনেনের মতই চকচকে ;** কিন্তু লিনেন অপেক্ষা অনেক মোটা।

নারিকেলের ছোবড়া : ইহা দ্বারা কোন প্রকার বস্ত্র তৈরী হয় না। নারিকেলের **ছোবড়ার দড়ি, পাপোষ আমাদের দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজন হয়।** খাটের জাজিমের ভিতর নারিকেলের ছোবড়া দেওয়া হয়।

খনিজ-তন্তু : খনিজ পদার্থ হইতে যে তন্তু প্রস্তুত হয় তাহাকে খনিজ-তন্তু বলা হয়। একমাত্র অ্যাসবেস্টস তন্তু দ্বারাই পোশাক তৈরী হইতে পারে। তাহা ছাড়া আর কোনও খনিজ-তন্তু পোশাকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। **অ্যাসবেস্টস তন্তু অগ্নি-নিরোধক,** সেইজন্য দমকল-বাহিনীর কর্মীরা কর্তব্যরত অবস্থায় এই তন্তুর পোশাক পরিধান করে। অ্যাসবেস্টস্ তাপ-কুপরিবাহক।

অনেক রেশম ও ব্রোকেও কাপড়ে সোনা এবং রূপার জড়ি বসানো থাকে। তাছাড়া বেনারসী শাড়ীতে জড়ির ফুল সর্বজনবিদিত। এই সোনা ও রূপা খনিজ পদার্থ।

(কৃত্রিম-তন্তু) রেয়ন : কৃত্রিম তন্তুর ভিতর রেয়নই পূর্বে আবিষ্কৃত হয়। অধুনা বিভিন্ন প্রকারের কৃত্রিম তন্তু পরিচ্ছদ জগতে লক্ষ্য করা যায়। **তুলা, কাঠ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তরল করিয়া এই তন্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে।** তুলা ও কাঠের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া উহার সেলুলোজ অংশটি রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে গলানো হয়। ধাতুনির্মিত ছাঁচের ফুটার ভিতর বিশেষ চাপের সাহায্যে ঐ গলিত পদার্থ বাহির করিলে উহা সূতার আকারে বাহির হইয়া আসে। ঐ নরম সূতা পুনরায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় শক্ত করা হয়। এই কাপড়ে সূর্যের প্রতিফলন করা যায়, এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে রেয়ন।

রেয়ন তন্তু উত্তাপ সুপরিচালক। কোনও প্রকার ক্ষার এবং অ্যাসিড প্রয়োগ ইহাতে একেবারেই চলে না।

প্লাস্টিক : এক প্রকার কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তু। ইহা দ্বারা পরিচ্ছদ তৈরী না হইলেও ছাতা, বর্ষাতি, মাথার টুপি, হুড্, টেবিলের ঢাকনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

নাইলন : নাইলনের কদর এখন সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। পরিচ্ছদ জগতে এই সিনথেটিক তন্তুটি এক নূতন যুগ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা আমেরিকায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইহার জল শোষণ করিবার ক্ষমতা খুব কম। ক্ষারের প্রয়োগে নাইলন নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য অ্যাসিড ও অল্প উত্তাপ নাইলনকে নষ্ট করিতে পারে না। **রৌদ্র নাইলনের পক্ষে খুব খারাপ**; নাইলনের কাপড় কাচিয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। নাইলন পোশাকের সুবিধা এই যে, ইহা ইস্ত্রির প্রয়োজন হয় না এবং **রেশম ও পশমের মত ইহা পোকায় কাটে না**। তবে নাইলনের সহিত পশম মিশ্রিত থাকিলে পোকায় কাটে।

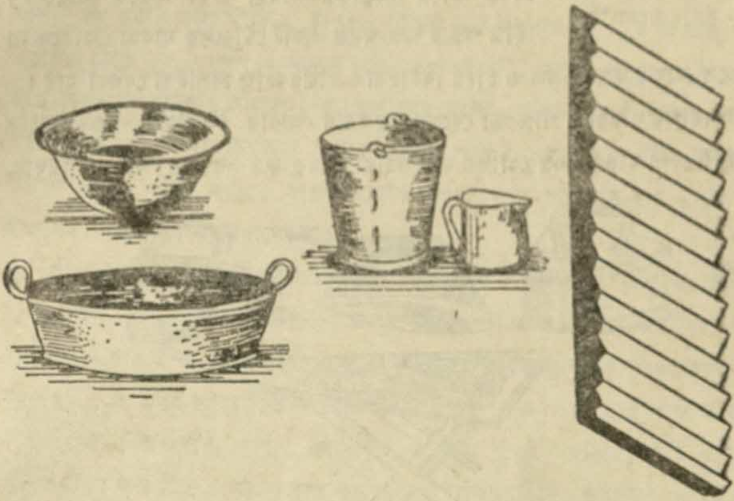
টেরিলিন : নাইলনের কয়েক বছর পর টেরিলিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপাদান তৈল জাতীয় পদার্থ। টেরিলিনের সহিত সুতীর মিশ্রণে যে তন্তু হয় উহার দ্বারা আজকাল জামা, প্যাণ্ট, সার্ট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার ধুইবার পদ্ধতিও খুব সহজ। সূর্যের কিরণ ইহাতে কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। প্রয়োজন হইলে সামান্য উত্তাপে ইস্ত্রির সাহায্যে এই পোশাক ইস্ত্রি করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

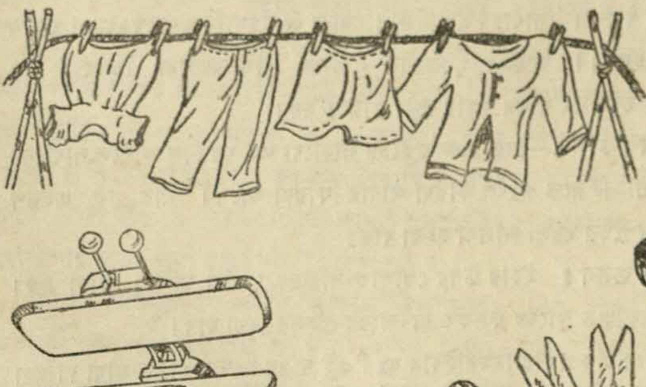
বিভিন্ন তন্তুর ধৌতি ও পারিপাট্য প্রণালী

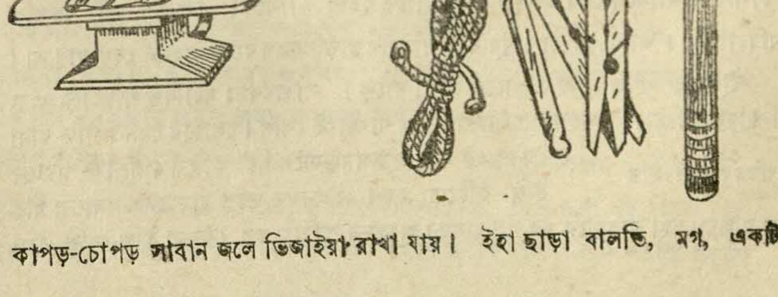
পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রধান উপায়। গৃহস্থ পরিবারে বাড়ীতেই কাপড় কাচার কাজটি সম্পন্ন করা হয়। আমরা বিভিন্ন তন্তুর পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহার ধৌত-প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। বস্ত্র ধৌতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম তন্তুর রাসায়নিক উপাদান, উহার বৈশিষ্ট্য ও প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে জানিতে হয়। এই সকল তথ্য জানা না থাকিলে বস্ত্র ধৌতির নীতি ব্যর্থ হইয়া পোশাক-পরিচ্ছদ অচিরেই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পোশাক-পরিচ্ছদের ধৌত-প্রণালী ও পারিপাট্যের উপর উহার চাকচিক্য ও স্থায়িত্বে অনেকাংশে নির্ভর করে।

বাড়ীতে কাপড় কাচিতে হইলে মোটামুটি কয়েকটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখিতে হয়।



কাপড় কাচিবার জন্য একটি বড় টব বা গামলার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এই গামলায়



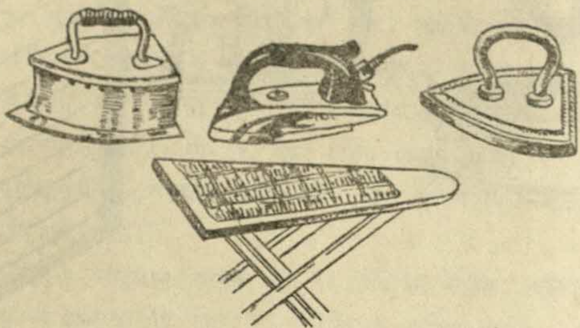


কাপড়-চোপড় সাবান জলে ভিজাইয়া রাখা যায়। ইহা ছাড়া বালতি, মগ, একটি

কাঠের তক্তা, দড়ি, লোহার তার, ক্লিপ, ইস্ত্রি, ইস্ত্রি করার জন্য একটি টেবিল, কম্বল, একটি চাদর প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। ইস্ত্রি করার জন্য স্বতন্ত্র একটি টেবিলের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে মেঝের উপর কম্বল ও চাদর বিছাইয়াও ইস্ত্রির কাজ চালাইয়া দেওয়া যায়।

কাপড় কাচার সরঞ্জামাদি

অবস্থাপন্ন পরিবারে পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে আবার বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থাও দেখা যায়। বস্ত্র ধৌতির জন্য উহারা সমকুঞ্চিত কাচের ফলক, রিঙ্গার,



ভ্যাকুয়াম কোন, বৈদ্যুতিক আলমারী, স্লিভ্‌বোর্ড, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও ম্যাঙ্গলার ব্যবহার করিয়া থাকে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ঐ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রাখা কোন রকমেই সম্ভব হয় না। অতএব গৃহকর্ত্রীর সাধারণ সাজসরঞ্জামের ভিতরেই বস্ত্র ধৌতির কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করিতে হয়।

ভ্যাকুয়াম কোন ঃ—বৈদ্যুতিক সুইচের সাহায্যে এই যন্ত্র চালু করিলে সাবানের জল কাপড়ের প্রতিটি রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আবার ফিরিয়া আসে। বার বার এইরূপ হওয়ার ফলে কাপড়ের ময়লা আলগা হইয়া যায়।

সমকুঞ্চিত তক্তা ঃ ইহার উপর পোশাক-পরিচ্ছদ থুপিয়া থুপিয়া কাঁচা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমকুঞ্চিত কাচের ফলকও ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

রিঙ্গার ঃ ইহা একপ্রকার নিঙ্গরাইবার যন্ত্র। এই যন্ত্রের ভিতর কাপড়-জামা রাখিয়া চালাইয়া আনিলে উহা জলশূন্য হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। বিদেশে এই যন্ত্রগুলি ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে খুব ধনী পরিবার ছাড়া এরূপ যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায় না।

ইস্ত্রি ঃ ইস্ত্রি নানা প্রকারের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারে এবং নিম্নবিত্ত পরিবারে লোহার গরম করা ইস্ত্রির ব্যবহারই বেশি। লোহার মোটা পাত দ্বারা তৈরী এই ইস্ত্রি কয়লার উনানে গরম করিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ ইস্ত্রি করিতে হয়। ইচ্ছামত তাপ বাড়ানো কমানো যায় না বলিয়া ইহা ব্যবহারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, কেননা ইস্ত্রি বেশি গরম

বিভিন্ন প্রকারের ইস্ত্রি

করিলে কাপড়-জামা পুড়িয়া যায়। লোহার আর এক প্রকারের ইস্ত্রি আছে, উহা একটি বন্ধ করা বাক্সের মতই। ঢাকনা খুলিয়া কাঠ কয়লার সাহায্যে ভিতরে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়, যতক্ষণ ঐ আগুন জলে ততক্ষণ ইস্ত্রি গরম থাকে। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি নিয়মমত ব্যবহার করিলে বৈদ্যুতিক খরচ অনেক বেশি হয়, এই কারণে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে এই ব্যয় সঙ্কুলান কষ্টকর হইয়া পড়ে। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে, ইহাতে কাপড়-জামায় লোহার দাগ পড়িবার ভয় থাকে না। ইচ্ছামত তাপ বাড়ানো কমানো যায়।

কাপড়-জামা ইস্ত্রি করিবার জন্য একটি বড় টেবিল থাকিলে খুব ভাল হয়, টেবিলের উপর কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর পরিষ্কার চাদর পাতিতে হয়। এইবারে ইস্ত্রির জিনিসটি উহার উপর রাখিয়া ইস্ত্রি চালাইতে হয়। মেঝেতেও এই ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু মেঝেতে উপুর হইয়া ইস্ত্রি করিলে পরিশ্রম বেশী হয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বুকে জোর বেশী লাগে, আবার মেরুদণ্ডও বাঁকিয়া যায়। পাঞ্জাবী, সার্ট প্রভৃতির হাতা ইস্ত্রির জন্য স্নিভ বোর্ড ব্যবহার করিলে পোশাকের ইস্ত্রি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ম্যাঙ্গলার নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে। মোটা পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন অলেষ্টার, কোট, ওভার কোট, মোটা র‍্যাগ, বড় বড় বেড কভার প্রভৃতি, জোরে চাপ দিয়া ইস্ত্রি করা সম্ভব নয়। ম্যাঙ্গলারের ভিতর ভাজকরা জিনিসটি রাখিয়া দিলে মেসিনের চাপে উহা সুবিন্যস্ত হয়। এই যন্ত্রটির দুইটি অংশ থাকে। প্রথম অংশটির ভিতর পোশাকটি রাখিয়া উপরের অংশটি চাপিয়া নামাইয়া দিতে হয় এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটাইয়া দিলে তাপে ও চাপে উহার ইস্ত্রি ও পারিপাট্যের কাজটি সুসম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে বড় বড় ধোতাগার ছাড়া এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না।

ম্যাঙ্গলারের সুবিধা

কাপড় কাচিবার জন্য **জলই প্রধান উপাদান**। কিন্তু সকল প্রকার জলই কাপড় কাচার পক্ষে উপযোগী হয় না। জলের ভিতর ধাতব পদার্থের অবস্থিতি অনুযায়ী জলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, **খর জল ও মৃদু জল**। যে জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না, তাহাকে খর জল বলে; এবং যে জলে সহজেই সাবানের ফেনা হয় তাহাকে মৃদু জল বলা হইয়া থাকে। জলে দ্রবীভূত **ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ এবং কখনও কখনও আয়রণ লবণ জলের খরতার কারণ হইয়া থাকে**। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট খর জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কিন্তু জলে এই ধরনের লবণ থাকার জন্য সাবানের সহিত সেই সকল লবণের বিক্রিয়ার ফলে সাবান অদ্রাব্য পদার্থে

পরিণত হয় এবং সাবানের ফেনা হয় না। এই কারণে খর জলে কাপড় কাচা সম্ভব হয় না।

খরতার শ্রেণীবিভাগ : যে জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের শুধু বাই-কার্বনেট লবণ দ্রবীভূত থাকে, তাহাকে **অস্থায়ী খর জল বলে।** যে জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা আয়রণের সালফেট বা ক্লোরাইড লবণ দ্রবীভূত থাকে, তাহাকে **স্থায়ী খর জল** বলা হয়।

জলের খরতা দূরীকরণের উপায় : জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণই খরতার জন্য দায়ী। যে কোনও উপায়ে এই সকল দ্রবণীয় লবণকে অদ্রবণীয় লবণে পরিণত করিতে পারিলেই খর জল মৃদু করা যায়।

অস্থায়ী খর জলের মৃদুকরণ :

(1) **স্ফুটনের সাহায্যে :** অস্থায়ী খর জলকে ফুটাইয়া মৃদু করা যায়। ইহাকে ফুটাইলে **ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তাপের ফলে বিশ্লিষ্ট হয় এবং অদ্রাব্য কার্বনেট লবণে পরিণত হয় ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।** ঐ দুই ধাতুর কার্বনেট জলে খুব অল্প পরিমাণে দ্রাব্য। সুতরাং ইহারা ফুটনের ফলে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

(2) **ক্লার্ক পদ্ধতি :** ক্লার্ক পদ্ধতিতে আমরা পরিমিত কলিচুণের সাহায্যে জলের স্থায়ী খরতা দূর করিতে পারি। ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট কলিচুণের সহিত বিক্রিয়া করিয়া ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও জল দেয় ; এবং ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট দেয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও জল।

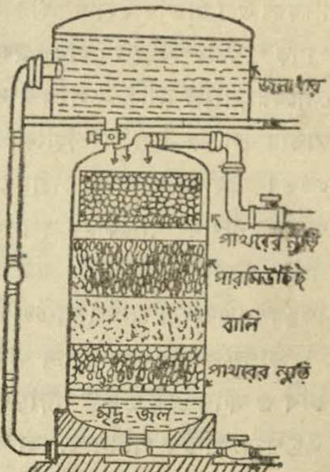
লক্ষ্য রাখিতে হইবে বেশী মাত্রায় যেন কলিচুণ দেওয়া না হয়, উহাতে খরতা দূরীভূত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইবে। কেননা কলিচুণ নিজেই একটি ক্যালসিয়াম জাত পদার্থ।

স্থায়ী খর জলের মৃদুকরণ :

স্থায়ী খর জলে দ্রবীভূত থাকে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট লবণ। অস্থায়ী খর জলের মত এই জলকে মৃদু করা যায় না। ইহার খরতা দূরীকরণে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

(ক) কাপড়-কাচা সোডার সাহায্যে (খ) জিওলাইট বা পারমিউটিট পদ্ধতি—কাপড়-কাচা সোডার দ্বারা খরতা দূর করা ব্যয়সাধ্য। বর্তমানে অল্পব্যয়ে খর জলের খরতা দূর করার উপায় বাহির করা হইয়াছে। এই উপায়কে জিওলাইট বা পারমিউটিট পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে জিওলাইট নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এই খনিজ পদার্থটি **সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম,**

সিলিকন ও অক্সিজেন ঘটিত এক প্রকার যৌগিক পদার্থ (সোডিয়াম অ্যালুমিনো সিলিকেট)। এই সকল মৌলের পরমাণুগুলি প্রচুর সংখ্যায় পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া জিওলাইটের বিরাট অণু কাঠামো গঠন করে।



খরজল মৃদুকরণ (পারমিউটিট পদ্ধতি)

খর জলকে জিওলাইট স্তরের মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হয়। উহার অণুগুলি বেশ বড় করিয়া জল দ্বারা ধৌত হইয়া নীচে নামিয়া যায় না। খর জল ইহার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবার সময় ইহাতে দ্রবীভূত লবণের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রণ পরমাণু জিওলাইটের সোডিয়ামের সহিত স্থান বিনিময় করে। এইভাবে খরতা দূর হয়।

বর্তমানে জিওলাইট অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী এবং ঐরূপ গুণসম্পন্ন পারমিউটিট নামক একপ্রকার পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হইতেছে। **ইহা কৃত্রিম সোডিয়াম অ্যালুমিনো সিলিকেট।** জিওলাইটের পরিবর্তে পারমিউটিট লইয়া খর জল ফিল্টার করিলে, উহা অতি সহজে ও অল্প ব্যয়ে মৃদু জলে পরিণত হয়।

গোলাকার এবং উচ্চ একটি ইষ্টক বা লৌহ প্রকোষ্ঠে জিওলাইট বা পারমিউটিট রাখিয়া উপর হইতে নীচের দিকে ধীরে ধীরে খর জল পরিচালনা করা হয়। জিওলাইট বা পারমিউটিট্ স্তরের উপরে ও নীচে সামান্য মোটা বালির স্তর ও নুড়ি থাকে। এই উপায়ে স্থায়ী, অস্থায়ী উভয় প্রকার খর জলই মৃদু জলে পরিণত হয়।

কাপড় কাচায় খর জলের অসুবিধা

খর জলে কাপড় কাচিতে গেলে সাবানে ফেনা হয় না, অধিকন্তু বেশী দিন খর জলে কাপড় ধুইতে ধুইতে কাপড় একপ্রকার হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এবং কাপড় তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া যায়। সাবান মাখিলে সাবানের ফেনা হয় না এবং কাপড়ও পরিষ্কার হয় না।

কাপড়-জামা ধৌত করিবার বিভিন্ন উপকরণ

পরিচ্ছদ ময়লা হওয়ার বিভিন্ন কারণ

আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রতিদিন নানা কারণে ময়লা হয়। বাহিরের ধুলা, বালি প্রভৃতি বায়ুর সহিত উড়িয়া জামা-কাপড়ের রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আটকাইয়া যায়। দেহস্থিত তৈলাক্ত ময়লা ঘামের সহিত কাপড়-জামায় লাগিয়া যায়। ইহা ছাড়া অসাবধানতা বশতঃ যেখানে সেখানে বসিবার ফলেও কাপড়-জামা মলিন হইয়া থাকে।

কাপড় পরিষ্কার করিবার প্রধান উপাদান জল হইলেও ময়লা অপসারক কোনও পরিষ্করণ দ্রব্য ব্যতীত ইহা পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। বহু প্রাচীন কালে যখন কাপড় পরিষ্কার করিবার কোনও দ্রব্য সুলভে পাওয়া যাইত না তখন পল্লীগ্রামের লোকেরা **সাজি মাটি, কলার-বাসনার ছাই, আমকাঠের ছাই প্রভৃতি** ক্ষার জাতীয় পদার্থের সাহায্যে তাহাদের মোটা-সোটা পরিধেয় সূতীর বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া লইত। ইহার পর কাপড় কাচার সোডা উহারা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। বর্তমানে সাবানই পারিষ্কারক দ্রব্য হিসাবে বেশি ব্যবহার হয়। নানা রকমের গুঁড়া সাবান বাজারে বিক্রয় হয়। সূতীর কাপড়খানি সোডা-সাবান মিশ্রিত গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া কাচিয়া দিলে খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়।

কাপড় কাচায় ভাল সাবান ব্যবহার না করিলে কাপড়ের তন্তু নষ্ট হইয়া যায়। **চর্বি ও ক্ষার এই উভয় পদার্থের সংমিশ্রণে সাবান তৈরী হয়।** সাবানের এই ক্ষার **কস্টিক পটাস অথবা কস্টিক সোডা** কাপড়ের সূতীর রন্ধ্রের ভিতরের ময়লা আলগা করার সাহায্য করে। ভাল সাবানে ক্ষারের মাত্রা বেশী থাকে না; কিন্তু অনেক সময় বাজারে সস্তা সাবান বিক্রী হয়, ঐগুলি অতিরিক্ত ক্ষার মিশ্রিত থাকে আবার অনেক সময় ফেনা হইবার জন্য রজনও মিশাইয়া থাকে। সাবানের ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য সাবানে ভেজাল হিসাবে জলও থাকে। সাবানে ক্ষারের মাত্রাধিক্য হেতু কাপড়-জামা খুব পরিষ্কার হয় বটে কিন্তু উহা সূতাকে নষ্ট করিয়া দেয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদ তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায়।

সাবানে ভেজাল

কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করিবার জন্য **বোরাক্স ও অ্যামোনিয়াও** ব্যবহার করা যায়। সোডার পরিবর্তে পশমের পোশাকে বোরাক্স ও অ্যামোনিয়া ব্যবহার করিলে উহার তন্তুর কোনও ক্ষতি হয় না। বোরাক্সের ভিতর ক্ষার পদার্থ থাকে। ইহা কাপড়ের দাগ তুলিতেও সাহায্য করে। সূতীর বস্ত্রে চা-এর দাগ লাগিলে, বোরাক্স ব্যবহারে উহা উঠিয়া যায়। বোরাক্স সোডার মত খর জলকে মৃদু করিতে সাহায্য করে।

অ্যামোনিয়া : এক প্রকার ঝাঁঝালো পদার্থ। ইহার প্রয়োগ করিলে জামা-কাপড়ের অনেক দাগ উঠিয়া যায়। তাহাছাড়া সাবানের ফেনার সহিত অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করিয়া পশম-তন্তুর ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখা যায়।

তুষের জল : বস্ত্র পরিষ্কারক হিসাবে অল্প খরচে তুষের জল একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। গমের ভূষি বা তুষ একটি ন্যাকড়ার পুটুলীতে ভিজাইয়া রাখা হয়। কয়েক ঘণ্টা ভিজিবার পর উহা ফুলিয়া ওঠে। এইবারে একটি পাত্রে জল সহ ঐ ভূষির

পুটুলীটা আগুনে ফুটাইতে হয়। জলের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করিলে নামাইয়া পুটুলী চিপিয়া আরও জল বাহির করিয়া সমগ্র জলটা ছাঁকিয়া ফেলিতে হয়। এখন ঐ ছাঁকা জলের ভিতর রঙীন কাপড় ভিজাইয়া রাখিলে উহা অনেক পরিষ্কার হইয়া যায়। সূতী বস্ত্রের কাঠিন্স সৃষ্টি করিতেও ইহা বিশেষ উপযোগী।

রিঠা: এক প্রকার বন্য ফল। পশম ও রেশম পরিষ্কারের পক্ষে ইহা অতুলনীয়। ইহা দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদ নষ্ট হয় না; রং ওঠে না এবং পশম ও রেশমের চাকচিক্য বজায় থাকে। এই ফলের বিচি ছাড়াইয়া কয়েক ঘণ্টা গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ভিজিয়া অনেকটা নরম হইলে হাত দিয়া চটকাইয়া ফেনা বাহির করিতে হয়। এইবার খোসাগুলি ফেলিয়া ফেনা-যুক্ত জল একটি গামলা বা বালতিতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই জলের ভিতর রেশম বা পশমের পোশাকটি ডুবাইয়া আলগা ভাবে নাড়াচাড়া করিতে হয়। রিঠা জলের ফেনায় পোশাকের ময়লা আলগা হইয়া আসে। এই ভাবে রিঠার সাহায্যে পশম ও রেশম বস্ত্র পরিষ্কার করা হয়। সূতীর রঙীন কাপড়ও রিঠার সাহায্যে ভাল ভাবে পরিষ্কার করা যায়।

রিঠার ব্যবহার

বস্ত্র ধৌতি ও পারিপাট্য: সাবান, সোডা প্রভৃতির সাহায্যে গরম জলের ভিতর ভিজাইয়া রাখিলে বস্ত্রের ভিতরের ময়লা আলগা হইয়া যায়। সাবান জলে ভিজানো ঐ সকল বস্ত্র সামান্য আছড়াইয়া বা খুপিয়া খুপিয়া কাচিলে ভালভাবে পরিষ্কার হইয়া যায়। বস্ত্রটি সাদা সূতীর হইলে উহাকে শুভ্র করিবার জন্য সামান্য নীলের প্রয়োজন। কেবলমাত্র নীল দিলেই কাপড় কাচার কাজ শেষ হইল না, কলপ ছাড়া কাপড়ে কোনও কাঠিন্স সৃষ্টি হয় না। কাঠিন্সের অভাবে সূতীর পোশাক ভাল ইস্ত্রি করা যায় না। ইস্ত্রি পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য বজায় রাখে। ইস্ত্রি করা সুবিন্যস্ত কাপড় না হইলে উহা বেশভূষার পক্ষে উপযোগী হয় না। অতএব কেবলমাত্র কাপড়-জামা ভাল পরিষ্কার করিলেই চলে না; উহার পারিপাট্যের জন্য উপযুক্ত নীল, কলপ ও যথাযথ ভাঁজ ও ইস্ত্রির বিশেষ প্রয়োজন।

সাদা সূতী বস্ত্র ধৌত-প্রণালী ও পারিপাট্য

পরিষ্কার একটি পাত্রে পরিমাণ মত জল লইয়া উহাতে এক আউন্স মত সাবানের গুড়া ও সামান্য সোডা ভালভাবে মিশাইতে হইবে। ময়লা কাপড়টি এক্ষণে উহাতে ডুবাইয়া **অন্তত পক্ষে আধ ঘণ্টা ফুটাইয়া লইতে হইবে।** ফুটন্ত সাবানের জল যাহাতে কাপড়ের সমস্ত জায়গায় লাগে, সেইজন্য একটা কাঠির সাহায্যে ওলোট-

পালোট করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিতে হয়। ইহাতে কাপড়খানির সমস্ত ময়লা আলগা হইয়া যায়। ইহা ছাড়া নাড়াচাড়ার অভাবে এক স্থানে সাবান জমিয়া বস্ত্রে দাগ ধরিয়া যাইতে পারে। উক্ত থাকিতে থাকিতে কাপড়খানি সমকুঞ্চিত তক্তায় অথবা কাঠের পাটায় খুপিয়া খুপিয়া কাচিতে হয়। **কাচিবার সময় গরম জলের ছিটা দিয়া কাচিতে পারিলে কাপড়খানি খুব ভাল পরিষ্কার হয়।** অতিরিক্ত ময়লা সূতীর কাপড় ইহাতে পরিষ্কার হইবে না, অধিকন্তু ময়লা সূতীর রন্ধ্রে আরও কঠিনভাবে আটকাইয়া যাইবে। উহার কারণ মানুষের দেহনিঃসৃত ঘর্মে অ্যালবুমেন থাকে। **এই অ্যালবুমেন তাপের প্রভাবে জমাট বাঁধে।** কাপড়-জামা যখন অধিক ময়লা হয় তখন এই কাপড় প্রথমেই গরম সাবান জলে সিদ্ধ না করিয়া, ঐ বস্ত্রের ভিতরের ময়লা উহাতে সাবান মাখিয়া প্রথম বারের মত কাচিয়া উহার অ্যালবুমেন মিশ্রিত ময়লা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, পরে এই কাপড় সাবান জলে ফুটাইয়া শেষ বারের মত কাচিতে হয়। এই পরিষ্কার-পদ্ধতি শেষ করার পর **কাপড়খানি অধিকতর শুভ্র করিবার জন্য নীল দিতে হয়।**

কাপড়ে নীল ও কলপ একসঙ্গে দেওয়ার রীতি বর্জন করাই ভাল। কাপড়ে নীল দেওয়ার পর কলপ ভাল ভাবে ছাঁকিয়া কাপড়টি পুনরায় উহার ভিতর দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নিঙড়াইয়া লইতে হয়। **অ্যারারুট, ময়দা, ষ্টার্চ, সাবু, ভাতের ফ্যান প্রভৃতি** অনেক জিনিসের সাহায্যেই কলপ প্রস্তুত করা যায়। গৃহকর্ত্রী তাহার আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী কলপের উপকরণ নির্বাচন করিবেন।

ইহার পর নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইবার পালা। পল্লীগ্রামে গৃহস্থেরা এবং ধোপারা বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠে কাচা কাপড় শুকাইবার জন্য মেলিয়া দেয়। কেবলমাত্র জায়গার সুবিধার জন্য নয়, এইভাবে সবুজ ঘাসে শুকাইবার ফলে সাদা কাপড় অধিকতর শুভ্র হয়। গাছের ক্লোরোফিল এবং সূর্যকিরণ—এই দুইয়ের সংস্পর্শে কাপড়ে শুভ্রীকরণের কাজ হয়। শহরে এই সুবিধা নাই বলিয়া উহারা দড়ি বা তার টাঙ্গাইয়া বস্ত্রাদি শুকাইবার ব্যবস্থা করে। ছোট ছোট পোশাক-পরিচ্ছদ যাহাতে উড়িয়া না যায় সেই জন্য উহা শুকাইবার সময় কাঠের **ক্লীপ** ব্যবহার করিতে হয়।

বস্ত্রাদি শুকাইবার পর আসে ইস্ত্রির কথা। বস্ত্রাদি সামান্য ভিজা থাকিতেও ইস্ত্রি করা যায়। আবার শুকাইয়া গেলে সমস্ত কাপড়ে জলের ছিটা দিয়া কিছুক্ষণ পাকাইয়া রাখিবার পর ইস্ত্রি করিলে খুব ভাল ইস্ত্রি হয়। ভাল কলপের উপর ভাল ইস্ত্রি নির্ভর করে। পোশাক-পরিচ্ছদের **চাকচিক্য ঔজ্জ্বল্য বা পারিপাট্য সবই ভাল ইস্ত্রির উপর নির্ভর করে।** কাপড় ও বিভিন্ন পোশাকের ভাঁজ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান

থাকা দরকার। একবার ভাঁজ করিয়া ইস্ত্রি করিয়া ফেলিলে উহা আর তখন নূতন করিয়া ভাঁজ করা যায় না, ভাঁজের দাগ থাকিয়া যায়। কতকগুলি সিনথেটিক তন্তু আছে যাহার ভাঁজ নূতন করিয়া করা যায় না। পোশাকটি তৈরী করিবার সময় যদি উহার ভুল ভাঁজ হইয়া থাকে তবে বিশেষ কোনও দোকানে দিয়া উহার ভাঁজ পরিবর্তন করিতে না পারিলে পোশাকটি একেবারেই অব্যবহার্য হইয়া পড়ে।

পোশাক-পরিপাট্যে ভাঁজের প্রভাব

রঙ্গীন সুতী বস্ত্রাদি ধৌত করার প্রণালী : রঙ্গীন কাপড় ধোয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। প্রথমতঃ, রঙ্গীন কাপড় ধুইতে হইলে বিভিন্ন রং-এর বস্ত্রাদি একসঙ্গে জলের ভিতর ডুবাইতে হয় না। উহাতে একের রং অপর আর একটি পোশাকে লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনা। **ক্ষারযুক্ত সাবান অথবা সোডা কোনটাই রঙ্গীন কাপড় ধোয়ায় ব্যবহার করিতে হয় না।** রঙ্গীন বস্ত্র সাবান জলে বেশী সময় ভিজাইয়া রাখা চলিবে না। বস্ত্রে সাবান মাখাইয়া বা ভিজাইয়া অল্প সময় পরেই কাচিয়া দিতে হয়। কাঁচা রং হইলে সাবানের সংস্পর্শে আসিবার পরেই রং উঠিতে থাকে; সেক্ষেত্রে সাবানের জলের ভিতর **এক আউন্স আন্দাজ লবণ** মিশাইয়া কাপড়খানির ভিতর মিশাইতে হয়। উহাতে রং ওঠা বন্ধ হয়। রঙ্গীন কাপড়ের চাকচিক্য বজায় রাখার জন্য ভিজানো অবস্থায় দুই চামচ **ভিনিগার** দেওয়া চলে। রঙ্গীন কাপড়ে নীল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কাপড়টির পারিপাট্যের জন্য কলপের প্রয়োজন আছে। রঙ্গীন কাপড়ে কলপ দিলে অনেক সময় ইস্ত্রির পর দেখা যায় সমস্ত কাপড়ে কলপের সাদা সাদা দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাবু আল দিলে উহার রং সাদা হয় না। সুতরাং **সাবু আল দিয়া ছাঁকিয়া নিলে ঐ কলপ রঙ্গীন সুতীর পোশাকে ব্যবহার করা যায়।** রঙ্গীন সুতীর কাপড় কখনই **রৌদ্রে শুকাতে নাই; উহাতে রং বিবর্ণ হইয়া যায়।** ছায়াযুক্ত স্থানে মেলিয়া দিয়া শুকাইবার পরেই ভাঁজ করিয়া ফেলিতে হয়। রঙ্গীন কাপড় ইস্ত্রির জন্য ইস্ত্রির তাপ খুব বেশী না হওয়াই উচিত। **উহাতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া কাপড়ের রং বিবর্ণ হইয়া যায়।** (লিনেন ধুইবার প্রণালী সুতীর মত)

রেশম বস্ত্র ধৌতি ও পারিপাট্য : রেশম প্রাণিজ-তন্তু হইতে প্রস্তুত বলিয়া সুতি ও লিনেনের মত উহার প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই। সুতরাং রেশম ধুইবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। রেশমে অত্যধিক গরম জল, **ক্ষার প্রয়োগ, অত্যধিক রগড়ানো, জোরে নিঙড়ানো প্রভৃতি কোনটাই চলে না।** রেশম কাপড় সাধারণতঃ সুতীর কাপড়ের মত আট পৌরে পোশাক হিসাবে

ব্যবহার হয় না, সুতরাং সুতীর মত ইহা বেশী ময়লা হয় না এবং ময়লাও সুতীর ন্যায় তন্তুর ভিতর গভীর ভাবে বসে না। সেই কারণে উহা সাবান জলে বেশী সময় ডুবাইয়া রাখিবার প্রয়োজনও হয় না। রেশম পরিষ্কারের জন্য ক্ষারহীন সাবান অথবা রিঠা ব্যবহার করা যায়। কুসুম কুসুম গরম জলে সাবান অথবা রিঠার জলের ফেনা তৈরী করিয়া বস্ত্রটি সতর্কতার সহিত নাড়াচাড়া করিতে হয়; লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে বেশী ঘষা না লাগে। **চাকচিক্য বাড়াইবার জন্য বস্ত্রটি শেষবারে ধুইবার সময় লবণ ও ভিনিগার মিশাইয়া লইলে ভাল হয়; ইহাতে কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকে।** বড় এক গ্লাস জলে বড় এক চামচ ভিনিগার এবং এক চামচ লবণ মিশাইয়া ঐ জলে কাপড়খানি ভিজাইয়া লইতে হয়। জল আরও বেশী দরকার হইলে **ভিনিগার ও লবণের** পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়াইতে হয়। রেশমের কাপড় কখনও নিঙড়াইতে হয় না, আলগা ভাবে চাপ দিয়া জল ঝরাইয়া লইতে হয়। রেশমের বস্ত্রে নীল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রঙীন বা সাদা উভয় প্রকার রেশমেই সামান্য কাঠিন্যের প্রয়োজন আছে। রেশম বস্ত্রে সুতীর কাপড়ের মত কলপ দিতে হয় না। **উহার কাঠিন্যের জন্য গঁদের জল ব্যবহার করা যায়।** পূর্ব হইতেই বোতলে করিয়া গঁদের জল তৈরী করিয়া রাখিতে হয়।

দুই পাইণ্ট জলে চার আউন্স আন্দাজ একটি **গঁদের টুকরা** ভিজাইয়া সম্পূর্ণ গলিয়া যাইবার পর ছাঁকিয়া বোতলে ভরিয়া রাখিতে হয়। এই জল যাহাতে পচিয়া না যায় সেজন্য কয়েক ফোঁটা **ফরম্যালিন** উহার ভিতর ফেলিয়া রাখা যায়।

রেশম বস্ত্র ধোয়ার পর উহাকে লম্বাভাবে ভাঁজ করিয়া রোলারে জড়াইতে পারিলে উহা তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় এবং কাপড়টি অনেকটা সুবিন্যস্ত থাকে। ইহার পর পুনরায় ভাঁজ করিয়া উহা ইস্ত্রি করিয়া লইতে হয়। রেশম **উত্তাপ কুপরিবাহী,** সুতরাং ইস্ত্রির তাপ সুতী অপেক্ষা অনেক কম হইবে। **৩০০° হইতে ৩৫০° ফারেনহাইটের বেশী ইস্ত্রির তাপ হওয়া উচিত নয়।** রেশম বস্ত্রে কোনও সুতি বা জরীর কাজ থাকিলে উহা উল্টা দিক হইতে ইস্ত্রি করিতে হয়।

পশম বস্ত্র ধৌতি ও পারিপাট্য : পশমের যে-কোনও একটি পোশাক ধৌত করিতে হইলে প্রথমে রৌদ্রে রাখিয়া **বুরুশের সাহায্যে উহার উপরের আলগা ধূলা-বালিগুলি ঝাড়িয়া কিছুটা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।** একণে উহার ঝুলের এবং বুকের ছাতির মাপ লিখিয়া রাখিতে হয়। লম্বা হাতার জামা হইলে হাতার ঝুলের মাপও লিখিয়া রাখা দরকার। একটি গামলাতে রেশম বস্ত্র ধোয়ার প্রণালীর মত রিঠা জলের ব্যবস্থা করিতে হয়। রিঠার অভাবে লাক্সের জলও প্রস্তুত

করা যায়। পরিমাণ মত ঐ জলের ভিতর পোশাকটি ভালভাবে নাড়াচাড়া করিয়া লইতে হয়। **অত্যধিক রগড়ানো বা ঘষা দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ।** লাক্স সাবানের মাপ হইতেছে ১ গ্যালন জলের ভিতর ½ আউন্স লাক্সের গুঁড়া। কোনও ক্ষারযুক্ত সাবান পশমের কাপড়ের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। পশম ধৌতির ব্যাপারে জল সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। **পশম ধৌতির জন্য চাই পরিষ্কার মৃদু জল।** সম্পূর্ণ জলটাই ঈষদুষ্ণ হওয়া প্রয়োজন, জলের তাপের আকস্মিক পরিবর্তনে পশম খারাপ হইয়া কুঁচকাইয়া যায়। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জলই ঈষৎ উষ্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাবান-জলে ভালভাবে নাড়াচাড়ার পর দেখা যাইবে, পোশাকটির ময়লা সাবান-জলে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। সাবান-জল হইতে আল্‌গা ভাবে পোশাকটি তুলিয়া আস্তে আস্তে খুপিয়া খুপিয়া পোশাকটি কাচিবার পর না নিঙড়াইয়া **তোয়ালের সাহায্যে অল্প চাপ দিয়া জল ঝরাইয়া লইতে হয়।**

পশমের পোশাক কখনও **ঝুলাইয়া শুকাইতে দেওয়া উচিত নয়।** ঝুলান অবস্থায় উহা অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং পূর্বে লিখিত পোশাকের মাপের সঙ্গে মিলাইয়া সেইভাবে প্রয়োজন মত টানিয়া তোয়ালের উপর পোশাকটি মেলিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। সামান্য আর্দ্র অবস্থায় হাওয়ায় রাখিতে হয়। সামান্য ভিজা অবস্থায় পশম ইস্ত্রি করা উচিত। যদি বস্ত্রটি বেশী শুকাইয়া যায় তাহা হইলে ইস্ত্রির সময় পোশাকটির উপরে একখানি ভিজা সূতীর কাপড় পাতিয়া ইস্ত্রি করিতে হয়। পশম **উত্তাপ কুপরিচালক।** সুতরাং রেশমের মত পশম বস্ত্রখানিও অল্প তাপে ইস্ত্রি করিতে হয়। পশম বস্ত্রের জন্য ইস্ত্রির তাপ হওয়া উচিত ৩০০° **ফারেন-হাইট।** পশমের জামা ইস্ত্রির পর কিছু সময় হাওয়ায় রাখিয়া আর্দ্রভাব দূর করিয়া তুলিয়া রাখিতে হয়।

রেয়ন বস্ত্র ধৌতি ও পারিপাট্য : রেশমের মত রেয়ন বস্ত্রেও অত্যধিক উত্তাপ, ক্ষার প্রয়োগ, অত্যধিক রগড়ানো ইহার কোনটাই চলে না। রেশমের বস্ত্রের উজ্জ্বলতা বজায় রাখার জন্য ভিনিগার দেওয়া যায় কিন্তু রেয়ন বা অন্য কোনও কৃত্রিম রেশমে ভিনিগার দিলে তন্তু নষ্ট হইয়া যায়। ভিনিগারের রাসায়নিক নাম **অ্যাসেটিক অ্যাসিড। অ্যাসেটিক অ্যাসিড রেয়ন তন্তুকে নষ্ট করিয়া দেয়।** ঈষদুষ্ণ জলে লাক্স বা ঐ জাতীয় ক্ষারবিহীন সাবানে বস্ত্রটি ভালভাবে নাড়াচাড়া করিয়া খুপিয়া খুপিয়া কাচিয়া লইতে হয়। রেয়ন বস্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম, সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উহা নাড়াচাড়া করিয়া আলতো ভাবে জল ঝরাইয়া লইতে হয়।

রেশম বস্ত্রের ন্যায় ইহা রোলারে জড়াইয়া শুকাইতে পারিলে ভাল হয়। যদি ঐ ব্যবস্থা সম্ভব না হয় তাহা হইলে কোনও কিছুর উপর বিছাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। রেয়ন বা কৃত্রিম সিল্ক ভিজাইলে নরম হয়। সুতরাং কাপড় ঝুলাইয়া শুকাইতে দিলে বেশি লম্বা হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। রেয়ন বা অন্যান্য কৃত্রিম রেশমে বস্ত্রের কাঠিন্যের কোনও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কলপ বা গঁদের জল ইহার কোনটাই কৃত্রিম রেশমে ব্যবহার করা উচিত নয়। ইস্ত্রি খুব সামান্য গরম করিয়া বস্ত্রের উল্টাদিকে ইস্ত্রি করিয়া পারিপাট্যের কাজ সম্পন্ন করিতে হয়।

(নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন যে-কোনও কৃত্রিম রেশম উপরোক্ত প্রণালীতে ধৌত করিতে হয়।)

পঞ্চম অধ্যায়

মানবদেহের প্রাথমিক শারীর স্থান ও শারীর বৃত্ত

মস্তক, উদর ও বক্ষোদেশ, এবং হস্ত ও পদ—মানবদেহের সাধারণতঃ এই তিনটি বিভাগ। কঠিন অংশ অস্থি এবং কোমল অংশ মাংসপেশী, ত্বক, রক্ত ও রসবাহী শিরাগুলি ও স্নায়ু লইয়া এই মানবদেহ। মানবদেহে জলীয় অংশ বেশী, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগই অস্থি, মাংসপেশী, শিরা ও স্নায়ু লইয়া গঠিত এবং শরীরের যে-কোনও অংশ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের সমষ্টিমাত্র। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত চর্মচক্ষে এই জীবকোষগুলিকে দেখা যায় না। এই জীবকোষগুলি হয় পৃথক ভাবে (যেমন রক্তে) অথবা একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া তন্তুর (টিস্যু) ন্যায় (যেমন মাংসপেশী, স্নায়ু বা অস্থিতে) থাকে। এই টিস্যুগুলি আবার একত্রীভূত হইয়া দেহের অবয়ব শারীর যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করে। ইহাদের প্রত্যেকটির বিশেষ বিশেষ কার্য নির্দিষ্ট আছে। জীবদেহ রক্ষার জন্য (হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি), জীবন উপভোগের জন্য (চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বা)। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন তাহার জীবন-ক্রিয়ার ফলে দেহস্থ এই সকল জীবকোষ অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের পরিপূরণ হইতেছে। জীবনের প্রতিমুহূর্তেই এই ক্ষয় ও পরিপূরণ চলিতেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান

প্রাণসম্পন্ন ক্ষুদ্রতম বস্তুর নাম **কোষ**। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি যন্ত্র, প্রত্যেকটি অংশ বিভিন্ন জাতীয় কোষ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষের কেন্দ্রে থাকে একটি **প্রাণকেন্দ্র**; তাহার চারিদিকে থাকে **জালের একটি আবরণ ও বালুকণার মত পদার্থ**। ইহা ছাড়া কোষের পুষ্টি ও স্থিতির সহায়ক তরল ও অর্ধ-তরল **প্রোটোপ্লাজম** নামে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ থাকে। এই প্রোটোপ্লাজম **স্বচ্ছ বর্ণহীন। ইহা এক ক্ষারীয় পদার্থ**। প্রোটোপ্লাজমে **কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন** প্রভৃতি কতকগুলি উপাদানের অণু পাওয়া যায়।

কোষের প্রাণ **নিউক্লিয়াস**। প্রত্যেকটি কোষ এক একটি সম্পূর্ণ সত্তা। প্রত্যেকটি জীবকোষ নিজ অন্তর্নিহিত ক্রিয়া দ্বারাই বিভক্ত হইয়া নূতন নূতন কোষ সৃষ্টি করিতে পারে।

কোষগুলি পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া তন্তু গঠন করে। এই তন্তু দিয়াই দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় গঠিত হয়। এই কোষ ও তন্তুকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) আবরক বা এপিথেলিয়াল কোষ দিয়া তৈরী এপিথেলিয়াল তন্তু।
(২) সংযোজনী কোষ দিয়া তৈরী সংযোজনী তন্তু।
(৩) পেশী কোষ দিয়া গঠিত হয় পেশী-তন্তু।
(৪) স্নায়ু কোষ দিয়া তৈয়ারী হয় স্নায়ু-তন্তু।

এপিথেলিয়াল তন্তু দ্বারা সমস্ত দেহ ও সমস্ত দেহযন্ত্রের আবরণ তৈরী। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বহিরাবরণ এই তন্তু দিয়াই গঠিত। ত্বক এই আবরক তন্তুরই সমষ্টি।

সংযোজনী তন্তু—এই তন্তু দেহের কাঠামো তৈরী করে। অস্থি, তরুণাস্থি, সন্ধি, বন্ধনী এই সব সংযোজন তন্তু দিয়া গঠিত।

পেশী কোষ দিয়া যাবতীয় পেশী গঠিত। এই পেশী দ্বারা নড়াচড়া এবং শারীরিক গতি সম্ভব হয়।

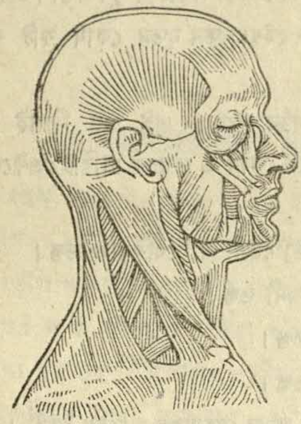
স্নায়ুতন্তু—কেন্দ্রীয় ও উপাস্থি স্নায়ুমণ্ডল ইহা দ্বারা গঠিত।

মাংসপেশী : যে তন্তু দ্বারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহাকে পেশী বলে। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা মাংস বলি তাহাই মাংসপেশী। পেশীর তন্তু কতকগুলি রক্তবর্ণ আঁশের সমষ্টি মাত্র এবং আঁশগুলি কোমল পদার্থে পূর্ণ অতি

সূক্ষ্ম নলির মত। রক্তের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ুগুলি মাংসপেশীর মধ্যে থাকিয়া ইহাকে পোষণ করে ও কর্মের প্রেরণা দেয়। মাংসপেশীগুলি দেহের কাঠামোকে আবৃত করিয়া অবয়বসমূহের শোভা ও সৌন্দর্য সাধন করে, অস্থিগুলিকে রক্ষা করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও শারীর যন্ত্রগুলির শক্তি ও গতি দেয়।

অবস্থিতি ভেদে ইহারা নানা আকারের—দীর্ঘ (উরু ও হস্তে), হ্রস্ব (অঙ্গুলিতে) এবং বিস্তৃত ও সমতল (গ্রীবায়)।

মাংসপেশীগুলি অস্থি, উপাস্থি, বন্ধনী ও ত্বকের সহিত সাক্ষাৎভাবে অথবা রজ্জুর ন্যায় একপ্রকার উজ্জ্বল দৃঢ় শ্বেতবর্ণ পদার্থের সাহায্যে যুক্ত থাকে। ত্বকের সহিত যুক্ত পেশীগুলি একটি স্তরের মত ত্বকের নীচে বিস্তৃত হইয়া থাকে ; অস্থির সহিত যুক্ত পেশীগুলি মধ্যে স্থূল ও দুই প্রান্তে সূক্ষ্ম। অস্থির সহিত ইহাদের সংযোগ এই দুই প্রান্তে টেণ্ডনের সাহায্যে হয় ; প্রত্যক্ষ ভাবে হয় না।



(১) অস্থি ও পেশীর সংযোগসূত্র
(২) স্নায়ু (নার্ভ)
(৩) ধমনী (আর্টারি)
(৪) শিরা (ভেন)
(৫) হাঁটুর হাড় (প্যাটেলী)
(৬) বন্ধনী বা প্যাটেলীর লিগামেণ্ট

এই পেশীর দুই প্রান্তের একটিকে মূল কারণ (যেখানে বন্ধন দৃঢ় ও স্থিরতর) এবং অপরটিকে অন্তর্নিবিষ্ট স্থান (পেশীর গতি ও শক্তি যে মুখে কাজ করে) বলে।

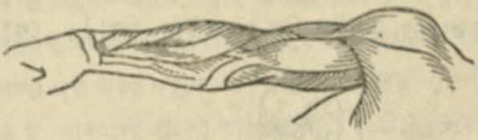
অবশ্য ২।১টি পেশী ছাড়া (যেমন, মুখের কতকগুলি পেশী যাহাদের এক প্রান্ত স্থিরভাবে অস্থির সহিত ও অপর প্রান্ত ত্বকের নীচে থাকে) সাধারণতঃ পেশীগুলির কোন এক বিশিষ্ট প্রান্তকে নির্দিষ্ট মূল স্থান বলা যায় না—সময় বিশেষে উভয় প্রান্ত হইতেই তাহারা কার্য করিতে পারে।

মাংসপেশীগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) মানুষের ইচ্ছাধীন (২) অনিচ্ছাধীন।

(১) ইচ্ছাধীন পেশী ঃ এই পেশীগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তক, স্কন্ধ এবং গ্রীবাদেশে থাকে। ইহারা প্রায়ই কোন-না-কোন অস্থির সহিত যুক্ত। ইহাদের শক্তিকেন্দ্র মধ্যের স্থূল অংশে থাকে এবং সেই শক্তি সূক্ষ্ম দুই প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া কার্য করে ;

অস্থিসন্ধিগুলির মুখে টেণ্ডনের সাহায্যে ইহাদের প্রান্তভাগ যুক্ত থাকায় এবং ইহাদের আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া বর্তমান থাকায়, আপনাদের গতির সঙ্গে সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও ইহারা চালিত করিতে পারে। ইহাদের স্নায়ুগুলি আমাদের আয়ত্তাধীন বলিয়া আমরা ইচ্ছামত সেই সকল অঙ্গ চালনা করিতে পারি।



যেমন,—হাত, পা।

(২) **অনিচ্ছাধীন পেশী :** এই পেশীগুলির গঠন বিভিন্ন। ইহারা পাকাশয়, অন্ত্রগাত্রে, রক্তবহা শিরায় ও ধমনীতে, লোমকূপে এবং দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিতে (পাকস্থলী, যকৃৎ) অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডও একপ্রকার অনিচ্ছাধীন মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত। ইহারা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা চালিত বা শাসিত নয়। আপনা হইতেই ইহাদের কার্য (যথা, পাকস্থলীতে পাচক রস নিঃসরণ, উদর হইতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র-মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যের ক্রমশঃ সঞ্চালন, রক্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি জৈবিক ব্যাপার) চলিতে থাকে। নিদ্রিত অবস্থায়ও ইহার ব্যাঘাত হয় না। ইহাদের কার্য মেরুদণ্ডে অবস্থিত কতকগুলি বিশিষ্ট স্নায়ুকেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত। ইহারা আমাদের আয়ত্তাধীন নয়।

মাংসপেশীর প্রধান ধর্ম : উত্তেজনার ফলে আকুঞ্চিত হয় অর্থাৎ উত্তেজনায় সাড়া দেয়। টানিলে বড় ও টান ছাড়িলে পূর্বের আকার হয়। ইহাকে স্থিতিস্থাপকতা গুণ বলে। এক অংশ হইতে দূরতর অপর অংশে শক্তি বা বেগ সঞ্চার করিতে পারে।

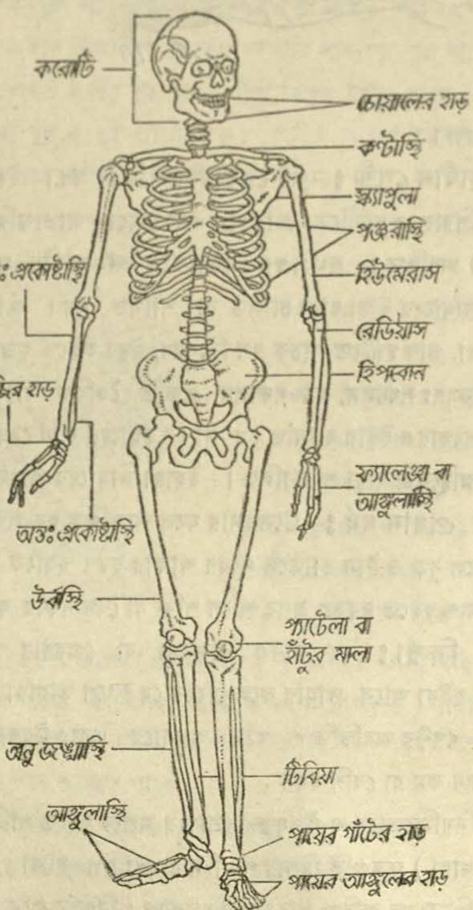
মাংসপেশীর ক্রিয়া : যে-কোনও উত্তেজনা বা প্রেরণায় মাংসপেশীগুলি প্রথমে ছোট ও ঘন হইয়া আসে, তাহার ফলে দেহের যে অংশে তাহারা যুক্ত সেখানে একটা গতি দেয় ; পেশীর অবস্থিতি ও গঠন অনুসারে এবং উত্তেজনার তীব্রতা অনুযায়ী এই আকুঞ্চন কম বা বেশি হয়।

এই উত্তেজনা নিয়মিতভাবে ও উপযুক্ত বিশ্রামের অন্তরে হইতে থাকিলে (যেমন, নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা) তন্তুগুলি দিনের পর দিন ক্রমশঃ স্থূল হইয়া সেই পেশীকে ক্রমে দৃঢ়তর ও পরিধিতে বড় করিয়া তাহার আকারেরও পরিবর্তন করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি : চারিটি জিনিসের উপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি নির্ভর করে—অস্থি ও অস্থিসন্ধি, তাহাদের বন্ধনী, পেশী ও স্নায়ু। বন্ধনীর সাহায্যে অস্থিগুলি

সন্ধির মুখে খিলের মত উঠানামা করে এবং পেশীগুলি সেই কার্যে শক্তি ও স্নায়ুগুলি তাহাতে প্রেরণা দেয়।

দেহের যে-কোনও অংশের গতি কেবলমাত্র একটি পেশী লইয়া নয়, বিভিন্ন পেশীর পর পর চালনায় একটি সম্পূর্ণ ক্রিয়া সাধিত হয় (যেমন, হাত মুড়িবার সময়) ; ইহা ছাড়া, কখন কখন এক সঙ্গেই কতকগুলি বিভিন্ন পেশী কাজ করে (সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত হইয়া ও একই ভাবে বা বিপরীত দিক হইতে টান দিয়া) ; কেহ বা গতি



দেয়, কেহ বা সেই গতি সংযত করে। কেহ বা দেহের মাধ্যাকর্ষণের ভার ঠিক রাখে। যেমন ঘাড় নীচু করিবার বা চলিবার সময়। শিশুদের পেশীগুলি সবল না

হওয়ায় প্রথম দাঁড়ান বা হাঁটিবার সময় সেইজন্ত তাহারা অনবরত পড়িয়া যায়। দাঁড়িবার সময় পেশীগুলির এইভাবে কাজ হয়—

পেশীগুলি **পরস্পর বিপরীতটানে** মস্তক, পৃষ্ঠদেশ, জঙ্ঘা ও জানুকে স্থির রাখিয়া দেহটিকে এইভাবে খাড়া রাখে; **গলার সম্মুখের ও পিছনের পেশীগুলির পরস্পর বিপরীত টানে**—মস্তক, উদর ও তলপেটের এবং **পৃষ্ঠদেশের পেশীগুলির টানে** পৃষ্ঠদেশ, উরুর সম্মুখের এবং **পৃষ্ঠদেশ ও জঙ্ঘার পিছনের পেশীগুলির টানে** জঙ্ঘা এবং উরুর সম্মুখের ও **'পায়ের গুলির' পেশী টানে**—জানু।

কঙ্কাল-তন্ত্র : মানবদেহ হাড়ের কাঠামো দ্বারা তৈরী। চামড়া ও মাংসপেশীর আবরণের নীচে রহিয়াছে এই হাড়ের কাঠামো; ইহাকেই **কঙ্কাল** বলা হয়। মানুষের দেহে অস্থি না থাকিলে মেদ, মাংস ও ত্বকের সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত না। অস্থি ছাড়া মানব দেহ একটি মাংসপিণ্ডের মত মনে হইত।

পরিণত অবস্থায় মানুষের দেহে সর্বসমেত ২০৬টি অস্থি থাকে। সব বয়সে অস্থির সংখ্যা এক-থাকে না। শিশুকালের অনেক অস্থি বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে মিলিয়া যায়। মানবদেহ অস্থি দ্বারা গঠিত হইলেও যেমন খুশী শরীরটাকে নাড়ানো চাড়ানো যায়। অস্থির রং সাদা, সামান্য লালচে ভাব। অস্থির ভিতরের দিকের রং টকটকে লাল।

অস্থি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ও জল দ্বারা গঠিত। অস্থিতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ জলীয় পদার্থ এবং বাকী ৩ ভাগের ২ ভাগ **ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট** প্রভৃতির দ্বারা গঠিত। বাকী এক-তৃতীয়াংশ কার্বন বা অঙ্গারক উপাদানে গঠিত।

(১) **করোটি :** করোটি বা মাথার খুলি আটখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। মাথার খুলির ভিতরেই মস্তিষ্ক থাকে। করোটির সামনে মুখমণ্ডল থাকে। ইহাতে মোট ১৪ খানা অস্থি আছে। ইহার ভিতরের একখানা চোয়ালের অস্থি। কানের ভিতরে দুই কানে মোট ৬টি অস্থি আছে।

(২) **দেহকাণ্ড :** (ক) মেরুদণ্ড, (খ) বক্ষপিঞ্জর ও (গ) শ্রোণিচক্র—দেহকাণ্ডের এই তিনটি অংশ।

(ক) **মেরুদণ্ড :** ৩৩টি গোলাকৃতি অস্থি দ্বারা মেরুদণ্ড গঠিত। গ্রীবা হইতে অস্থিপ্রদেশের শেষ পর্যন্ত পিঠের ঠিক মাঝখান হইতে দণ্ডাকারে নামিয়া আসিয়াছে। মেরুদণ্ডের গোলাকৃতি অস্থিগুলিকে কশেরুকা (ভার্টিব্রা) বলে। মেরুদণ্ডটি এক পাশ হইতে দেখিলে বোঝা যায় যে ইহা সোজা নয়, ঈষৎ বাঁকানো। ইহাতে পাঁচটি বাঁক আছে।

(১) গ্রীবাদেশের বাঁকে ৭ খানা কশেরুকা আছে।

(২) পৃষ্ঠদেশের বাঁকে আছে ১২ খানা কশেরুকা।

(৩) কটিদেশের বাঁক—ইহাতে ৫ খানা কশেরুকা আছে।

(৪) বস্তিদেশের বাঁকটিতে শৈশবে ৫ খানা, পরিণত বয়সে উহাই একখানায় পরিণত হয়।

(৫) পঞ্চম বাঁকটি গুহ্যদেশের বাঁক। শৈশবে এখানে ৪ খানা অস্থি থাকে, পরিণত বয়সে একখানা হয়।

কশেরুকাগুলির ক্ষয় নিবারণের জন্য উহাতে একপ্রকার নরম হাড় থাকে, উহাকে তরুণাস্থি বলে। কশেরুকার মাঝখানে এক একটি গর্ত থাকে। পর পর কশেরুকা সাজানো থাকে বলিয়া সমস্ত গর্ত মিলিয়া একটি নালার মত সৃষ্টি হয়। এই নালার ভিতরই সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুরজ্জু (স্পাইনাল কর্ড) থাকে।

(খ) **বক্ষপিঞ্জর:** এই বক্ষপিঞ্জর বা বুকের খাঁচা দেহকাণ্ডের সামনের অংশ। বক্ষপিঞ্জরের সামনের নীচের দিকে একখানা লম্বা চ্যাপ্টা অস্থি আছে। ইহাকে **উরঃফলক** বলে। বক্ষপিঞ্জরে ১২ জোড়া সরু বাঁকানো পাঁজরা আছে। ইহাই পঞ্জরাস্থি। পঞ্জরাস্থিগুলি বক্ষগহ্বরকে আবৃত করিয়া তন্মধ্যস্থ ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও রক্তপ্রণালী সকল, শ্বাসবহা ও অন্নবহা নালিসমূহ এবং প্লীহা, যকৃৎ ও উদরকে রক্ষা করিতেছে।

শ্রোণিচক্র: দেহকাণ্ডের অপর একটি অংশ বস্তিপ্রদেশ। মেরুদণ্ডের নীচের দিকে যে তিনখানি চ্যাপ্টা অস্থি আছে তাহাদিগকে শ্রোণি অস্থি বলে। ইহারা মেরুদণ্ডের নীচের অংশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একটি কোটর সৃষ্টি করিয়াছে।

ঊর্ধ্বশাখা

(স্কন্ধ, বাহু এবং করতল)

স্কন্ধদেশের অস্থি অর্থে কণ্ঠার হাড় (কলার বোন বা ক্লাডকেল) এবং পাখনার হাড় (সোলডার ব্লেড বা স্ক্যাপুলা) ; গলার নীচে দুই পার্শ্বে অঙ্গুলি পরিমিত স্থূল যে দুইটি নাতিদীর্ঘ বক্র অস্থি আছে তাহাদিগকে 'কণ্ঠার হাড়' বলে ; সম্মুখে ষ্টার্নাস বা বক্ষের অস্থির সহিত এবং পাশে কাঁধের উপর পাখনার হাড়ের সহিত ইহারা সংযুক্ত। দুই কাঁধের পিছনে এবং ঠিক নীচে যে দুইটি ত্রিকোণ অস্থি আছে তাহাদিগকে পাখনার হাড় বলে। কণ্ঠার হাড় এবং বাহুর অস্থির সহিত তাহারা যুক্ত।

বাহুর অস্থি দুই ভাগে বিভক্ত। (১) স্কন্ধ হইতে কনুই পর্যন্ত প্রসারিত অংশ (ইহাকে আর্ম্ বোন্ বা **হিউমেরাস** বলে) ; এই অস্থির উপরের অংশটি গোলাকার, পাথনার হাড়ের গর্তের সহিত পেশীর সাহায্যে যুক্ত থাকে।



(২) কনুই হইতে কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ (ফোর আর্ম) ; শেষোক্ত ভাগে দুইখানি বিভিন্ন অস্থি আছে,—(১) বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে **রেডিয়াস** এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিকে **আল্না**। উভয় অস্থিই কনুই হইতে কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং হাত ঘুরাইলে তাহাদের অবস্থিতির পরিবর্তন হয়।

হস্ত বা করতল : ইহার অস্থিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—(১) কব্জির হাড় (রিস্ট বোন বা কারপাস) (চিত্র নং ঙ) ; ইহারা সংখ্যায় আটটি, চারিটি করিয়া দুই সারিতে থাকে।

(২) করতলের অস্থি (মেটাকার্পাস) ইহারা সংখ্যায় পাঁচটি, অঙ্গুলির অস্থিগুলি ইহাদের সহিত যুক্ত থাকে।

(৩) অঙ্গুলির হাড় (ফ্যালাঞ্জেস্) বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুইটি এবং অপর অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া থাকে।

নিম্নশাখা

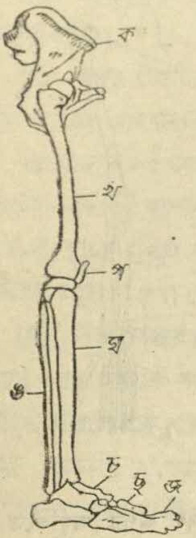
(বস্তি, উরু ও পদ)

মেরুদণ্ডের অধোভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া এবং শরীরের উর্ধ্বাংশের অবলম্বন স্বরূপ বাটির ন্যায় যে তিনটি অস্থি সংযুক্ত আছে তাহাকে বস্তি বা (পেলভিস্) বলে ; পশ্চাতে সেক্রম এবং উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ অস্থি বা 'জঙ্ঘার অস্থি' লইয়া বস্তি-গহ্বর গঠিত। (চিত্র নং—ক)। এই জঙ্ঘার অস্থি দুইটি পশ্চাতে সেক্রমের সহিত এবং সম্মুখে দেহের মধ্যরেখায় ক্ষুদ্র এক খণ্ড কার্টিলেজ দ্বারা পরস্পর যুক্ত। অন্ত্র এবং মূত্রাধার এই অংশে অবস্থিত। অন্ত্রের সমুদয় ভার এই পেলভিসের উপর আসিয়া পড়ে। পেলভিসের গায়ে যে একটি গভীর গোলাকার গর্ত আছে তাহার সহিত উরুদেশের অস্থি সংযুক্ত থাকে।

উরুদেশের অস্থি (থাইবোন বা ফিমার) উরু-সন্ধি হইতে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং স্থূল সুদৃঢ় গোলাকার ও সম্মুখভাগে বক্র ; উপরের অংশে গোলাকার মুণ্ড-

বিশিষ্ট এবং জঘন সন্ধির গর্তের ভিতর প্রবেশের সুবিধার জন্য ভিতরের দিকে একটু হেলান। ইহাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ অস্থি।

উরু অস্থির (ফিমার) শেষভাগে এবং ত্বকের ঠিক নীচে জানুর অস্থি (নী-ক্যাপ বা প্যাটেলা) বা হাটুর চাকৃতি অবস্থিত—(চিত্র নং—গ)। ইহা একটি ত্রিকোণ স্থূল অস্থি। ইহা জানুসন্ধির সম্মুখ ভাগ রক্ষা করে এবং উরুদেশের সম্মুখের মাংসপেশীগুলিকে দৃঢ় করে।



লেগ বা পদ দুইখানি অস্থি দ্বারা গঠিত ; এই দুই-খানিকে টিবিয়া ও ফিবুলা বলে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে টিবিয়া এবং বিপরীত দিকে ফিবুলা। টিবিয়াজানু হইতে গুল্ফ সন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত ; ইহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ পায়ের সম্মুখ-ভাগে চর্মের নীচেই থাকে। ফিবুলা বা ব্রুচবোন টিবিয়ার পশ্চাতে থাকে। উপরেজানুসন্ধির সহিত ইহার কোন সংযোগ নাই, কিন্তু ইহার অধোদেশ দিয়া গোড়ালির বহিঃসীমা নির্মিত হইয়াছে।

ফুট বা চরণ : ইহা ২৬ খানা অস্থি দ্বারা নির্মিত। চরণের অস্থিগুলি হস্তের অস্থির মত পর্যায়ক্রমে তিনভাগে সাজানো আছে।

(১) **টার্সাস :** পদতলের প্রথম অংশে সাতখানি অসম অস্থি ; ইহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎটিকে গোড়ালির অস্থি এবং সর্বোচ্চটিকে গুল্ফ অস্থি বলে। এই শেষের অস্থি দ্বারা গুল্ফ-সন্ধির অধোভাগ নির্মিত হইয়াছে।

(২) **মেটে টার্সাস :** টার্সাসের সম্মুখের পাঁচখানি দীর্ঘঅস্থি—ইহারা অঙ্গুলি-গুলির অবলম্বন স্বরূপ।

(৩) **পদাঙ্গুলির অস্থি** (ফ্যালাঞ্জেস, টোবোনস্) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুইখানি এবং অপর অঙ্গুলিতে তিনখানি করিয়া থাকে।

সন্ধি বা জোড়—জয়েণ্ট : দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থি-সন্ধি বলে। এই সংযোগ নানাভাবে হইতে পারে। করাতের দাঁতের মত খাঁজে খাঁজে (যেমন মাথার খুলিতে) অপর কোন ক্ষুদ্র অস্থি বা উপ-অস্থির সাহায্যে (যেমন হাঁটুতে) বা কেবলমাত্র বন্ধনী দিয়া (যেমন কব্জিতে)।

অস্থি-সন্ধি দুই প্রকার : (১) দৃঢ়বদ্ধ অচল, যথা মস্তকের অস্থিসন্ধি। (২) সচল, যথা কনুই, জানু এবং উরু সন্ধি।

শেষোক্ত সন্ধিগুলিতে অস্থির উপরিভাগ নরম কার্টিলেজ (প্যাডের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ) দ্বারা আবৃত থাকে, তাহার ফলে অস্থিগুলির মধ্যে পরস্পর ঘর্ষণ কম হয়, এবং আঘাত লাগিলে তাহার শক্তি অনেকটা প্রতিহত হয়। সন্ধিগুলি ক্যাপসুলে (থলিতে) ঢাকা থাকে ও তন্মধ্যে একপ্রকার ডিমের লালার মত তরল পদার্থ (জয়েন্ট অয়েল বা সাইনোভিয়া) নির্গত হইয়া এই সকল সন্ধিকে নিষিক্ত করিয়া রাখে। ফিতার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ (লিগামেন্ট বা বন্ধনী) এই সকল সন্ধির অস্থিকে পরস্পর বাঁধিয়া রাখে, তবে তাহাতে চলাফেরার কোনও অসুবিধা হয় না।

এই শেষোক্ত সচল সন্ধি আবার দুইভাগে বিভক্ত :

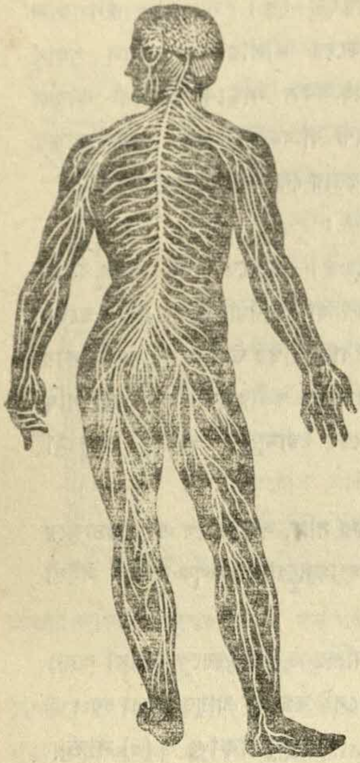
(১) **বর্তুল ও বাটি-সন্ধি** (বল ও সকেট জয়েন্ট)—ইহাতে একটি অস্থির বাটির ন্যায় অংশের মধ্যে অপর এক অস্থির বর্তুলাকার অংশ আসিয়া মিলিত হয়। যথা স্কন্ধের সন্ধিতে পাখনার বহিরাংশে বাটির ন্যায় গর্তের মধ্যে বাহু অস্থির ঊর্ধ্বাংশের বর্তুলাকার অংশ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তবে পাখনার গর্ত তত গভীর নয় বলিয়া এই সন্ধি তত দৃঢ় নহে, এবং সেজন্য বাহু অস্থির সহজেই স্থানচ্যুত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

(২) **কব্জা-সন্ধি** (হিঞ্জ জয়েন্ট)—যথা, গুল্‌ফের সন্ধি, সম্মুখভাগে এবং অভ্যন্তরে সিনবোন, বাহিরের দিকে ক্রচ বোন এবং নিম্নে অ্যাঙ্কলবোন (গুল্‌ফ-অস্থি) লইয়া গঠিত।

নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্র ঃ দেহের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়কে চালনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি গুরুদায়িত্ব যে তন্ত্রের উপর ন্যস্ত সেই তন্ত্রকেই স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়।

নার্ভতন্ত্রে তিনটি প্রধান অংশ আছে—(১) **মস্তিষ্ক**, (২) **সুষুম্নাকাণ্ড** ও (৩) **নার্ভ**। বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইহার সহিত পাঁচটি ইন্দ্রিয় স্থানযুক্ত হইয়া আছে। যেমন **চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক**। মস্তিষ্ক মাথার খুলির মধ্যে থাকে। ইহা জমাট ঘৃতের মত এক প্রকার পদার্থ। আমাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া ছোট ছোট হাড় বা কশেরুকার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কশেরুকায় একটি গর্ত থাকায় শিরদাঁড়ার ভিতরে লম্বা নলের ভিতর একটা ফাঁপা জায়গা থাকে। এই ফাঁপা নলের ভিতরই সুষুম্নাকাণ্ড থাকে। মাথার খুলি ও মেরুদণ্ড মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে সাদা রং-এর সরু সূতার মত অসংখ্য স্নায়ু বাহির হয়। স্নায়ুগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পেশী, ইন্দ্রিয় স্থান, অন্তর্গ্রন্থি ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে। নার্ভ সহ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড একত্রে কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র গঠন করে।

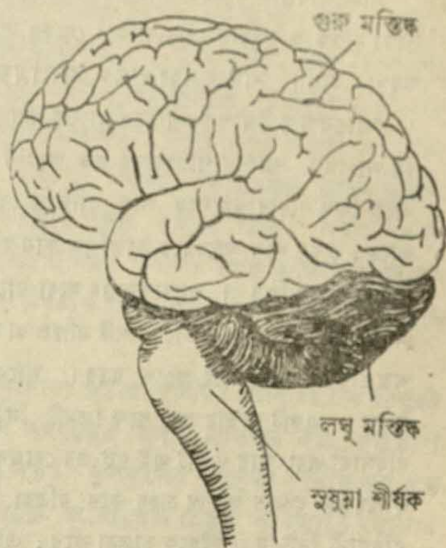
আমাদের মস্তিষ্ককে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা হইয়াছে ; **গুরু মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক**, এবং **সুষুম্নাশীর্ষক**। মস্তিষ্কের উপরের দিকে সবচেয়ে বড় অংশটি গুরু মস্তিষ্ক। ইহা দক্ষিণ ও বাম গোলার্ধে বিভক্ত এবং খুলির সামনের দিক হইতে পিছন দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। **গুরু মস্তিষ্ক স্নায়ুমণ্ডলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জটিল অংশ।** সমগ্র স্নায়ুকেন্দ্রের অন্যান্য অংশের ক্রিয়ার সমন্বয় সাধনের ভার গুরু মস্তিষ্কের। গুরু মস্তিষ্কের বহির্ভাগ ধূসর বর্ণের নার্ভ কলা ও নীচের স্তর সাদা নার্ভ কলা দ্বারা গঠিত। গুরু মস্তিষ্কের ধূসর কলার স্তরটি আমাদের **জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা, বিচারবুদ্ধি ও স্মৃতির প্রাণকেন্দ্র।**



গুরু মস্তিষ্কের পিছন দিকে এবং নীচে লঘু মস্তিষ্কের অবস্থিতি। দেহের ভারসাম্য রক্ষার কেন্দ্র এখানে। সাঁতারকাটা, সাইকেল চড়া ইত্যাদি ক্রিয়া, যেখানে অনেকগুলি পেশীর সমন্বয় প্রয়োজন, তার কেন্দ্রও এইখানে। প্রত্যেক পেশীর সঙ্গে নার্ভ যুক্ত থাকে। **লঘু মস্তিষ্ক নার্ভ-পথে পেশীগুলির কোন্‌টি কি ভাবে কার্য করিবে তাহার নির্দেশ দেয়।** কোনও পেশীতে যদি ঠিক সময়ে নির্দেশ আসিয়া না পৌছায় তবে উহা অস্থায়ী ভাবে অকেজো হইয়া পড়ে। **জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লঘু মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত হয় না।**

মস্তিষ্কের একেবারে নীচের অংশকে অর্থাৎ মেরুদণ্ডটি মোটা হইয়া যেখানে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে সেই অংশকে বলা হয় **সুষুম্নাশীর্ষক**। এখানে যে-সব স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত তাহা শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল পরিচালনা করে। লালা গ্রন্থি হইতে লালা ক্ষরণ, পৌষ্টিক নালীর মধ্যে কয়েক প্রকার জারক রস নিঃসরণ সুষুম্নাশীর্ষকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার আমাদের চোখের পাতা যে বারে বারে পড়িতেছে তাহাও পরিচালনা করে সুষুম্নাশীর্ষক।

সুষুম্নাকাণ্ড ঃ ইহা সুষুম্নাশীর্ষকের নীচ হইতে শিরদাঁড়ার শেষভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরুদণ্ড কতকগুলি ছোট ছোট অস্থির সংযোগ দিয়া তৈরী, যেন একটি হাড়ের মালা। ইহাদের মধ্যস্থলে ছিদ্র দিয়া স্নায়বিক উপাদানে গঠিত একটি ফিতা চলিয়া গিয়াছে, ইহাকেই বলে সুষুম্নাকাণ্ড। সুষুম্নাকাণ্ড হইতে নার্ভ বাহির হইয়া দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, কেবল যে অংশগুলিতে মস্তিষ্ক হইতে নার্ভ আসে, তথায় সুষুম্না-কাণ্ডের নার্ভ থাকে না। সুষুম্নাকাণ্ড অনেক কার্য পরিচালনা করে। ইহা প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলির কেন্দ্র। আগুনে হাত লাগিলে কিছু অনুভব করিবার পূর্বে হাতটি দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়া আসে। ইহাই **প্রতিবর্তী ক্রিয়া**। অনেকে মুদ্রাদোষ বশতঃ নিজের অজান্তে পড়িবার সময় পা তুলিতে থাকে বা বসাকালীন অবস্থায় পা নাড়াইতে থাকে। এই সকল শারীরিক অঙ্গচালনায় প্রথম দিকে মস্তিষ্কের যোগাযোগ থাকিলেও শেষের দিকে যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন ইহা সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে নার্ভগুলির সহিত মস্তিষ্কের সরাসরি যোগাযোগ নাই সেগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত থাকে।



দেহের অন্যান্য অংশের মত নার্ভতন্ত্র অসংখ্য নার্ভকোষ দ্বারা গঠিত। নার্ভ-কোষকে বলা হয় নিউরন। এই কোষের কোনও আকার নাই। কোষের মধ্যে **নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজম** আছে। নার্ভ-কোষের একধারে ছোট শাখান্বিত অনেকগুলি সুতা এবং আর এক ধারে একটি লম্বা সুতা। লম্বা সুতাটি মজ্জিত আবরণে ঢাকা। ছোট সুতাগুলিকে **ডেনড্রাইট** এবং লম্বা সুতাকে **অ্যাকসন** বলা হয়। উত্তেজনা ডেনড্রাইট দিয়া নার্ভকোষে প্রবেশ করে এবং অ্যাকসন দিয়া বাহির হইয়া যায়। মানুষের দেহে অনেক নার্ভকোষ আছে যেগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতর অবস্থান করে কিন্তু ইহাদের অ্যাকসনটি হাত কিংবা পা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এইরূপ অনেক-

গুলি অ্যাকসনের গোছাকে বলা হয় নার্ভ। অ্যাকসনগুলি প্রত্যেকটি যুক্ত থাকে পৃথক পৃথক নিউরনের সঙ্গে।

নার্ভকোষগুলি মস্তিষ্কের বহিরাঞ্চলে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যভাগে থাকে। ইহা ছাড়া মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বাহিরে দেহের নানা স্থানে নার্ভকোষগুলি দল বাঁধিয়া অবস্থান করে। নার্ভকোষের দলকে **গ্যাংগ্লিয়ন** বলে।

আবেগ ঃ উদ্দীপক আসিলে নার্ভের মধ্য দিয়া যাহা প্রবাহিত হয় তাহাকেই বলা হয় আবেগ। আবেগ পরিবহণের জন্য অসংখ্য রাস্তা আছে। শিশুদের কিছু কম থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেকটি রাস্তার তিনটি অংশ আছে ; প্রথম অংশ আবেগকে উত্তেজিত স্থান হইতে মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডে লইয়া যায়। দ্বিতীয় অংশ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে। ইহার মধ্য দিয়া আবেগ তৃতীয় অংশে চলিয়া যায়। তৃতীয় অংশটি মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বাহির হইয়া পেশী, অন্তগ্রন্থি বা অন্যান্য যন্ত্রে প্রবেশ করে। আবেগ পরিবহণের রাস্তাগুলি নিউরন দ্বারা গঠিত। একটি রাস্তায় কম পক্ষে তিনটি নিউরন থাকে। একটি অন্তর্গামী, একটি বহির্গামী এবং আর একটি এই দুই-এর যোজক হিসাবে। অন্তর্গামী নিউরন সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়গুলি হইতে আবেগ গ্রহণ করে বলিয়া ইহাদের বলা হয় সংজ্ঞাবহ নিউরন। বহির্গামী নিউরন দেহযন্ত্রকে চালনা করে ; এইজন্য উহাদের বলা হয় চালক নিউরন। যে নিউরন উহাদের যুক্ত করে তাহাদের বলা হয় আনুষঙ্গিক নিউরন।

সুষুম্নাশীর্ষক লালাগ্রন্থি হইতে লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু চোখে খাদ্যবস্তু না দেখিলে লালা বাহির হয় না। চোখ নার্ভদ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত আছে। খাদ্যের বার্তা মস্তিষ্কে পৌছাইলে, মস্তিষ্ক সুষুম্নাশীর্ষককে সংবাদ পাঠায়। সুষুম্নাশীর্ষক নার্ভ মারফত মুখের লালাগ্রন্থিকে নির্দেশ দেয়, তখন জিভে জল আসে।

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ছাড়া আমাদের দেহে আর একটি নার্ভতন্ত্র আছে, ইহাকে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র বলা হয়। ইহা দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিশেষ নার্ভতন্ত্র দেহের মধ্যে অবিরাম কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহা হৃৎপিণ্ডকে প্রতি মিনিটে ৭০ বার স্পন্দনের নির্দেশ দেয় ; ইহার ফলে দেহের মধ্যে রক্ত-সংবহন অব্যাহত থাকে। ইহা ছাড়া অন্ত্রের সংকোচন, বিভিন্ন অন্তগ্র্রন্থি হইতে ক্ষরণ এবং অন্যান্য আন্তর যন্ত্রগুলির কার্য এই তন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ্রন্থি

রসক্ষরা গ্রন্থি ঃ দেহ থেকে মল, মূত্র, ঘর্ম এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ বাহির হইবার জন্য কতকগুলি গ্রন্থি আছে। ইহাদের **সনালী গ্রন্থি** বলে। চোখের জল,

মায়ের বুকের দুধ, এই সকলই সনালী গ্রন্থির কাজ। ইহাদের ক্ষরণগুলি বাহ্যিক। কিন্তু দেহের ভিতরে আরও কতকগুলি গ্রন্থি আছে যাহাদের ক্ষরণ অন্তর্মুখী। এই সকল গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় **অনালী বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি।**

থাইরয়েড ঃ এই গ্রন্থিটি থাকে ঘাড়ের নীচে শ্বাসনালীর কাছে। ইহার আকৃতি ডানা-মেলা ছোট একটি প্রজাপতির মত। ইহার ক্ষরিত দ্রব্যের রাসায়নিক নাম **থাইরক্সিন।** থাইরক্সিন-এর একটি বিশেষ উপাদান আয়োডিন। মানুষের ব্যবহারের উপর থাইরয়েড গ্রন্থির প্রভাব অসামান্য। ইহার উপর দেহের ও মনের বিকাশ নির্ভর করে। এই সকল গ্রন্থি বা হর্মনের অভাব ঘটিলে দেহের **চামড়া শিথিল, চক্ষু নিষ্প্রভ** এবং **আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায়।** এরূপ ব্যক্তি উৎসাহহীন, অলস ও বুদ্ধির দীপ্তিহীন হয়। আবার ইহার **অতিরিক্ত ক্ষরণে** শরীরের **অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়।** বাড়তিটাও হয় দ্রুত। কিন্তু বুদ্ধির কিছু বৃদ্ধি হয় না।

এড্রেনাল গ্রন্থি ঃ উহারা একজোড়া ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থি। মূত্রাশয়ের ঠিক উপরেই অবস্থিত। এড্রেনালিন ক্ষরণের ফলে **হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুততর হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, পেশীগুলির বলবৃদ্ধি হয়। ফুসফুসের বায়ুবহা নাড়ীর মুখ খুব বেশি খুলিয়া যায়, তার ফলে রক্তে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে** সঞ্চালিত হয়। **পরিপাক ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।** সঞ্চিত গ্লাইকোজেন বিশ্লেষিত হইয়া রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

পিটুইট্যারী গ্রন্থি ঃ ইহার অবস্থান হইতেছে **গলার উপরে মস্তিষ্কের ঠিক নীচে।** ইহা ছোট, ঠিক একটি মোটর দানার মত। সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুইটি ভাগ আছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। অন্যান্য গ্রন্থির সুষ্ঠু ক্রিয়া এই গ্রন্থির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। ইহার সম্মুখের অংশ ক্ষতি-গ্রস্ত হইলে দেহের উত্তাপ কমিয়া যায়, হাত-পা টলে, শরীর শুকাইয়া যায় এবং হজমের গোলমাল হয়। আবার এই অংশ হইতে ক্ষরণ বেশী হইলে সর্বদিক হইতে **দেহটি বিরাট আকৃতির হয়।** আবার শিশু বয়সে ইহার ক্ষরণ কম হইলে **বৃদ্ধি থামিয়া যায় এবং মানুষটি হয় 'ক্ষুদে'।** ইহার পশ্চাতের অংশ দেহের মসৃণ পেশীগুলির সতেজভাব রক্ষা করার সাহায্য করে।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও রূপ রস শব্দ গন্ধ ও স্পর্শের মধ্য দিয়া জীবনের যা কিছু উপভোগ, যা কিছু প্রসার, এই ইন্দ্রিয় কয়টির সাহায্যেই হয়। পঞ্চইন্দ্রিয় গোচর না হইলে বাহিরের কোনও জিনিসই অনুভূত

হয় না। আনন্দ লাভ ও আত্মরক্ষার ইহারাই একমাত্র উপায়। ইহাদের অভাবে দেহ শুধু মাংসপিণ্ড মাত্র; জীবনের কোনও সার্থকতা থাকে না। একটি ইন্দ্রিয়ের অভাবেই জীবনের অনেক সাধ অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। অনুভূতির দিক দিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট কাজ আছে। সাধারণ জীবজন্তুর ইন্দ্রিয় শক্তি খুব প্রখর। ইন্দ্রিয়গুলি স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে সংবাদ দেয় মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতি একমাত্র মস্তিষ্কের বা মনের কার্য অর্থাৎ মনের সহিত সংযোগ না হইলে কোনও ইন্দ্রিয়ই অনুভূতি দিতে পারে না। সেইজন্য অন্যমনস্ক থাকিলে, কেহ ডাকিলে আমরা শুনিতে পাই না বা সম্মুখ দিয়া কেউ চলিয়া গেলে দেখিতে পাই না।

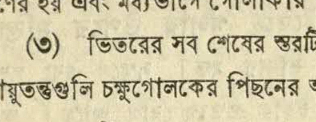
চক্ষু

মাথার খুলি ও মুখের অস্থি লইয়া চক্ষু-গহ্বর নির্মিত। তাহার মধ্যে, চর্বির গদির উপরে অক্ষিগোলক আছে। এই গোলক একটি মাংসপিণ্ড এবং স্নায়ু ও রক্ত-নলিতে পূর্ণ। ইহার তিনটি স্তর—(১) বাহিরে দৃঢ় শ্বেতবর্ণ টিস্যুর (আঁশের) আবরণ, চক্ষু তারা, বেষ্টনীর সম্মুখের অংশে কর্ণিয়া, ইহা স্বচ্ছ এবং বাহিরের দিকে ধনুকের মত ঠেলিয়া আছে। এই অংশ দিয়া চক্ষুর মধ্যে আলো যায়।

চক্ষুর গঠন

(২) মধ্যের স্তরটি পাটলবর্ণ ও সূক্ষ্ম রক্তনলিতে পূর্ণ; ইহার সম্মুখের অংশে, অর্থাৎ কর্ণিয়ার নীচে, চক্ষুতারা-বেষ্টনী (আইরিস্)। এই বেষ্টনী কৃষ্ণ পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণের হয় এবং মধ্যভাগে গোলাকার ছিদ্রযুক্ত (চক্ষু তারা বা কনীনিকা)।

(৩) ভিতরের সব শেষের স্তরটি (রেটিনা বা চক্ষুদানি) স্নায়ুময় শ্বেতবর্ণ। এই স্নায়ুতন্তুগুলি চক্ষুগোলকের পিছনের অংশে একটি ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্ক হইতে আসিয়া প্রায় তারা-বেষ্টনী পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া আছে। তারা-বেষ্টনীর নীচে গাঢ় মধুর ন্যায় পদার্থে পূর্ণ, স্ফীত কাচখণ্ডের মত একটি থলি (লেনস্) আছে। কোনও স্নায়ু বা রক্তনলী ইহাতে নাই। ইহাই দৃষ্টিশক্তির মূল কারণ। বাহিরের আলো ইহার মধ্য দিয়া চক্ষুদর্শনে (রেটিনা) পৌঁছায়। আলো না থাকিলে ইহার কোনও কাজ হয় না, সেজন্য অন্ধকারে কোনও জিনিস দেখা যায় না। ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার মত বাহিরের যে-



(ক) কর্ণিয়া; (খ) চক্ষুতারা-বেষ্টনী; (গ) চক্ষুতারা; (ঘ) লেন্স: (ঙ) পেশী; (চ) রেটিনা; (ছ) জলীয় অভ্যন্তর; (জ) বহিস্তর; (ঝ) মধ্যের স্তর।

কোনও বস্তুর ছবি ইহার মধ্য দিয়া চক্ষু-দর্শনে বিপরীত ভাবে আসিয়া পৌছায় এবং স্নায়ুর সাহায্যে সে বার্তা মস্তিষ্কে গিয়া দৃষ্টবস্তুর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান (বর্ণ, আকৃতি) দেয়।

তারা-বেষ্টনীর (আইরিস) প্রধান কাজ চক্ষুতে যে আলো আসিয়া পড়ে তাহার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। ইহা আবশ্যক মত সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া চক্ষুরন্ধ্র বা কণীনিকাকেও সেই সঙ্গে ছোট বড় করিয়া, দৃষ্টিশক্তির জন্য যখন যেমন প্রয়োজন সেই পরিমাণ মাত্র আলো কাচ-পুটের (লেন্স) মধ্য দিয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিতে দেয়; তীব্র আলোকে ক্ষুদ্র এবং অস্পষ্ট আলোকে প্রসারিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে কাচপুটক ক্রমশঃ শক্ত ও আড়ষ্ট হওয়ায় তাহার মধ্য দিয়া ঠিক মত আলো যাইতে পারে না বলিয়া দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়। বাহিরের আলো-রেখাগুলির সংযোগ-বিন্দু ঠিক চক্ষু-দর্শনের (রেটিনা) উপরেই পড়িলে সঠিক ছবি উঠে, নহিলে অস্পষ্ট বা বিকৃত হয়। যাহাদের চোখে আলো-রেখাগুলির সংযোগ চক্ষুদর্শনে পৌছিবার পূর্বেই হইয়া যায় তাহারা দূরের অপেক্ষা কাছের জিনিস ভাল দেখিতে পায় (সর্টসাইট)। যখন আলো-রেখাগুলি দর্শনে পৌছিয়াও যুক্ত হয় না তখন কাছের অপেক্ষা দূরের জিনিস ভাল দেখা যায় (লং সাইট)। চোখের দোষ হইলে অবিলম্বে চক্ষু পরীক্ষা করান ও প্রয়োজন হইলে চশমা লওয়া উচিত। নহিলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল ও মাথাধরা প্রভৃতি নানা উপসর্গ আসে। চশমা চক্ষুর ত্রুটি সংশোধন করিয়া রশ্মির সংযোগ-বিন্দুগুলিকে ঠিক দর্শনের (রেটিনা) উপর ফেলে। চক্ষুগোলকের ভিতরের সমস্ত অংশটি জলীয় পদার্থে পূর্ণ। চক্ষু-কোটরের অস্থিগুলি ও 'পাতা' দুইটি আঘাত হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে; পাতা দুইটি ও লোমগুলি (অক্ষিপক্ষ্ম) ধূলি বা তীব্র আলো চোখের মধ্যে আসিতে দেয় না। উপর 'পাতায়' প্রতি চক্ষুতে জলে-ভরা একটি ছোট থলি আছে—আনন্দে বা দুঃখে ইহা হইতে চোখের জল বাহির হয়, নাক দিয়াও (চোখের ভিতর কোণ হইতে একটি নলির মধ্য দিয়া) ঝরিয়া পড়ে; এই সংযোগ আছে বলিয়া ঝাঁঝাল কোন জিনিস নাকে ধরিলে চোখেও জল আসে।

চোখের কাজ

প্রতি চক্ষুতে ছয়টি পেশী আছে, তাহারা একপ্রান্তে গহ্বরের অস্থি ও অপর প্রান্তে চক্ষুগোলকের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে; ইহাদেরই সাহায্যে আমরা চক্ষুকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ। চক্ষু সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তীব্র আলোকের দিকে চাহিয়া থাকা বা অস্পষ্ট আলোকে চক্ষু 'টান' করিয়া লেখাপড়া করা

বা অন্য কাজ করা বা ছোট অক্ষরের বই পড়া খুবই ক্ষতিকর। পড়িবার সময় চক্ষুর সম্মুখে আলো না রাখিয়া পাশ বা উপর হইতে আলো আসিয়া যেন বই খাতার উপরে পড়ে এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। শুইয়া শুইয়া বই পড়া চোখের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। চক্ষুর ক্লান্তিবোধ হইলেই কিছুক্ষণের জন্য চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হয়। দূরে, যতদূর দৃষ্টি যায়, কোন বস্তুর প্রতি বা দিকচক্রবালে চাহিয়া থাকা অথবা কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু বন্ধ করিয়া শীতল জলে ধুইয়া ফেলা প্রভৃতি অভ্যাসগুলি চোখের পক্ষে মঙ্গলজনক। নীল আকাশ ও সবুজ তরুলতাও চক্ষুকে স্নিগ্ধ রাখে। নিদ্রা চক্ষুর স্বাভাবিক বিশ্রাম লাভের উপায়।

চোখের যত্ন

কর্ণ

কানের তিনটি অংশ—(১) বাহিরের মাংস ও কানের 'খাল', বাহিরের শব্দ ইহাদের মধ্য দিয়া কানে যায়। (২) মধ্যের অংশ—একটি ঢাকের মত, মাথার খুলির গহ্বরে আছে; ইহার নিম্নভাগে একদিকে কানের খালের পাশে ঢাকের চামড়ার মত একটি পর্দা (কর্ণপটহ) এবং অপর দিক দিয়া একটি নল গলদেশ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহা সর্বদা বায়ুপূর্ণ থাকে; কারণ, কর্ণপটহের দুইদিকে বায়ুর (অর্থাৎ বহির্বায়ু ও শ্বাসবায়ুর) চাপ সমান না থাকিলে ভাল শোনা যায় না। এই জন্য বেশী গলা ফুলিলে সময়ে সময়ে কানে তালা লাগে। কর্ণপটহ এবং ভিতর কানের সংযোগ পর পর তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দ্বারা হয়। (৩) ভিতরের কান বা মূল শ্রবণ-যন্ত্র। খুলির মধ্যে রগের হাড়ের (টেম্পোরাল) নীচে থাকে। ইহার অভ্যন্তর তরল পদার্থে পূর্ণ; মধ্যাংশ স্থূল, সম্মুখভাগ শামুকের খালের মত গুটান, এবং পশ্চাদ্‌ভাগ তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি নলের মত। এই তিনটি নলের মধ্যে তরল পদার্থ আছে, তাহা দেহের গতির সঙ্গে উঠানামা করে।

কর্ণের গঠন



ক—কানের খাল; খ—মধ্যের অংশ; গ—মূল শ্রবণ-যন্ত্র; ঘ—অস্থিত্রয়; ঙ—কর্ণপটহ; চ—স্নায়ু; ছ—ইউস্টেশিয়াননল

শব্দ মাত্রেই তরঙ্গের মত বাতাসের মধ্য দিয়া ভাসিয়া আসে। শব্দ বাহিরের কান দিয়া আসিয়া কর্ণপটহে স্পন্দন দেয়। সেই স্পন্দন ক্ষুদ্র অস্থিত্রয়ের পর পর কম্পনের ফলে ভিতর কানে পৌঁছিয়া সেখানের তরল পদার্থকে তরঙ্গিত করে। সেই তরল শামুকের খোলের মত অংশে গিয়া বিশিষ্ট স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোষগুলিকে স্পন্দিত করে এবং তাহাদের সাহায্যে মস্তিষ্কে গিয়া

আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। কলকারখানার অবিরাম শব্দ ও কোলাহল, যে-কোনও তীক্ষ্ণ ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতিকর এবং মস্তিষ্ককেও দুর্বল করে। বজ্রধ্বনিতে কত লোক বধির হইয়া যায়। কানে আঘাত করা বা কান ধরিয়া সজোরে টানা অনিষ্টকর। কানে 'খোল' হইলে, অল্প গরম সরিষার তেল বা সোডা-গ্লিসারিণ লইয়া সাবধানে তুলা দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। পেন্সিল, কলম বা সেফটিপিন কোনও কিছুর সাহায্যে কান খোঁচার অভ্যাস খুব খারাপ। অসাবধানে ঘা লাগিয়া শুধু বধিরতা নয় আরও নানা উপসর্গ ঘটিতে পারে। কর্ণপটহ ছিন্ন হইলে আর নূতন হয় না।

কানের যত্ন

নাসিকা

নাসারন্ধ্র বহু সূক্ষ্ম রক্তনলীপূর্ণ একটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। সেইজন্য বাহিরের শ্বাসবায়ু রক্তনলীর সংস্পর্শে উত্তপ্ত না হইয়া ফুসফুসে যাইতে পারে না, এবং বায়ু-প্রবাহিত ধূলিকণা ও রোগবীজাণুগুলি ঝিল্লীর শ্লেষ্মায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মুখ দিয়া শ্বাস লইলে বহির্বায়ুর দূষিত অংশ উত্তাপ ও শ্লেষ্মার অভাবে শোধিত না হইয়াই বরাবর মুখ ও গলনলী দিয়া ফুসফুসে যায়; তাহার ফলে মুখে দুর্গন্ধ, গলগ্রন্থির প্রদাহ, উদরাময়, সহজে ঠাণ্ডা লাগা ও নানাভাবে স্বাস্থ্যহানি হয়। মাঝে মাঝে ভাল করিয়া নাক ঝাড়িলে বায়ু ও শ্লেষ্মার সঙ্গে অনেক দূষিত জীবাণু বাহির হইয়া যায়। সুতরাং গন্ধানুভূতিই নাসিকার একমাত্র কার্য নয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুকোষগুলি নাসারন্ধ্রে 'খিলানের' পাশে আছে। গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া এই স্নায়ুকোষগুলিতে লাগে এবং সেখান হইতে স্নায়ুতন্তুগুলি সে সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া গিয়া আমাদিগকে ঘ্রাণের অনুভূতি দেয়, এবং সুগন্ধে তৃপ্তি ও দুর্গন্ধে স্বাস্থ্যের অপকারী বস্তু হইতে আমাদের সতর্ক করিয়া দেয়।

জিহ্বা

ইহা একটি মাংসপিণ্ড মাত্র; মুখগহ্বর এবং গলনলীর উপর অংশে অবস্থিত এবং চারিটি পেশীর সাহায্যে মুখগহ্বরে বিভিন্ন অংশে যুক্ত আছে। ইহার মূলদেশ, চোয়ালের ভুজ ও কণ্ঠের নিকট একটি অস্থির সহিত যুক্ত। স্নায়ু, রক্তনলী এবং শ্লেষ্মা ও রসবাহী থলিতে ইহা পরিপূর্ণ। স্পর্শ-শক্তি দেহ-ত্বকে সর্বত্র আছে, কিন্তু আস্বাদন-বোধ মাত্র জিহ্বাতেই হয়; জিহ্বাই আবার বাক্‌শক্তির প্রধান কারক এবং খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিবারও সহায়ক। ডাক্তারেরা সাধারণতঃ রোগীর নাড়ীর পরই জিহ্বা পরীক্ষা করেন; কারণ পাচক-ক্রিয়ার

জিহ্বার গঠন

ব্যতিক্রম জিহ্বায় প্রকাশ পায়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নরম জিভ-ছোলা ব্যবহার করিলে খাদ্যের আস্বাদন ও ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়। আস্বাদনের বিশিষ্ট কোষগুলি জিহ্বার ত্বকে এবং গলনলীর কিয়দংশ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই কোষের সহিত যুক্ত স্নায়ুগুলি বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদের কথা মস্তিষ্ককে জানায়। তাহার ফলে আমাদের আস্বাদন-বোধ হয়।

জিহ্বার যত্ন

ত্বক বা চর্ম

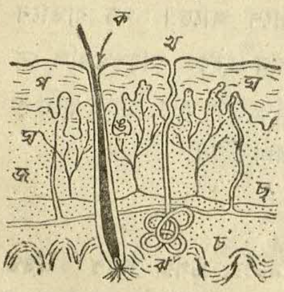
চর্মের গঠন

ত্বক দেহের বহিরাবরণ। ইহার তিনটি অংশ—(১) উপরের সূক্ষ্ম আঁশ ; ইহাতে রক্ত বা স্নায়ু নাই, সুতরাং অনুভূতিও থাকে না ; করতলে পদতলে এবং যে অংশে ঘর্ষণ বেশি হয় (যেমন গোয়ালাদের কাঁধে), ইহা অপেক্ষাকৃত স্থূল।

(২) মধ্যের অংশ, এই ভিতরের আবরণকে এপিডারমিস্ বলা হয়। ইহাই দেহের বর্ণকারক ; জাতি বিশেষে ইহা শ্বেত, পীত, তাম্রাভ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। প্রদেশবিশেষে এবং সূর্যকিরণের প্রভাবেও এই বর্ণের অনেক তারতম্য হয়।

(৩) নীচের অংশ বা আসল ত্বক, ইহাকে ডারমিস বলা হয়। রক্তবহা নলী ও স্নায়ুপূর্ণ অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ের মত ইহা জাগিয়া আছে ; এই স্নায়ুগুলিই বাহিরের সহিত অনুভূতি আদান-প্রদান করে। ত্বকের মধ্যে **ঘর্মনলী ও রোমকূপগুলি** অনিচ্ছাধীন মাংসপেশী দ্বারা আবদ্ধ হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যভাগ ফাঁপা। গ্রীষ্ম, শীত সকল সময়েই দেহের ক্ষয়জনিত দূষিত পদার্থ কতক অংশ ঘর্মরূপে বাহির হইয়া যায়। দেহের যে-কোনও পরিশ্রমে ঘর্মনালীর কাজও বাড়ে এবং দূষিত পদার্থগুলিকে শীঘ্র বাহির করিয়া দিয়া দেহ সুস্থ রাখে। দেহের তাপের আধিক্যও এই ঘর্মনালী দিয়া বাহির হয়। 'ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়া' এইজন্য বলে। সময়বিশেষে আবার তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া দেহ হইতে অতিরিক্ত তাপ বাহির হইতে দেয় না, অর্থাৎ দেহের যথাযথ তাপ রক্ষা করে (যেমন শীতকালে)। রোমকূপগুলি স্নেহপদার্থে পূর্ণ এবং ত্বকের মধ্যে বাঁকা ভাবে থাকে, ভয়ে বা আনন্দে তৎসংলগ্ন অনিচ্ছাধীন পেশীগুলির আকর্ষণে ইহারা সোজা হইয়া উঠে। এই রোমকূপের নীচে হইতে স্নেহপদার্থ আসিয়া উপরের ত্বক মসৃণ রাখে।

চর্মের কাজ



(ক) রোমকূপ ; (খ) ঘর্মনলী ; (গ) মধ্যত্বক ; (ঘ) স্নেহপদার্থ ; (ঙ) অনিচ্ছাধীন পেশী ও তাহার স্নায়ু ; (চ) স্নায়ু ; (ছ) রক্তবহানলী ; (জ) ডার্মিস ; (ঝ) ঘর্মনলীর মূল।

প্রতিদিন স্নান ও দেহের সমস্ত অংশ মার্জনা করিলে রোমকূপগুলি পরিষ্কার থাকে, ফলে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়াও স্বাভাবিক হয়। কিন্তু পরিশ্রান্ত অবস্থায়, ভরাপেটে বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ। সুস্থ লোকের পক্ষে শীতল জলে স্নান হিতকর—ইহাতে দেহে উদ্দীপনা আসে ; বৃদ্ধ, শিশু বা রোগীর পক্ষে উষ্ণ জল প্রশস্ত—ইহা দেহ স্নিগ্ধ করে। প্রতিদিন মাথার চুলে তেল বা গ্লিসারিন দিলে এবং নরম চিরুনী ও ব্রাস দিয়া টানিলে মাথার চুল ও ত্বক দুই-ই ভাল থাকে।

চর্মের যত্ন

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া : হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা ও কৈশিক নাড়ী—ইহাদের সাহায্যে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়। **হৃৎপিণ্ড** একটি ত্রিকোণাকৃতি অনিচ্ছাধীন পেশীময় পদার্থ। বক্ষের অস্থি ও পঞ্জরের উপাস্থির পশ্চাতে, উভয় ফুসফুসের মধ্যস্থলে, এবং ডায়াফ্রাম বা বক্ষের খিলানের ঠিক উপরে কোণাকুণি ভাবে ইহা অবস্থিত। দেহের মধ্যরেখার দক্ষিণে ইহার এক-চতুর্থাংশ এবং বামে বাকী ত্রি-চতুর্থাংশ থাকে। বাম স্তনের ঠিক এক ইঞ্চি নীচে এবং ১½ ইঞ্চি ভিতরের দিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঞ্জরের মধ্যস্থ ত্বকের উপর অঙ্গুলি রাখিলে ইহার স্পন্দন অনুভূত হয়। ইহার অভ্যন্তর লম্বালম্বি একটি পর্দা দ্বারা দক্ষিণ ও বাম দুইভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে দুইটি (উপরে নীচে) করিয়া মোট চারিটি কুঠুরী আছে। **উপরের কুঠুরী দুইটিকে বাম ও দক্ষিণ অরিকল এবং নীচের কুঠুরী দুইটিকে বাম ও দক্ষিণ ভেন্টি্রকেল বলে।** সাধারণ মানুষের হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় ৯ আউন্স এবং প্রত্যেক মানুষের নিজের মুষ্টির ন্যায় ইহার আকার।

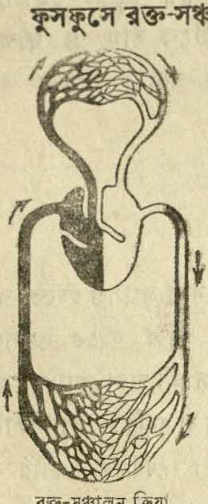
আর্টারি, ভেন ও ক্যাপিলারী

(ধমনী, শিরা ও কৈশিকা-নাড়ী)

যে নলী হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে তাহাকে ভেন এবং যে নলী হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত বহন করে তাহাকে আর্টারি বলে। যে সকল নলী দ্বারা শরীর হইতে হৃৎপিণ্ডে দূষিত রক্ত আসে তাহাদের নাম ভেন বা শিরা, এবং যে সকল নলিদ্বারা শোধিত রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে সর্বশরীরে বাহিত হয় তাহাদের নাম আর্টারি বা ধমনী। ক্যাপিলারি-গুলি আর্টারি এবং ভেনগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখে। যেখানে ধমনীর সূক্ষ্ম প্রশাখাগুলি শেষ হইয়াছে এবং শিরার সূক্ষ্ম প্রশাখা আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে উভয়ের মধ্যে ইহারা মাকড়সার জালের ন্যায় বিস্তৃত থাকে। ধমনীর শেষ বিস্তার ক্যাপিলারিতে কিন্তু শিরার আরম্ভ ক্যাপিলারি হইতে।

রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া : অম্লজান-যুক্ত, পরিষ্কৃত এবং শোধিত লোহিত বর্ণ রক্ত, হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকেল হইতে শরীরের প্রধান ধমনী বা এওর্টাতে প্রবাহিত হয়। এওর্টা হইতে বহু শাখা ধমনী নির্গত হইয়া দেহের বিভিন্ন বিভাগে এই শোধিত রক্ত সঞ্চালিত করে। এই ধমনীগুলি পুনরায় বহু শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া ক্যাপিলারি রূপে দেহের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ধমনীর এই ক্যাপিলারিগুলি অতি সূক্ষ্ম আবরণে গঠিত। এই আবরণের মধ্য দিয়া ধমনীর রক্তের রস ও অক্সিজেন (অম্লজান) দেহের তন্তু (টিস্)-গুলির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের পুষ্টিসাধন করে ; তাহার প্রতিদানে টিস্গুলির ক্ষয়জনিত উৎপন্ন কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (কার্বন ডাই-অক্সাইড) রক্তের মধ্যে চলিয়া আসে। অক্সিজেনের অভাবে এবং দূষিত গ্যাসের সংস্পর্শে এইবার রক্ত ক্রমশঃ নীল ও গাঢ় বেগুনী বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া ক্যাপিলারি হইতে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অন্যান্য শিরার ক্যাপিলারির সহিত সংযোগের ফলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল হইয়া অবশেষে দুইটি বৃহৎ শিরার সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অরিকলে এবং সেখান হইতে দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেলে পৌছায়। শিরাগুলির (বিশেষতঃ অঙ্গের শিরাগুলির) মাঝে মাঝে কপাট বা দরজা আছে বলিয়া দূষিত রক্ত সম্মুখেই অগ্রসর হয়, আর পশ্চাদ্‌গমন করিতে পারে না,—ফুটবলের সিরিঞ্জের মত তাহার কার্য হয়।

ফুসফুসে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া : হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগে আসার পর এই শিরার রক্ত শোধন করার আবশ্যক হইয়া পড়ে। দূষিত গ্যাস দূর করিবার জন্য এবং নূতন অক্সিজেন গ্রহণ করিবার জন্য এই রক্ত এখান হইতে পাল্মোনারী আর্টারির সাহায্যে ফুসফুসে নীত হয় এবং সেখানে এই আর্টারির সাহায্যে ফুসফুসে নীত হয় ; এবং সেখানে এই আর্টারির অসংখ্য ক্যাপিলারির সাহায্যে দক্ষিণ ও বাম ফুসফুসের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইবার এই ক্যাপিলারির সহিত ফুসফুসের অসংখ্য বায়ুকোষের আদান-প্রদান হইতে থাকে। নিঃশ্বাসের বায়ুতে যে অম্লজান গ্যাস (অক্সিজেন) বাহিরের হাওয়ার সহিত লওয়া হয়, সেই অম্লজান গ্যাস ক্যাপিলারির রক্তে চলিয়া আসিয়া রক্তকে বিশুদ্ধ গাঢ় লোহিত বর্ণে রূপান্তরিত করে ; এবং দূষিত কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ক্যাপিলারির সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া ফুসফুসের বায়ুকোষে চলিয়া গিয়া প্রশ্বাসের বায়ুর সহিত


রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া

শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ফুসফুস হইতে এইরূপে শোধিত হইয়া এইবার এই গাঢ় লোহিত বর্ণ রক্ত পাল্মোনারী ভেনের সাহায্যে বাম অরিকল হইয়া বাম ভেন্ট্রিকেলে যায়, এবং তারপর সেখান হইতে প্রধান ধমনী বা এওর্টাতে গিয়া পুনরায় সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। এইরূপে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

চিত্রের মধ্যস্থলে হৃৎপিণ্ড, ইহার চারিটি কুঠরিতে বিভক্ত রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের উপরে ফুসফুসীয় (পাল্মোনারী) রক্তসঞ্চালন এবং নিম্নের অংশে দেহের সাধারণ রক্ত-সঞ্চালন কিরূপে হয় দেখান হইয়াছে। যে সকল নলী দিয়া দূষিত রক্ত চালিত হয় তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ এবং যে সকল নলী দ্বারা শোধিত রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে দেখান হইয়াছে। উভয় প্রকার নলীর সংযোগস্থলে ক্যাপিলারি রহিয়াছে। তীর চিহ্ন দ্বারা রক্ত-সঞ্চালনের গতি নির্দেশ করা হইয়াছে।

নাড়ীর গতি ঃ হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক নিয়মে অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। বাম ভেন্ট্রিকেলের সঙ্কোচনের ফলে হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীতে সজোরে রক্ত চালিত হয় এবং তাহার ফলে ধমনীর নলীগুলিও ততবার বিস্তৃত হইয়া সেই রক্ত প্রবাহিত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। এই রক্ত-সঞ্চালনই নাড়ীর গতি নির্দেশ করে। অস্থির উপরে ও চর্মের ঠিক নীচে যে-কোন ধমনীতে অঙ্গুলির চাপ দিলে এই নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়। শিরাতে এই স্পন্দন থাকে না। কারণ, সূক্ষ্মতম ধমনীর (ক্যাপিলারির) মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হওয়ার পর রক্তের সে বেগ আর থাকে না।

সাধারণতঃ ধমনীতে (আর্টারি) প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ ইঞ্চি এবং শিরায় (ভেন) ৪ ইঞ্চি হিসাবে রক্তের গতি। হৃৎপিণ্ডের বাম ভাগ হইতে নির্গত হইয়া ধমনী ক্যাপিলারি ও শিরা দিয়া সমস্ত শরীর একবার ঘুরিয়া আসিতে রক্তবিন্দুর মাত্র ২০ সেকেণ্ড সময় লাগে। সাধারণতঃ দেহে রক্তের পরিমাণ দেহের ওজনের $\frac{1}{১৩}$ অংশ।

চিকিৎসকেরা রেডিয়াল ধমনীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিয়া নাড়ী দেখিয়া থাকেন। এই 'নাড়ীর' স্থান বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে কব্জি হইতে এক ইঞ্চি নীচে ও হাতের কিনারা হইতে আধ ইঞ্চি ভিতরের দিকে।

বয়স্ক লোকের দেহে সুস্থাবস্থায় প্রতি মিনিটে গড়পড়তা ৭২ হইতে ৭৫ বার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়, তবে ব্যক্তিবিশেষে ইহার তারতম্য হয়; বালকদের ৮০ হইতে ১০০ এবং শিশুদের ১০০ হইতে ১২০ বার। ইহা নাড়ী গণনা করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু উঠিয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে তাহার হার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

মানবদেহে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া ঠিক শহরে কলের জল সরবরাহের অনুরূপ। উপমা স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, হৃৎপিণ্ডকে জলের কলের পাম্পিং স্টেশন (অর্থাৎ যেখান হইতে কলের চাপে জল বাহির হয়), আর্টারি ও ধমনীগুলিকে পরিষ্কার জল সরবরাহের পাইপ বা নল, এবং ভেন বা শিরাগুলিকে অপরিষ্কার ও আবর্জনাপূর্ণ জল বহন করিবার নর্দমা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়াটি কলের জল সরবরাহের কার্যের সঙ্গে তুলনা

শহরে যেমন প্রতি গৃহের ব্যবহৃত দূষিত ও পঙ্কিল জল ক্ষুদ্র নর্দমা দিয়া বাহির হইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ নর্দমা দিয়া অবশেষে গঙ্গায় গিয়া পড়ে, এবং পরে পুনরায় সেই নদীর জল উত্তোলিত এবং বিভিন্ন কলের সাহায্যে (বিভিন্ন ফিল্টারিং চেম্বারে) বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতর হইয়া পাম্পিং স্টেশনে আসিয়া পৌছায় এবং সেখান হইতে যন্ত্রের চাপে চালিত হইয়া পুনরায় ব্যবহারের জন্য প্রতি গৃহে সরবরাহ হয়; মানবদেহেরও ঠিক সেই মত দূষিত রক্ত ক্যাপিলারি হইতে শিরা (অর্থাৎ নর্দমা) দ্বারা চালিত হইয়া ও কিড্‌নী প্রভৃতি দিয়া কতক শোধিত হইয়া দক্ষিণ অরিকলে এবং পরে দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেলে ও সেখান হইতে পাল্মোনারী আর্টারী দ্বারা ফুসফুসে যাইয়া কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস প্রভৃতি রক্তের দূষিত অংশ প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত করিয়া দেয়, এবং তারপর নিঃশ্বাস বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা আরও শোধিত হইয়া সেই রক্ত পাল্মোনারী ভেন দ্বারা হৃৎপিণ্ডের বাম অরিকলে (অর্থাৎ পাম্পিং স্টেশনের বৃহৎ চৌবাচ্চায়) জমা হয়। তারপর পাম্পিং স্টেশনের কলের ন্যায় হৃৎপিণ্ডের অবিরাম আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে, এই বিশুদ্ধ রক্ত বাম ভেন্ট্রিকেল হইয়া এওর্টা বা প্রধান ধমনীতে এবং সেখান হইতে বিভিন্ন ধমনী দিয়া পিচকারীর ন্যায় প্রবাহিত হয়; সর্বশেষে সূক্ষ্ম ধমনীগুলি (ক্যাপিলারি) দিয়া (প্রতি গৃহে পাইপ দিয়া বিশুদ্ধ জলের ন্যায়) দেহের প্রত্যেক অংশে টিস্থগুলিতে রক্ত সরবরাহ হয়।

রক্তের উপাদান ঃ রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া বুঝিলেই শেষ হইল না, এই সঙ্গে রক্ত কি, উহার উপাদান কি কি, কিরূপে তাহা উৎপন্ন হয় এবং উহার কার্যাবলীও বা কি সবই জানা আবশ্যক। খাদ্য বা পানীয় যাহা কিছু আমরা গ্রহণ করি তাহাই নানা-রূপে পরিবর্তিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। ভুক্ত দ্রব্যাদি মুখ হইতে অন্নবহা নলী দ্বারা প্রথমতঃ পাকস্থলীতে এবং সেখান হইতে ক্ষুদ্র যন্ত্রসমূহের মধ্যে গিয়া পড়ে। মুখের লালা এবং পাকস্থলীর অন্ত্রসমূহের ও যকৃৎ প্রভৃতির পাচক রস নানাভাবে এই খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত করিয়া তাহাকে দেহে গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া দেয়। খাদ্যদ্রব্য এইভাবে জীর্ণ হয়—

(১) প্রথমে মুখে ও দন্তের সাহায্যে চর্বিত ও লালার সহিত মিশ্রিত হয় ;

(২) শ্বেতসার অংশ লালার সাহায্যে কতক জীর্ণ হইয়া পাকস্থলীতে পৌঁছায় ;

(৩) সেখানে গ্যাসট্রিক রস নিঃসারিত হইয়া প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কতক জীর্ণ হয় এবং পাকস্থলীর উত্তাপে স্নেহজাতীয় পদার্থ গলিত হয়। এইখানে প্রায় সকল খাদ্য তরল হইয়া যায় ;

(৪) পাকস্থলী হইতে বাহির হইলেই পিত্ত ও প্যানক্রিয়াসের রস আবার প্রোটিন, শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় পদার্থ জীর্ণ করিতে থাকে ;

(৫) তারপর ক্ষুদ্র অন্ত্রের রসে শর্করা জাতীয় খাদ্য জীর্ণ হইতে থাকে ;

(৬) ইহার পর এই সব নানা পাচক রস সংযুক্ত ভুক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে পেশীর আকুঞ্চনে ভালভাবে মিশ্রিত হইতে হইতে এবং ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে হইতে অগ্রসর হইতে থাকে।

এইরূপে পরিবর্তিত খাদ্যের রস ক্রমে পাকস্থলী ও অন্ত্রগাত্রস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্যাপিলারী দ্বারা গৃহীত হইয়া কতক অংশ যকৃতের মধ্য দিয়া ইনফিরিয়র ভেনাকেভা নামক বৃহৎ শিরায় গিয়া পড়ে এবং কতক অংশ 'থোরাসিক ডাক্ট' নামক নলী দিয়া গলার নীচে সাবক্লেভিয়ান ভেন নামক শিরায় রক্তের সহিত মিলিত হয়। তারপর ইহা দক্ষিণ অরিকল, ভেন্ট্রিকেল, ফুসফুস, এবং পরে বাম অরিকল ও বাম ভেন্ট্রিকেলে গিয়া ধমনী ও ক্যাপিলারি দিয়া সর্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া দেহের টিসুগুলির পুষ্টিসাধন করে।

উপযুক্ত খাদ্য হইতে যে রস রক্তরূপে পরিণত হয় তাহাতে শরীর পোষণের উপযোগী সকল রকম উপাদান বর্তমান থাকে। রক্ত সূক্ষ্মতম শিরার (ক্যাপিলারি) সাহায্যে সেই সকল উপাদান দেহের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়—দেহের জীবকোষগুলি তাহা হইতে আপন আপন পুষ্টির উপযোগী উপাদান গ্রহণ করিতে থাকে ; কারণ সকল জীবকোষের প্রয়োজন একই নয়—মাংসপেশী, স্নায়ু ও অস্থি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহার সারভাগ রক্তে পরিণত হইয়া সবই শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে লাগে। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে, মাত্রাধিক্য ঘটিলে, যখন কিছুতেই তাহাকে কাজে লাগাইতে পারা যায় না (যেমন গুড় বা চিনি খুব বেশি খাইলে) তখন তাহার কতক অংশ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। বাম ও দক্ষিণ কুক্ষিতে অবস্থিত যে দুইটি কিডনী আছে উহারাই ধমনীর রক্ত হইতে এই সকল অনাবশ্যকীয় অংশ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল এবং টিসুগুলির ক্ষয়জনিত যে সকল পদার্থ রক্তে আসিয়া পড়ে (ঘর্মরূপে এবং ফুসফুসে প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলেও টিসুগুলির ক্ষয়জনিত কতক দূষিত অংশ দূর হইয়া যায়) সে সকল বাহির করিয়া

লইয়া মূত্রাধারের সাহায্যে শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে বা যে সকল পদার্থ জীর্ণ হইবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহৎ অন্ত্রে আসিয়া মলরূপে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ দূষিত বীজাণুপূর্ণ হইতে থাকে। প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ না হইলে, অন্ত্রগাত্রস্থ সূক্ষ্ম নলীগুলি এই বিষ ক্রমশঃ রক্তের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়।

রক্তের কার্য ঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে ভুক্তদ্রব্য হইতে পাচক রসাদির ক্রিয়ায় যে রস উৎপন্ন হয়, রক্ত সেই রসবিশেষ মাত্র। রক্তের এই রসের নাম প্লাজমা। অসংখ্য জীবকোষ ইহাতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

লোহিত কণিকার কাজ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদিগকে স্পষ্ট দেখা যায়। এই জীব-কোষগুলি দুই প্রকারের—লোহিত ও শ্বেত। প্রথমোক্তগুলি সংখ্যায় খুব বেশি (প্রায় ৫০০ গুণ); ইহাতে হিমোগ্লোবিন নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। এই হিমোগ্লোবিনের ধর্ম অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড আকর্ষণ করা। ইহারই সাহায্যে রক্তের লোহিত জীবকোষগুলি ফুসফুসের বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং সেই অক্সিজেন ক্যাপিলারির মধ্য দিয়া টিস্থগুলিকে দিয়া টিস্থগুলির ক্ষয় হইতে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতিগ্রহণ করে। শ্বেতবর্ণ জীবকোষগুলি (ফ্যাগোসাইটিস্) দেহের রক্ষী বিশেষ; তাহারা যে-কোনও কারণে অনিষ্টকারী কোন জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়।

শ্বেতকণিকার কাজ

শ্বেতকোষগুলি যখন এইভাবে সমস্ত দূষিত জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে তখন রোগের উপশম ও শান্তি হয়। কিন্তু জীবাণুগুলি প্রবল হইলে শ্বেতকোষগুলিকে বিষাক্ত করিয়া নিজেরাই জয়ী হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আর একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক। ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন যে রস রক্তরূপে পরিণত হয় তাহা সাধারণতঃ দেহপুষ্টির কারণ হইলেও, অখাদ্য বা কোনও বিষাক্ত জিনিস খাইয়া ফেলিলে যকৃতের রসের সাহায্যে সব সময় তাহার সমস্ত বিষ নষ্ট হয় না। সুতরাং সেই বিষ সাধারণভাবে রক্তচলাচলের দ্বারা হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির টিস্থগুলিকে আক্রমণ করিয়া নানা উপসর্গ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। কিড্নীদ্বয়ের মধ্য দিয়াও কতক বিষ বাহির হইয়া যায় বটে কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগে। এজন্য বিষ উদরস্থ হইলে যতশীঘ্র সে বিষ নষ্ট করিয়া ফেলা যায় (বমি বা দাস্ত করাইয়া বা অন্য কোনও জিনিসের সাহায্যে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া)—তাহাই প্রধান কর্তব্য।

বিশুদ্ধ রক্তের আবশ্যকতা ঃ আমাদের দেহের মধ্যে জৈবিক ক্রিয়ার ফলে স্নায়ু মাংসপেশী প্রভৃতির অবিরত ক্ষয় ও পূরণ চলিতেছে। দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমের অনুপাতে ইহার মাত্রাধিক্য বা হ্রাস হয়; কিন্তু মানুষ বা যে-কোনও জীব যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন এই ক্ষয় পূরণ চলিবেই। এইজন্য উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা, কারণ তাহারই সারভাগ হইতে রক্তের উৎপত্তি এবং রক্ত হইতেই দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। শৈশব ও যৌবনই দেহবৃদ্ধির সময়। এই সময় পুষ্টিকর আহারের বেশি আবশ্যক হয়। প্রয়োজন মত খাদ্য না পাইলে টিস্যুগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া শরীরকে দুর্বল করে ও জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসে। অন্যদিকে আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনাবশ্যক খাদ্যে উদর পূর্ণ করিতে থাকিলে পাকস্থলী, যকৃৎ, কিড্‌নী, অন্ত্র প্রভৃতি ক্রমশঃ বিপর্যস্ত ও দুর্বল হইয়া আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্য

বায়ুই জীবন। বায়ুর অভাবে জীবনক্রিয়া একেবারে অচল। জীবদেহে গ্রহণোপযোগী অক্সিজেনের পূর্ণ মাত্রা বিশুদ্ধ বায়ুতেই থাকে, সেইজন্য সর্বদা বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করা আবশ্যক। বায়ু-চলাচল রহিত ঘরে বা বদ্ধস্থানে ভীড়ের মধ্যে অনেকক্ষণ থাকিলে অথবা মাথা মুখ ঢাকিয়া শয়ন করিলে, অক্সিজেনের অভাবে এবং প্রশ্বাস বায়ুর দূষিত গ্যাস পুনরায় নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এবং লোকে কত সময় অচৈতন্য হইয়া পড়ে, এমন কি মৃত্যুও ঘটে।

বায়ু ও বায়ুর উপাদান ঃ বায়ুর প্রধান উপাদান তিনটি; যেমন, **অক্সিজেন, নাইট্রোজেন** ও **কার্বন ডাই-অক্সাইড** গ্যাস। ইহাছাড়া **জলীয় বাষ্প**, দূষিত **অ্যামোনিয়া গ্যাস**, এবং **হিলিয়াম, নীয়ন, আর্গন, ক্রপটন, জেনন** প্রভৃতি গ্যাসও বায়ুর ভিতর আছে। অঞ্চল হিসাবে বায়ুর ভিতর আবার কতকগুলি গ্যাস বর্তমান থাকে; যেমন, সামান্য পরিমাণে ওজোন (সমুদ্রতীরে), সূক্ষ্ম ধূলিকণা, কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন (কলকারখানা অঞ্চলে) এবং মার্শ গ্যাস (শ্মশানে ও ভাগাড়ে)।

বিশুদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২১ (প্রায়), ৭৯ ও ·০৪ ভাগ।

অক্সিজেন এত তীব্র যে উহার সহিত **নাইট্রোজেন মিশ্রিত না থাকিলে জীবকুল ধ্বংস হইয়া যাইত।** শুধু অক্সিজেন নিঃশ্বাস দিয়া টানা যায় না, দম বন্ধ হইয়া আসে, ঐ কারণে প্রায় চতুর্গুণ ইহার সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। প্রশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়া ষোল ভাগ ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়িয়া প্রায় পাঁচভাগ হয়, কারণ রক্ত কিছু অক্সিজেন টানিয়া লয় ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। এই অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ক্রমশঃ বায়ুতে ছড়াইয়া যায়। দিবাভাগে সূর্যকিরণের প্রভাবে উদ্ভিদ (তরুলতা ইত্যাদি) বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড আকর্ষণ করিয়া নিজেদের দেহ পোষণের জন্য তাহা হইতে কার্বন রাখিয়া বহির্বায়ুতে অক্সিজেন ত্যাগ করে। এইভাবে বায়ুর উপাদানের সমতা রক্ষা হয়। কিন্তু রাত্রিতে উদ্ভিদ, সাধারণ জীবের প্রশ্বাস বায়ুর ন্যায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। সুতরাং **রাত্রিতে গাছপালার কাছে থাকিতে নাই** বলিয়া যে কথা আছে তাহা কুসংস্কার নয়।

বায়ুতে শতকরা দশ ভাগের কম অক্সিজেন হইলে শ্বাসকষ্ট এবং শতকরা তিন ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড হইলে দেহের বিশেষ অনিষ্ট হয়। অন্যদিকে আবার শতকরা ২৩ ভাগের বেশী অক্সিজেনও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

দূষিত বায়ুঃ বায়ুর ভিতর গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া **ভাসমান ধূলিকণা, নানাপ্রকার** রোগজীবাণু এবং **গলিত বৃক্ষলতা বা মৃতদেহ হইতে উৎপন্ন দূষিত অ্যামোনিয়া গ্যাস,** ধূলির সহিত মিশ্রিত **ধাতব পদার্থ** ইত্যাদি প্রতিনিয়তই বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের ভাইরাস বায়ুতে মিশিয়া বায়ু দ্বারাই আবার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া **যক্ষ্মা, নিমোনিয়া, ডিপথেরিয়া** রোগের জীবাণু দ্বারা বায়ু দূষিত হয়। বাসগৃহে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে না পারিলে এবং সেই গৃহে যদি বহুলোকের বাস হয় তাহা হইলে মনুষ্যদেহের নিঃশ্বাস-নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও রোগজীবাণু গৃহের বায়ুকে দূষিত ও অস্বস্তিকর করিয়া তোলে। স্বাস্থ্যের পক্ষে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ক্ষতিকর।

বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ·০৪ ভাগ, কিন্তু নিঃশ্বাস বায়ুতে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪·৫ ভাগে দাঁড়ায়। বদ্ধঘরে বায়ুর কার্বনের ভাগ বাড়িতে থাকে আর অক্সিজেনের ভাগ কমিতে থাকে।

মুক্তবায়ু সেবনের উপকারিতা

সুতরাং প্রতিদিন গৃহের বাহিরে কিছুক্ষণ খোলা হাওয়ায় থাকিতে পারিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হয়। মুক্ত বায়ু সেবনে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়,

রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনের প্রফুল্লতা বজায় থাকে। স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া বাসগৃহে এবং বিদ্যালয়ে মাথাপিছু নির্দিষ্ট ঘনফুট স্থান নির্ধারণ করা হয়। প্রতি ঘণ্টায় একজন মানুষের ৩০০০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়।

বায়ু-সঞ্চালন : বায়ু একটি গ্যাসীয় পদার্থ। বায়ুতে উত্তাপ লাগিলেই উহা প্রসারিত হয় এবং হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং ঐ স্থান শীতল এবং ভারী বাতাস আসিয়া পূর্ণ করে। ইহার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে সর্বত্র বায়ু-চলাচল হইতে থাকে। বায়ু-চলাচল না হইলে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং আমরা সব সময়ই একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে সময় কাটাই।

বাসগৃহের চতুর্দিকের **দূষিত বায়ুকে তাড়াইয়া বিশুদ্ধ বায়ু আনয়নই বায়ু-সঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য**। সাধারণতঃ দুইটি উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন কার্যকরী করা সম্ভব ; যেমন, প্রাকৃতিক উপায় ও কৃত্রিম উপায়।

প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন : সূর্যকিরণ, গাছপালা ও ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা বায়ু-সঞ্চালনের কাজ হইয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলে। **প্রখর সূর্যকিরণে রোগজীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়।** বাড়ীর চতুর্দিকের পচনশীল দ্রব্যাদি সূর্য-কিরণে শুষ্ক হইয়া যায় এবং **বায়ুর দুর্গন্ধ দূর করিয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলে।** আবার **সূর্যের উত্তাপে ভূ-পৃষ্ঠস্থ বায়ু হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, সেই স্থান শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু অধিকার করে।**

গাছপালা দ্বারাও বায়ু নানাভাবে বিশুদ্ধ হইতেছে। বৃক্ষবহুল স্থানে বৃষ্টিপাত বেশি হয় ; বৃষ্টির জল বায়ুমধ্যস্থ ভাসমান ধূলিকণা ও রোগজীবাণুগুলিকে ধৌত করিয়া বায়ুকে কিছু পরিমাণে বিশুদ্ধ করার সাহায্য করে। গাছপালা দিনের বেলায় **সূর্যকিরণের সংস্পর্শে বায়ুর কার্বন টানিয়া লয় ও অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়** ; ফলে গাছপালাবহুল স্থানের বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা বেশি থাকে। বৃষ্টি যেমন বায়ুকে বিশুদ্ধ করার সাহায্য করে আবার ঝড়ের সময়ও হঠাৎ বায়ুর বেগ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে অতি দ্রুত ঘরের দূষিত বায়ু বিতাড়িত হইয়া নির্মল বায়ু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। ইহাকে **পারফ্লেসন** বলে।

বায়ু-বিশোধনের কাজটি সব সময় প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলে চলে না। বাসগৃহের সুব্যবস্থা না থাকিলে বাইরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের দূষিত বায়ুকে তাড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। উষ্ণ দূষিত বায়ু ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য গৃহের উপরের দিকে ছিদ্রপথ অর্থাৎ **ঘুলঘুলি** (ভেন্টিলেটর) রাখিতে হয়। আবার শীতল ও ভারী বায়ু প্রবেশের জন্য নীচের দিকে **রুজু রুজু দরজা-জানালার** ব্যবস্থা

রাখিতে হয়। এইজন্য একটি স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণের সময় যথোপযুক্ত দরজা-জানালার ব্যবস্থা রাখা দরকার। শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখিবার জন্য গৃহে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা থাকে। অগ্নিকুণ্ডের উপর চিমনীর ব্যবস্থা রাখা হয়। **চিমনীর ভিতর দিয়া উত্তপ্ত দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং খোলা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা নির্মল বায়ু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে।** অগ্নিকুণ্ড ছাড়াও ঘরের ভিতর চিমনীর ব্যবস্থা রাখিলে ঘরের দূষিত উষ্ণ বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু অন্য পথে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

সাধারণ বাসগৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-বিশোধনের উপায়টি গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু শহরে বড় বড় বাড়ীতে বা অফিসে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। **যন্ত্রপাতির সাহায্যে অথবা বিশেষ কোন পদ্ধতির সাহায্যে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়।** দুইটি যান্ত্রিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হয় ; (১) **এক্সট্রাকশন** পদ্ধতি (২) **প্রপালশান** পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে ঘরের ভিতর **বৈদ্যুতিক পাখার** সাহায্যে দূষিত বায়ুকে বিতাড়িত করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু আনয়নের ব্যবস্থা করা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে **বায়ু-নিয়মন** (এয়ার কণ্ডিশনিং) ; বায়ুকে বিশোধিত করার পর প্রয়োজন মত শীতল বা উষ্ণ করা হয়। আবহাওয়াকে আরামপ্রদ করিবার জন্য সিনেমা, থিয়েটার হলে এবং ধনী পরিবারে বায়ু-নিয়মনের ব্যবস্থা খুব প্রচলিত। তবে ইহা স্বাস্থ্যের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিসাধনই বেশি করে।

জল (Water)

জলই জীবন। এই চল্‌তি কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে বলিতে হয় বায়ুর মত জলও আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। জলের তিনটি রূপ—**তরল, কঠিন ও বাষ্পীয়।** জল ফুটিয়া বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠিয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। বিশুদ্ধ জল **স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন।** জলের কোন আকার নাই।

জলের বৈশিষ্ট্য

জল একটি যৌগিক পদার্থ। দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের সংযোগে রসায়নাগারে জল তৈরী করা হয়।

জলের উপাদান

দুইটি উপায়ে আমরা জল পাই—**প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম।**

(১) **প্রাকৃতিক জল : (ক) সমুদ্র-জল, (খ) নদী, খাল, বিল, হ্রদ প্রভৃতির জল, (গ) বৃষ্টির জল, (ঘ) প্রস্রবণের জল** প্রভৃতি জলকে প্রাকৃতিক জল বলা হয়।

জলের উৎস

(ক) **সমুদ্রজল :** ভূ-পৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ জল। **প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার জলের উৎস হইতেছে এই সমুদ্র।** সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয় ; মেঘ হইতেই বৃষ্টির হয়। এই বৃষ্টির জলই ভূগর্ভের স্তরে সঞ্চিত থাকে। নদীর জলের উৎসও এই সমুদ্র-জল। সমুদ্রের জলে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ থাকার জন্য ইহা পানের উপযোগী নহে। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, কারণ ইহার ভিতর পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি লবণ মিশিয়া আছে। ইহার ভিতর সোডিয়াম ক্লোরাইড শতকরা ২.৬ ভাগ।

(খ) **নদীর জল :** বৃষ্টির জল এবং হিমবাহের তুষার-গলা জল হইতেই নদীর উৎপত্তি। নদী সাধারণতঃ পর্বত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া নদীর খরস্রোতে **শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম পলিমাটিতে** পরিণত হয়। নদীর জলে পলিমাটি ভাসমান দূষিত পদার্থ হিসাবে মিশ্রিত থাকে। বৃষ্টির জল ভূ-পৃষ্ঠ ধৌত করিয়া নদীর সহিত মিলিত হয় বলিয়া নদীর জলে **রোগ-বীজাণুও থাকে।** সেই কারণে বিশোধন না করিয়া এই জল পান করা উচিত নহে।

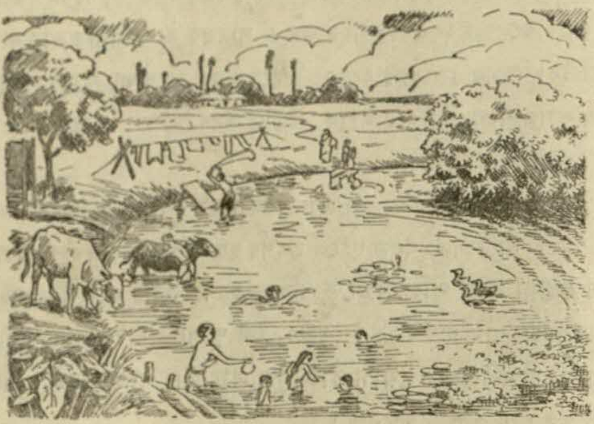
(গ) **বৃষ্টির জল :** সমুদ্র, নদী প্রভৃতির জল সূর্যের কিরণে বাষ্পীভূত হইয়া অধিক উচ্চতায় উঠিলে শীতল হইয়া ধরাপৃষ্ঠে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। ইহা **একপ্রকার পাতন প্রক্রিয়া,** এই কারণেই বৃষ্টির জল কোন **কিছুর মাধ্যমে পতিত না হইলে ইহা আংশিক** ভাবে বিশুদ্ধ। কিন্তু মাটিতে পড়িবার সময় বায়ুর **ধুলিকণা, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নানাবিধ দ্রবণীয় গ্যাস এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড, অ্যামোনিয়া** প্রভৃতি ইহাতে দ্রবীভূত হয়। ফলে ইহাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল বলা যায় না।

(ঘ) **প্রস্রবণের জল :** বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িয়া ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; এবং প্রবেশ্য স্তর ভেদ করিয়া অপ্রবেশ্য স্তরে গিয়া স্থির হয়। **প্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ইহা পরিস্রুত হইয়া যায় ;** কিন্তু মৃত্তিকার লবণ সমূহ কিছু পরিমাণে ইহাতে দ্রবীভূত হইয়া যায়। যেমন, **যে স্থানে গন্ধকের (Sulphur) পরিমাণ অধিক, সেই স্থানে ইহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত** থাকে। ইহাকে খনিজ জল বলা হয়।

(২) **কৃত্রিম জল :** যে জল মানুষকে পরিশ্রম করিয়া অর্থাৎ মাটি খুঁড়িয়া ভূগর্ভের তলদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয় তাহাই হইতেছে কৃত্রিম জল। **কূপ, পুষ্করিণী, নলকূপ** কৃত্রিম জলাশয় প্রভৃতির জলকে কৃত্রিম জল বলা হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ পানীয় হিসাবে এবং জলসেচের কার্যে ব্যবহৃত হয়।

গ্রামের জল দূষিত হওয়ার কারণ

শহরে জলের বরাদ্দ সীমিত। সুতরাং আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধি-



বাসীদের অনেক সময় জলের অভাব ভোগ করিতে হয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে জলের অপচয়ও হয়। গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও জলই আবার গ্রামবাসীদের বিপন্ন করিয়া তোলে। বিশুদ্ধজলের অভাব অনেক সময় প্রকটভাবে দেখা দেয়, এই কারণে জলবাহিত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব লাগিয়াই থাকে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা অজ্ঞতাবশতঃ একই পুকুরে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, গরু-মহিষ স্নান করায়, রোগীর কাপড়, রোগীর বস্ত্রাদি ধৌত করে আবার ঐ জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে।

পানীয় জল : প্রাকৃতিক জলকে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করিলে উহা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত; কেননা ইহাতে **নানাপ্রকার লবণ, ধূলাবালি, রোগজীবাণু** প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন; আমরা একেবারে স্বাদহীন জল পান করিতে পারি না। অক্সিজেন এবং প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ ইহাতে দ্রবীভূত থাকিলে জল সুপেয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হয়। জলকে পানীয় হিসাবে গ্রহণ করিতে হইলে ইহাকে অদ্রবণীয় দূষিত পদার্থ দূর করিয়া বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে জীবাণুমুক্ত করিতে হয়। ইহার জন্য **অল্প সময়ে প্রচুর জল পরিস্রুত করা যায়** এমন এক পরিস্রাবণ-প্রণালী গ্র্যাভিটি ফিলট্রেশন পদ্ধতির আশ্রয় লওয়া হয়।

(ক) নদী, খাল, বিল প্রভৃতির ঘোলা জলে ফটকিরী দিয়া রাখিয়া দিলে অদ্রবীভূত ময়লাগুলি শীঘ্রই থিতাইয়া পড়ে এবং উপরের জল পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে

জীবাণু ধ্বংস হয় না। ইহাকে পরে কমপক্ষে ২০ মিনিট ফুটাইয়া লইলে ঐ জল জীবাণুমুক্ত হইতে পারে। গ্রামাঞ্চলে এইভাবেই জল পরিশ্রুত করা হয়।

(খ) ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে কলস-ফিল্টারের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা গ্র্যাভিটি ফিলট্রেশন। এই পদ্ধতিতে পর পর চারিটি মাটির কলস সাজানো থাকে। সর্ব নিম্নের কলস ব্যতীত অন্যান্য সকল কলসে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। প্রথম কলসে অপরিশ্রুত জল, দ্বিতীয়টিতে থাকে কাঠ-কয়লা এবং তৃতীয়টিতে থাকে বালি ও ছোট ছোট নুড়ি। সর্বনিম্ন চতুর্থটিতে পরিশ্রুত জল সংগৃহীত হয়। প্রথম কলসের ছিদ্রপথে জল দ্বিতীয় কলসে আসে। এখানে কাঠ-কয়লা দ্বারা জল প্রাথমিক ভাবে পরিশ্রুত হয়। তৃতীয় কলসের বালি ও নুড়ির মধ্য দিয়া আসিবার সময় সূক্ষ্ম ভাসমান কণাগুলি আটকাইয়া যায়। কিন্তু তখনও রোগজীবাণু থাকিতে পারে। ইহাকে জীবাণুমুক্ত করা হয় স্ফুটনের সাহায্যে। ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রায় সকলপ্রকার রোগজীবাণু ধ্বংস হয়। এইভাবে স্বচ্ছ ও জীবাণুমুক্ত জল পানীয় হিসাবে গ্রহণ করা যায়।



কলস-ফিল্টার

(গ) **বার্কফেল্ড ফিল্টার বটল্** (Berkfeld Filter Bottle) **:** কলস-ফিল্টার ছাড়া বার্কফেল্ড ফিল্টার বটল্-এর সাহায্যে জল পরিশ্রুত করা যায়। এই ফিল্টার বটলের ভিতর পোরোসিলেন বা চীনামাটির নল থাকে। এই নলে এতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে যে জলের দূষিত পদার্থগুলি ঐ জলে আটকাইয়া যায়। পরিশ্রুত জল নলের মুখে আসিয়া সঞ্চিত হইলে কল খুলিয়া লইয়া জল বাহির করিয়া লইতে হয়। এই প্রণালীতে জল শোধন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রের চাহিদা মিটাইতে পারে।



বার্কফেল্ড ফিল্টার বটল্

(ঘ) **শহরের পানীয় জল :** গ্রামের তুলনায় শহরের লোকসংখ্যা অনেক বেশি এবং নদী, পুষ্করিণীও খুব নিকটবর্তী থাকে না। সেই কারণে শহরের লোকদের জন্য স্থানীয় পৌরসভাকেই জল সরবরাহ করিতে হয় ; এবং পাইপের সাহায্যে বাড়ী

বাড়ী জল পৌছাইয়া দিতে হয়। শহরের লোকসংখ্যা বেশি থাকাতে সেখানে অধিক পরিমাণে জল পরিস্রুত করিয়া সরবরাহ করিতে হয়। কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহ করিবার দায়িত্ব কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর। এই বিরাট নগরীর অগণিত লোকের জল সরবরাহ করা সহজ কথা নহে। গঙ্গাবক্ষ হইতে জল উঠাইয়া পলতায় উহাকে পরিস্রুত করা হয়। এবং এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ টালা ট্যাঙ্কে উহা সঞ্চয় করিয়া পরে পাইপের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়।

দুই পর্যায়ে এই জল পরিস্রুত করা হয়। প্রথমতঃ, পাম্পের সাহায্যে নদী হইতে জল উঠাইয়া কতকগুলি **বিরাট জলাধারে** (Settling tank) সেই জল রাখা হয়। সেই জলাধারে জলের স্রোত না থাকায় অদ্রবণীয় ভাসমান ধূলিকণাগুলি থিতাইয়া পড়ে। প্রয়োজন হইলে দ্রুত থিতাইবার জন্য উহাতে ফটকিরি দেওয়া হইয়া থাকে। তার-জালের খাঁচায় ফটকিরির চাঙ্গর রাখিয়া এই সকল জলাধারে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে জলের ময়লা শীঘ্র থিতাইয়া যায়। ইহাদের নিকটে থাকে **ফিল্টার বেড** সমন্বিত ট্যাঙ্ক। এইগুলি ইটের তৈয়ারী বিরাট চতুষ্কোণ চৌবাচ্চা। এইগুলিতে পর পর কতকগুলি স্তর থাকে। সর্বোচ্চে থাকে মিহি বালির স্তর, তাহার পর মোটা বালির স্তর, তাহার পর কাঁকর ও সর্বনিম্নে পাথরের নুড়ির স্তর থাকে। প্রতিটি স্তর কয়েক ফুট প্রশস্ত। প্রথম পাইপের মাধ্যমে সেটলিং ট্যাঙ্ক হইতে জল এই স্তরগুলির উপর ফেলা হয়। পর পর সাজানো এই সকল পরিস্রাবক স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে জল পরিস্রুত হইয়া যায়। **কিন্তু রোগজীবাণু তখনও থাকিয়া যায়।** এই রোগজীবাণুকে বিনষ্ট করিতে জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ক্লোরিণ বা ওজোন গ্যাস এই কার্যে ব্যবহার করা হয়। অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করিলেও জীবাণু ধ্বংস হয়।



পানীয় জল পরিস্রাবণ

চৌবাচ্চার মিহিবালির মাঝখানে একটা পলির স্তর পড়ে। জলের ময়লা ও জীবাণু এই স্তরে আটকাইয়া যায়। এই জন্য এই স্তরকে **ভাইটাল লেয়ার** (Vital layer) বলে।

কৃত্রিম উপায়ে গৃহে পানীয় জল সরবরাহ

প্রাকৃতিক জলকেই বিশেষভাবে সংগ্রহ করিয়া মানুষ পানীয় হিসাবে গ্রহণ করে। মানুষের চেষ্টায় এই যে জল প্রাপ্তির ব্যবস্থা ইহা নানা প্রকারের হইয়া থাকে।

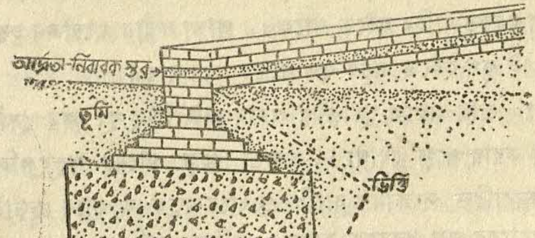
কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে সাধারণতঃ আমরা জল সংগ্রহ করি। কূপ নানা প্রকারের হয় ; যেমন, **অগভীর কূপ, গভীর কূপ, নলকূপ, আর্টেজীয় কূপ।**

দূষিত কূপ

অগভীর কূপের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। কাদার পরে বালির স্তর থেকে এই জল তোলা হয়। এখানে মৃত্তিকার উপরের ময়লা জল চোঁয়াইয়া সব সময়ই কূপের জলের সহিত মিশিয়া যায়, এবং ঐ কূপের জলকে দূষিত করিয়া তোলে।

সংরক্ষিত কূপ

গভীর কূপকে যদি স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে ঐ কূপ হইতে আমরা বিশুদ্ধ জল পাইতে পারি। প্রথমতঃ, কূপটি যথেষ্ট গভীর হইতে হইবে, মৃত্তিকার অপ্রবেশ্য স্তর ভেদ করিয়া আরও কিছুটা নীচের স্তর হইতে এই জল বাহির করা হইবে। অনেক সময় নির্মাণ-পদ্ধতি এবং ব্যবহারের ত্রুটি থাকার দরুণ এই জল দূষিত হয়। কূপ যতটা গভীর, নীচ থেকে ততটা পর্যন্ত ইটের গাঁথুনী দিয়া ভিতরের দিকে সিমেন্টের পলস্তরা করিয়া এমন ভাবে সুরক্ষিত করা হইবে যাহাতে বাহিরের ময়লা জল চুয়াইয়া কূপের জলে মিশিতে না পারে। ইহা ছাড়া কূপের বাহিরের দিকটাতেও বেশ খানিকটা জায়গা সহ কংক্রীটের সাহায্যে বাঁধাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই গোল বাঁধানো জায়গার



একপাশ ঢালু থাকিবে এবং একটি নর্দমার ব্যবস্থা রাখা দরকার। কূপের উপরে একটি চালের ব্যবস্থা থাকিলে গাছের পাতা ও পাখীর বিষ্ঠা প্রভৃতি পড়িয়া কূপের জল দূষিত হইতে পারে না। এই কূপের জল তুলিবার জন্য কপিকল, দড়ি ও বালতির

প্রয়োজন। বালতি যাহাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে কূপের জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট ফেলিলে জল ভাল থাকে।

নলকূপ (Tube-well) ঃ সাধারণতঃ গভীরতার উপর নলকূপের জল ভাল মন্দ নির্ভর করে। নলকূপ ১০০ ফিট হইতে ১৫০ ফিট পর্যন্ত গভীর হইলে পানীয়ের পক্ষে উপযুক্ত হয়। পাম্পের সাহায্যে ঐ জল তোলা হয়। মাটির নীচে নলের সর্ব নিম্ন প্রান্তে অসংখ্য ছিদ্র ছিদ্র একটি তামার চোঙ্গ লাগানো থাকে। ইহা ছাকনীর কাজ করে। এইভাবে আমরা নলকূপ হইতে পরিস্রুত জল পাই। সাধারণ কূপের মত নলকূপের উপরিভাগের কিছু জায়গা সিমেণ্ট করিয়া দিতে হয়। শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই নলকূপ পানীয় জলের অভাব মেটায়। কর্পোরেশন এবং মিউনিসি-প্যালিটির ব্যবস্থায় প্রতি বৎসর কলিকাতায় এবং ছোট ছোট শহরে বহু নলকূপ জন-সাধারণের জন্য স্থাপিত হইতেছে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে **জাতীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসূচী** (National Water Supply and Sanitation Programme) চালু হইয়াছে। প্রথম দুই পরিকল্পনায় ১০২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ১২৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। তবে সরকারী চেষ্টা জনসাধারণের সতর্কতা ও সহযোগিতা ছাড়া কখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। কারণ বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা থাকার পরও উহা নানাভাবে দূষিত হয়।

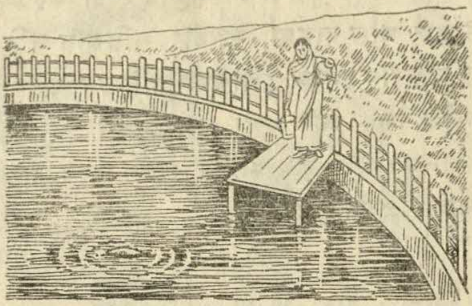
সরকারী প্রচেষ্টা

আর্টেজীয় কূপ ঃ মাটির নীচের গভীর তলদেশ হইতে জল যাহাতে নিজের চাপেই বাহির হইয়া আসে ঐরূপ ব্যবস্থার কূপকে আর্টেজীয় কূপ বলে। মৃত্তিকার অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যবর্তী প্রবেশ্য স্তরে যে জল সঞ্চিত থাকে তাহাই পাম্পের সাহায্য ব্যতীত এই কূপ হইতে বাহির হইতে থাকে। পাম্প করার প্রয়োজন হয় না বলিয়া বিনা পরিশ্রমে এই কূপ হইতে প্রচুর জল সংগ্রহ করা যায়।

পুষ্করিণী ঃ গ্রাম অঞ্চলে পুষ্করিণীর অভাব নাই, কিন্তু খুব কম পুষ্করিণীই আছে যাহার জল পান করার পক্ষে যোগ্য। অজ্ঞতা হেতু গ্রামের পুকুরগুলি দূষিত হয়, যাহার ফলে জলবাহিত সংক্রামক ব্যাধি সেখানে মড়ক আকারে ছড়াইয়া পড়ে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুরকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে হয়। এই পুকুরের ২০০ গজের ভিতর যাহাতে কোনও লোকালয়, হাট-বাজার, গোরস্থান, কাঁচা নালা-নর্দমা প্রভৃতি না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। পুকুরের চারিপাশে যেন বড় বড় গাছ না থাকে। পুকুরের চারিপাশ বাঁধানো থাকিবে এবং চওড়া সিঁড়ি থাকিবে। দেওয়াল ঘেরা থাকিবে যাহাতে যে-কোনও মানুষ প্রবেশ করিয়া জল দূষিত করিতে না পারে। জল তোলার জন্য

স্বতন্ত্রীকৃত পুষ্করিণী

দড়ি-বালতি ও কপিকলের সাহায্য নেওয়া উচিত। জল বিশুদ্ধ রাখার জন্য এই সব পুকুরে মাছ ছাড়া যাইতে পারে। পাড়ের মাটি যাহাতে ধ্বসিয়া জল দূষিত



স্বতন্ত্রীকৃত পুষ্করিণী

হইতে না পারে সেজন্য পাড়ে ঘাস লাগানো যায়। সর্বোপরি স্বতন্ত্রীকৃত পুষ্করিণীর জন্য একজন প্রহরী রাখার ব্যবস্থা করিলে ইহার উদ্দেশ্য খুবই ফলপ্রসূ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর যত্ন

মানব সম্প্রদায়ের কোনও কোনও জাতির ভিতর দেখা যায়, **প্রতি একশত শিশুর ভিতর পঁচাত্তরটি** শিশুরই এক বৎসর বয়সের পূর্বেই মৃত্যু ঘটে, আবার এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের শিশু-মৃত্যুর হার এত কম যে **প্রতি একশত শিশুর ভিতর মাত্র পাঁচটি শিশু** এক বৎসর বয়সের ভিতর মারা যায়। শিশু-মৃত্যুর হারের এতো পার্থক্যের মূল কারণ উপযুক্ত **যত্নের অভাব**। ভারতবর্ষে শিশু-মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ শিশুর জন্মের ঠিক অব্যবহিত পর **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার** অভাব। উহা ছাড়া বেশির ভাগ শিশু অপুষ্টজনিত রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মায়েরা **অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যবশতঃ** গর্ভকালীন অবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেক জননী আছেন শিশু-পালন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা সত্ত্বেও কি ভাবে শিশুকে যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতে হয় সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই। শিশু ভাষা দ্বারা কিছু প্রকাশ করিতে পারে না,

অতএব ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে প্রায় এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে **অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ** করে কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় **অনেক কম খাদ্য** গ্রহণ করে—এই সকল কারণে শিশু নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অঙ্কুরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুর উপযুক্ত **খাদ্য-ব্যবস্থা**, সর্বাঙ্গীণ **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা, মুক্তবায়ু সেবন, পোশাক-পরিচ্ছদ** পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের প্রতি জননীর সম্যক জ্ঞান অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ, অতএব জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় করিতে হইলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা গড়িয়া তোলাই প্রধান কাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহে শিশুর স্থান

মানব জীবনে গৃহের প্রভাব সর্বাধিক। কারণ মানব শিশুর মত পরনির্ভরশীল আর কেহ নয়। অন্যান্য জীবজন্তু ও প্রাণী তাহার পিতামাতার উপর সামান্য কিছুদিন মাত্র নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবকের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইতে হয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, চালচলন, রীতিনীতি ও কার্যকলাপ তাই মানুষকে শৈশব হইতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অনুকরণের দ্বারাই শিশু শিক্ষা লাভ করে। গৃহে পিতামাতা, ভাইভগিনী, অন্যান্য সদস্যদের কার্যকলাপ ও চাল-চলন যে যেমনটি দেখে তেমনটি শিখে, ফলে পরিবার মানব শিশুকে শুধু খাদ্য ও বস্ত্র যোগায় না; তাহার মনে তাহার ভবিষ্যতের বীজও বপণ করে। গৃহে শিশু যেমন **খাদ্য-বস্ত্র, আশ্রয়, স্নেহ, যত্ন ও শিক্ষা** পাইয়া পরনির্ভরশীল হইয়া উঠে, অন্যদিকে তেমনি সে **আত্মত্যাগ করিবার, অপরের সহিত ভাগ করিয়া লইবার, অপরের সাহায্যে অগ্রসর হইবার** প্রারম্ভিক শিক্ষাও লাভ করে। এইভাবে শিশুর মধ্যে **সামাজিক, অর্থনৈতিক** এমনকি **রাজনৈতিক ধারণাও** অঙ্কুরিত হয়। গৃহের পরিবেশ যদি অসৎ ও কুৎসিত হয়, তবে ঐ সকল পরিবেশে শিশুও অসৎ পথে চালিত হইয়া অস্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিবে। আবার গৃহ-পরিবেশ তাহাদিগকে সৎ ও সুন্দর জীবনেই অভ্যস্ত করে; মানুষের রুচি ও প্রবণতা

তাহার পরিবারের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এইভাবেই পারিবারিক পরিবেশে মানব চরিত্রের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে।



গৃহে শিশুর পরিবেশ

ছোট একটি শিশু, তাহার যত্নের জন্য কাজের যেন আর অন্ত নাই। কেবল মাত্র জননী নয়, সমগ্র পরিবারটি যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়ে শিশুর সুখ-সুবিধার চিন্তায়। শিশুর ভাষা নাই, কান্নার ভিতর দিয়া সে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা প্রকাশ করে। বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মাতা কান্নার ধরন শুনিয়া শিশুর অভাব-অভিযোগের বার্তা উপলব্ধি করিতে পারে; পরক্ষণেই সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়ে। কিন্তু এমন অনেক মাতা আছেন যাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার অভাবে শিশুর প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিষয় তাহার নিকট অজ্ঞাত; এক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে শিশু স্বভাবতঃ রুগ্ন ও অসুস্থ হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? শিশুর খাদ্য, স্নান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, নিদ্রা, শিশুর চিত্তবিনোদন—এ সকল ব্যবস্থাই শিশুর গৃহের পরিবেশে মায়ের হাতেই সম্পন্ন হয়।

শিশুর খাদ্য ঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব হইতেই শিশুর দেহের পরিপোষণের জন্য মায়ের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্য থাকা প্রয়োজন। শিশু মাতৃজঠরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের খাদ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর যতদিন তাহার দেহের

পরিপোষণ মাতৃদুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, ততদিন পর্যন্ত মায়ের খাদ্যের প্রতি পূর্বাপেক্ষাও বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শিশু জন্মাইবার পূর্বে মায়ের খাদ্য

শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে মায়ের খাদ্যে ২৫০০ ক্যালোরি থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শিশু জন্মাইবার পর মায়ের খাদ্যে ক্যালোরি থাকা প্রয়োজন ৩০০০। স্তনদাত্রী মায়ের খাদ্যে পূর্বাপেক্ষা **প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের** পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হয়। মা অসুস্থ থাকিলে অথবা মাতৃস্তনে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ না থাকিলে শিশুকে **গো-দুগ্ধ** অথবা **বেবী ফুডের** উপর নির্ভর করিতে হয়। মাতৃ-দুগ্ধে শিশুর প্রয়োজন মত সমস্ত উপাদানই থাকে কিন্তু গো-দুগ্ধ ফুটাইবার পর **সি-ভিটামিন** একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; উহা ছাড়া **লৌহের** পরিমাণও গো-দুগ্ধে থাকে না। সুতরাং শিশু-বয়সে প্রতিদিন উহাকে কমলালেবুর রস খাওয়ানো উচিত। শিশুর দাঁত উঠিবার পর প্রথম হইতেই তাহাকে **গলা-ভাত, আলু সিদ্ধ, বিস্কুট, ডিমের কুসুম** এই সকল খাদ্যে অভ্যস্ত করানো উচিত। দাঁত উঠিবার পর শিশুকে কলা,-দুধে ভিজানো পাউরুটি,

শিশু জন্মাইবার পর মায়ের খাদ্য



পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত শিশু

মাছ, সব্জীর জুস প্রভৃতি খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। একই শ্রেণীর খাদ্য শিশুকে অদল বদল করিয়া দিলে শিশুর স্বাদের বৈচিত্র্য থাকিবে এবং খাদ্যের প্রতি শিশুর স্পৃহা জন্মাইবে। শিশুর এক মাস বয়স থেকেই দুধের ভিতর ২।৩ ফোঁটা **কডলিভার অয়েল** মিশাইতে হয়। কডলিভার অয়েল ভিটামিন 'ডি'-এর অভাব পূরণ করে। ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে শিশুর **অস্থি-বিকৃতি রোগ হয়**। কেবল মাত্র পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইলেই চলিবে না; প্রত্যেক মায়ের শিশুর খাদ্যের সময় ও বারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিশুর আহারের সময় পার হইয়া গেলেও যেমন ক্ষতিকর আবার তেমনই শিশুর খাদ্য গ্রহণের পূর্বে আহার করানোও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ অভ্যাস। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার

খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিও মায়ের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিশু পালনেও আর্থিক অবস্থা লঙ্ঘন করা চলে না ; সুতরাং অবস্থাপন্ন পরিবারে যেখানে শিশুকে দুধ, কমলালেবু, ডিম, ছানা, কলা, বিস্কুট প্রভৃতি খাদ্য দ্বারা শিশুর পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করিতেছে সেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে বিভিন্ন ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়া শিশুর জন্য মূল্যবান খাদ্যের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সেই কারণে এই সকল ক্ষেত্রে **কম মূল্যের পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হয়।** দুধের পরিমাণ যথোপযুক্ত দিতে না পারিলে কয়েক বার দুধ দিয়া মাঝে মাঝে সুজি, শঠি, সাবু প্রভৃতি জাল দিয়া দুধের ভিতর মিশাইয়া খাওয়ানো যায়। কমলালেবুর পরিবর্তে টমেটোর রস দেওয়া যায়। মটরশুঁটি, পালং, পেপে প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া লবণ মিশাইয়া উহার স্যুপ শিশুকে খাইতে দেওয়া যায়, উহাতে **ক্যালসিয়াম, ভিটামিন** প্রভৃতির অভাব পূরণ হয়। ডাল সিদ্ধ করার পর উহার জল ও আলুসিদ্ধ সহ গলা ভাত নিয়মমত খাওয়াইতে পারিলে শিশুর ক্যালোরির মাত্রা বজায় থাকে। তবে একটি কথা প্রত্যেক মায়ের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে শিশুর খাদ্য-রচনায় সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগী হইতে হয়। **সাধ্য মত শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা উচিত।**

শিশুর স্নানের যত্ন ঃ শিশুর শরীর স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকিলে প্রতিদিনই স্নান করানো উচিত। শিশুকে কখনই **খোলা জায়গায় স্নান করানো উচিত নয়। নাতিশীতোষ্ণ জলে** শিশুকে স্নান করানো কর্তব্য। শিশুকে কখনই অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে বা গরম জলে স্নান করাইবার অভ্যাস ভাল নয়। শীতের সময় মাঝে মাঝে শিশুকে স্নান না করাইয়া ভালভাবে সমস্ত শরীর স্পঞ্জ করিয়া দেওয়া উচিত। **বেলা ১০টার পূর্বে শিশুকে স্নান করাইবার পক্ষে উপযুক্ত সময়।** শীতকালে স্নানের পূর্বে শিশুকে **সূর্যস্নান** করাইয়া লইলে খুব ভাল হয়। সমস্ত দেহে ভাল সরিষার তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শোওয়াইয়া রাখিতে পারিলে শিশুর রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অস্থিবিকৃতি রোগ হইতে পারে না। সূর্যকিরণের **অতিবেগুনি রশ্মি শিশুর দেহে 'ডি' ভিটামিনের কাজ করে।** শিশুকে স্নান করাইবার সময় প্রথমে মাথা ধোওয়াইয়া গামলার ভিতর বসাইয়া তোয়ালে অথবা পুরাতন পরিষ্কার কাপড়ের টুকরার সাহায্যে স্নান করাইতে হয়। শিশুর দেহের কোনও অঙ্গই অতিরিক্ত জোরে রগড়াইতে নাই। তোয়ালে অথবা নরম কাপড়ের সাহায্যে আলতোভাবে চাপিয়া জল মুছিয়া ফেলিতে হয়। স্নানের পর একটি পাতলা জামা পরিধান করাইয়া শিশুকে বাহিরে আনিতে হয়। স্নানের পর খালি গায় রাখিলে

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়। মাঝে মাঝে শিশুকে সাবান মাখাইয়া স্নান করানো চলে। স্নানের পর প্রতিদিন শিশুকে পাউডার মাখানো ভাল। বিশেষ করিয়া দেহের যে সমস্ত জায়গা খাঁজ-কাটা সেই সকল স্থানে নিয়মিত পাউডার না দিলে ঘামাচি, চুলকানী প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। অত্যন্ত **ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যের সহিত শিশুর স্নান কার্যটি সম্পন্ন করিতে হয়।**

শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ : সদ্যোজাত শিশু থেকে আরম্ভ করিয়া দুই তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরাইয়া দিতে হয়। শিশুর জামা নরম ও ঢিলাঢালা হওয়া দরকার। শিশুদের পক্ষে গ্রীষ্মকালে সূতীর জামা এবং শীতের দিনে পশমের জামা পরিধান করাইতে হয়। অন্য কোনও তন্তু বা কৃত্রিম রেশম শিশুকে পরিধান না করানোই ভাল। শিশুর জামা যাহাতে অত্যন্ত সহজভাবে পরিধান করানো যায় সেইভাবে তৈরী করিতে হয়। অতিরিক্ত **কাঁটছাট, লেস যুক্ত জামা** শিশুর জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়। শিশুর জামায় কখনও **বোতাম বা সেফটিপিন ব্যবহার করা উচিত নয়।** শিশুর পোশাক এমন হইবে যাহাতে তাহার চামড়ায় ঘষা না লাগে, উহাতে চামড়া আরক্ত হইতে পারে। শিশুকে কখনই **কলপযুক্ত ইস্ত্রি করা পোশাক ব্যবহার করাইতে নাই।**

শিশুদের রং-এর প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। অতএব শিশুর পোশাক উজ্জ্বল রং-এর হইলে ভাল হয়। এমন কোনও ম্লান বা নিস্তেজ রং-এর পোশাক শিশুকে দেওয়া উচিত নয় যাহা শিশুর মনকে বিষণ্ণ করিয়া তোলে। শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ সব সময় সাবানের সাহায্যে কাচিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। শিশুর পোশাক স্বভাবতঃ তাড়াতাড়ি ময়লা হয়। সুতরাং পোশাক বারে বারে পরিবর্তন করিতে হয়। শিশুর জুতা পরিধানের বয়স হইলে উহাকে জুতা পরিধান করানো একান্ত আবশ্যক; তবে লক্ষ্য রাখিতে হয় **জুতার দোষে যেন 'পা'-এর আকৃতি নষ্ট না হয়।** শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ শিশুর মানসিক বৃত্তি পরিস্ফুট হওয়ার যথেষ্ট সাহায্য করে। শিশু একটু বড় হইলে উহার **পরিচ্ছদ পরা ও খোলার ভিতরে উহার আত্মবিশ্বাস জন্মে এবং আত্মনির্ভরশীল হয়।** শিশুর ব্যক্তিগত পছন্দের উপর লক্ষ্য রাখিয়াও উহার পরিচ্ছদ পরিধান



শীতের পোশাক পরিহিত শিশু

করানো উচিত। যে পোশাকে শিশুর মন আনন্দে ভরিয়া উঠে, যে পোশাক শিশুর সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টি করিতে পারে এবং যে পোশাক শিশুর আরামের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া উহার **মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিগুলির বিকাশ লাভের সহায়ক হয় উহাই** শিশুর একান্ত উপযুক্ত পোশাক।

শিশুর খেলাধুলা : শিশুর দেহের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রয়োজন খাদ্যের, তেমনই আবার **শারীরিক শক্তি ও পেশী গঠনের জন্য শিশুর নিয়মিত খেলার প্রয়োজন।** শিশুর মানসিক গঠনের জন্যও খেলার গুরুত্ব কম নয়। খেলার ভিতর দিয়া শিশু বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করে। খেলা **শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বিকাশ।** যে শিশু খেলাধুলা করে না, কেবলই কাঁদে, সে শিশু কখনই সুস্থ নয়। খেলাধুলার আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিতে না পারিলে সে শিশুর চরিত্র দৃঢ় ও সবল হইতে পারে না এবং পরিণত বয়সে প্রকৃত মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। দুই মাস বয়স থেকেই শিশু শুইয়া শুইয়া খেলা করিতে থাকে। ঐ সময় উহার দোল্‌নায় বা খাটের বিছানায় খেলনা বা রঙ্গীন বল ঝুলাইয়া দিলে সে উহা দেখিয়া মনের আনন্দে খেলা করে। বসিতে শেখার পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে এই ভাবেই খেলনার ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে লক্ষ্য রাখিতে হয় ঝোলানো জিনিস যাহাতে একদিকে না থাকে উহাতে শিশুর, দৃষ্টি একদিকেই নিবদ্ধ থাকিবে; এইজন্য ঐ চোখ **ট্যেরা** হইবার সম্ভাবনা থাকে। শিশুর হাতে কখনও ঝুনঝুনি দেওয়াউচিত নয়। উহা শিশু মুখে দিতে পারে বা উহা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। শিশুর জন্য রকমারী খেলনার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। তবে খেলনা দ্বারা শিশু যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হয়।


ঘুমন্ত শিশু

শিশুর নিদ্রা : শিশুর নিদ্রার প্রতি মায়ের যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সদ্যোজাত শিশু বেশির ভাগ সময়ই ঘুমাইয়াকাটায়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার পরিমাণও কমিয়া যায়। নিদ্রা একটি উৎকৃষ্ট বিশ্রাম। শিশু শুইয়া শুইয়া অনবরত হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে, তারপর সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং এই ক্লান্তি দূর করার জন্য উহার নিদ্রার প্রয়োজন। **দৈনিক ১৬ ঘণ্টা** ঘুমাইলে শিশুর শারীরিক ক্লান্তি দূর হওয়ার অবসর ঘটে। প্রতিবার খেলাধুলার পর শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। শিশুর এই ঘুমের যাহাতে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়

মায়ের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ঘরে বেশি গোলমাল ও কথাবার্তা বা জোর কোনও আওয়াজ হইতে থাকিলে শিশুর নিদ্রা হয় না। অতএব যে ঘরে শিশু শয়ন করে সেখানে শিশুর নিদ্রার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়। **অন্ধকার, আলো-বাতাসহীন** ঘরে কখনই শিশুর শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত নয়।

নিদ্রার সময় ক্রমশঃ কমাইয়া **৪ হইতে ৮ বৎসর বয়স্ক শিশুর ১২ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত**। আমরা অনেক সময়ই লক্ষ্য করি শিশু খেলিতে খেলিতে, কথা বলিতে বলিতে বা মনোযোগ দিয়া কিছু দেখিতে দেখিতে ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে—শিশুর ঘুমের প্রয়োজনের তাগিদে ইহাই স্বাভাবিক।

গৃহে শিশুর যত্ন ও পরিচর্যায় পিতার ভূমিকা

একেবারে শিশু অবস্থায় শিশুর সঙ্গী বলিতে আমরা একমাত্র মাতাকেই বুঝি। আমাদের সব সমাজে **মায়েরাই নিজেদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া শিশুর সেবাযত্নে একান্তভাবে নিযুক্ত হইয়া থাকে**। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে শিশু মায়ের সঙ্গ কামনা করে। পরিবারের ভাই, বোন, দিদি, দাদা অনেকের সঙ্গ শিশু লাভ করে কিন্তু মায়ের মত বড় সঙ্গী তাহার আর কেহই হয় না। শিশুর জন্মের অনেক পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মের পর অনেক দিন পর্যন্ত শিশুর জীবন মায়ের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। **পিতা সেখানে অনেক দূরে**; সদ্যোজাত শিশুর নিকট পিতা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইহাই আমাদের চিরন্তন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শিশুর জন্মের পর হইতেই **পিতার সান্নিধ্য একান্ত-ভাবে প্রয়োজন**। পিতা তাহার অবসর সময়ে শিশুর মাতাকে বিশ্রাম দেওয়ার ছলে শিশুর বোতল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে, শিশুর তোয়ালে বা কাঁথা পাল্টাইয়া দিতে পারে অথবা নিতান্তই কর্মহীন অবস্থায় শুধুমাত্র শিশুর কাছে বসিয়াও থাকিতে পারে। নেহাৎ ছোট্ট শিশুটির কাছে পিতারও কিছু কর্তব্য আছে এই বোধটুকু প্রত্যেক পিতার মনে উপলব্ধি হওয়া উচিত। সদ্যোজাত শিশু থেকে আরম্ভ করিয়া কৈশোর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে পিতার সান্নিধ্যও শিশুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শিশুর নানা কাজের ভিতর পিতার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভ করার সুযোগ ঘটে। **পিতার চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা শিশুর চরিত্রে প্রভাবান্বিত হইয়া উহার চরিত্রও সবল ও তেজস্বী হইয়া উঠে**। মায়ের মত শিশুর সর্বাঙ্গীণ যত্নের প্রশ্ন পিতার ক্ষেত্রে আসে না কিন্তু শিশু ক্রমশঃ বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতা শিশুর অনেক

কাজের ভিতরই জড়িত থাকিতে পারে। ইহাতে মায়ের পরিশ্রমের লাঘব হয় অধিকন্তু পিতার সঙ্গ লাভে শিশু পিতাকে ভালবাসিতে শিখে, পিতার উপর তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা আসে। পিতাকে সে নানা রকম প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে এবং মনের কথা প্রকাশ করে। **পিতার নিকট হইতে তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া পিতার প্রতি তাহার আস্থা জন্মে।** শৈশব হইতে পিতৃসান্নিধ্য হইতে অনেক দূরে থাকিলে **সন্তান ও পিতার সম্পর্ক খুব ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না।** ভবিষ্যতে দেখা যায় শিশু তাহার পিতার কড়া শাসনে তাহাকে ভয় করিয়াই চলে; **অন্তরের আদান-প্রদান না থাকাতে তাহাকে ভালবাসিতে শিখে না।**

গৃহে মায়ের সঙ্গ লাভ করিয়া তাহার যত্নে ও স্নেহে যেমন শিশু বড় হইতে থাকে সেইরূপ পিতার সঙ্গও আংশিক ভাবে কিছুটা প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায় এবং শিশুর সাধারণ পরিচালনা

মানবশিশু সাধারণতঃ **৬।৭ পাউণ্ড ওজন** লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিশুর দেহে জলীয় অংশ বেশি থাকাতে এক সপ্তাহের ভিতর ঐ ওজন কমিতে থাকে। ঠিক একটি চারাগাছের মত শিশুও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অবশ্য এজন্য গাছের যেমন উপযুক্ত রস ও সারের প্রয়োজন হয় মানবশিশুরও দিনে দিনে বৃদ্ধির জন্য চাই উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য। শিশু ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে **ছয় মাস বয়সের সময়** উহার ওজন **জন্মের ওজন অপেক্ষ দ্বিগুণ বেশি হয়** এবং উহা এক বৎসর বয়সে জন্মের ওজনের তিনগুণ ওজন বৃদ্ধি পায় এবং লম্বার দিক থেকেও উচ্চতা প্রায় ২৮ ইঞ্চির মতো হয়। শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হইবার জন্য প্রতি সপ্তাহে ওজন যন্ত্রের সাহায্যে শিশুর ওজন সঠিক ভাবে লইয়া লিখিয়া রাখিতে হয়।

জন্মাইবার সময় শিশুর মুখে কোনও দাঁত দেখা যায় না। মাতৃগর্ভে থাকা-কালীন অবস্থাতেই শিশুর দাঁত গঠন হয় কিন্তু মাড়ির নীচে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে বলিয়া বাহির হইতে উহা দেখা যায় না। জন্মের ৬।৭ মাস বয়সে দুইটি দুধে দাঁত প্রথমে উঠে। আড়াই বৎসর বয়সের ভিতর শিশুর প্রাথমিক দাঁতগুলি সবই উঠিয়া যায়। **শিশুর দাঁত উঠিতে খুব বেশি দেরী হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ**

লইতে হয়। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্য শিশুর দাঁত সুস্থ রাখার এবং সময় মত ঐ দাঁত বাহির হইবার সাহায্য করে। শিশুর বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের



ভিতর অন্যান্য উপাদানের সহিত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর ৭ বৎসর হইতে ৮ বৎসরের ভিতর সমস্ত প্রাথমিক দাঁতগুলি পড়িয়া আবার নতুন স্থায়ী দাঁতগুলি উঠিতে থাকে।

শিশুর প্রথম দাঁত উঠিবার সময় শিশুর মাড়ি শক্ত হইয়া যায়, উহার ফলে কিছু কামড়াইবার জন্য সে যাহা কাছে পায় তাহাই চিবাইতে চায়। শিশুর মুখে হাত দিলে তখনই সে আঙ্গুল কামড়াইতে থাকে। শিশুকে এই সময় শক্ত জিনিস চিবাইয়া খাইতে দিতে হয়। এই সময় কেবল তরল খাদ্যের উপর রাখিলে শিশুর স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়।

শিশুর কয়েকটি দাঁত উঠিতে থাকিলেই মায়ের কর্তব্য শিশুর দাঁতগুলি আস্তে আস্তে ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা। **১ মাস হইতে ৪ মাস বয়স পর্যন্ত** শিশু নিজে বুঝিয়া কিছুই করিতে পারে না। মুখ দিয়া **নানা রকম সুরে আওয়াজ করে** আর কেহ মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিলে শিশুও হাসে। **৪ মাসের পর হইতে নিজের আয়ত্তে কিছু কিছু কাজ করিতে শিখে। কোনও জিনিস পাইলে হাতের মুঠোয় ধরিতে চাহে** এবং কোনও কাজে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে তৃপ্তি লাভ করে। ঘাড় অনেকটা শক্ত হয়। খাড়া অবস্থায় কোলে করা যায়। **৬।৭ মাস বয়সে কোনও** অবলম্বন ছাড়াই অনেক সময় শিশু বসিতে পারে। **চেনা, অচেনা লোক** বুঝিতে পারে এই বয়সে। মুখের অভিব্যক্তি দ্বারা অচেনা লোকের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন বুঝাইয়া দেয়। **১০ মাস বয়সের ভিতর শিশু দাঁড়াইতে শিখিয়া ১ বৎসর বয়সে হাঁটিতে পারে,** আবার কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বেশি সময় নেয়। শিশু হাঁটিতে শিখিলে মনে খুব আনন্দ পায়। উহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য এবং আরও যাহাতে দ্রুত এই কাজ করিতে পারে সেইজন্য দিনের ভিতর কিছু সময় তাহাকে খেলাচ্ছলে হাঁটানো অভ্যাস করাইতে হয়। শিশুর ভিতর কোনও অভাব-জনিত রোগ থাকিলে হাঁটিতে বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। প্রতি মাসে শিশু নূতন কিছু আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহার এই চেষ্টায় শরীরে ক্ষয় হয়, এইজন্য শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয়।

হাঁটিতে শেখার পর প্রায় ৩½ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু খুবই লাফালাফি ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়।

জন্মের পর হইতেই কিছুদিনের ভিতর মায়ের লক্ষ্য রাখিতে হয় শিশুর **দৃষ্টিশক্তি** ও **শ্রবণশক্তি** স্বাভাবিক আছে কিনা। জন্মের পর কয়েকদিন প্রায় সব সময়ই শিশু চোখ বন্ধ করিয়া থাকে, চোখ মেলিয়া তাকাইবার শক্তি থাকে না; এই সময় তাহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। কয়েক সপ্তাহ বা এক মাসের ভিতর সে চোখ মেলিয়া ভালভাবে তাকায় এবং ক্রমশঃ সে চোখ ঘুরাইয়া তাকাইতে থাকে। জন্মের ৪।৫ দিন পরেই শিশুর শ্রবণ-শক্তি প্রখর হয়, সামান্য একটু আওয়াজ বা জোরে কথা-বার্তায় শিশু হঠাৎ চমকাইয়া উঠে। এই লক্ষণগুলি প্রকাশ না পাইলেই শিশুকে চিকিৎসকের অধীনে রাখিতে হয়।



চিকিৎসকের পরীক্ষাধীন শিশু

৬।৭ মাস বয়সে শিশু কতকগুলি শব্দ মুখ দিয়া বাহির করে মাত্র; **৮।১০ মাস বয়সে শিশু বাবা, মামা, কাকা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে।** যে-সব শিশু দেরীতে শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে তাহারাও এক বৎসর বয়সের ভিতর শিখিয়া লয়, কিন্তু এক বৎসরের শিশু কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিলে বোঝা যাইবে তাহার জিহ্বা বা স্বরযন্ত্রের কোনও গোলমাল আছে। এক্ষেত্রে দেরী না করিয়া অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের নির্দেশে চিকিৎসা করাইতে হয়।

একটি সুস্থ শিশুর স্বাভাবিকভাবে দৈহিক বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং এই দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্র** প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রগুলিও বৃদ্ধি পায়। দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তিগুলিরও বিকাশ ঘটে। **চিন্তাশক্তি, কল্পনা-**

শক্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারক্ষমতা সকলই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। শিশুর ঐ সকল মনোভাব ঠিকভাবে চালনা করিতে না পারিলে অনেক সময়ই শিশু **কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ** হইয়া ওঠে।

শিশু পরিচালনা ঃ শিশুই জাতির মেরুদণ্ড। শিশুর শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয় শৈশবেই। শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালনা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে সে একটি আদর্শ নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। সুপরিচালনার দ্বারা শিশুকে সমস্ত বিষয়ে অভ্যাস গঠন করানো দরকার, একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে কোনও কিছু আয়ত্ত করিতে শিশুর পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না। শিশুকে ভাল ভাবে পরিচালনা করিতে না পারিলে বড় হইয়া শিশু এলোমেলো ও ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিতে শিখিবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিশুকে যদি সুপথে চালিত করা যায় তবে উহার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুন্দর হইয়া উঠিবে।

খাদ্যগ্রহণ ঃ জন্মের পর শিশুর উপযুক্ত খাদ্য **মাতৃদুগ্ধ**। অতএব মাতা একদিকে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে অন্যদিকে আবার তাহার পুষ্টিকর খাদ্যও গ্রহণ করা উচিত। শিশুর সুস্থতা ও পুষ্টি মায়ের উপরই নির্ভর করে। অনেক মায়ের খুব খারাপ অভ্যাস আছে। শিশু কাঁদিলেই উহাকে দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করে। যখন তখন এরূপ দুধ খাওয়াইবার ফলে শিশুর হজমের গোলমাল হয় এবং খাদ্য সম্বন্ধে শিশু নিয়ম বা অভ্যাস আয়ত্ত করিতে পারে না। মাতৃদুগ্ধ শিশুকে **৩ ঘণ্টা অন্তর** সমস্ত দিনে রাত্রে **৬ বার** খাওয়াইবার অভ্যাস করিলে ভাল হয়। রাত্রি ১০টার পর শিশুকে দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস খুব খারাপ। ৯।১০ মাসে হঠাৎ মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করিয়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করানো উচিত নয়। **মাতৃদুগ্ধের বার কমাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে উহার পরিবর্তে অন্য খাদ্যের ব্যবস্থার অভ্যাস করাইয়া লইতে হয়।** বদলী খাদ্য ইচ্ছামত দিলে চলে না। শিশুর বয়স অনুযায়ী এবং শরীরের অবস্থা অনুযায়ী শিশুকে নানাবিধ খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হয়। সাধারণতঃ শিশুকে গলা ভাত, আলুসিদ্ধ, ডালের জল, দুধে-ভিজানো পাউরুটি, মাছ, বিভিন্ন সব্জীর স্যুপ, কমলা ও টমেটোর রস, কলা, বিস্কুট, ছানা প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্য দুধের সঙ্গে সঙ্গে দিতে হয়। মাতৃদুগ্ধের অভাব ঘটিলে শিশুকে গরুর দুধ অথবা বাজারের বেবী ফুড দেওয়া যায়, তবে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে **বোতল অপেক্ষা ঝিনুক, বাটিতে খাওয়ানো অনেক নিরাপদ**। **মাতৃদুগ্ধ সহজপাচ্য**। সুতরাং শিশুকে গরুর দুধ খাওয়াইতে হইলে দুধ ভালভাবে ফুটাইয়া সামান্য জল ও চিনি মিশাইয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয়। জল না মিশাইলে গো-দুগ্ধের **ক্যাসীন যাতীয় প্রোটিন**

শিশু হজম করিতে পারে না। মাতৃদুগ্ধে **ল্যাক্টঅ্যালবুমেন প্রোটিন সহজপাচ্য।**

শিশু একটু বড় হইলে যখন বিভিন্ন রকমের খাদ্যে অভ্যস্ত হয় তখন শিশুর খাদ্য বিভিন্ন বাসনে সাজাইয়া শিশুর কাছে রাখিতে হয়। শিশুর খাদ্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয় বাসনপত্র স্বতন্ত্র হইলে ভাল হয়। সাজানো-গুছানো পরিপাটি মত খাদ্য পরিবেশন করিলে শিশুর সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টি হয়। ইহাতে শিশুর খাদ্যের প্রতি আকর্ষণও আসে। শিশুর বাসনপত্র ছোট ও হাল্কা হওয়া উচিত। শিশু নিজেই খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে এই সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার খাদ্য পরিবেশনে সুব্যবস্থা করিতে হয়। নিজে নিজে কাজ করিবার সুযোগে শিশু **আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল** হইয়া উঠিবে। "যেখানে যখন যাহা পাইলাম তাহাই খাইলাম"—এই নীতি শিশুর মন থেকে একেবারেই বর্জন করাইতে হয়। হাত ধুইয়া খাওয়ার অভ্যাস করিলে শিশু সব সময়ই খাইবার পূর্বে এই নিয়মটি পালন করিবে। **যেখানে সেখানে জল পান করার রীতিও খুব খারাপ।** জল বহু রোগের জীবাণু বহন করে। সদ্যোজাত শিশুকে ফুটন্ত ঠাণ্ডা জল, দুধ খাওয়াইবার মাঝে মাঝে খাওয়াইতে হয়। শিশু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে জলের পরিমাণও বাড়াইতে হয়। জল পানের বিষয় মাতার লক্ষ্য রাখিতে হয়, শিশু যেন খেলিয়া আসিয়া **ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় জল পান না করে।** প্রতিদিন নিয়মিত বিশুদ্ধ জল পান করিতে পারিলে শিশুর **পরিপাক ক্রিয়া ভাল হয়** এবং দেহের **ক্লেদ নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।**



শিশুর নিজে খাদ্য গ্রহণ

শিশুর নিদ্রা ঃ নিদ্রার মত উৎকৃষ্ট বিশ্রাম আর নাই। নিদ্রায় শরীরের গঠন ও ক্ষয় পূরণের কাজ হয়। সদ্যোজাত শিশু দৈনিক ১৬ ঘণ্টা ঘুমায়, এই নিদ্রার সময় কমিতে কমিতে ৭।৮ বৎসরের একটি শিশুর দৈনিক ঘুমানো উচিত ১২ ঘণ্টা। ঘুমের অভাবে শিশুর শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং মেজাজ খিটখিটে হইয়া যায়। দেহের কোনও কষ্ট থাকিলে শিশুর নিদ্রা হয় না। দৈনিক ঘুমাইবার জন্য **একই সময় নির্দিষ্ট থাকা উচিত।** ঘুমের নির্দিষ্ট সময় থাকিলে পরে আর ঐ সময় শিশুকে ঘুম

পাড়াইবার জন্য বেগ পাইতে হয় না, আপনা থেকেই শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। শিশু একটু বড় হইলেও কোনও কারণেই তাহাকে রাত জাগিতে দিতে হয় না। শৈশব হইতেই **তাড়াতাড়ি শয়ন করা** এবং **তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করা এরূপ অভ্যাস করানো উচিত।** শিশুর শয়নভঙ্গীটি যথাযথ হওয়া উচিত। বেশি সময় চিৎ হইয়া শয়ন করিলে শিশুর বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অস্থির উপর চাপ পড়ে, সেইজন্য শিশুকে কাত হইয়া শয়ন করিবার অভ্যাস ভাল, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে এক কাতে বেশি সময় যাহাতে নিদ্রা না যায়। ডান কাতে বেশি সময় শয়ন করিলে **ফুসফুসে চাপ** পড়ে আবার বাম কাতে বেশী সময় শয়ন করিলে **হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ** পড়ে, সুতরাং কিছুক্ষণ পর পর ঘুমন্ত অবস্থাতেই শিশুকে এক কাত হইতে আর এক কাতে ফিরাইয়া দিতে হয়। শয়ন-ঘরে যাহাতে **আলোবাতাস প্রবেশ করে** সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দরজা-জানালা সব বন্ধ করিয়া যেন শোয়ার ব্যবস্থাটি করা না হয়। একেবারে শিশুর কথা ছাড়িয়া দিলে সামান্য বড় শিশুকে কখনই আলো জ্বালাইয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়। এই অভ্যাসে রাত্রে অন্ধকার ঘরে সে কখনই ঘুমাইতে পারিবে না।



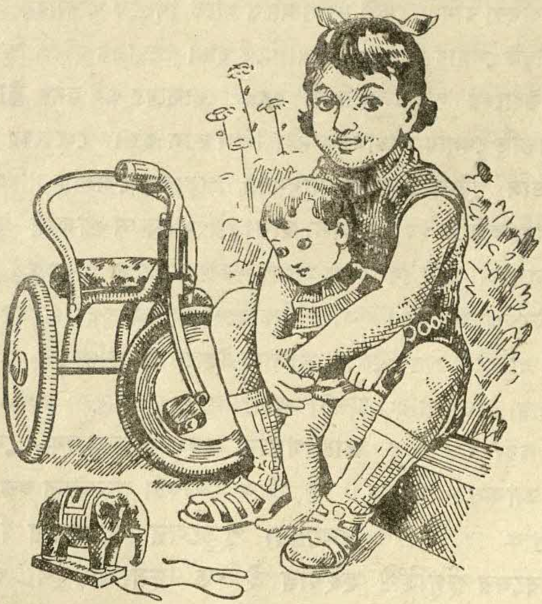
বাড়ন্ত শিশুর নিদ্রা

শিশুর মলমূত্র ত্যাগ ঃ দেহের ক্লেদ নিঃসরণের জন্য শিশুকে মলমূত্র ত্যাগ করানো উচিত। শিশু জন্মিবার পর কয়েক মাস খুব ঘন ঘন প্রস্রাব করিয়া থাকে। শিশুর খাদ্য হইতেছে জলীয়পদার্থ। অতএব দেখা যায় শিশু যতবার খায়, খাওয়ার পর পরই ততবার সে প্রস্রাব করে। এই কাজটি যদি অভ্যাস করাইয়া লওয়া হয় তবে শিশুর ল্যাংটি জামা ও বিছানাপত্র ভিজে না। অনেক সময় শিশু মার কোলেও প্রস্রাব করিয়া দেয়। শিশুর দুই-তিন মাস বয়স হইলে ধরিয়া প্রস্রাব করাইবার অভ্যাস করাইতে পারিলে তখন আর শিশু বিছানায় এবং কোলে প্রস্রাব করিবে না। কখনও প্রস্রাব করা কাঁথা বা তোয়ালে ভাল করিয়া না ধুইয়া শিশুকে ব্যবহার করিতে দিতে হয় না। ইহাতে শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিতে পারে না। মলত্যাগ করার ব্যাপারটিও শিশুকে শৈশব হইতে অভ্যাস করাইয়া লইতে হয়। শিশু একেবারে ভোরে এবং বৈকালে মলত্যাগ করিলে উহার কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগিতে হয় না। শিশু একটু বড় হইলে অনেক সময় একবার মলত্যাগ করিলেই চলে,

সে ক্ষেত্রে ভোর বেলাই হইতেছে উৎকৃষ্ট সময়। **প্রাতঃকৃত্য একবার অভ্যাস করিয়া নিলে শিশু প্রতিদিন ভোরে মলত্যাগ করিয়া, চোখ-মুখ ধুইয়া, দাঁত পরিষ্কার করিয়া নিজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবে।**

শিশু বয়স হইতে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগিলে কোনদিন সে সুস্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। **মায়ের সতর্ক দৃষ্টিতে শিশুর মল-মূত্র ত্যাগের সু-অভ্যাসটি অতি সহজেই আয়ত্ত হইয়া যায়।** অনেক সময় দেখা যায় শিশু যেখানে সেখানে এবং যখন তখন মলত্যাগ করে এবং রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করিয়া বিছানাকে দুর্গন্ধ-যুক্ত করিয়া তোলে। একটু বড় শিশুর পক্ষে এই অভ্যাসগুলি অত্যন্ত ঘৃণাকর। মায়ের সুশিক্ষার অভাবেই শিশু সু-অভ্যাসগুলি গড়িয়া তুলিতে পারে না।

শিশুর খেলা ও খেলার সাজ-সরঞ্জাম ঃ শিশুর জীবনে খেলা একটি অপরিহার্য বিষয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক সপ্তাহ পরেই হাত-পা নাড়িয়া খেলিতে



আত্ম-নির্ভরশীল ক্রীড়ারত শিশু

থাকে। এই জন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ইহা জন্মগত বৃত্তি। শিশুর কান্না থামাইবার জন্য তাহাকে **লোলা, চুষি কাঠি, ঝুনঝুনি** প্রভৃতি দ্বারা ভুলাইতে হয়। শিশু একটু বড় হইলে উহার খেলার জন্য নানাবিধ সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। বসিতে শিখিয়া সে নিজের খেলার সামগ্রী লইয়া আপন মনে খেলিতে থাকে।

কখনও বা খেলিতে খেলিতে কিছু খেলনা ভাঙ্গিয়া ফেলে, ছুঁড়িয়া ফেলে, তবু নিজের খেলনার ভাগ অন্য কাহাকেও দিতে রাজী নয়। শিশুর এই স্তর পার হইয়া গেলে উহার মনোভাবেরও পরিবর্তন দেখা যায়। সে তখন খেলার সঙ্গী চায় এবং খেলার জিনিস সমস্ত অকপটে বাহির করিয়া সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করে, সঙ্গীদের উহার খেলনা দান করিতেও কার্পণ্য করে না। এইরূপে ২।৩ বৎসর বয়সে বালক-বালিকার খেলা বিভিন্ন হয়। মেয়েরা **রান্নাবাটি, পুতুল বিয়ে** ইত্যাদি খেলে আর ছেলেরা বাহিরের খেলার দিকে আকৃষ্ট হয়। ছেলে বা মেয়ে উভয়ের খেলার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দিয়া উহাদের ঠিক পথে চালনা করিতে হয়। এই বয়স থেকেই শিশু সব থেকে খেলা ভালবাসে এবং খেলা নিয়াই বেশির ভাগ সময় কাটাইতে চায়। সকালে এবং বিকালে কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয় এবং লক্ষ্য রাখিতে হয় **খেলার জন্য যাহাতে স্নান, আহার ও নিদ্রার সময় পার হইয়া না যায়।** বসিয়া বসিয়া খেলা ছাড়া মাঝে মাঝে শিশুকে শারীরিক ব্যায়ামের কাজ হয় এরূপ ছুটাছুটি খেলার কিছু ব্যবস্থা রাখিতে হয়। প্রয়োজন হইলে শিশুর সঙ্গী হইয়া পিতামাতার উহাদের সহিত খেলিতে হয়। ছেলেদের এই সময় **ট্রাইসাইকেল, ব্যাটবল** প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম কিনিয়া দিলে ভাল হয়। মেয়েদের পুতুল বিয়ের খেলার জন্য ভাল পুতুল, খেলনার বাসনপত্র, পুতুলের পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। **খেলনা দ্বারা শিশু কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত বা রোগাক্রান্ত না হয়** সে বিষয়ে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিশুর খেলা অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলক হয়। কাজেই ছেলেদের বিভিন্ন খেলনার ভিতর কিছু গঠন-মূলক খেলনা থাকিলে শিশুর ঝোঁক অনুযায়ী উহাতে সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। ভবিষ্যতে যাহারা ইঞ্জিনীয়ারিং বৃত্তিটা পছন্দ করে তাহাদের শৈশবের খেলাধুলার ভিতর লক্ষ্য করা যায় কিছু **ভাঙ্গাগড়ার এবং গঠনমূলক কোন কার্যে তাহাদের আকর্ষণ থাকে।** ঐ দিকে ঝোঁকটা বাড়াইবার জন্য সেই অনুযায়ী খেলনাও শিশুকে দিতে হয়। **মেয়েরা পুতুলের সংসারের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সুগৃহিণী হইবার ইঙ্গিত দিয়া নৈপুণ্য গঠন করে।** শিশুর জীবনে খেলার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সুতরাং খেলা সুপরিচালনার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়।

শিশুর বয়স অনুযায়ী খেলনার আকৃতি ও গঠন হওয়া উচিত। শিশুর ব্যাট, বল, পুতুল, রান্নাবাটির সরঞ্জামাদি সবই শিশুর উপযোগী হওয়া দরকার; তাহা না হইলে শিশুর নাড়াচাড়া করিতে অসুবিধা হইবে। শিশু তাহার উপযুক্ত খেলনা পরিমাণ

মত না পাইলে বিষণ্ণ হয় এবং খেলার প্রতি আকর্ষণ থাকে না এবং অনেক সময় দেখা যায় সে খেলিতে চায় না। ইহাতে শিশুর মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। এই অবস্থায় শিশু বেশি দিন কাটাইলে উহার শরীর ও মনের গঠন সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। সুতরাং **উপযুক্ত খেলনার ব্যবস্থা করিয়া শিশুর খেলার ঝোঁক বাড়াইয়া তুলিতে হয়।** তবে একথাও ঠিক শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দামী দামী খেলনার ব্যবস্থা করিলে শিশু কেবলই নূতন নূতন খেলনার বায়না করিবে। শিশু একবার বায়না ধরিলে সে বায়না এড়ানো বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আর্থিক ক্ষমতা থাকিলেও **কখনই শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দামী দামী খেলনা দিতে হয় না।** ইহা চরিত্র-গঠনেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এখনকার দিনে একটা খেলনার দামও নেহাৎ কম নয়। সুতরাং আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে মায়েরা পুরানো কাপড়ের টুকরা দিয়া রং-এর সাহায্যে ভালো ভালো পুতুল গড়িয়া দিতে পারে ; পুতুলের জামা, কাপড়, বালিশ, বিছানা সমস্তই পুরাতন বা নূতন কাপড়ের ছোট টুকরার সাহায্যে তৈরী হইতে পারে। আবার দেশলাইয়ের খোল দিয়া পুতুলের আসবাব হইতে পারে। অনেক সময় উৎসাহী ও কর্মঠ মায়েরা কার্ডবোর্ডে বা পীচবোর্ডের সাহায্যে শিশুদের খেলার বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করিয়া দেয়। শিশুর কাছে ইহার মূল্য অনেক, আবার খেলনার পিছনে পয়সা খরচেরও দরকার পড়ে না। ছোট ছেলেদের বেলাতেও মা নানারকম বল তৈরী করিয়া দিতে পারে। শিশুর জীবনে কতবার যে বল হারাইয়া ফেলে এবং ভাঙ্গে তাহা হিসাব করিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং শিশুর বল কেনার খরচও নেহাৎ কম নয়। কাগজ, পীচবোর্ড, রং প্রভৃতির সাহায্যে শিশুকে নানা প্রকার লুডো ও অন্যান্য খেলনাও তৈরী করিয়া দেওয়া যায়। **হাতে তৈরী খেলনার আর একটি সুবিধা আছে এই যে, শিশু নিজেই ঐগুলি তৈয়ারী করিবার জন্য প্রয়াসী হইবে।** এইভাবে শিশুকাল হইতে গঠনমূলক কাজের দিকে তাহার প্রবণতা দেখা দিবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ-শুশ্রূষার মূল নীতি

গৃহে রোগীর যত্ন: স্বাস্থ্যরক্ষামূলক নানাবিধ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গৃহে রোগাক্রান্ত অবস্থা হইতে সব সময় এড়ানো যায় না। রোগ কখনও গৃহে জানাইয়া শুনাইয়া আসে না। গৃহে ছোট বড় নানারকম রোগ হইয়াই থাকে, এইজন্য বিব্রত হইয়া পড়িলে চলে না। দূরদৃষ্টিসম্পন্না গৃহকর্ত্রী পূর্ব হইতেই রোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকে। সুতরাং পরিবারের ছোট বড় যে-কোনও ব্যক্তি যখন রোগাক্রান্ত হয় গৃহকর্ত্রী পূর্ব হইতেই যদি রোগের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামাদি গৃহে মজুত রাখে এবং অত্যন্ত যত্নের সহিত সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সহিত রোগীর সেবা করে তবে এই কাজটি খুব কষ্টকর বলিয়া মনে হইবে না।

সেবা-শুশ্রূষার কাজ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ করিতে পারে, পুরুষেরা তেমন পারে না। এইজন্য সেবা-শুশ্রূষার কাজটি একান্তভাবে গৃহকর্ত্রীরই। স্বামীর সেবা, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা, ছেলেমেয়েদের যত্ন, এই সকল দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়াই তাহার সেবা করার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে। সেবাপরায়ণা স্ত্রীলোক অপর কোনও পীড়িত ব্যক্তিকে অসহায় অবস্থায় দেখিলেই তাহার কোমল মন সেবা করার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে।

শয্যাগত রোগীর নিকটে শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের মত বন্ধু আর কেহই হয় না। তাহাদের স্নেহ-মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ মুখখানা দেখিলেই অসুস্থ ব্যক্তি এক অনির্বচনীয় শান্তি ও ভরসায় তৃপ্তিলাভ করে। ইহাতে তাহার রোগ-যন্ত্রণা অর্ধেক কমিয়া যায়।

রোগীর আরোগ্যলাভের জন্য দৈহিক ও মানসিক আরামের ব্যবস্থাই শুশ্রূষার মূল উদ্দেশ্য। যে-কোনও রোগীই হউক না কেন উহার পরিচর্যার মূল নীতি একই প্রকারের হয়; যেমন, রোগীর মাথা ধোওয়ানো, মুখ ধোওয়ানো, গা মোছানো এবং রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন—এই সকলই রোগীর প্রতি শুশ্রূষাকারীর অবশ্য করণীয় কাজ।

রোগীর মাথা ধোওয়ানো: যে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন রোগীকে প্রতিদিন মাথা ধোওয়াইয়া দিতে হয়। মাথা ধোওয়াইবার পূর্বে প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলি—**দুইটি ছোট ছোট রবার ক্লথের টুকরা, দুইটি তোয়ালে, একটি মগ, একটি বালতি এবং একটি গামলা** গুছাইয়া কাছে রাখিতে হয়।

প্রথমতঃ, একটি রবার ক্লথ রোগীর পিঠ হইতে ঘাড় পর্যন্ত বিছানায় পাতিয়া দিতে হয়। রোগীর বিছানায় মাথার দিকে একটি ছোট বালিশ নীচের দিকে একটু হেলান অবস্থায় রাখিতে হয়, উহার উপর আর একটি রবার ক্লথ বালিশের উপর পাতিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে আনিয়া একটি গামলার ভিতর রাখিতে হয়। গামলাটি নীচে না রাখিয়া একটি টুলের উপর রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই বারে রোগীর ঘাড় হইতে আরম্ভ করিয়া গলা পর্যন্ত ঘুরাইয়া আলগাভাবে একটি তোয়ালে জড়াইয়া রাখিতে হয় যাহাতে মাথা ধোয়ার জলে ঘাড় ও পিঠ ভিজিয়া না যায়। বালতি হইতে মগে করিয়া রোগীর মাথায় জল ঢালিতে হয়। পূর্বেই রোগীর মাথাটি বালিশের উপর নীচের দিকে হেলান অবস্থায় রাখিতে হইবে। রোগীর মাথা ধোওয়ার জল রবার ক্লথের ভিতর দিয়া গামলায় আসিয়া পড়িবে। ধোয়াইবার পর অতি ধীর হস্তে নৈপুণ্যের সহিত রোগীর মাথা মোছাইয়া দিতে হয় যাহাতে জল না থাকে। প্রয়োজনীয় তৈজস-পত্রাদি তুলিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে হয়। বড় চুল হইলে সহজে চুল শুকাইবে না ; এক্ষেত্রে গরম জলের ব্যাগে চুল কিছুক্ষণ ছড়াইয়া শুকানো যাইতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হয় মাথায় যেন গরম জলের ব্যাগের স্পর্শ না হয়।

চুল ও মাথা পরিষ্কারের জন্য **মাঝে মাঝে সাবান দেওয়া দরকার**। রোগীর মাথায় সাবান দিতে হইলে উষ্ণ গরম জলের দরকার। মাথা ধোওয়ার কাজটি শেষ হইলে চিরুনীর সাহায্যে রোগীর চুল বেশ করিয়া আঁচড়াইয়া দিতে হয়। রোগী পছন্দ করিলে মাঝে মাঝে চুলে ব্রাশ ব্যবহার করা ভাল। রোগীর মাথায় উকুন জন্মিলে উহা সত্বর নির্মূল করা আবশ্যক। **তরল প্যারাফিনের সহিত কার্বলিক অ্যাসিডের লোসন মিশাইয়া উহা চুলে ভাল করিয়া মাখিয়া একটি বড় ত্রিকোণাকৃতি কাপড়ের টুকরার সাহায্যে মাথাটি ৪ ঘণ্টাখানেক বাঁধা থাকিলে উকুন মরিয়া যায়।** এইবারে মাথা সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। রোগীর মাথা বারে বারে নিয়মমত আঁচড়াইলে আর সহজে উকুন হইতে পারে না।

রোগীর গা মোছানো ঃ যে সকল রোগী উঠিয়া বসিতে পারে না তাহাদের শায়িত অবস্থায় গা মোছাইয়া দিতে হয়। এই কাজটি দায় সারা না করিয়া অত্যন্ত যত্ন সহকারে করা উচিত। গা মোছাইবার জন্য প্রথমে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। দেহের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচ পর্যন্ত মুছিতে হয়। রোগীর গা মোছাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গরম জল, একখানা রবার ক্লথ ও দুইখানি তোয়ালে প্রয়োজন। এছাড়া ভাঁজ করা একখানা কাপড়, ১টি বালতি, ১টি জগ ও ১টি

মগ আবশ্যক। প্রথমে গরম জলে ১ খানি তোয়ালে ভিজাইয়া মুখখানা মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই সময় কানের পিছন, ঘাড়, গলা সবই মুছিতে হইবে। অপর



তোয়ালে খানা দ্বারা শুকাইবার জন্য মোছাইয়া দিতে হইবে। মুখ পরিষ্কার করার পর বগল, কুচকি, হাটুর নীচ প্রভৃতি স্থান প্রয়োজন হইলে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। মোছাইবার তোয়ালের নোংরা ঠাণ্ডা জলের গামলায় ধুইয়া, মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিয়া নিঙরাইয়া ফেলিতে হয়। দেহের সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার হইবার পর কৌশলে রোগীকে পাশ ফিরাইয়া পিঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ পিছনের অংশ পরিষ্কার করিতে হয়। সম্পূর্ণ দেহটি পরিষ্কার করিবার পর রোগীর দেহে পাউডার মাখাইয়া জামা পরাইয়া শরীর ভাঁজ-করা কাপড়-খানা দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। রোগীর দেহ আচ্ছাদন করিয়া দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া দিতে হয়।

রোগীর মুখ ধোয়ানো ঃ প্রতিদিন নিয়মমত সকালবেলা রোগীর মুখ ধোওয়াইয়া দিতে হয়। মুখ ধোওয়াইবার সময় **চোখ, মুখ, জিহ্বা, দাঁত** সমস্তই পরিষ্কার করিতে হয়। মুখ চোখ পরিষ্কার থাকিলে রোগী অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবে। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি—উষ্ণ জলসহ কেটলী, গামলা, দাঁত মাজার পেষ্ট ও ব্রাশ, লিষ্টারিন লোসন ইত্যাদি পূর্বেই গুছাইয়া রাখিতে হইবে। প্রথমে রোগীর মুখে জল দিয়া কুলকুচা করিয়া ফেলিতে বলা হইবে। ইহার পর সামান্য পেষ্ট লাগাইয়া ব্রাশটি রোগীর হাতে দিতে হয়। রোগী বেশী দুর্বল হইলে এবং এই কাজে অক্ষম হইলে ব্রাশের সাহায্যে দাঁত মাজিতে পারিবে না। অতএব শুশ্রূষাকারী আঙ্গুলে পরিষ্কার ন্যাকড়ার টুকরা জড়াইয়া উহাতে পেষ্ট মাখাইয়া রোগীর দাঁত ও মাড়ি ঘষিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। জিভে ময়লা জমিলে উহাও আস্তে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে জিভ-ছোলা ব্যবহার করা হইবে।

পরিষ্কার করার পর উষ্ণ গরম জলের সাহায্যে মুখ কুলকুচা করিয়া ফেলিতে হয়। রোগীর মুখের দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য লিষ্টারিনের লোসনে মুখ কুলকুচা করিতে দিতে হয়।

রোগীর পিঠের যত্ন: রোগীর পিঠের যত্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে সহজে বেড-সোর হইতে পারে না। দীর্ঘদিন একভাবে শুইয়া থাকিতে থাকিতে রোগীর দেহের সমস্ত জায়গায় সমানভাবে রক্ত চলাচল করিতেপারে না, ফলে চামড়া রুক্ষ হইয়া যায়। দীর্ঘ দিন এই অবস্থা হইলে বেড-সোর বা শয্যাক্ষত দেখা দেয়। বেডসোর যাহাতে হইতে না পারে সেই জন্য প্রথম দিকেই শুশ্রূষাকারীর সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রোগীকে একই অবস্থায় বেশি সময় না রাখিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিতে হয়। দেহের কোনও ভাঁজের জায়গায় যাহাতে ময়লা ও ঘাম জমিতে না পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। গা মোছাইবার সময় যাহাতে দেহে জল না থাকে সেইজন্য পরিষ্কার করিয়া তোয়ালে দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। পিঠে, হাঁটুতে, কোমরে মাঝে মাঝে টেলকাম পাউডার লাগাইতে হয়। রোগীর বয়স ৪০-এর বেশি হইলে পিঠের চারিপাশে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাঝে মাঝে স্পিরিট মালিশ করিতে হয়; কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখিতে হয় একবার শয্যাক্ষত হইয়া পড়িলে তখন আর স্পিরিট দেওয়া চলে না।

শয্যাক্ষত হইবার পূর্বে স্থানটি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং স্থানটি গরম বোধ হয়; তারপর ওখান হইতে অনেক সময় ছোটফুস্কুড়ি উঠে। ফুস্কুড়ি হইতে 'ঘা'-এ পরিণত হইলে রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। ঐস্থানে ঠাণ্ডা বা গরম কিছুই লাগাইতে পারে না। একবার ঘা হইয়া গেলে উহা সারানো খুবই কষ্টকর। অনেক সময় রোগীকে বেডপ্যান ব্যবহার করাইবার ত্রুটিতে পিছনে কোমরের নীচে বেড-সোর হইতে দেখা যায়। এইজন্য সতর্ক হওয়া উচিত। বেড-সোর যাহাতে না হয়-সেজন্য দীর্ঘ শয্যাশায়ী রোগীকে নরম বিছানায় শোয়ান এবং ডাক্তারের পরামর্শ মত ক্যাষ্টর অয়েল অয়েণ্টমেণ্ট গায়ে লাগানো যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোগীর সাধারণ যত্ন

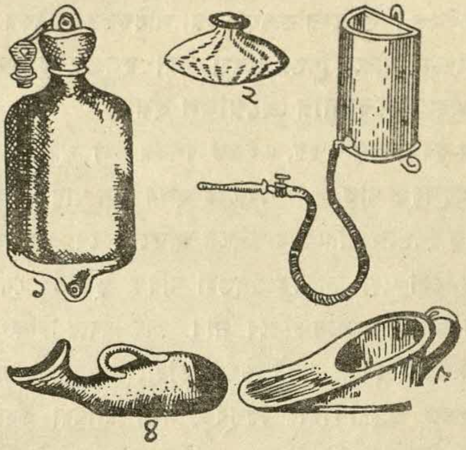
একজন সুস্থ ব্যক্তি নিজস্ব কাজগুলি যেমন—স্নান করা, খাওয়া, মুখধোওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করা, পোশাক্-পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদি সবই অন্যের সাহায্য ব্যতীত করিয়া লয়। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির উহার সামান্য কাজও নিজের করার ক্ষমতা থাকে না। সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া সে পরনির্ভর-শীল হয়। তাই অন্তরের ভালবাসা ও কর্মনৈপুণ্যের মাধ্যমে একটি আদর্শ শুশ্রূষাকারী রোগীর কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে। গতানুগতিক কাজ ছাড়াও আরও কতকগুলি সহজ অথচ দায়িত্বপূর্ণ কাজ শুশ্রূষাকারী হিসাবে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর করিতে হয়। রোগীর গা স্পঞ্জ করানো, দেহের তাপ লওয়া এবং উহা চার্টের আকারে লিখিয়া রাখা, বেডপ্যান দেওয়া, শয্যা পরিবর্তন করা, খাদ্য পরিবেশন করা এবং রোগীকে ঠিকমত ঔষধ দেওয়া, এমন কি রোগীর জন্য উপযুক্ত একটি কক্ষ নির্বাচন করা এ সকলই শুশ্রূষাকারীর কাজ। এই কাজগুলি বাদ দিয়া কখনই রোগীর যত্ন হইতে পারে না।

রোগীকক্ষ নির্বাচন ঃ গৃহের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত একই ঘরে রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা করিলে রোগীর পক্ষে অসুবিধাজনক হয় এবং অপরের পক্ষেও ইহা নিরাপদ হয় না। গৃহের যে **কক্ষটিতে আলোবাতাস সহজেই প্রবেশ করে এবং বাহিরের কোলাহল হইতে যথেষ্ট দূরে রোগীর জন্য সেই কক্ষটি নির্বাচন করা যুক্তিসঙ্গত।** একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে স্বতন্ত্র একটি কক্ষ রোগীর জন্য ব্যবস্থা করা খুবই অসুবিধাজনক, তবুও যতদূর সম্ভব নিরাপত্তার দিক হইতে উহার পৃথক ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে একই ঘরের ভিতর সাময়িক ভাবে মোটা পর্দার সাহায্যে রোগীর থাকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়।

রোগী-কক্ষে **রুজু রুজু জানালা-দরজা থাকা প্রয়োজন।** আলো হাওয়া ব্যতীত রোগীর মন আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠে। রোগীর ঘরে বাইরের দমকা হাওয়া যাহাতে হঠাৎ প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য দরজায় পর্দার ব্যবস্থা রাখিতে হয়।

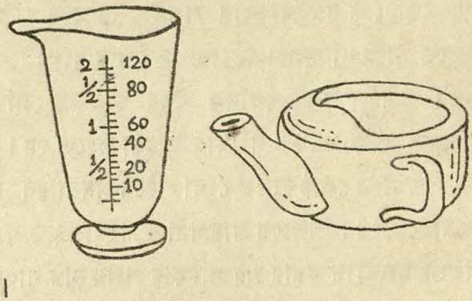
রোগী-কক্ষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ঃ রোগী-কক্ষে প্রয়োজনের তুলনায় কোনও জিনিস বেশি রাখিয়া ঘরটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে হয় না।

রোগীর উপযুক্ত ছোট একখানি **খাট**, ছোট একটি **টেবিল**, একটি **চেয়ার**, একটি



জলচৌকি, রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি রাখিবার জন্য একটি **জালযুক্ত কাঠের ছোট আলমারী** প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই রাখা উচিত নয়। এই সকল প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতীত শুশ্রূষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি জিনিস প্রতি গৃহে থাকা একান্ত আবশ্যক, যেমন—

(১) ঠাণ্ডা জলের ব্যাগ।
(২) একটি গরম জলের ব্যাগ।
(৩) নলযুক্ত ডুস।
(৪) ফিডিং কাপ।
(৫) বেডপ্যান।
(৬) ঔষধ মাপিবার গ্লাস।
(৭) একটি ক্লিনিক্যাল থার্মমিটার।
(৮) সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত একটি ঘড়ি।



রোগীর দৈনন্দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য **গামলা, বালতি, মগ**, মুখ ধুইবার **পিকদানী, বেডপ্যান, নলযুক্ত একটি ডুস, ইউরিন্যাল** প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিতে হয়। রোগীর শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে আরও অনেক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা থাকে কিন্তু গৃহে ঐগুলি রাখা সম্ভব হয় না এবং সাধারণ সেবা-শুশ্রূষায় উল্লিখিত সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোনও জিনিসের দরকার হয় না।

শিশু, বয়স্ক এবং বৃদ্ধ বয়সের এই বিভিন্ন স্তরের রোগীর শুশ্রূষা ঃ

শিশুর শুশ্রূষা ঃ শিশুদিগের এবং বয়স্কদিগের শুশ্রূষার ভিতর কতকগুলি মূলগত পার্থক্য আছে, এইজন্য শিশুদিগের শুশ্রূষা করা অধিকতর কষ্টকর ব্যাপার। শিশুর বিশ্বাসভাজন হইতে না পরিলে শিশুর শুশ্রূষা করা ফলপ্রসূ হয় না, এজন্য **অসীম ধৈর্য, কৌশল** এবং **সমবেদনার প্রয়োজন হয়।**

শিশুর দেহের খুব দ্রুত বৃদ্ধি হয়, এইজন্য শিশুর পথ্য পুষ্টিকর হওয়া প্রয়োজন। শিশুকে কম বা অনুপযুক্ত খাদ্য দিলে শরীরের ওজন হ্রাস পায়, আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্য শিশুকে পরিবেশন করিলে অতিভোজনে পরিপাকের গোলমাল সৃষ্টি হয়। অথচ বয়স্ক লোকদের চাইতে শিশুরা অধিক ক্ষুধার্ত; সেইজন্য শিশু অসুস্থ বলিয়া তাহার খাবার বন্ধ করিলে চলিবে না। এই বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শমত পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছোট শিশুরা তাহাদের রোগের যন্ত্রণার কথা বলিতে পারে না; সেইজন্য শুশ্রূষাকারীর যত্নপূর্বক লক্ষ্য রাখিয়া উহার দেহের যন্ত্রণার উপশম ও দেহ-যত্নের ব্যবস্থা করিতে হয়। অভিজ্ঞ শুশ্রূষাকারী শিশুর কান্নার ধরন দেখিয়া উহার শারীরিক যন্ত্রণার কারণ নির্ণয় করিতে পারে। **শিশু একেবারে না কাঁদিলে** উহার কোনও গুরুতর রোগের কথাই ধরিয়া লইতে হয়। **স্বাস্থ্যবান শিশু সাধারণতঃ একদিকে কাত হইয়া শয়ন করে; কিন্তু শারারিক কোনও কষ্ট হইলে চিৎ হইয়া শয়ন করে এবং চোখ বন্ধ থাকে।**

ছোটদের মুখ ধোওয়ার কাজটিও বয়স্কদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শিশুরা নিজেরা মুখ ধুইতে পারে না বলিয়া বড়দের মত শিশুর মুখের ভিতরটা ভালভাবে পরিষ্কার করা যায় না। জীবাণুনাশক কোনও ঔষধ ন্যাকড়ায় লাগাইয়া আঙুলের সাহায্যে মুখের ভিতর, মাড়ি ও জিভ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে গ্লিসারিন সাপোজিটরের সাহায্যে মলত্যাগ করাইতে হয়। শিশুদের পায়খানা করাইবার জন্য কখনও জোলাপ খাওয়াইতে হয় না। শিশুর মলত্যাগ করার পর পরিষ্কার ন্যাকড়ার সাহায্যে জোর না দিয়া আস্তে আস্তে মলদ্বার মুছিয়া ফেলিতে হয়। জোরে ঘষা লাগিলে চামড়া উঠিয়া ক্ষত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ **শিশুর চর্ম খুব কোমল।**

শিশুর দেহের তাপ নিতে হইলে থার্মমিটার বগলে অথবা মুখে না দিয়া, মলদ্বারে দিতে হয়। থার্মমিটারটির পারদ নামাইয়া উহার **পারদ দেওয়া অংশটি ভেসলিন মাখাইয়া শিশুর মলদ্বারে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়।** এই সময় শিশুকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া পা দুইটি তুলিয়া ধরিতে হয়। এক মিনিট

রাখিবার পর থার্মমিটারটি তুলিয়া তাপ দেখার পর জলে ধুইয়া সাবধানে খাপের ভিতর রাখিয়া দিতে হয়।

এইভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে বয়স্ক রোগী ও শিশু রোগী-ভিতর শুশ্রূষায় পদ্ধতি আলাদা, যদিও সাধারণভাবে সমস্ত ব্যক্তির পক্ষেই সেবা-শুশ্রূষার নিয়মকানুন একই ধারায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বয়স্ক রোগীর শুশ্রূষা : রোগকালীন অবস্থায় মানুষের মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে না। শরীরের কষ্টে মনের দুর্বলতায় বয়স্ক ব্যক্তিও অনেক সময় শিশুর মত ব্যবহার করে। পথ্য খাওয়া, ঔষধ খাওয়া, মাথা ধোওয়া প্রভৃতি বিষয়ে এতো খামখেয়ালী করিয়া থাকে যে অনেক সময় তাহাদের শান্ত ও সংযত করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। আদর্শ গৃহকর্ত্রী ধৈর্যহারা না হইয়া ধীর মস্তিষ্কে কৌশলে রোগীকে শান্ত করিয়া শুশ্রূষার কার্য চালাইয়া যায়। দিবরাত্রি কঠিন ধৈর্য ও কৌশল দ্বারা বুদ্ধিমতী শুশ্রূষাকারী যে-কোন রোগীকেই বশে আনিয়া শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য পালন করেন। রোগীর প্রয়োজনীয় কার্য ছাড়াও রোগীর নিকট মাঝে মাঝে বসিয়া রোগীর রুচিমত হাল্কা ধরনের গল্প ও কথাবার্তার ভিতর দিয়া শুশ্রূষাকারী রোগীর মনকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে পারে। আবার কখনও বা রোগীর গায়ে, মাথায় হাত বুলাইয়াও দিতে পারে; অবশ্য এসব ক্ষেত্রে রোগীর পছন্দ ও অপছন্দের কথাই বড়।

ঘুম হইতে ওঠার পর সর্বপ্রথমে রোগীর মুখ পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। রোগী নিজে মুখ ধুইতে পারিলে এই কাজে কেবল মাত্র তাহাকে সাহায্য করিলেই চলিবে। সেইজন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী—পেস্ট, ব্রাশ, জল, জিভছোলা, কুলকুচা করিবার ঔষধ, মাড়িতে লাগাইবার ঔষধ প্রভৃতি হাতের কাছে দেওয়া। শোয়ানো অবস্থায় মুখ ধোয়াইতে হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত কাজটি করিতে হয়।

যে সমস্ত রোগী উঠিয়া বসিতে পারে না বা ডাক্তারের নির্দেশমত নড়াচড়া নিষেধ তাহাদের বেড্-প্যানের সাহায্যে পায়খানা করাইতে হয়। বেড্-প্যান ব্যবহারের পূর্বে দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার উপর একটি রবার ক্লথ পাতিয়া বেড-প্যানটি পাতিয়া দিতে হয়। শীতকালে বেড্-প্যান গরম করিয়া দিলে রোগী আরাম বোধ করিবে।

প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ হওয়ার পর রোগীর ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া শুশ্রূষাকারী নিজের জামা-কাপড় পাল্টাইয়া লইবে। নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া রোগীর প্রাতঃকালীন খাবারের ব্যবস্থা করিবে। তাহার পূর্বে সকালের দিকেই একবার থার্মমিটার দিয়া রোগীর তাপটি দেখিয়া লইতে হয় এবং ঐ সময় ব্যবহার্য ঔষধ থাকিলে তাহা দিতে হয়।

রোগীকে খাদ্য দিবার পূর্বে যতদূর সম্ভব **উহা তরল ও ভিটামিনবহুল** হওয়া আবশ্যক। **ক্ষারধর্মী খাদ্য** রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। রোগীর উপযোগী খাদ্য-অদল বদল করিয়া **বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া রোগীকে পরিবেশন করিতে হয়।** চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া রোগীকে কোনও খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। রোগীর খাদ্য গ্রহণের কিছুক্ষণ পর উহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিতে হয়। **ঔষধ দিবার পূর্বে ভাল করিয়া নাম দেখিয়া লইয়া ঝাঁকাইয়া নিয়া মাপিবার গ্লাসে ঢালিতে হয়।** ঔষধ খাওয়াইবার পর ঔষধটি যথাস্থানে রাখিয়া গ্লাসটিও ধুইয়া তুলিয়া রাখিতে হয়। ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল দিতে হইলে খাইবার পূর্বে কিছু জল মুখে লইতে হয়। তারপর ঔষধটি খাইবার পর পুনরায় জল পান করাইতে হয় যাহাতে ঔষধটি গলাধঃ-করণ হইতে পারে। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী সারাদিন এবং রাত্রের ঔষধ রোগীকে নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট বারে দিতে হয়।

কিছু সময় বিশ্রাম করার পর রোগীকে বেলা দশটার ভিতর মাথা ধোওয়াইয়া, গা স্পঞ্জ করিয়া দিতে হয়। যত্ন সহকারে গা স্পঞ্জ করিয়া দিলে রোগী খুব আরাম বোধ করিবে। স্পঞ্জ করিবার পর রোগীর সমস্ত দেহে পাউডার মাখাইয়া দিতে হয়। এক্ষণে রোগীকে আর এক প্রস্থ পোশাক পরিধান করাইতে হইবে। রোগীর ছাড়া জামা-কাপড়গুলি এক পাশে রাখিয়া দিয়া, পরে **জীবাণু-নাশক ঔষধ ও সাবানের সাহায্যে ধুইয়া কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।** রোগীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পর্ব শেষ হইবার পর উহাকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করিতে হয়। এই খাদ্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। রোগী তাহার পথ্য সহজে গ্রহণ করিতে চায় না সুতরাং পরিষ্কার ও সুন্দর বাসনপত্রে সাজাইয়া-গুছাইয়া একটি ট্রেতে পরিবেশন করিলে খাদ্যের প্রতি স্বভাবতঃ তাহার আকর্ষণ আনিবে। **খাদ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াও খাদ্যের প্রতি রোগীর মনোযোগ আনা যায়।** খাওয়ার পর রোগীকে হাত-মুখ পরিষ্কার করাইয়া—পুনরায় বিশ্রামে রাখিতে হয়। খাওয়ার ঠিক পরেই রোগীকে ঘুমাইতে দিতে নাই। ঘণ্টাখানেক পর রোগীকে কিছুক্ষণ ঘুমাইবার সময় দিতে হয়। সহজে রোগীর ঘুম না আসিলে মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইতে হয়।

রোগীর ঘুম ভাঙ্গিবার পর রোগীকে কিছু হাল্কা খাবার বা ফলের রস খাইতে দিতে হয় এবং যথারীতি ঔষধপত্রাদি দিয়া দেহের তাপ লইয়া পূর্বের ন্যায় লিখিয়া রাখিতে হয়। প্রয়োজন মত রোগীকে একবার বেড্‌প্যান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সময় রোগীর পছন্দমত হাল্কা ধরনের **গল্পের বই, পত্রিকা** ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা

করিয়া দেওয়া যায়। সব সময় রোগীকে কড়াকড়ি নির্দেশের ভিতর না রাখিয়া উহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরও কিছু কিছু কাজ ছাড়িয়া দিতে হয়। রোগের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদর্শন করিলে রোগীর মন আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে।

রাত্রেও আবার যথারীতি ঔষধ দেওয়া, তাপ লওয়া, আহার করানো, মুখ পরিষ্কার করানো, মলমূত্র ত্যাগ করানো প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাইয়া রোগীর নিদ্রার প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। রাত্রের নিদ্রায় যাহাতে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় শুশ্রূষাকারীর সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। অযথা রোগীকক্ষে লোকসমাগম, রোগীকক্ষে বা কক্ষ সন্নিকটে জোরে কথাবার্তা বলা, মচ্ মচ্ করিয়া জুতা পায়ে হাঁটা বা উচ্চ শব্দ প্রভৃতি হইয়া যাহাতে রোগীর কোন বিরক্তি উৎপাদন না করে, সে বিষয়ে বাড়ির প্রত্যেকের সতর্ক হওয়া উচিত।

বৃদ্ধের শুশ্রূষা : শিশু ও বয়স্ক লোক অপেক্ষাও বৃদ্ধের শুশ্রূষা সর্বাপেক্ষা কষ্টকর। শিশু কথা বলিতে পারে না বা বুঝাইতে পারে না, তাই তাহার শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া নেওয়াতে শুশ্রূষাকারীর অভিজ্ঞতা ও চাতুর্যের প্রয়োজন। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি সবই উপলব্ধি করিতে পারে এবং বুঝাইতে পারে, কেবলমাত্র তাহার মনকে সান্ত্বনা দিয়া ধৈর্য সহকারে শুশ্রূষা করিয়া গেলেই চলে। কিন্তু বৃদ্ধকে চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসকেরাই অনেক সময় হিম্‌সিম্ খাইয়া যায়, সেখানে শুশ্রূষাকারীর পক্ষে রোগীকে আয়ত্তে আনা খুবই অসুবিধাজনক। শরীরের দিক তো বটেই মনের দিক থেকেও বৃদ্ধরা খুব দুর্বল থাকেন। সংসারে তাহারা অবহেলিত এ ধারণাটা বহু বৃদ্ধের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বৃদ্ধ শিশুর মতই অবুঝ। কোনও কিছু যুক্তি দ্বারা তাহাদের বুঝানো যায় না। শুশ্রূষা করার কাজগুলি ব্যক্তিগতভাবে সকলের বেলাতে একই কিন্তু বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী মনস্তত্ত্ব বিচারকরিয়াশুশ্রূষায় অগ্রসর হইতে হয়। শিশুর-মত মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া রোগীর মনকে সংযত করিয়া লইতে হয়।

বৃদ্ধ রোগীকে পথ্য দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। হজম করিতে কষ্ট এরূপ কোনও খাদ্য রোগীকে দেওয়া চলে না। বৃদ্ধের হজম ক্ষমতা এমনিতেই কম, এই বয়সে দেহের কোনও ক্ষয়-পূরণ, দেহ পরিপোষণ, পুষ্টিসাধন প্রভৃতি কোনও কাজই হয় না। বৃদ্ধের রোগকালীন অবস্থায় লঘুপাক ভিটামিনবহুল খাদ্য দিলেই চলে, ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী দুধ, ছানা, ফলের রস, রুটি, মাছ এই সকল লঘুপাক খাদ্য বৃদ্ধকে দিতে হয়। স্নেহ পদার্থ, বেশি মিষ্টি এবং কোনও গুরুপাক খাদ্য বৃদ্ধের আহার্য বস্তুতে একেবারেই বর্জন করিতে হয়। খাদ্যের পরিমাণও একবারে যাহাতে বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

মুখ ধোওয়াইবার সময় বৃদ্ধ ব্যক্তির দাঁতে কখনও জোরে ঘষা দিতে হয় না। বাঁধানো দাঁত থাকিলে উহা মুখ পরিষ্কার করিবার **পূর্বে জীবাণুনাশক ঔষধে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়।** বৃদ্ধের আদৌ যদি কোনও দাঁত না থাকে তবে নরম তুলির সাহায্যে মাড়ি পরিষ্কার করিয়া লিষ্টারিন মিশাইয়া অল্প গরম জলে মুখ ধোয়াইয়া দিতে হয়। ন্যাকড়া বা তুলার সাহায্যে জিভ পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

গা স্পঞ্জ করিবার সময় বৃদ্ধ ব্যক্তির বেলাতে শুশ্রূষাকারীর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। বৃদ্ধের চামড়া শিথিল হইয়া ঝোলা থাকে, অনেক সময় অনেক বৃদ্ধ **অস্থিচর্মসার থাকেন,** মাংসপেশী কম থাকাতে জোরে রগড়াইলে বেদনা অনুভূত হয়; সুতরাং যত্ন সহকারে এই কাজটি ধীর স্থির ভাবে করিতে হয়। গা স্পঞ্জ করিবার সময় **নিম্ন অঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় ভাঁজ আছে, সেই সকল স্থান ভাল ভাবে পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণ শুকাইয়া লইতে হয়।** বৃদ্ধ ব্যক্তির শুইয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় **বেড-সোর** হইতে দেখা যায়, সুতরাং কখনই রোগীর কোনও অঙ্গে ময়লা এবং জল যাহাতে জমিয়া থাকিতে না পারে সেজন্য শুশ্রূষাকারীর সতর্ক হইতে হয়। রোগীর পিঠে, কোমরে প্রতিদিন **স্পিরিট ও অলিভ অয়েল** একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খুব ভাল ভাবে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মালিশ করিতে হয়। দেহের কোনও অংশে যেন বেশি চাপ না পড়ে, এবং রোগীকে নরম বিছানায় শুইতে দিতে হয়। রক্ত-চলাচলের জন্য মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ ঘুরাইয়া ফিরিয়া শোওয়াইতে হয়। সাধারণতঃ বৃদ্ধদের রক্তের জোর কমিয়া গিয়া রক্ত-চলাচলের কাজও খুব কম হয়। **সুতরাং উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার অভাবে অনেক সময় বৃদ্ধ রোগীদের বেডসোর হইতে দেখা যায়।** একবার বেড-সোর হইয়া পড়িলে উহা সারানো কষ্টকর এবং উহা খুব বেদনাদায়ক হয়।

একজন বৃদ্ধ অসমর্থ রোগীকে বেডপ্যান দেওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। রোগী অনেক সময় মলমূত্রের বেগ সামলাইতে পারে না; সে ক্ষেত্রে তাহার যদি মলমূত্র বিছানায় পড়িয়া যায় উহাতে শুশ্রূষাকারীর বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া যেন কিছুই হয় নাই এরূপ ভাব দেখাইয়া রোগীকে সহানুভূতির সহিত পরিচালনা করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি শিশু আর বৃদ্ধ একই পর্যায় পড়ে, শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাঁহার লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় তাহার এই কার্যকলাপের জন্য নিজেই লজ্জিত থাকে। অপর কেহ যাহাতে টের না পায় শুশ্রূষাকারীর গোপনে সহানুভূতির সহিত রোগী ও তাহার

বিছানা পত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। রুগ্ন অবস্থায় বৃদ্ধদেরও সময় কাটাইবার জন্য বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয়। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মত বৃদ্ধ ব্যক্তি রোগকালীন অবস্থায় কোনও পুস্তক বা খবরের কাগজ পড়িতে সমর্থ হন না। উহাদের **দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ** থাকে সুতরাং তাহাদের ইচ্ছামত মাঝে মাঝে অথবা প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা পড়িয়া শুনাইলে আনন্দ লাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া অনেকে **গীতা, চণ্ডী, প্রভৃতি ধর্মপুস্তক পাঠ শ্রবণেও ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন।** একজন গৃহকর্ত্রী কোনও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে শুশ্রূষা করিতে হইলে সমবেদনা ও সহানুভূতির সহিত কোমল মন লইয়া নৈপুণ্যের সহিত এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হইবে।

রোগীকে স্পঞ্জ করানো : রোগীকে স্পঞ্জ করাইবার প্রধান উদ্দেশ্য দেহের উত্তাপ কমানো এবং অস্থিরতা কমাইয়া সুনিদ্রার সাহায্য করা।

ঠাণ্ডা এবং গরম দুই প্রকার জল দ্বারাই স্পঞ্জ করানো যাইতে পারে। ঠাণ্ডা স্পঞ্জের জন্য জলের উত্তাপ হওয়া উচিত ৭০° হইতে ৫০° ফারেনহাইট পর্যন্ত এবং উষ্ণ স্পঞ্জে জলের তাপ হওয়া উচিত ৯০° ফারেনহাইট হইতে ৭০° ফারেনহাইট পর্যন্ত।

রোগীকে স্পঞ্জ করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি : দুইটি কম্বল, একটি ম্যাকিণ্টোস, স্নানের একটি তোয়ালে, মুখ পরিষ্কার করিবার একটি তোয়ালে, স্পঞ্জ বাথ ইহার পরিবর্তে তোয়ালে দিয়াও কাজ চালানো যায়। একটি জলপূর্ণ পাত্র যাহাতে অডিকোলন, লবণ অথবা ভিনিগার মিশ্রিত থাকিবে। উল্লিখিত উত্তাপের এক জগ জল, প্রথম জল ব্যবহারের পর পুনরায় এই জলের দরকার হইবে।

স্পঞ্জ করার প্রণালী : রোগীর গায়ের উপরের চাদরটি সরাইয়া দিয়া। রোগীকে একটি কম্বল দ্বারা মুড়িয়া দিতে হইবে। আর একখানা ম্যাকিণ্টোস এবং কম্বল রোগীর নীচে রাখিতে হইবে। অন্যান্য সমস্ত পরিচ্ছদ সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

প্রথমতঃ, রোগীর মুখ স্পঞ্জ অথবা ভিজা তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া লইতে হইবে। ইহার পর একটি হাত ক্ষিপ্রতার সহিত মুছিয়া লইতে হইবে। তোয়ালে বা স্পঞ্জ জলে ভিজানো থাকিবে কিন্তু কোনও সাবান মাখান থাকিবে না। কারণ **স্পঞ্জ করার উদ্দেশ্য তাপ কমান**—পরিষ্কার করা নহে। অপর হাতটি, দেহ, গা এবং পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্পঞ্জ করিয়া যথা সম্ভব দেহখানি কম অনাবৃত রাখিতে হইবে।

স্পঞ্জ করিবার পর চামড়া দৃঢ়ভাবে কিন্তু ধীরে ধীরে একটি তোয়ালে দ্বারা চাপিয়া দেহের আর্দ্রতা শুকাইয়া লইতে হইবে। জোরে ঘষাঘষি বা **রগড়ানো একেবারেই নিষিদ্ধ**। কারণ ইহাতে গায়ের তাপ কমিবার পরিবর্তে বাড়িবে।

২০ মিনিট ধরিয়া স্পঞ্জ করিবার পর ম্যাকিণ্টোস ও কম্বল সরাইয়া লইয়া রোগীকে শুষ্ক পোশাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

শীতল আবরণ (কোল্ড প্যাক) : পূর্বের ন্যায় রোগীকে প্রস্তুত করিয়া, ভিজা কাপড় নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া রোগীর দেহে জড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ডাক্তারের নির্দেশমত ১৫ হইতে ৩০ মিনিট রাখিতে হইবে। পুনরায় আবার ভিজা আবরণ সরাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি রোগীকে শুষ্ক রাখিতে হইবে এবং পরিচ্ছদ দ্বারা রোগীকে ঢাকিয়া দিতে হইবে। **রোগীর কম্পন আরম্ভ হইলে, গরম কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইবে** এবং গরম দুধ বা হরলিক্‌স্ খাইতে দিতে হইবে। সর্দিগর্মি রোগে এই প্রক্রিয়ায় তাপ কমানোর ব্যবস্থা চলিতে পারে। এই প্রক্রিয়ার কিছু পূর্বে রোগীর তাপ লইতে হইবে আবার ফলপ্রসূ হইল কিনা ইহা জানিবার জন্য স্পঞ্জ করার পর আবার রোগীর তাপ পরীক্ষা করিতে হইবে।

রোগীর দেহের তাপ লওয়া এবং উহা ছকের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা

ক্লিনিক্যাল থার্মমিটারের সাহায্যে দেহের তাপ লওয়া হয়। দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৮·৪° ফাঃ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক স্বাস্থ্য অনুসারে এই তাপ কম-বেশি হয়।

অসুস্থ অবস্থায় দেহের তাপ কম বা বেশি হয়। থার্মমিটার দেহের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানে লাগানো যায়, যেমন—**মুখে, বগলে, কুচকিতে ও মলদ্বারে**। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের সাধারণতঃ মুখে এবং বগলে থার্মমিটার লাগানো হয়। শিশুদের কুচকিতে এবং মলদ্বারে থার্মমিটার রাখিয়া তাপ লইতে হয়। তাপের চার্ট রাখিতে হইলে দেহের একই স্থান হইতে বিভিন্ন বার তাপ লইতে হয় কেননা বগল ও কুচকি অপেক্ষা মুখ ও মলদ্বারে দেহের তাপ ১° ফারেনহাইট বেশি ওঠে।

দেহের উত্তাপ লইবার সময় সতর্কতা

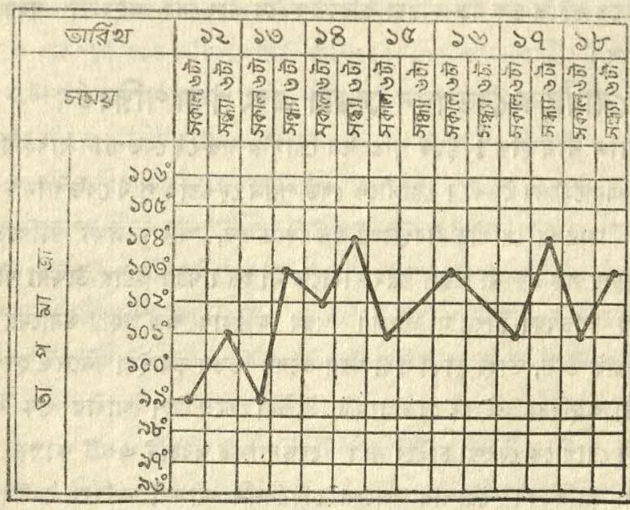
(১) থার্মমিটারটি ঝাঁকাইয়া ৯৫° ফাঃ-এর নীচে নামাইয়া লইতে হয়।

(২) জলীয় অর্থাৎ তরল পদার্থ খাইবার অন্ততঃ পনেরো মিনিটের মধ্যে মুখে থার্মমিটার লাগানো উচিত নয়।

(৩) রোগীর গা মোছানো বা স্পঞ্জ করিবার ঠিক পরেই কুচ্‌কি বা বগলে থার্মমিটার দিয়া দেহের তাপ লওয়া উচিত নয়।

(৪) থার্মমিটার নির্ধারিত সময় অপেক্ষা কিছু আগে না তুলিয়া বরং কিছু পরে তুলিলে ভাল।

(৫) কখনও রোগীর দেহে লাগানো অবস্থায় থার্মমিটারের তাপ না দেখিয়া উহা তুলিয়া লইয়া ভালভাবে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে চার্টে লিখিয়া রাখিতে হয়।



(৬) ব্যবহারের পর থার্মমিটারটি ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া কিছুক্ষণ জীবাণুনাশক লোসনে ধুইয়া তুলিয়া রাখিতে হয়। শিশুকে মলদ্বারে থার্মমিটার দেওয়ার পূর্বে পারদে ভেসেলিন মাখাইয়া লইতে হয়।

রোগীর দেহের উত্তাপ লইবার পর উহা একটি ছক কাটা কাগজে লিখিয়া রাখিতে হয়। উত্তাপের ওঠা নামা দেখিয়া চিকিৎসক রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। স্থতরাং এই কাজটি শুশ্রূষাকারীর খুব সতর্কতার সহিত করিতে হয় যাহাতে থার্মমিটার দেখিতে ভুল না হয় বা লিখিতেও কোনরকম ত্রুটি না থাকে।

গ্রাফ কাগজের মত কাগজে ছোট ছোট করিয়া চৌকা ঘর কাটিয়া লইতে হয়। ছকের উপরিভাগে বাঁ দিক হইতে ডান দিকে তারিখ ও তাপ লইয়ার সময় লেখা থাকিবে। দিনে দুইবার তাপ লইলে ছকে প্রতিদিনের জন্য দুইটি করিয়া ঘর টানিয়া লইতে হয়। ছকের বামদিকে দেহের নিম্নতম তাপের সংখ্যা ৯৬° হইতে উচ্চতম ১০৬° ডিগ্রী পর্যন্ত দাগ কাটিয়া রাখা হইবে। (যদিও থার্মমিটারে ১১০° ডিগ্রি

পর্যন্ত দাগ থাকে আবার নীচের দিকে ৯৫° পর্যন্ত চিহ্নিত থাকে। ঐরূপ তাপ উঠিতে এবং নামিতে হইলে তার পূর্বেই রোগীর মৃত্যু ঘটে।)

এইবার জর দেখিয়া ছকের ভিতরের ঘরগুলিতে তাপের সংখ্যা বসাইয়া যাইতে হয়। বিন্দুর সাহায্যে ইহা চিহ্নিত করা হয় তারপর রেখা টানিয়া দিয়া বিন্দুগুলিকে পরস্পর যুক্ত করিয়া দিলে জরের ওঠা নামা সহজেই বোঝা যায়। দৈনিক দুবারের বেশি জর নিতে হইলে ছক বড় করিয়া করিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী সময়গুলিও লিখিতে হইবে।

রোগীকে বেডপ্যান দেওয়া এবং শয্যা পরিবর্তন

বেডপ্যান ব্যবহার ঃ গৃহস্থ পরিবারে রোগীর জন্য যে বেডপ্যান ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা এনামেলের তৈরী। রোগীকে বেড প্যান দেওয়ার পূর্বে বেডপ্যানটি একটু গরম করিয়া তারপর রোগীর ব্যবহারের জন্য দিতে হয়, আবার লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে চামড়ায় সহ্য হয় না এরূপ গরম যাহাতে না হয়। গরম করার উদ্দেশ্য যাহাতে রোগীর দেহে আচমকা ঠাণ্ডা না লাগে। গরম করিবার জন্য উহা উনানের কাছে রাখিয়া দেওয়াই ভাল, তাহা ছাড়া উহা গরম জলের ভিতর ডুবাইয়া নিলেও হয় কিন্তু ইহার একটা অসুবিধা এই যে বেডপ্যানটি ভিজিয়া গেলে উহা আবার শুষ্ক করিয়া নেওয়ার পূর্বে রোগীকে দেওয়া চলিবে না। বেডপ্যানটি সর্বদাই একটি কাপড় দ্বারা ঢাকা দেওয়া থাকিবে। রোগীর গায়ের চাদরখানি আলগা করিয়া বেডপ্যানের ঢাকনা খুলিয়া লইয়া রোগীর ডান পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এক্ষণে বাম হস্তদ্বারা নিতম্বদেশ তুলিয়া ডান হাত দ্বারা বেডপ্যানটি যথাস্থানে বসাইয়া দিতে হয়। মলত্যাগের পর কিছুটা পেঁজা তুলা লইয়া জলে ভিজাইয়া রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। রোগীর গায়ে জর থাকিলে তুলাটি গরম জলে ভিজাইয়া লইতে হয়। ঐ তুলা বেডপ্যানে ফেলিতে হয় না কেননা বেডপ্যানের মলের সঙ্গে উহা নালায় ফেলিলে নালার মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। রোগীর ব্যবহারের পর ডাক্তারের দেখিবার প্রয়োজন না পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে বেডপ্যানটি সরাইয়া লইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। নাইজল বা কোনও **নির্বীজক ঔষধের সাহায্যে বেডপ্যানটি পরিষ্কার করিতে হয়।** রোগীর জন্য ব্যবহৃত জল অন্য পাত্রে ফেলিয়া নির্বীজক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। **শৌচের জল বেডপ্যানে ফেলিলে, মলের প্রকৃতি বোঝা যায় না।** রোগীর ব্যবহৃত তুলা একটি কাগজে মোড়ক করিয়া রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। বেড প্যান দিনান্তে একবার চূর্ণ বা ব্লিচিং পাউডারের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

শয্যা পরিবর্তন : যে রোগী নিজে উঠিয়া বসিতে পারে না বা নড়াচড়া করিতে পারে না তাহার বিছানা পরিবর্তনের জন্য শুশ্রূষাকারী একজন সাহায্যকারী ব্যক্তি লইবে। খাটের দুই দিকে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া চাদরটির কোণগুলি আগে আলগা করিয়া আনিবে। রোগীর গায়ের আচ্ছাদন সমস্ত সরাইয়া লইতে হইবে। যে পরিষ্কার চাদর এবং ম্যাকিণ্টোস পাতা হইবে উহা লইয়া রোল করিয়া গুটাইয়া রাখিবে। এই-রূপ প্রস্তুত হইয়া রোগীর মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। এইবার দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীকে একপাশ কাত করিয়া ধরিয়া থাকিবে। তখন শুশ্রূষাকারী বিছানায় পাতা ম্যাকিন্‌টোস ও চাদর একসঙ্গে রোল করিয়া সরাইয়া লইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ম্যাকিন্‌টোস ও পরিষ্কার চাদর পাতিতে থাকিবে। নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিছানার মাঝামাঝি পাতা হইয়া গেলে অপর ব্যক্তি রোগীর কাঁধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে সামান্য তুলিয়া ধরিবে এবং শুশ্রূষাকারী একসঙ্গে চাদর ও ম্যাকিন্‌টোস সম্পূর্ণ খুলিয়া ফেলিয়া নূতন ম্যাকিন্‌টোস ও চাদর খুব তাড়াতাড়ি টানিয়া পাতিয়া দিবে। বালিশ যথাস্থানে রাখিয়া রোগীর গায়ের চাদর রোগীর গায়ে ঢাকিয়া দিবে। এইরূপে অন্যের সাহায্যে লইয়া শুশ্রূষাকারী রোগীর বিছানা পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইবে।

রোগীকে খাদ্য ও ঔষধ দেওয়া

খাদ্য : চিকিৎসক রোগীর জন্য যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন শুশ্রূষাকারী উহা সারা দিন ও রাত্রে ভাগ করিয়া লইবে। এ বিষয়ে শুশ্রূকারীর যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। খাদ্যের বেশির ভাগ অংশ দিবাভাগে প্রয়োজন হয়। রাত্রে এক বারের বেশি খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রাত্রে যাহাতে ৯টার পর রোজ ঘুমাইয়া থাকে সেইরূপ ব্যবস্থাই করা উচিত। চিকিৎসকের নির্দেশ ব্যতীত রোগীকে ঘুম হইতে তুলিয়া খাদ্য খাওয়াইবার প্রয়োজন হয় না। শুশ্রূষাকারী একটি খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহার বার ও পরিমাণ লিখিয়া রাখিলে পর্যবেক্ষণের খুব সুবিধা হয়।

রোগীকে খাদ্য দিবার পূর্বে উহার হাত মুখ ভাল করিয়া ধোওয়াইয়া দেওয়া উচিত। শীতকাল হইলে এবং রোগী যদি জরাক্রান্ত থাকে তবে উষ্ণ জল দ্বারা হাত মুখ ধোওয়ানোই শ্রেয়। রোগী যতটা খাদ্য খাইবে ততটা পরিমাণই রোগীর নিকট আনিতে হয়। রোগীর যাহা খাওয়া উচিত তাহার বেশি খাদ্য কখনও রোগীর নিকট আনা উচিত নয়। রোগীর খাদ্যটি **সুন্দর ঢাকনা সহ একটি ট্রেতে বিভিন্ন বাসনে সাজাইয়া আনিতে পারিলে খাদ্যের প্রতি রোগী আকৃষ্ট হইবে।** রোগীর বাসন কখনও যেন ভাঙ্গা, ফাটা ও দাগযুক্ত না হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং যতদূর সম্ভব সুন্দর বাসনপত্রে রোগীর খাদ্য পরিবেশন করিতে হয়। বিছানার উপর একখানা **জলচৌকির উপর** খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া রোগীর খাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে রোগীর খুব সুবিধা হয়। রোগী তাহার স্বাধীন মত খাদ্য গ্রহণ করিবে। এই ব্যাপারে রোগীর সঙ্গে বেশি কথা বলা বা রোগীকে বেশি সাহায্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। রোগীর আহার গ্রহণের সময় শুশ্রূষাকারীর তখনও তাড়াহুড়া বা অস্থিরতা প্রকাশ করা উচিত নয়। রোগী যাহাতে **আস্তে আস্তে ধীর চিত্তে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।**

রোগীকে শায়িত অবস্থায় তরল খাদ্য খাওয়াইতে হইলে হাতখানি বালিশের নীচে দিয়া রোগীর মাথা সামান্য উঁচু করিয়া ধরিতে হয় আর ডান হাত দিয়া **ফিডিং কাপের সাহায্যে** নলের ভিতর দিয়া খাদ্য রোগীর মুখে দিতে হয়। যাহাতে জামা ভিজিয়া না যায় সেজন্য শুশ্রূষাকারী রোগীর গলা ও বুক একটি তোয়ালে দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। রোগীর গিলিতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ : (১) রোগীকে ঔষধ দেওয়ার পূর্বে, সর্বদা **ঔষধের গায়ের টিকিট** পড়িয়া লইতে হয়। আন্দাজের উপর শুধুমাত্র ঔষধের রং দেখিয়াই রোগীকে ঔষধ দেওয়া চলে না।

(২) ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী **ঔষধের মাত্রা ও বার এবং কয় ঘণ্টা অন্তর** ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ দেওয়া উচিত।

(৩) তরল ঔষধ দিবার পূর্বে ঔষধের শিশিটি ভালভাবে **ঝাঁকাইয়া লইতে** হয়। ঔষধ ঢালিবার পর সঙ্গে সঙ্গে **ছিপি দ্বারা শিশিটি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।**

(৪) বড়ি ঔষধ দেওয়ার সময় প্রথমে মুখে জল দিয়া লইতে হয় আবার ঔষধটি মুখে লওয়ার পর মুখে জল দিতে হয় যাহাতে গিলিতে অসুবিধা না হয়।

(৫) শায়িত অবস্থায় রোগীকে কোনও পাউডার ঔষধ দিতে হইলে উহা জলে গুলিয়া দিতে হয়।

(৬) রোগী ঘুমাইতে থাকিলে ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া ঔষধ দেওয়া উচিত নয়।

ঔষধ রাখার বিষয়ে শুশ্রূষাকারীর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ ঔষধ (খাইবার ঔষধ) এবং মালিশ করার **'বিষ'** ঔষধ কখনও এক জায়গায় রাখিতে হয় না। বিষ ঔষধে 'বিষ' কথাটি বোতলের গায়ে লেখা থাকিবে। যে কোনও ঔষধই রোগীর নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

অষ্টম অধ্যায়

সাধারণ কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি

মানুষের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যবান্ ও সুগঠিত দেহের অধিকারী হইবার জন্য মানুষকে শৈশব হইতেই সতর্ক হইতে হয়। অখাদ্য ভোজন, অতিভোজন, বিশ্রামের অভাব, অনিয়ম, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। এই সকল বিষয়ে সতর্ক হইলে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে স্বাস্থ্যবান হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও সে নানা প্রকার **সংক্রামক ব্যাধির** আক্রমণে রোগাক্রান্ত হইতে পারে। সংক্রামক ব্যাধি বলিতে সেই সকল রোগকেই বুঝায় যে সকল রোগ কোন বিশেষ প্রকার বীজাণু দ্বারা এক দেহ হইতে আর এক দেহে ছড়াইয়া পড়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধারণ কয়েকটি শিশুরোগ

আমাদের দেশে বহু শিশু প্রতি বৎসর বিভিন্ন রোগে মারা যায়। রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই সকল মৃত্যুর প্রধান কারণ। শিশুদের সাধারণতঃ **ডিপথেরিয়া, হাম, জলবসন্ত, মাম্পস, হুপিং কাশি, ঘুংড়ি কাশি** প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগিতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া খাদ্য ও পানীয়ের দোষে শিশুর পেটের নানা রকম পীড়া হইতে পারে। **আমাশয়, ইনফ্যানটাইল কলেরা** প্রভৃতি রোগ শিশুর পক্ষে মারাত্মক। পোলিওমায়েলেটিস নামক একপ্রকার **ইনফ্যানটাইল প্যারালেসিস্ শিশুর জীবনকে পঙ্গু করিয়া** দেয়। ইহা এক প্রকার ভাইরাস জাতীয় জীবাণু দ্বারা আক্রমণ ঘটে।

আগেকার তুলনায় আমাদের দেশেও এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এতো দ্রুত উন্নতি সাধন হইয়াছে যে পিতামাতা একটু সতর্ক হইলেই সামান্য লক্ষণ প্রকাশের পর ডাক্তারের চিকিৎসায় শিশুকে রাখিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় বেশির ভাগ পিতামাতা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শিশুর তিন মাস বয়স থেকেই যদি উহাকে **ট্রিপল্ এন্টিজেন** দেওয়া হয় তাহা হইলে আর এই মারাত্মক রোগ হইতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেক সময় শিশুর ব্রঙ্কাইটিস রোগ হয়। বুকে সর্দি বসিয়া এই রোগ শিশুকে দুর্বল করিয়া তোলে, অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে। শিশুকে মুক্ত বায়ু সেবন করানো ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া কোন অবস্থাতেই ঠাণ্ডার ভিতর শিশুকে রাখা উচিত নয়। **ব্রঙ্কাইটিস** থেকে অনেক সময় শিশুর **নিউমোনিয়া** রোগ হয়। শিশুর টনসিল্ বড় থাকিলে চিকিৎসকের অধীনে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়। টনসিল্ থেকে নানা রকম ব্যাধিতে শিশু আক্রান্ত হইতে পারে। শিশুদের ভিতর **কর্ণমূল ফোলা** বা গালগলা ফোলা রোগ খুবই দেখা যায়। বাড়ীতে কোনও শিশুর এই রোগ দেখা দিলে অন্য শিশু হইতে তাহাকে দূরে রাখিতে হইবে। হাম, জলবসন্ত প্রভৃতি রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। ছোট ছোট শিশুদের এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকে বলিয়া বাড়ীতে একটি শিশুর হইলে অপর কোনও শিশুও এই রোগে আক্রান্ত হয়। যথাসম্ভব হাম জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা রাখিতে হয়, যাহাতে অন্য শিশুর ভিতর ইহা ছড়াইয়া না যায়। শিশুর স্নায়বিক বা পেটের কোনও গোলমাল হইতে অনেক সময় **তড়কা** আরম্ভ হয়। রোগটি মারাত্মক না হইলেও শিশুকে দুর্বল করিয়া তোলে। যে কারণে তড়কা হয় শরীরের সেই কারণ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। তড়কা বন্ধ করার জন্য **মাথায় অনবরত জল ঢালিতে হয় এবং উষ্ণ জলের মধ্যে শিশুকে বসাইয়া রাখিতে হয়।** পরে গরম কম্বলে শিশুকে জড়াইয়া রাখিতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংক্রামক ব্যাধির বিভিন্ন লক্ষণসমূহের প্রাথমিক জ্ঞান

হাম ঃ রোগী এই রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হয়। প্রথম অবস্থায় সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় দিনে অথবা ৩।৪ দিন পর গায়ে ঘামাচির মত ছোট ছোট লাল গুটি দেখা যায়। প্রথম দিকে জ্বর কম থাকে, শেষে জ্বর বাড়ে। মাথায় যন্ত্রণা হয়, আহারে অরুচি আসে।

জলবসন্ত ঃ জলবসন্তের গুটিগুলি জল নিয়া উঠে এবং হাম অপেক্ষা গুটিগুলি বড় হয়। পিঠে ও পায়ে বেদনা অনুভূত হয়। অল্প জ্বর হয়, রোগীর অস্থির ভাব দেখা যায়।

গুটি বসন্ত : গুটি বসন্ত বা আসল বসন্ত, ইহা জলবসন্ত অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি ; ইহাতে জ্বরের তাপ খুব বেশি হয়। শরীরে তীব্র যন্ত্রণা হয়। রোগের তৃতীয় দিনে গুটি বাহির হয়। শেষের দিকে গুটিগুলিতে পুঁজ হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা : রোগের প্রারম্ভে ক্রমাগত হাঁচি ও কাশি হয়। হাত, পা ও মাথায় ব্যথা হয়। কাঁপুনি দিয়া বেশি জ্বর হয়। রোগীর খাওয়ায় অনিচ্ছা হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে।

ডিপথেরিয়া : এই রোগে রোগীর দেহ ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয় ; আবার অতর্কিতেও আক্রান্ত হয়। গলায় ক্ষত হয় ; গলা ব্যথা হয় ; গিলিতে কষ্ট হয়। জ্বর ১০১° হইতে ১০৩° পর্যন্ত উঠে।

কলেরা : রোগটি জলবাহিত সংক্রামক ব্যাধি। ইহা একটি মারাত্মক রোগ বমি ও দাস্ত হয়। দাস্তের রং চাল-ধোওয়া জলের মত। রোগীর চোখ, মুখ ও গলার স্বর বসিয়া যায়। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

টাইফয়েড : রোগীর জ্বর একেবারে কখনই ছাড়ে না, মাথায় যন্ত্রণা থাকে। অনেক সময় পায়খানা পাতলা হয় ; জিভ অপরিষ্কার থাকে। রোগের প্রকোপ বেশি হইলে রোগী ভুল বকে।

হুপিং কাশি (ঘুংড়ি কাশি) : প্রথম অবস্থায় নাক দিয়া জল পড়ে, তারপর কাশি আরম্ভ হয়। কাশির বেগ এতো বেশি হয় যে আর থামিতে চাহে না। সাধারণতঃ রাত্রে কাশি বাড়ে এবং হুপ্ হুপ্ করিয়া শব্দ হয়। অনেক সময় এই রোগে চোখ দিয়া, মুখ দিয়া রক্ত পড়ে।

মাম্পস্ (কর্ণমূল ফোলা) : এই রোগের লক্ষণ হঠাৎ দেখা দেয়। সামান্য জ্বর হয় ; খাদ্য খাওয়া যায় না। চোয়ালের পিছনে কানের সামনে বেদনা অনুভূত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার বিভিন্ন উপায়

(ক) রোগের প্রথম অবস্থায় রোগ নির্ণয় : রোগকে অবহেলা না করিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া মাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হয়। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসকের নির্দেশ মত ঔষধ সেবন করিলে রোগ নিরাময় হয়।

(খ) **স্বতন্ত্রীকরণ ঃ** গৃহে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে রোগীকে অন্য একটি নির্দিষ্ট ঘরে স্থানান্তরিত করিতে হয় ; সেখানে শুশ্রূষাকারী ব্যতীত আর কেহ প্রবেশ করিবে না। বাড়ীতে স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা না থাকিলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইতে হয়।

(গ) **বিজ্ঞপ্তিকরণ ঃ** সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি নিবারণ করিতে হইলে বাড়ীতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্র স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হয়। ইহাই বিজ্ঞপ্তিকরণ। সংবাদ পাইলে কর্তৃপক্ষ এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে এবং রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

(ঘ) **সঙ্গরোধ ঃ** সংক্রামক রোগের সংস্রবে যে সকল ব্যক্তি থাকে, তাহাদিগকে যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয় তাহাকে সঙ্গরোধ বলা হয়।

রোগীর যতদিন রোগ-সংক্রমণ করার ক্ষমতা আছে, ততদিন পর্যন্ত সেই বাড়ীর লোকেদের অফিস-কাছারীতে যাওয়া বন্ধ করিতে হয় ; ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়—এই সকল আটককে স্থানীয় সঙ্গরোধ বলা হয়।

সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তিদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, ইহাকে আভ্যন্তরীণ সঙ্গরোধ বলা হয় ; আবার অনেক সময় প্রতিবেশী দেশের লোকদের নিরাপত্তার জন্য কোন একটি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত দেশের লোকদের সেই দেশ ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও যাইতে দেওয়া হয় না ; ইহাকে বহির্মুখী সঙ্গরোধ বলে।

(ঙ) **নির্বীজন** (সদ্য ও পরিশেষ) **ঃ** নির্বীজন দুই প্রকারের হয় ; **সদ্য নির্বীজন ও পরিবেশ নির্বীজন**। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর **মলমূত্র, কফ, থুথু, বমি** এবং উহার ব্যবহৃত বাসন-পত্রাদি জীবাণুশূন্য করণের নাম **সদ্য নির্বীজন**। রোগীর **কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, বাসন-পত্রাদি** অর্থাৎ রোগী যাহা কিছু ব্যবহার করে সব কিছুর ভিতরই রোগ-জীবাণু থাকে। রোগীর বাসনপত্র ও কাপড়-জামা লাইজল-মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সাবান দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয়। পরে **রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই নির্বীজন হইয়া যায়।**

পরিশেষ নির্বীজন ঃ রোগী আরোগ্যলাভের পর বা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে **রোগীর কক্ষ, আসবাব-পত্রাদি ও রোগীর ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্য হইতে যাহাতে রোগ না ছড়ায় সেইজন্য যে নির্বীজন করা হয় তাহাকে পরিশেষ নির্বীজন বলে।**

বসন্ত, কলেরা, প্লেগ এই জাতীয় কোনও রোগীর জিনিসপত্রাদি পুড়াইয়া ফেলা উচিত। কোন ঘরকে বিশেষভাবে বিশোধন করিতে হইলে দেওয়ালের প্লাস্টার তুলিয়া নূতন করিয়া বালি ও সিমেণ্টের প্লাস্টার করা হইবে এবং পরে পর পর **দুইবার চুণকাম করা হইবে**। ইহা ছাড়া **ফরম্যালডিহাইড গ্যাস প্রয়োগ** করিয়া জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া লইলে ঘর বিশোধন হইয়া যায়। অনুরূপভাবে **ঘরে গন্ধকও পোড়ানো যায়**। এইগুলি ছাড়া ঘরের দেওয়াল ও সিলিং নির্বীজন করিতে হইলে **'পারক্লোরাইড অফ মার্কারী' সলিউসন স্প্রে করিয়া** ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ঘরের মেঝে ৩০ মিনিটের মত লাইজল লোসনে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ফিনাইলে দুর্গন্ধ দূর হয় কিন্তু জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা ফিনাইলের নাই। আসবাব-পত্রগুলি লাইজলের জলে মুছিয়া রৌদ্রেরাখিতে হয়। ধোয়ারপরআসবাব-পত্র-গুলিতে রং লাগাইয়া লইলে ভাল হয়। **বইপত্র, চামড়ার সুটকেস, ব্যাগ** ইত্যাদি তৈজসপত্র গন্ধকের ভাঁপ লাগাইয়া নির্বীজন করিতে হয়। **রোগীর তোষক, গদী ও, বালিশে** ফরম্যালিনের ভাঁপ লাগাইয়া পরে কয়েকদিন পর পর উহা কড়া রৌদ্রে রাখিতে হয়। **প্রখর সূর্যকিরণে রোগ-জীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়**। কাঁচা বাড়ী বিশোধন করিতে হইলে মেঝের কিছু মাটি ফেলিয়া দিয়া গোবর-মাটি দিয়া ঘর লেপিয়া ফেলিতে হয়। সম্ভব হইলে টিন বা বাঁশের কঞ্চির বেঁড়া খুলিয়া লিয়া জীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা ধুইয়া কিছুদিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিতে হইবে; টিনের অথবা টালির চাল ঘরে গন্ধক পুড়াইয়া নির্বীজন করা যায়।

(চ) **অনাক্রম্যতা ঃ** আমাদের দেহের রক্তে রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকিলে অনেক সময় এই প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে এই ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা যায়। রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা হইতে রোগজীবাণুর শক্তি বেশি হইলে তবেই আমরা সেই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হই। রোগাক্রমণের বিরুদ্ধে এই ক্ষমতা অর্জনকেই বলা হয় **অনাক্রম্যতা**।

দেহের ভিতর রোগের বীজ ঢুকাইয়া অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি করা হয়; যেমন **টিকা ও ইন্‌জেকশন** দ্বারা বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা যায়। ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি রোগের অনাক্রম্যতা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহের ভিতর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সৃষ্টি করা হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা ঃ সংক্রামক ব্যাধির কারণ, এবং উহার গুরুত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ জ্ঞান জনসাধারণের ভিতর প্রচার করিয়া এ বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিতে হয়।

সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিকট হইতে দূরে থাকা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বাজারের আঢাকা ও পচা খাদ্য ক্রয় না করা, সংক্রামক রোগ দেখা দিলে অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট নানা উপায় দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা স্থায়ী করিয়া তুলিতে হয়। নৈশ বিদ্যালয়ে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, **সভা-সমিতিতে** রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের **বক্তৃতার মাধ্যমে** এবং **ছায়াচিত্রের সাহায্যে** রোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ছবি দেখাইয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রস্তুত রাখা

গৃহে যে-কোনও সময় যে-কোনও লোকের আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত উহার আরামের ব্যবস্থা করিয়া প্রাথমিক প্রতিবিধান দেওয়া গৃহকর্ত্রীরই কর্তব্য। গৃহকর্ত্রীর এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা উচিত। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির বাক্স সহ গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে প্রস্তুত থাকা উচিত যাহাতে আকস্মিক দুর্ঘটনায় সেই ব্যক্তির প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। কম বেশি অনেক জিনিসই প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজন হয়। তবে নিম্নলিখিত অপরিহার্য দ্রব্যগুলি প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর জন্য গৃহে থাকা একান্ত আবশ্যক। **ডেটল, বরিক তুলা, বার্ণল, টিংচার আয়োডিন, ছোট কাঁচি, বিভিন্ন রকমের ব্যাণ্ডেজ** ইত্যাদি জিনিসগুলি হাতের কাছে থাকিলে গৃহকর্ত্রী অতি সহজেই রোগীর প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রোগীর কিছুটা আরামের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে বাড়ীর যে-কোনও প্রাথমিক প্রতি-বিধানকারী যাহাতে উহার সাহায্যে রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে সে বিষয়ে সচতেন থাকিতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানের **বাক্সটি নাড়াচাড়ার দায়িত্ব সাধারণতঃ গৃহকর্ত্রীর উপরই থাকা উচিত।** কেননা শুশ্রূষার ব্যাপারে মেয়েদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। আদর্শ গৃহকর্ত্রী অনেক সময় পুরাতন শক্ত কাপড়ের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাণ্ডেজ তৈরী করিয়া রাখেন প্রয়োজনে

ব্যবহারের জন্য। পুরাতন সাদা কাপড় দিয়া বিভিন্ন মাপের রোলার ব্যাণ্ডেজ এবং বড় ছোট নানাপ্রকার ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ তৈরী করা যায়। কিনিতে হইলে ইহার দামও এখন নেহাৎ কম নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক প্রতিবিধান এবং ইহার প্রয়োগস্থল

আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনায় চিকিৎসক আসিবার পূর্বে রোগীকে শুশ্রূষা করা এবং উহার আরামের ব্যবস্থা করাকে **প্রাথমিক প্রতিবিধান** বলা হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীর অবস্থা গুরুতর হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া।

প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১) কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে **অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত** কাজটি করিতে হয়।

(২) রোগীর আহত স্থান হইতে রক্তপাত ঘটিলে **সর্বপ্রথম রক্তপাত বন্ধ করিতে হয়।**

(৩) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে **কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করিতে হয়।**

(৪) রোগীকে বেশি নড়াচড়া করানো উচিত নয়।

(৫) রোগীর নিকট হইতে **ভীড় সরাইয়া দিতে হয়।** নির্মল বায়ুর ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(৬) কখনই ডাক্তারের কাজ শুশ্রূষাকারী না করিয়া **যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারকে ডাকিতে হয়** অথবা হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়।

সকলপ্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন বহু দুর্ঘটনা রাস্তায় ও বাড়ীতে সব সময়ই ঘটিতেছে। কাহারও আছাড় খাইয়া হাত-পা ভাঙ্গে, কেহ বা গাড়ী চাপা পড়িয়া আহত হয়, কাহারও কলার খোসা বা আমের খোসায় পা পিছলাইয়া দুর্ঘটনা ঘটে। আবার বাড়ীতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া,

বিষাক্ত কোনও কীটের দংশন, কাঁকড়া বিছার হুল ফুটানো, গলায় কিছু আটকাইয়া যাওয়া, ইলেকট্রিক শকে আহত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের দুর্ঘটনা প্রতি সংসারেই ঘটিতেছে। সামান্য অবহেলা এবং অজ্ঞতার জন্য এই সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে না পারিলে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিক প্রতিবিধানের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার কর্মতৎপরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে রোগীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর সুব্যবস্থার জন্য ডাক্তারের চিকিৎসার অনেক সুবিধা হয়। একটি কথা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হয় ডাক্তারের কাজ কখনও প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করা উচিত নয় এবং ডাক্তার আসিবার পরই তাহার কর্তব্য শেষ হইয়া যায়।

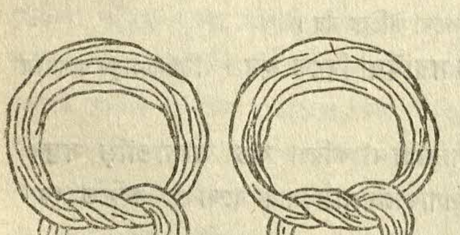
বিভিন্ন প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সাধারণ ব্যাণ্ডেজ

দেহের কোথায়ও ক্ষত ও আহত হইলে কাপড়ের সাহায্যে বাঁধিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই বাঁধিয়া দেওয়াকেই ব্যাণ্ডেজ বলা হয়।

ব্যাণ্ডেজ করিবার পূর্বে ব্যাণ্ডেজের বাঁধ সম্বন্ধে প্রথমে জানিতে হয়। বাঁধ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে; যেমন, **গ্র্যানি নট ও রিফ নট**। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য কখনও গ্র্যানি নট ব্যবহারকরিতে নাই। গ্র্যানি নট ব্যাণ্ডেজের এক অংশ টানিলেই বাঁধ খুলিয়া যায় না। তাড়াতাড়ি খোলা সম্ভব নয় বলিয়া **ব্যাণ্ডেজে গ্র্যানি নট না দিয়া রিফ নট ব্যবহার করিতে হয়।** রিফ নট সহজেই খোলা যায়। সার্টের উপর ছেলেরা যেনেক টাই ব্যবহার করে তাহাও রিফ নট দ্বারাই বাঁধা হয়।

বন্ধনীর প্রকারভেদ


রিফনট গ্রানিনট

ব্যাণ্ডেজ দুই প্রকারের হয়; **ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ এবং রোলার ব্যাণ্ডেজ**। অস্থি ভঙ্গ হইলে বা হাড়ে চোট লাগিলে হাত ঝুলাইয়া রাখা সম্ভব হয় না; সেক্ষেত্রে হাতটিকে আরাম দেওয়ার জন্য হাতটিকে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া দিতে হয়,

ইহাকেস্লিং বলা হয়। স্লিং ছাড়াও ব্যাণ্ডেজ করিবারজন্যও ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন হয়। পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে হঠাৎ কোনও ব্যাণ্ডেজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না; সেখানে একটি **রুমাল কোণাকুণি ভাঁজ করিয়া ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের কাজ চালানো যায়।**

ব্যাণ্ডেজের প্রকারভেদ

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার প্রণালী : ব্যাণ্ডেজ মাত্রই **মজবুত, আরামপ্রদ** এবং **শোভন** হওয়া উচিত; ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় বেদনা বা অস্বস্তি হইতে পারে, এমন ভাবে চাপ দিতে হয় না। **ব্যাণ্ডেজ ভাল বাঁধিবার জন্য অনবরত অভ্যাস করিতে হয়।**


মাথার খুলির ব্যাণ্ডেজ

মাথার খুলির ব্যাণ্ডেজ : একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া ভূমির সহিত সমান্তরাল করিয়া ১½ ইঞ্চি চওড়া একটি ভাঁজ করিয়া এমনভাবে মাথায় রাখিতে হয় যাহাতে এই ভাঁজ করা অংশ **কপালের উপর ভ্রূর খুব কাছাকাছি পড়ে এবং ব্যাণ্ডেজের কোণটি পিছনে ঝুলিতে থাকে। ব্যাণ্ডেজের অপর দুইটি কোণ কানের উপর দিয়া মাথার পিছন হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া কপালে বাঁধ দিতে হয়।** পিছনে যে কোণটি ঝোলা থাকে, তাহা নীচের দিকে টানিয়া সমান করিয়া ঘুরাইয়া মাথার উপরে আনিয়া পিন দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়।

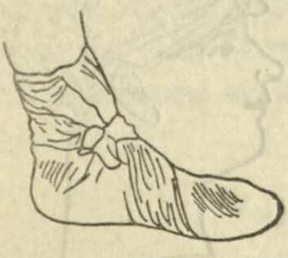
করতলের ব্যাণ্ডেজ : আঙ্গুলগুলি বিস্তৃত থাকিলে ব্যাণ্ডেজের ভূমিতে একটি ভাঁজ করিয়া এমনভাবে রাখিতে হয় যাহাতে **ভূমির মধ্যস্থল কব্জির নীচে** এবং তৃতীয় কোণটি আঙ্গুলগুলির নীচে পড়ে; **তৃতীয় কোণটি আঙ্গুলগুলি ঢাকিয়া কব্জির উপর সামনের দিকে লইয়া আসিতে হয়**; এবং ভূমির দুই কোণ বিপরীত দিক হইতে কব্জি জড়াইয়া ঘুরাইয়া আনিয়া বাঁধ দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে তৃতীয় কোণটির যে অংশ বাহির হইয়া থাকে, তাহা দিয়া বাঁধটি ঢাকিয়া সেফটিপিনদিয়া আটকাইয়া রাখা যায়।


করতলে ব্যাণ্ডেজ

ফুট বা চরণে : ব্যাণ্ডেজটি চওড়া করিয়া পায়ের নীচে এমনভাবে রাখিতে হয় যাহাতে ব্যাণ্ডেজের মধ্যস্থল পায়ের নীচে এবং তৃতীয় কোণটি আঙ্গুলের দিকে পড়ে। তৃতীয় কোণটি ইন্‌ষ্টেপে

পায়ের কব্জার উপরে আনিয়া রাখিতে হয়। এইবার ভূমির দুই প্রান্ত পায়ের উপরে ভাঁজ করিয়া বিপরীত দিক হইতে গোড়ালি বেড়িয়া সম্মুখ ভাগে আনিতে হইবে, এবং গুল্ফ-সন্ধির সম্মুখে বা পাশে বাঁধ দিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকারেরও হইতে পারে; যেমন, পূর্বের ন্যায় ভূমির দুই প্রান্ত সম্মুখভাগে আনিয়া এবং বিপরীত দিক হইতে পায়ের চেটোর নীচ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া পায়ের চেটোর উপর বাঁধ দিতে হয়। সর্বশেষে মধ্য কোণটি টানিয়া সোজা করিয়া ইন্‌ষ্টেপের উপর ভাঁজ করিয়া লইয়া ব্যাণ্ডেজের সহিত পিন দিয়া আটকাইতে হয়।





পায়ের চেটোর ব্যাণ্ডেজ

নিম্ন চোয়াল ব্যাণ্ডেজ : আহত অস্থির ঠিক নীচে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করতল রাখিয়া ধীরে ধীরে উপরের চোয়ালের দিকে তুলিয়া ধরিবে। এইবার একটি সরু ব্যাণ্ডেজ চিবুকের নীচে রাখিয়া একপ্রান্ত মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া চোয়ালের কোণের কাছাকাছি অপর প্রান্তের সহিত ফাঁস দিতে হইবে; পরে দীর্ঘপ্রান্ত পুনরায় চিবুকের উপর দিয়া ঘুরাইয়া একপাশে অপর প্রান্তের সহিত বাঁধিতে হইবে।

রোলার ব্যাণ্ডেজ : সাধারণ রোলার ব্যাণ্ডেজের জন্য **বিভিন্ন ইঞ্চি মাপের লম্বা কাপড়ের ফালি জড়ানো বা গুটানো অবস্থায় লম্বা 'গুলি' পাকানো থাকে।** ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় একটু একটু করিয়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে গুটানো ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ **হাতের আঙ্গুলে, পায়ের আঙ্গুলে, মাথায়, চোয়ালে, কব্জিতে** প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানেই রোলার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়। পায়ের গোড়ালির সন্ধিস্থলে ব্যাণ্ডেজ করিবার প্রয়োজন হইলে সেক্ষেত্রে রোলার ব্যাণ্ডেজই উপযোগী। প্রথমে রোলার ব্যাণ্ডেজটি পায়ের পাতার উপরে ব্যাণ্ডেজের মুখের



চোয়ালের ব্যাণ্ডেজ

কাপড়টি রাখিয়া হাতের চাপে ঠিক মত ধরিয়া ব্যাণ্ডেজটি গোড়ালির উপর দিয়া ঘুরাইয়া মুখটির কাছে আনিতে হয়; তারপর দুইটি মুখ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বাকি অংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই প্রণালীতে সন্ধিস্থলের রোলার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহে বিষাক্ত ঔষধপত্রের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা

প্রত্যেক গৃহস্থ সংসারেই হঠাৎ কোনও বিপদ-আপদ এড়াইবার জন্য কিছু কিছু ঔষধপত্র মজুত রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া বাড়ীতে রোগী থাকিলে তো নানা রকমের ঔষধ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী গৃহে রাখিতেই হয়। এই সকল ঔষধপত্রাদি সংরক্ষণ করায় অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র খাইবার ঔষধ ব্যতীত আরও অনেক ঔষধ আমরা ব্যবহার করি; যেমন, **চোখের ঔষধ, কানের ঔষধ, দাঁত ও গলায় লাগাইবার ঔষধ** এবং **বাত** প্রভৃতির জন্য মালিশের ঔষধ। খাইবার ঔষধ ছাড়া অল্পবিস্তর সব ঔষধই **'বিষ'** বলিয়া গণ্য করিতে পারি। তাহা ছাড়া একজনের ঔষধ অপর আর একজন খাইয়া ফেলিলে উহাতে বিষতুল্য ফলই ভোগ করিতে হয়। বাড়ীতে অনেক ছেলেপিলে থাকে। উহারা খেয়ালবশতঃ অনেক সময় ঔষধপত্র খাইয়া ফেলিতে পারে, আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেক আনাড়ী লোক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া না দেখিয়া একই রং-এর কোনও বিষাক্ত ঔষধ হয়তো রোগীকে খাওয়াইয়া দিল। ইহা যে কত মারাত্মক ব্যাপার তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। এই সকল কারণে **'বিষ' ঔষধপত্রগুলি নাগালের বাইরে আলমারীতে তালা চাবি দিয়া রাখিতে হয়।** বিষাক্ত ঔষধ সব সময় 'বিষ' কথাটি লিখিয়া লেবেল আঁটিয়া রাখা উচিত। বাড়ীতে রোগী সুস্থ হওয়ার পর উহার **অবশিষ্ট ঔষধগুলি ফেলিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।** কোন টনিক ঔষধ ব্যবহার না করিয়া যদি ফেলিয়া রাখা হয় তাহা হইলে উহা পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে দেখিয়া লইতে হয়, উহা ব্যবহারের উপযোগী কিনা। **ঔষধ ব্যবহারের মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে উহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া উচিত।** এই সকল ঔষধ ঘরে কখনও মজুত করিয়া রাখা উচিত নয়। অজ্ঞতাবশতঃ এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরের অনেক ক্ষতি

হয়। গৃহস্থ পরিবারে অনেক সময় **ইঁদুর, আরশোলা, উকুন** এবং **ছারপোকা** মারার বিভিন্ন **কীটনাশক** ঔষধ ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে ঐ ঔষধ ঘরে জমা করিয়া না রাখিয়া শিশি সহ ঔষধ বাইরে ফেলিয়া দিতে হয়। অবশিষ্ট ঔষধ যতদূর সম্ভব ঘরে না রাখাই ভাল। যদি রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে উহা বাড়ীর প্রত্যেকের অজ্ঞাতে গৃহকর্ত্রীর **একটি গোপন স্থানে তালা চাবি দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হয়।** গৃহে যেখানে সেখানে **টিকটুয়েন্টি** (ছারপোকা মারার ঔষধ) ঔষধ রাখায় অনেক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এরূপ গল্প অনেক শোনা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স পরিচালনা করা

গৃহকর্ত্রী এবং বাড়ীর অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যেকেরই প্রাথমিক প্রতিবিধান বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে হইলে বাড়ীতে উহার একটি বাক্স কিনিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই বাক্সে **ছোট ছোট খোপ থাকে,** উহাতে বিভিন্ন প্রকার **প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি** এবং অন্যান্য **সাজসরঞ্জামাদি থাকে।** **টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, এনহেসিভ্ প্লাষ্টার, বরিক কটন, স্মেলিং সল্ট, বার্ণল, ডেটল, পেনিসিলিন অয়েণ্টমেণ্ট, নিক্সোডাম, ছোট কাঁচি, সেফটিপিন, রোলার ব্যাণ্ডেজ, ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ** প্রভৃতি সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র প্রভৃতি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে সাজানো-গুছানো অবস্থায় থাকে। এই জিনিসগুলি অথবা ঔষধপত্রাদির ভিতর কোনটা ফুরাইয়া গেলে **ক্রয় করিয়া উহা পুনরায় বাক্সে রাখিয়া দিতে** হয়। ব্যবহারের পর যে জিনিসটি যেমন অবস্থায় বাক্সে থাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে গুছাইয়া রাখা প্রয়োজন।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের বাক্সটি কখনও **গুপ্ত স্থানে রাখা উচিত নয়।** ইহাতে হঠাৎ কোনও প্রয়োজনে গৃহিণীর অনুপস্থিতিতে অপর কেহ বিপদের সময় প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটি কাজে লাগাইতে পারিবে না।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের বাক্সটির ভিতর কোনও **ঔষধ বা মলম পুরাতন হইয়া গেলে উহা ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। এই সকল ঔষধের কোনও কার্যকরী গুণ থাকে না** অধিকন্তু উহা **দেহের ক্ষতিসাধন করে।**

উচ্চ মাধ্যমিক

গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ফলপ্রসূ গৃহ-পরিচালনা

গৃহকর্ত্রী তাহার পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে। গৃহের সুষ্ঠু পরিচালনা ফলপ্রসূ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের উপর মনোযোগী হইতে হয়। প্রথমতঃ **পরিকল্পনা**; পরিকল্পনা ব্যতীত কোন কাজেই কৃতকার্য হওয়া যায় না; সেজন্য গৃহের প্রতিটি কাজের জন্য চাই সুচিন্তিত পরিকল্পনা। গৃহকর্ত্রীর পক্ষে একা কোনও কাজ করা সম্ভব হয় না। গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য বাড়ীর প্রত্যেকের **সহযোগিতার** প্রয়োজন হয়। **গৃহকর্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া প্রত্যেকের একের প্রতি অপরের সহযোগিতা থাকিলে গৃহ-কাজটি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হয়।** উহার পরিবর্তে যদি একে অপরের সহিত হিংসার বশবর্তী হইয়া কলহ করে তবে পরিবারে কখনও শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিতে পারে না। গৃহকর্ত্রী প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বাড়ীর প্রত্যেকের কাজ তৎপরতার সহিত দেখাশুনা করিবে, নচেৎ অলস কর্মী কাজটি ফাঁকি দিয়া কোন রকমে সম্পন্ন করার চেষ্টা করিবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ ভাগ করিয়াও কোনও সুবিধা হয় না। **কাজের শেষে গৃহিণী লক্ষ্য রাখিবে বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্বগুলি কতদূর কার্যকরী হইল।** তাহার পরিকল্পনায় যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে এই সময় উহা ধরা পড়িবে। প্রয়োজন বোধে গৃহকর্ত্রী উহার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া পুনরায় তাহার পরিকল্পনাটি পরিবর্তন করিয়া লইবে। এইভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া কার্যটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্পন্ন করাইবার চেষ্টা করিয়া গেলেই কোনও এক সময় উহা ফলপ্রসূ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফলপ্রসূ পরিচালনায় পরিকল্পনার স্থান

প্রয়োজনবোধে পরিকল্পনার পরিবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশ এবং মূল্যাংনের স্থান

পরিকল্পনা: পরিকল্পনা ব্যতীত সুষ্ঠু গৃহ-পরিচালনা কখনই সম্ভব হয় না।

প্রত্যেক পরিবারের **গৃহকর্ত্রীকেই একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ আয়ের ভিতর সংসারের যাবতীয় খরচ চালাইয়া যাইতে হয়। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহকর্ত্রীর পক্ষে ইহা একটি কঠিন কাজ।** অতএব গৃহের সুব্যবস্থার জন্য গৃহকর্ত্রীকে পূর্বেই আয়-ব্যয়ের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, প্রচুর আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও একটি **সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবে গৃহ-পরিচালনার কাজটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়।**

সহযোগিতা : গৃহের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন হয়। শ্রম-বিভাগের অর্থ হইতেছে এই যে, পরিবারের ছোট বড় বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়া। ইহাতে একের অপরের সহিত যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় **অপরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজটি করিলে উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।** বিভিন্ন কার্যকে কেন্দ্র করিয়াই একের সহিত অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। **কাজের মাধ্যমে এই সহযোগিতার ভাব আরও দৃঢ় করা যায়।** প্রীতি ও স্নেহের বন্ধনে ইহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। বাইরের ক্ষেত্রে কোনও কাজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সফলতা লাভ করা যায় কিন্তু **গৃহের কাজে প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতাই প্রধান স্থান অধিকার করে।** যেখানে এই সহযোগিতার অভাবে কেবল দ্বন্দ্ব, কলহ ও ঈর্ষা বর্তমান সেখানে গৃহকর্ত্রী তাহার সংসারটিকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে না।

নির্দেশ : সুগৃহিণী একদিকে যেমন নিজের কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করিবে অপরদিকে উহার নির্দেশমত যাহাতে অপরাপর কাজগুলি অন্যের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতিও তাহার যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কাজের ভার দিবার সময় বাড়ীর পরিজনদের সময় ও সামর্থ্যের কথাটি সর্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া লওয়া দরকার। গৃহকর্ত্রীই পরিবারের নেত্রী। তাহার নির্দেশেই সমগ্র পরিবারটি পরিচালিত হয়। সুতরাং গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট **দুরদৃষ্টি, সমদর্শিতা, কাজ করাইবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ না থাকিলে তাহার নির্দেশে কাজের ব্যবস্থাপনায় কোনও কৃতকার্যতা লাভ করা যায় না।** পরিবারের সকল ব্যক্তির উপর নির্দেশ চালাইতে হইলে গৃহকর্ত্রীকে যথেষ্ট **ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইতে হয়।** গৃহকর্ত্রীর পক্ষে একা সকল রকমের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তাহার নির্দেশে অপরের দ্বারা কাজগুলি সুষ্ঠু সম্পন্ন হওয়াই গৃহকর্ত্রীর কৃতিত্ব।

মূল্যায়ন : সংসারের সমস্ত কাজ সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কতদুর উহা কার্যকরী

হইল গৃহকর্ত্রীর তাহা মূল্যায়ন করিয়া দেখিতে হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ ভাগ করিয়া দেওয়ার পর কাজগুলি যথার্থভাবে সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে উহা কতটা করা হয় নাই এবং কেন করা হয় নাই, কাজ ভাগের ভিতর কোনও ত্রুটি ছিল কিনা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় গৃহকর্ত্রীর পর্যবেক্ষণ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। কোথায়ও কোনও ত্রুটি থাকিলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পুনরায় উহা কিভাবে সংশোধন করা যায় সেদিকে মনোযোগী হইতে হয়। অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এবং সহানুভূতির সহিত কাজগুলি বিচার করিয়া দেখা দরকার। মূল্যায়ন কাজটি নিজে বিচার করিবার পূর্বে বাড়ীর পরিজনের উপর কিছু কিছু ছাড়িয়া দিতে হয়। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে সমস্ত ছোট-খাট কাজ করে উহা শেষ হইলে কাজটি ভাল হইল কি খারাপ হইল তাহার মূল্যায়ন উহারা নিজেরাই করিবে। ইহাতে তাহাদের বিচার-ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। ভাল কাজের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, নিজের কন্যার উপর একটি গুরু দায়িত্বসম্পন্ন কাজের ভার দিয়া বলা হইল কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। পুরস্কারের লোভে সে কাজটি আগ্রহের সহিত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, এবং ইহাতে উহার নৈপুণ্যও সৃষ্টি হইবে। পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে একখানা শাড়ী দেওয়া হইলে উহা সংসারের অপব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে না। ছেলেদের বেলাতেও কোনও একটি কাজ করাইয়া একটি ভাল পুস্তক পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। মাঝে মাঝে এরূপ কাজের মূল্য বিচার করিলে ছেলেমেয়েরা কাজের উৎসাহ পায়; তবে মনে রাখিতে হইবে এই পুরস্কারের চুক্তি যেন প্রতিটি কাজের জন্য না হয়, তাহা হইলে কাজের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে পুরস্কারের প্রতি লোভই বড় হইয়া দাঁড়াইবে।

সাংসারিক যাবতীয় কাজে কোনও রকম ত্রুটি দেখিতে না পাইলে গৃহকর্ত্রী পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য পূর্ববর্তী পরিকল্পনার ছকটিই গ্রহণ করিতে পারে। এই ভাবে সমীক্ষা চালাইয়া গৃহকর্ত্রীর পরিকল্পনা কখনও একই থাকিবে বা কখনও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহ-পরিচালনায় মানবীয় উপাদান

পরিবারের একের সহিত অপরের যদি সদ্ভাব না থাকে তবে গৃহটি সম্পূর্ণভাবে অচল হইয়া পড়ে। পরিবারটিকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে হইলে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের মধুর সম্পর্ক রাখা উচিত। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর নির্দেশ যদি কেহ না মানিয়া উহা অবহেলা করিয়া অগ্রাহ্য করে তবে সে সংসারে কখনও শান্তি বজায় থাকে না।

প্রত্যেক লোকের প্রকৃতি একরূপ হয় না, তবুও সংসারে একত্রে বাস করিতে হইলে একের সহিত অপরের খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়। সাধারণতঃ সংসারী মানুষের ভিতর ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি চারিত্রিক দোষগুলি প্রায়ই দেখা যায়। এই দোষগুলির প্রাধান্য ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে তো ক্ষতি হইবেই, একটি সংসারও অনেক সময় ছারখার হইয়া যায়।

ক্রোধের কুফল

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। **ক্রোধী লোককে কেহই পছন্দ করে না** এবং তাহার সহিত পরিবারের কাহারও মধুর সম্পর্ক স্থায়ী হইতে পারে না। **ক্রোধী লোককে সকলে ভয় পায়, তাহার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা, ভালবাসা সৃষ্টি হইতে পারে না।** এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা ক্রোধের সময় চীৎকার করিয়া অপরকে ভৎর্সনা তো করেই অধিকন্তু সংসারের জিনিসপত্র হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই ছুড়িয়া ফেলে এবং ভাঙ্গিয়া চুরমার করে। সুষ্ঠু গৃহ-পরিচালনা ইহাতে বিঘ্নিত হয়।

লোভ মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তোলে

ক্রোধের ন্যায় লোভও সংসারের বহু ক্ষতি সাধন করে। লোভী ব্যক্তি কখনই সংসারের অপরের কথা চিন্তা করে না। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি সাধারণতঃ লোভী হয়। পরিবারের তুচ্ছ জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সকল জিনিসের উপরই তাহার লোভ থাকে। গৃহকর্ত্রী বা গৃহকর্তা যদি লোভী প্রকৃতির হয় তবে সে সংসারে কখনই উন্নতি হইতে পারে না। বৃহৎ পরিবারে বা একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিতে হইলে **লোভ দমন না করিলে লোভী ব্যক্তি অপরের কথা চিন্তা না করিয়া**

সর্বস্বই নিজে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে; ইহা সংসারের পক্ষে অনিষ্টকর। ক্রোধ যেমন কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিলে প্রশমিত হয়, লোভও অপরের সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া অল্প সময়ের ভিতর দমন করা যায়। অভিজ্ঞ লোকের ক্রোধের সময় এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করিলে এই সময়ের ভিতর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি একটি সুন্দর সংসারকে ধ্বংস করিয়া দেয়। একান্নবর্তী পরিবারে ছোটখাটো ব্যাপারে ঈর্ষা লাগিয়াই থাকে। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি কাহারও কিছু ভাল দেখিলে তাহার প্রাণ জ্বলিয়া যায়। ভাইয়ে ভাইয়ে ঈর্ষার কথা এখন প্রায় প্রতি গৃহেই শোনা যায়। বিবাহের পূর্বে যে ভাই-এর প্রতি টান ছিল বিবাহের পর অচিরেই উহা ধূলিসাৎ হইয়া যায় কেন? এক্ষেত্রে তাহা হইলে বলা যায় মেয়েরা ঘর গড়ে, আবার মেয়েরাই ঘর ভাঙ্গে। পরিবারে স্ত্রী জাতির প্রভাব খুব বেশি। **মেয়েরা তাহার সুন্দর স্বভাবের গুণে পুরুষের চরিত্র প্রভাবিত করিয়া সংসারের শান্তি বজায় রাখিতে পারে।**

স্নেহ-ভালবাসা ঈর্ষাপরায়ণতা দূর করে

পারিবারিক ব্যবহারে ঈর্ষার বীজ শিশু বয়স হইতে দানা বাঁধে। দুইটি সন্তান যদি পিতামাতার কাছে ভিন্ন রকম ব্যবহার পায় তবে একে অপরকে হিংসা করিতে শিখে। শিশুর ভিতর ভালবাসার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে হিংসা দূর হয়। সংসারে যদি ভাইয়ে ভাইয়ে, বধূতে বধূতে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া কলহ করে তাহা হইলে একজন যদি উদারপ্রকৃতির হয় তবে **ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে ভালবাসার দ্বারা তাহার মন সে জয় করিতে পারে।** এই নতি স্বীকারে তাহার কোনও লজ্জা নাই, ইহা চরিত্রের সরলতা ও উদারতার পরিচয়।

মনের মিল থাকিলে সংসারে কাহারও বড় ত্রুটি-বিচ্যুতিও নজরে পড়ে না, আবার মিলের অভাবে সামান্য ত্রুটি বড় হইয়া যায়। একটি সুখের সংসার রচনা করিতে হইলে পরিবারের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সুমধুর সম্পর্ক গড়িয়া তোলা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ গৃহ-রচয়িত্রী

গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী এই দুইজনের মিলিত প্রচেষ্টায় গৃহের সর্বাঙ্গীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়। বাড়ীর কর্তা আর্থিক ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে আর গৃহিণী গৃহের সকল দায়িত্ব পালন করিয়া গৃহটিকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলে। গৃহিণী গৃহ রচনা করে বলিয়াই তাহাকে গৃহ-রচয়িত্রী বলা হয়। গৃহকর্ত্রীর **শিষ্টাচার, একনিষ্ঠতা, উদ্দীপনা, সহানুভূতি, গাম্ভীর্য** প্রভৃতি গুণের সমাবেশে গৃহের সুখ ও শান্তি বজায় থাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহিণীর ব্যক্তিত্ব ও আচরণ-বিধি

ব্যক্তিত্ব শব্দটির অর্থ হইতেছে সমগ্র মানুষটির পরিপূর্ণ রূপ। মানুষের **বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষগুণ** এই সকল মিলিয়াই উহার **ব্যক্তিত্ব।** ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্বের প্রভাবেই এক মানুষ অন্য মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

গৃহকর্ত্রীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমগ্র পরিবারের বিভিন্ন কার্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। **ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান লক্ষণ গাম্ভীর্য।** গাম্ভীর্যের প্রবল শক্তি। গৃহিণী উচ্চশিক্ষিতা না হইলেও চলে কিন্তু গম্ভীর না হইলে সংসারে কেহ মান্য করিবে না। চঞ্চল না হইয়া গম্ভীর প্রকৃতির হইলে স্ত্রীলোকের স্থির বুদ্ধি জন্মে এবং স্থির বুদ্ধি জন্মিলে সকল কাজই সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করা যায়।

গাম্ভীর্যের গুণ

কথায়-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে গাম্ভীর্য বজায় রাখিলে সকলেই ভয়, ভক্তি ও মান্য করে। ফলে সংসারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় অন্যান্য পরিজনের কেহই স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করার সাহস পায় না। গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের গুণে গৃহিণী গৃহের প্রত্যেককে মুগ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। এই অসীম গুণের জন্যই সংসারের সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

কয়েকটি গুণের মাধ্যমে গৃহকর্ত্রীর সৎ আচরণগুলি ধরা পড়ে। সুগৃহিণী হইতে হইলে প্রথমতঃ যে গুণের প্রয়োজন হয় সেটা হইতেছে **বুদ্ধিমত্তা**। অন্যান্য কতকগুলি সৎ গুণ থাকা সত্ত্বেও গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তার অভাবে এক একটি পরিবার সর্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বুদ্ধি মানুষের অনেক শক্তি দান করে। **পর্যবেক্ষণ-শক্তি, বিচার-ক্ষমতা, জ্ঞানসন্ধিৎসা** প্রভৃতি বুদ্ধিমত্তা হইতেই সৃষ্টি হয়। গৃহকার্যে এই ক্ষমতাগুলির অভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হঠাৎ কোনও পারিবারিক সমস্যা দেখা দিলে স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্না নারী হতভম্ব হইয়া পড়ে; তাহা দ্বারা কোনও সমস্যা সমাধানের উপায় থাকে না।

সুগৃহিণী হইতে হইলে বুদ্ধিমত্তার পরেই আসে **মানব চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান**। পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই ভিন্নপ্রকৃতির হয়; একের সহিত অপরের চরিত্রের হুবহু মিল কখনই সম্ভব হয় না। অতএব তাহাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ সব কিছু চিন্তা করিয়া সুগৃহিণী উহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে সেইরূপ আচরণ করিবে। এইভাবে প্রকৃতি বুঝিয়া কৌশল অবলম্বন করিয়া চলিলে কাহারও নিকটই অপ্রিয় হইতে হয় না; অধিকন্তু কাজটি আদায় করিয়া লওয়া যায়।

বৃহৎ সংসারে নানাপ্রকার অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রিয় ঘটনা বা পরিস্থিতির সহিত গৃহকর্ত্রীর সম্মুখীন হইতে হয়, সে ক্ষেত্রে গৃহিণীর যথেষ্ট **ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হইতে হয়**। হঠাৎ ধৈর্যহারা হইয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িলে কোনও মীমাংসা বা সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে আসা যায় না। অতএব সুগৃহিণীর **ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতা তাহার ব্যক্তিত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে**।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহ-পরিচালনায় বিভিন্ন উপাদান, জনশক্তি ও আর্থিক শক্তি

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির সহযোগিতা ও চেষ্টার বলে যেমন গৃহের সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভর করে, তেমনই আবার বিভিন্ন উপাদান ও আর্থিক সচ্ছলতা ব্যতীত গৃহ-পরিচালনার কাজটি সুসম্পন্ন সম্ভব হয় না।

সংসারের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়, ঐ

সকল জিনিসের অভাব ঘটিলে কাজকর্মের যথেষ্ট অসুবিধা হয়, ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যেমন রন্ধন ক্রিয়াদির জন্য হাঁড়ি, কড়াই, ডেকচি, থালা, বাটি, গ্লাস, হাতা, চামচ, খুন্তি, সাঁড়াশী, চাটু, বেলুন, চাকী, শিল, নোড়া, বালতি, মগ, কলসী প্রভৃতি; কাপড় কাচার জন্য গামলা, মগ, সতরঞ্চি, কম্বল, ইস্ত্রি প্রভৃতি; রোগীর চিকিৎসার জন্য থার্মমিটার, বেডপ্যান, ইউরিন্যাল, ঔষধ মাপিবার গ্লাস, হট ওয়াটার ব্যাগ, বরফের ব্যাগ ইত্যাদি। এই সকল ছাড়া আরও কত টুকিটাকি জিনিস আছে যাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রত্যেকটি জিনিসের যাহাতে সুষ্ঠু ব্যবহার হয় উহার প্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রয়োজনের সময় ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে উহার কোনই মূল্য থাকে না; সেই কারণে উপযোগিতার কথা চিন্তা করিয়া প্রত্যেকটি জিনিস ক্রয় করিতে হয়। পরিবারটি ছোট কি বড় সেই হিসাবে জিনিসটিও ছোট বড় হইবে।

গৃহ-পরিচালনায় বিভিন্ন তৈজসপত্রাদি

আবার অনেক গৃহিণী আছেন যাহারা কার্পণ্য করিয়া গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করে। উপযুক্ত জিনিসের অভাবে কাজে সময় বেশি লাগে, কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সুষ্ঠুভাবে কাজটি সম্পন্ন হয় না। গৃহিণীর এইরূপ কার্পণ্যকে কখনই প্রশংসা করা যায় না। ইহাতে কর্মের অপটুতাই প্রকাশ পায়।

সুষ্ঠু গৃহপরিচালনায় লোকশক্তি যে কতবড় ভরসা গৃহিণী মাত্রই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। মনুষ্য সমাজে লোকবল, বড় বল—ইহা অস্বীকার করা যায় না। একটি বড় পরিবার অপেক্ষা একটি ছোট পরিবার অনেক বেশি দুর্বল। যে পরিবারে লোকের সাড়া পাওয়া যায় না, শিশুর কলধ্বনি শোনা যায় না, গৃহকর্ত্রীর হাঁক-ডাক নাই, উহা অরণ্যের মতই নির্জন, নিস্তব্ধ। যে গৃহে বিভিন্ন লোকের সমাবেশ, সেখানে গৃহকর্ত্রী বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন লোক দ্বারা করাইয়া লইয়া গৃহটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলে এবং নিজেও বিশ্রামের অবকাশ পায়। মানুষের জীবনে কাজের মাঝে গল্পগুজবেরও একটা মূল্য আছে। তাই তো আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাজে কথার' উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। একক সংসারের গৃহিণী অবসর সময়ে কাহারও সঙ্গে গল্প-গুজব করার সুযোগ পায় না। সুগৃহিণী বাড়ীর প্রত্যেকটি লোককে কিছু না কিছু কাজ বণ্টন করিয়া উহাদের কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখিবে। ক্ষমতা অনুযায়ী এবং নৈপুণ্য অনুযায়ী কাজ ভাগ করিয়া দিলে সংসার স্বভাবতঃই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকর হইয়া উঠিবে। উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত কাজ না

সংসারে লোকবলের প্রয়োজনীয়তা

দিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হইবে না। আবার কাহাকেও সুস্থ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিলে তাহাকে অলসতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আমরা জানি অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক একটি শয়তানের কারখানা।

অর্থের সচ্ছলতা থাকিলেও গৃহিণী মিতব্যয়ী না হইলে অভাব-অনটন সে পরিবারে লাগিয়াই থাকে। অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা কখনই মিটানো যায় না। গৃহিণী সব সময়ই আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। আয়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র পরিবারটিই অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। সুগৃহিণীর সব সময়ই দৃষ্টি থাকিবে কি করিয়া ব্যয় কমাইয়া আয় বাড়ানো যায়। আয় না বাড়াইলে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। বাড়ীতে কৃষি ফসল উৎপন্ন করিয়া বাজার খরচ কমানো যায়, বাড়ীতে জামা-কাপড় কাচিয়া ও পোশাক তৈরী করিয়া দর্জি খরচ এবং ধোপা খরচ কমানো যায়। গৃহস্বামীর একার আয়ে সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার। গৃহকর্ত্রীর লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে সংসারে কিছু উপার্জন বৃদ্ধি পায়। অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা নানাবিধ অর্থকরী কাজের মাধ্যমে সংসারের কিছু আয় বাড়াইতে সক্ষম হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক অর্থ পরিচালনা

পারিবারিক সকল কর্তব্যের ভিতর একটি প্রধান কর্তব্য হইতেছে আর্থিক ব্যবস্থাপনা। পরিবারে অর্থ উপার্জন করে প্রধানতঃ গৃহকর্তা। বর্তমানে অবশ্য অনেক পরিবারের গৃহিণী অর্থ উপার্জন করিয়া গৃহের আয় বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, কারণ মধ্যবিত্ত একক পরিবারে একজনের আয়ে সংসার চালানো কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। **গৃহপরিচালনার কাজটি প্রধানতঃ মেয়েদের উপরই ন্যস্ত থাকে।** সুগৃহিণী সংসারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয়ের জন্য রাখিয়া দেয়। সুতরাং **আর্থিক ব্যাপারে গৃহস্বামী ও গৃহিণীর ভিতর যথেষ্ট সহযোগিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যে পরিবারে এই দুই-এর ভিতর আর্থিক সহযোগিতার অভাব দেখা যায়, সেখানে সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ব্যয় ও সঞ্চয় শৃঙ্খলামত হয় না।**

প্রথম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক বাজেট দ্বারা অর্থের ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে নির্দিষ্ট আয়ের ভিতর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া সংসার চালানো এক গুরুতর সমস্যা। যে-কোনও আয়সম্পন্ন পরিবার হউক না কেন আয়-ব্যয়ের জন্য একখানি সুপরিকল্পিত বাজেটের প্রয়োজন হয়। **মাসিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক খসড়াকেই বাজেট বলা হয়।** বাজেট ব্যতীত খরচ করিতে গেলে মাস শেষ হইবার পূর্বেই টাকা নিঃশেষ হইয়া যায়; আবার বাজেট অনুযায়ী খরচ করিলে সংসারের আকস্মিক কোনও ব্যয়ও অতি সহজেই মিটানো যায়। **বাজেট প্রণয়নে কোনও অপব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে না।** জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে বাজেটের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাজেট রচনার প্রয়োজনীয়তা

বাজেট রচনার সময় জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বিষয়গুলি বাজেটে প্রথম গণ্য করিতে হয়। **বাসস্থান, খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ** এই তিনটি আমাদের সভ্য সমাজে একান্ত আবশ্যকীয় হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা ব্যতীত পরিবারটি গ্রাম কি শহরে সেই হিসাবেও বাজেটের বাসস্থানের খরচ কম বেশি হয়। **গ্রাম অপেক্ষা শহরের বাড়ী-ভাড়া বেশি**; যাতায়াতের জন্য **যানবাহনের ব্যয় বেশি**। আবার জীবনের মান অনুযায়ী ধনী পরিবার অধ্যুষিত অঞ্চলে বাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য নানাবিধ খরচ বেশি। জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলির পরেই আসে শিক্ষা-খাতের খরচের কথা। পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় একটি বড় রকমের খরচ। বইপত্র, স্কুল-কলেজের মাহিনা, প্রাইভেট টিউটরের মাহিনা—এই সমস্তই শিক্ষা-খরচের অন্তর্ভুক্ত। ইহার পর আসে চিকিৎসা, ঔষধপত্র প্রভৃতির খরচ, আমোদ-প্রমোদ, লৌকিকতা আরও কত যে বিবিধ ব্যয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বাজেট রচনায় বিভিন্ন বিষয়

কয়েকটি বাজেটের নমুনা দেওয়া হইল। আয় অনুযায়ী পারিবারিক বাজেট রচনা করিতে হয় বলিয়া **নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত** ও **উচ্চ মধ্যবিত্ত** পরিবারের বাজেট একরূপ হয় না। ক্রয়ক্ষমতা কম থাকিলে প্রথমে **জীবনের একান্ত অপরিহার্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরে আর্থিক সঙ্কুলান অনুযায়ী ব্যয় করিতে হয়।**

আয়কে ছাড়াইয়া কখনই ব্যয় করা উচিত নয়। মানুষের প্রয়োজনের সীমা নাই; অতএব চতুর সুগৃহিণী কখনই বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রতি প্রলুব্ধ হইয়া ক্ষমতার বাইরে কোনও জিনিস ক্রয় করিবার জন্য অগ্রসর হইবে না।

গ্রাম অঞ্চলের একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের বাজেটের নমুনা ঃ

[পরিবারের লোক-সংখ্যা—গৃহকর্তা, উহার দুইটি শিশুসন্তান, স্ত্রী, বিধবা মাতা ও কলেজে পড়া একটি ভাই—মোট ৬ জন। গৃহকর্তা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ১২ কাঠা জমির উপর কাঁচা বাড়ী। কয়েকটা নারিকেল গাছ আছে। বাড়ীর কিছু জমিতে কৃষির ব্যবস্থা আছে, সারা বৎসরেই কিছু কিছু তরিতরকারী ফলানো হয়। ইহাতে বাজার খরচ কিছু বাঁচে।]

আয়		ব্যয়	
(ক) গৃহকর্তার মাসিক বেতন বাবদ আয়	= ৩০০·০০	(ক) **বাসস্থান**	
		বাড়ী-সম্পর্কিত ব্যয়	= ১০·০০
		জমির সার, ঔষধ ইত্যাদি বাবদ	= ২০·০০
		আলোর জন্য কেরোসিন	= ১৫·০০
(খ) টিউসনী বাবদ =	৫০·০০	(খ) **খাদ্য**	
		চাল	= ৭৫·০০
		গম	= ৪৫·০০
		তেল, মসলা, ডাল ইত্যাদি বাবদ মুদি খরচ	= ৪০·০০
		বাজার	= ৬০·০০
		জ্বালানী কাঠ, কয়লা ইত্যাদি	= ১০·০০
		দুধ	= ৩০·০০
(গ) (নারিকেল বিক্রয় করিয়া বৎসরে ২৪০ টাকা) মাসে=২০ টাকা	২০·০০	(গ) **পোশাক-পরিচ্ছদ**	
		কাপড়, জামা ইত্যাদি বাবদ	= ২০·০০
(ঘ) ভাইয়ের টিউসনি বাবদ	৫০·০০	সাবান, সোডা	= ১০·০০
		(ঘ) **শিক্ষা**	
মোট আয় =	৪২০·০০	কলেজের মাহিনা, বই ও খাতা-পত্র	= ২০·০০
			৩৫৫·০০

আয়	ব্যয়		
	জের	=	৩৫৫·০০
	(ঙ) চিকিৎসা	=	৫·০০
	(চ) টয়লেট	=	৫·০০
	(ছ) ভাই-এর হাতখরচ বাবদ	=	১০·০০
	(জ) বিবিধ	=	১০·০০
	মোট ব্যয়—		৩৮৫·০০
	সঞ্চয়	=	৩৫ টাকা।

মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটের একটি নমুনা

[পরিবারে মোট লোক-সংখ্যা ৫ জন। স্বামী, স্ত্রী, বৃদ্ধা মাতা, দুইটি সন্তান; একটি ১২ বৎসর বয়স্ক ছেলে এবং অপরটি ৯ বৎসর বয়স্কা মেয়ে। স্বামী, স্ত্রী দু'জনেই চাকরী করেন। দু'জনের যৌথ আয়—১০০০·০০]

আয়		ব্যয়		
		(ক) বাসস্থান		
স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ আয় =	১০০০·০০	বাড়ী-ভাড়া	=	১৫০·০০
		বিদ্যুৎ বিল	=	১৫·০০
সঞ্চয়ঃ		মেরামতী খরচ	=	১০·০০
(১) জীবন বীমার প্রিমিয়াম =	টাকা ৩৪·০০	ঠিকা ঝি-এর মাহিনা	=	২৫·০০
(১) ব্যাঙ্কে টাকা	৮০·০০	বাসস্থান হইতে কর্মস্থলে যাতায়াত	=	২৮·০০
	১১৪·০০	(খ) খাদ্য		
		রেশন	=	৭০·০০
		চাল		৫০·০০
		ডাল, তেল, মসলা ইত্যাদি মুদী খরচ	=	৮০·০০
		গয়লার দুধ	=	৮০·০০
		বাজার খরচ	=	১৫০·০০
		ফল মিষ্টি ইত্যাদি বাবদ	=	২০·০০
		ঘুটে, কয়লা, কেরোসিন	=	২০·০০
				৬৯৮·০০

আয়	ব্যয়		
	জের		৬৭৮·০০
	(গ) পোশাক-পরিচ্ছদ		
	জামা-কাপড়	=	৪০·০০
	ধোপা ও সাবান খরচ	=	১৮·০০
	(ঘ) শিক্ষা		
	স্কুলের মাহিনা, বই-খাতা ইত্যাদি	=	৭০·০০
	খবরের কাগজ	=	১০·০০
	(ঙ) চিকিৎসা	=	১৫·০০
	(চ) প্রসাধন দ্রব্য	=	১০·০০
	(ছ) আমোদ-প্রমোদ	=	১০·০০
	(জ) লৌকিকতা	=	১০·০০
	(ঝ) পূজা-পার্বণ	=	৫·০০
	মোট ব্যয় :—		৮৮৬·০০

শহরে একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেট

[পরিবারের লোক-সংখ্যা ৬। স্বামী, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, একটি পুত্র এবং বাড়ীর ঝি।

নিজস্ব দোতলা বাড়ী ; একতলা ভাড়া মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে]

আয়			ব্যয়		
			বাসস্থান		
মাসিক আয় সর্বসমেত	=	৩০০০·০০	বাড়ীর ট্যাক্স, বাড়ী রং করা ও মেরামতী খরচ	=	১০০·০০
বাড়ীভাড়া বাবদ	=	২০০·০০	গ্যাস ও বৈদ্যুতিক খরচ	=	১০০·০০
	টাকা	৩২০০·০০	মোটর গাড়ী বাবদ „ (গৃহকর্তা নিজে গাড়ী চালান)	=	২০০·০০
			টেলিফোন, টেলিভিসন (গড়ে মাসিক)	=	৮০·০০
			ঝি-এর মাহিনা	=	৭০·০০
			খাদ্য		
			চাল ও রেশন বাবদ	=	২০০·০০
					৭৫০·০০

আয়		ব্যয়	
জের আয় =	৩২০০.০০	জের	৭৫০.০০
মোট ব্যয় =	২৩৭০.০০	তেল, ডাল, ডালডা, ঘি, মসলাপাতি ইত্যাদি বাবদ =	২০০.০০
মোট সঞ্চয় মাসে	৮৩০.০০	কাঁচা বাজার =	৩০০.০০
(ক) ১০০ টাকা জীবন বীমার প্রিমিয়াম।		দুধ =	১৫০.০০
(খ) ব্যাঙ্ক ও ন্যাশানাল সার্টিফিকেট বাবদ ১৩০ টাকা জমা।		**পোশাক-পরিচ্ছদ**	
		জামা-কাপড় ও বিছানা-পত্র =	১০০.০০
		ধোপা ও সাবান খরচ =	৪০.০০
		শিক্ষা	
		স্কুলের মাহিনা, স্কুলের গাড়ী, বই খাতাপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা-সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি (গৃহশিক্ষক সহ) =	৪০০.০০
		গানের শিক্ষক =	৮০.০০
		সংবাদ-পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বাবদ =	৪০.০০
		টয়লেটের জন্য ব্যয় (মাথার তেল সহ) =	৩০.০০
		আমোদ প্রমোদ	
		(ক) সিনেমা, থিয়েটার, পিকনিক ইত্যাদি বাবদ =	৫০.০০
		(খ) বৎসরে একবার বাইরে ভ্রমণ বাবদ মাসিক জমা =	১০০.০০
		পূজা পার্বণ =	২০.০০
		লৌকিকতা ও আতিথেয়তা =	৮০.০০
		বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হিসাবে মাসিক চাঁদা =	৩০.০০
		মোট ব্যয় :—	২৩৭০.০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহস্থালীর হিসাব পরিচালনা

হিসাব রাখার জন্য **পৃথক পৃথক** খাতা ব্যবহার করিতে হয়। দৈনন্দিন বাজারের জন্য কোন্ কোন্ জিনিস কি পরিমাণে ক্রয় করা হইল তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়। বাজার খরচ নির্দিষ্ট টাকার ভিতর যতদূর সম্ভব বিভিন্ন প্রকারের তরিতরকারী, মাছ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে হয়। কোনও কারণে মাঝে মাঝে ব্যয় বেশী হইলে অন্য দিন কম ব্যয় করিয়া ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। এই ভাবে ঘাটতি পূরণ না করিলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকিবে না। হিসাবের খাতায় **তারিখ, জিনিসের নাম, পরিমাণ, মূল্য** সমস্ত বিবরণই লিখিতে হয়; তাহা না হইলে হিসাব লেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যর্থ হইয়া যায়।

হিসাব লিখিবার নিয়ম

মুদী দোকানের হিসাবের জন্য একটি স্বতন্ত্র খাতা করিতে হয়। প্রতি মাসের প্রথমে সমস্ত জিনিসের ফর্দ লিখিয়া দোকানে পাঠাইতে হয়। দোকানদার ফর্দ অনুযায়ী মালের মূল্য লিখিয়া গৃহকর্তা বা তাহার প্রেরিত লোককে জিনিসপত্র দিয়া দিবে। টাকা দিবার পূর্বে গৃহকর্তা অথবা গৃহিণীর **ফর্দ অনুযায়ী মাল দিল কিনা এবং টাকার হিসাব ঠিক আছে কিনা উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।**

পরের মাসে আবার মাসের নাম উল্লেখ করিয়া পূর্বের ফর্দের মত লিখিয়া মাল ক্রয় করিতে হয়।

ধোপার বাড়ী হইতে অনেক সময় কাপড়-চোপড় হারাইয়া যায়। সুতরাং পোশাকের মোটামুটি বর্ণনা সহ কি কি জিনিস ধোপাকে দেওয়া হইল তাহা তারিখ সহ লিখিয়া রাখিতে হয়। মাসের শেষে হিসাব করিয়া খাতায় টাকার অঙ্ক লিখিয়া ধোপাকে পাওনা মিটাইয়া দিতে হয়।

ধোপার হিসাব

গয়লার দুধের হিসাবের জন্য কোনও খাতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ গয়লার নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণের দুধ প্রতিদিন নেওয়া হয়। কোন দিন বেশী দুধ নিলে বা গয়লা কোনও দিন দুধ না দিলে ক্যালেণ্ডারের তারিখে দাগ দিয়া রাখিতে হয়। সরকারী বোতলের দুধ ক্রয় করিলে হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কোনও দিন দুধ সরবরাহ বন্ধ থাকিলে উহা কার্ডেই লেখা থাকে।

গয়লার দুধের হিসাব রাখার সহজ উপায়

মাসের প্রথমে যে খরচটা হয় উহা পাওনাদারকে মিটাইয়া দেওয়ার পরেই খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া যাবতীয় রসিদ-পত্রাদি তারের ফাইলে ঢুকাইয়া কোথায়ও টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। লাইফ ইন্সিওরেন্সের রসিদ, ইলেকট্রিকের বিল, পোশাক-পরিচ্ছদ ধোপাকে কাচিতে দেওয়ার বিল, বাড়ীভাড়ার রসিদ প্রভৃতি সমস্তই যত্নপূর্বক রাখিয়া দিতে হয় যাহাতে প্রয়োজনের সময় সহজেই বাহির করা যায়।

(১) মুদীর দোকানের হিসাব ঃ

যে সকল পরিবারে মাসের মাল-মশলা একসঙ্গে আনা হয় না, তাহাদের মুদীর দোকানের দ্রব্যাদির জন্য একটি স্বতন্ত্র হিসাবের খাতা করিতে হয়।

তারিখ	জিনিসের নাম	মূল্য	পরিমাণ	খরচ
২/৫/৭৬	মুসুরীর ডাল	টাঃ ২·৪০ কিলো	১ কিলো	টাঃ ২·৪০
	জিরা	টাঃ ১৮·০০ ,,	১০০ গ্রাম	টাঃ ১·৮০
	হলুদ	টাঃ ৭·০০ ,,	২০০ ,,	টাঃ ১·৪০
	সরিষার তৈল	টাঃ ৭·০০ ,,	১ কিলো	টাঃ ৭·০০
	লবণ	·৩০ পয়সা ,,	১½ ,,	·৪৫ পঃ
				১৩·০৫
১৫/৫/৭৬	মুগের ডাল	টাঃ ২·৬০ কিলো	১ কিলো	টাঃ ২·৬০
	সরিষার তৈল	টাঃ ৭·০০ ,,	১ ,,	টাঃ ৭·০০
	সরিষা	টাঃ ৪·০০ ,,	১০০ গ্রাম	·৪০পঃ
	গুড়	টাঃ ২·৫০ ,,	৫০০ ,,	টাঃ ১·২৫
	সোডা	টাঃ ২·০০ ,,	২৫০ ,,	·৫০পঃ
				১১·৭৫
২৮/৫/৭৬	মটর ডাল	টাকা ২·২৫	৫০০ গ্রাম	টাঃ ১·১২
	সরিষার তৈল	টাকা ৬·৮০	২৫০ ,,	টাঃ ১·৭০
	চিড়া	টাকা ৪·৫০	৫০০ ,,	টাঃ ২·২৫
				৫·০৭

(২) দৈনিক বাজার-খরচের হিসাব

তারিখ	দ্রব্যের নাম	মূল্য	দ্রব্যের পরিমাণ	খরচ
১০/৭/৭৬	মাছ	১২ টাঃ কিলো	২৫০ গ্রাম	৩'০০
	আলু	১'২০ ,,	২৫০ ,,	'৩০ পয়সা
	অন্যান্য শাকসব্জী বেগুন ঢেড়স			'৭৫ পয়সা
	কলা	৪০ পয়সা জোড়া	৪ টা	'৮০ পয়সা
	পেয়ারা	৩০ পয়সা জোড়া	৪ টা	'৬০ পয়সা
				৫'৪৫

(৩) ধোপার হিসাব

তারিখ	পোশাকের বিবরণ	সংখ্যা	দর	খরচ
২/৭/৭৬	ধুতি	২	প্রতিটি	৩'০০
	রঙীন শাড়ী } সাদা ,, }	২	২৫ পয়সা হিসাবে	
	ব্লাউজ	৩		
	পাঞ্জাবী	২		
	ফুল প্যান্ট	১		
	বুশ সার্ট	২		
১৬/৭/৭৬	মশারী	১	মশারী ১'৫০	১'৫০
	বেড কভার	১	'৫ পয়সা হিসাবে	'৭৫
	সাদা বিছানার চাদর	২	৫০ পয়সা হিসাবে।	১'০০
	শাড়ী	৩	০'৫০	১'৫০
	ধুতি	২	০'৩০	০'৬০
	সায়া	২	০'৩০	০'৬০

তারিখ	পোশাকের বিবরণ	সংখ্যা	দর	খরচ
৩০/৭/৭৬	ধুতি	২	২৫ পয়সা হিসাবে	২·৭৫
	শাড়ী	৩		
	ব্লাউজ	২		
	পাঞ্জাবী	২		
	সার্ট	১		
	প্যাণ্ট	১		

জুলাই মাসে ধোপার মোট প্রাপ্য — ১১·৭০

হিসাব রাখার সুবিধা ঃ হিসাব লিখিবার ফলে পাওনাদারদের প্রাপ্য টাকা মিটাইতে অনেক সুবিধা হয়। সমস্ত হিসাব-নিকাশ মনে রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হিসাব লিখিবার ফলে পাওনাদারদের সহিত অযথা কথা ব্যয় করিতে হয় না। হিসাব লিখিবার ফলে বাজার-দর কতটা উঠিতেছে বা নামিতেছে সেটা সহজেই বোধগম্য হয়। কোন্ জিনিস কি পরিমাণে লাগে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়। কোনও জিনিস চুরি হইলে সহজেই উহা বোধগম্য হয়। আদর্শ গৃহিণী গৃহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ভাবে চালাইবার জন্য অবশ্যই হিসাব লেখার অভ্যাস করিবে। ইহাতে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়, সেইরূপ আবার সঞ্চয়ের পক্ষেও সুবিধা হয়।

হিসাব লেখার প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবনের মান অনুযায়ী পারিবারিক সঞ্চয়

আর্থিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করিয়া মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা অনুযায়ী জীবন-যাত্রার ধারাকে জীবনের মান বলা হয়। মূলতঃ **অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর জীবনের মান নির্ভর করে।** আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের জীবনের মান অনেক উন্নত।

জীবনের মান

আবার আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের এই দুই-এর জীবনের মান সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধনী পরিবারের সহিত পাল্লা দিয়া কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা চলিতে পারে না।

আয় অনুযায়ী ব্যয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছু গচ্ছিত রাখার নামই সঞ্চয়। প্রত্যেক সভ্য জাতিরই সঞ্চয়শীল মনোবৃত্তি থাকা উচিত। সঞ্চয় মানুষকে এবং জাতিকে উন্নত করিয়া তোলে। বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া যখন মানুষ ভবিষ্যতে গিয়া পৌছায় তখন নানাবিধ **বাড়তি খরচের জন্য** সঞ্চয়ের টাকার প্রয়োজন হয়। বৃদ্ধ বয়সে আয় করার

সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

ক্ষমতা বন্ধ হইলে মানুষ তখন অসহায় হইয়া পড়ে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে সম্পত্তি বলিতে কিছুই থাকে না, তাই **বার্ধক্যের সময় উহাদের সামান্য সঞ্চিত অর্থের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়।** সুতরাং যে সমস্ত পরিবারে অর্থ-নৈতিক অবস্থা, সাধারণ উহাদের সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

পারিবারিক সঞ্চয়-ব্যবস্থা জীবনের মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। একটি সাধারণ পরিবারে সাংসারিক সমস্ত ব্যয় সংকুলান করিয়া সঞ্চয়ের জন্য মাসে খুব কম টাকা রাখিতে পারা যায়। মাসে মাসে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার মত আর্থিক ক্ষমতা উহাদের থাকে না; কোনও প্রকারে জীবন বীমার প্রিমিয়ামের টাকাটা চালাইয়া যায়। কিন্তু সেই তুলনায় একটি সচ্ছল পরিবার **বীমা, সেভিংস হিসাব, মেয়াদী হিসাব**—সঞ্চয়ের এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারে। ইহাতে সুদের মাত্রাও বেশী হয়। আবার ধনী পরিবারের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহাদের ব্যয়ও যেমন অধিক সঞ্চয়ও ততোধিক। এই সব পরিবারের **গাড়ি, বাড়ী, সোনা, জমি** প্রভৃতি সম্পত্তির শেষ নাই। তাহাছাড়া বিভিন্ন প্রকার **বীমা, ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেট** প্রভৃতির মাধ্যমে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ সকল সঞ্চয় দ্বারা অনেক সুদের টাকাও আসে।

পূর্বে সঞ্চয় কথাটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে একেবারেই অবাস্তব ছিল। জীবনের মান বজায় রাখিয়া সংসারের সমস্ত রকম ব্যয় মিটাইয়া ব্যাঙ্ক বা পোস্টঅফিসের মাধ্যমে সঞ্চয় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। সমস্ত জীবনে জীবনবীমার মাধ্যমে পাঁচ ছয় হাজার টাকা জমা করার ভিতরই তাহাদের সঞ্চয় পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে সরকার সঞ্চয়ের নানারকম সুবিধা করিয়া নূতন নূতন পরিকল্পনা প্রচলন করিয়াছে। ইহার ভিতর স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। এই স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা দ্বারা সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সম্বন্ধে একটি চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পারিবারিক ও সমাজ জীবনে সঞ্চয় অপরিহার্য। সঞ্চয় মানুষকে ভবিষ্যৎ জীবনে নিরাপত্তা আনিয়া দেয়। স্বল্প সঞ্চয়ের অর্থ ভবিষ্যতে একদিন মোটা সংখ্যক টাকায় পরিণত হয়। যে কোনও পরিবারই হউক সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয় করা প্রত্যেক গৃহকর্তার মানবিক কর্তব্য। **সময় থাকিতে সঞ্চয় না করিলে পরবর্তী জীবনে আর্থিক বিপর্যয়ে দিন কাটাইতে হয়।** অনেক পরিবার গৃহকর্তার অকাল মৃত্যুতে অসহায় হইয়া পড়ে। গৃহকর্তা সঞ্চয়শীল হইলে তাহার অবর্তমানে সংসার অচল হইয়া পড়ে না। ভবিষ্যতের এই দূরদর্শিতার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া প্রত্যেক গৃহস্বামীর অবস্থা অনুযায়ী সঞ্চয় করা উচিত। পরিবারের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েদের মনের ভিতর সঞ্চয় সম্বন্ধে সচেতনতা উদ্বুদ্ধ করাইতে হয়। ইহাতে সংসারের অপচয় বন্ধ হয়। ছেলেমেয়েরা অনাবশ্যক ব্যয় হইতে বিরত হয়। উহারাও সামান্য পয়সা জমাইয়া একটি টাকায় রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারে। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার ব্যয় হ্রাস করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। এ দায়িত্ব কেবল মাত্র গৃহস্বামীর একার নয়। **গৃহকর্ত্রী এবং পরিবারের ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য পরিজন সতর্ক থাকিলে সাংসারিক অপচয় বন্ধ করিয়া সঞ্চয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি করা যায়।** মানুষের প্রয়োজনীয়তার কোনও সীমা নাই। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিলে উহা আর কখনও কমানো যায় না। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারে অবিবেচকের মত ব্যয় করিলে ভবিষ্যতে উহাদের অশেষ আর্থিক বিপর্যয়ে পড়িতে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী! প্রাচীন মুনি ঋষিগণও সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সতর্কতামূলক বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে আমাদের সরকারের স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনার তাৎপর্য 'মনুসংহিতায়' লক্ষ্য করা যায়। প্রতিদিন একমুষ্টি তণ্ডুল সঞ্চয় করিলে ভবিষ্যতে একদিন বেশী ওজনের তণ্ডুল লাভ করা যায়। এই সাধারণ কথাটি নীতিমূলক ও তাৎপর্যপূর্ণ। 'মনুসংহিতার' মূল সুরটি অবলম্বন করিয়া আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু

গৃহস্থ পরিবারের লক্ষীর পাঁচালীতে গৃহস্থ বধূদের জন্য রচিত হইয়াছে। "লক্ষীর ভাণ্ডার স্থাপিত রাখ নিজ ঘরে, রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে।" গৃহকর্ত্রী এ বিষয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে সচেতন হইলে সাংসারিক সঞ্চয় অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা যায়। **কার্পণ্য নিন্দনীয়, উহা অপেক্ষাও অপব্যয় আরও নিন্দনীয়, কিন্তু পরিবারের যথাযথ ব্যয় মিটাইয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী উভয়ের পক্ষেই কৃতিত্বের বিষয়।**

গৃহিণীদের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে একটি তালা মারা বাক্স দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গৃহিণীরা ইচ্ছা করিলে ঐ বাক্স লইয়া সাংসারিক অর্থের ব্যয় হ্রাস করিয়া প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু অর্থ উহার ভিতর রাখিলে কয়েক মাস পর উহা ভর্তি হইয়া যায়। ঐ বাক্সটি ব্যাঙ্কে লইয়া গেলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঐ টাকা একত্রিত করিয়া আমানতকারীর নামে জমা করিয়া লয়। স্বল্প সঞ্চয়ের ইহা একটি সহজ উপায়। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এইরূপ স্বল্প সঞ্চয়ের পদ্ধতি পূর্বেও ছিল। এখনও আছে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের ভিতর ব্যয় প্রবণতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তাহারা এখন আর এইভাবে সঞ্চয় করার ব্যাপারে আগ্রহশীল নয়।

তবে একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে সরকারী প্রচেষ্টায় যে বিভিন্ন স্বল্প-সঞ্চয় প্রকল্পের প্রচলন হইয়াছে তাহাতে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁক স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী প্রচারে জনসাধারণের মনে সঞ্চয়শীলতা সম্বন্ধে চেতনা প্রকাশ পাইতেছে। এই সব নানা প্রকারের প্রকল্প রহিয়াছে। ইহার মস্ত বড় সুবিধা এই যে প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়াদে টাকা সঞ্চিত করিয়া সাধারণ সঞ্চয় অপেক্ষা সুদের হার অনেক বেশি লাভ করা যায়।

বিদ্যালয়ের এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীর জন্য স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে একটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় মাসের প্রথমে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া নির্দিষ্ট বৎসরে সুদ সমেত একটি মোটা টাকা লাভ করিতে পারিবে। দৈনিক টিফিন খরচের কিছু পয়সা বাঁচাইয়া মাসে দুই টাকার মত সঞ্চয়ের জন্য রাখিয়া দিতে পারে। এই প্রকল্প অনুযায়ী জমাকারীকে একটি পাশবই দেওয়া হয় এবং প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আসিয়া ছাত্রছাত্রীর ঐ ক্ষুদ্র সংখ্যক অর্থ জমা করিয়া লয়।

বাস্তবিকই ইহা খুবই আনন্দের বিষয় এই যে ভবিষ্যৎ গৃহস্বামী ও গৃহিণীদের সঞ্চয়শীলতার দিকে আগ্রহশীল হওয়ার ইহা একটি কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা। পরিবার ও সমাজের পক্ষে ইহা একটি মঙ্গলময় ব্যবস্থা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পারিবারিক অর্থ-বিনিয়োগ ব্যবস্থা

সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে না পারিলে উহা হইতে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। প্রাচীনকালে রাজা জমিদারদের অর্থ ঘড়ায় ঘড়ায় মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখিত। এই সঞ্চিত অর্থের সন্ধান অজ্ঞাত থাকিলে গৃহস্বামীর উত্তরাধিকারী সূত্রে তাহার বংশধরগণও ভোগ করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া জাতীয় সম্পত্তি হিসাবেও কোনও কাজে লাগিত না। বর্তমান যুগে সঞ্চিত কোন টাকাই ফেলিয়া রাখা হয় না। মোটা টাকার মালিক টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটাইয়া টাকাকে আরও বাড়াইয়া তোলে ; ইহা দেশের পক্ষেও মঙ্গলজনক। সাধারণ পরিবারের সামান্য সঞ্চয়ও এখন আর কেহ বাড়ীতে ফেলিয়া রাখে না। আমাদের দেশে সঞ্চয়ের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা হওয়াতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও উহাদের স্বল্প বরাদ্দ টিফিনের পয়সা হইতে বাঁচাইয়া মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় করিতেছে। এইরূপ স্বল্প সঞ্চয়ও সুদে বাড়িতে থাকে।

সঞ্চয় অর্থ বৃদ্ধি করে

ব্যাঙ্ক, পোস্টাফিস, জীবন বীমা, সেভিংস সার্টিফিকেট, শেয়ার ক্রয় প্রভৃতির মাধ্যমে পারিবারিক অর্থ খাটাইয়া সুদের হার বাড়ানো হয়।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলী : জনসাধারণ যে টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে, উহা খাটাইয়া ব্যাঙ্ক মোটা টাকায় পরিণত করিয়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে। জমাকারী বা আমানতকারীকে ব্যাঙ্ক টাকার অঙ্ক হিসাবে জমাকারীকে কিছু সুদ দেয়। এইরূপে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। নিরাপত্তার জন্য জনসাধারণ মূল্যবান কাগজপত্র, সোনার গহনা প্রভৃতি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। এই ভাবে ব্যাঙ্ক কিছু সুদের টাকাও পায়।

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার জন্য আবেদন করিতে হয়। এই আবেদন-পত্রে জমাকারীর সহি থাকে। ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেনের ব্যাপারে এই সহিই কার্যকরী হইয়া থাকে। সহি না মিলিলে ব্যাঙ্ক জমাকারী হিসাবে সেই ব্যক্তিকে গণ্য করিবে না।

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার নিয়ম

আবেদন-পত্র গ্রহণ করিবার পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জমাকারীকে **একটি খাতা দেয়।** ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী জমাকারী ন্যূনতম অর্থ অথবা তাহার বেশী টাকা

জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেনের ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। টাকা জমা দিবার এই খাতায় দুইটি অংশ থাকে। টাকা জমা দিবার সময় **জমাকারীর নাম, ব্যাঙ্কের ,অ্যাকাউন্টস নম্বর, যত টাকা জমা পড়িবে উহার সংখ্যা, তারিখ, জমাকারীর সহি** প্রভৃতি দুইটি অংশেই লিখিতে হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট টাকা জমা রাখিয়া খাতার ডানদিকের অংশের পাতা ছিড়িয়া রাখিয়া রসিদ স্বরূপ ব্যাঙ্কে জমা রাখে, অপর অংশ সহ খাতাটি জমাকারীকে ফেরত দেয়। টাকা জমা দেওয়ার অনেক রকম উপায় আছে। ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন হিসাবে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে পারে।

কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা চলতি হিসাব : চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখিলে যে-কোনও দিনই টাকা জমা রাখিতে পারে বা তুলিতে পারে। **ন্যুনতম টাকার অঙ্ক অন্যান্য হিসাবে জমা অপেক্ষা চলতি হিসাবে অনেক বেশী।** অতএব সাধারণের পক্ষে এই হিসাবে টাকা জমা রাখার কোনও সুবিধা নাই। সাধারণতঃ যখন তখন মোটা টাকার লেন-দেনের ব্যাপার হয় বলিয়া বড় বড় ব্যবসায়ী চলতি হিসাবে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। ব্যাঙ্ক এই টাকা বেশী খাটাইতে পারে না বলিয়া **এই হিসাব হইতে সুদ খুব কম পাওয়া যায়।**

সেভিংস হিসাব : নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সেভিংস হিসাবে টাকা জমা রাখা খুবই সুবিধাজনক। **চলতি হিসাবের তুলনায় ইহার সুদ বেশি।** ন্যূনতম জমা রাখার টাকার অঙ্কও অন্যান্য হিসাব অপেক্ষা অনেক কম।

মেয়াদী জমা বা ফিক্সড্ ডিপোজিট : এই হিসাবে টাকা জমা দিতে হইলে **একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা নির্দিষ্ট বৎসরে মোটা সুদ সহ পাওয়া যায়।** টাকার অঙ্ক ও মেয়াদ যত বেশি হইবে সুদের হারও তত বৃদ্ধি পাইবে। **মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে টাকা তোলা যায় না।** ইচ্ছামত টাকা তোলা যায় না বলিয়া একটি বড় খরচের ব্যাপারে এই টাকাটা প্রয়োজনে লাগে। **ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের বিবাহ, বাড়ী করা** প্রভৃতি কাজে এই টাকা অনেক সাহায্য করে।

পাশ বই : ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলা এই দুইয়ের হিসাব রাখিবার জন্য জমাকারীকে একটি পাশ বই দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া টাকা তুলিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে একখানি **'চেক' বই**ও পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট জমাকারী বা জমাকারীর মনোনীত ব্যক্তির টাকা তুলিবার জন্য যে হুকুমনামা তাহাই চেক। এই চেকের উপর **গ্রহীতার নাম, তারিখ, টাকার অঙ্ক,**

অ্যাকাউন্ট নম্বর, জমাকারীর সহি প্রভৃতি লেখা থাকে। সহি না মিলিলে সেই চেকে ব্যাঙ্ক টাকা দেয় না। এই সহির ব্যাপারটি কড়াকড়ি না থাকিলে জমাকারী বা জমাকারীর মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহ সহি জাল করিয়া অনায়াসেই টাকা তুলিয়া লইতে পারে।

চেক তিন প্রকারের হয় :—(১) বাহক বা **বেয়ারার চেক**, (২) **অর্ডার চেক**, (৩) **ক্রশড্ চেক** বা রেখাঙ্কিত চেক।

(১) **বেয়ারার চেক :** যে চেকে জমাকারী কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে বা চেক বাহককে টাকা তুলিবার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন, উহাই **বাহক বা বেয়ারার চেক**।

(২) **অর্ডার চেক :** আবার বেয়ারার চেকটির লেখা **বেয়ারার** কথাটি কাটিয়া দিলে অর্ডার চেক হইয়া যায়। তখন আর জমাকারী ছাড়া আর কেহ এই টাকা তুলিতে পারিবে না। বেয়ারার চেকের পিছনে জমাকারী উহার মনোনীত ব্যক্তির বা নিজের নাম লিখিয়া দিলে উহা বেয়ারার চেক হইয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক মনোনীত ব্যক্তিকে টাকা দেয়।

(৩) **ক্রশড্ চেক :** সাধারণ চেকের কোণে কোণাকুণিভাবে দুইটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া উহাতে (A/C Payee) লিখিয়া দিলেই চেকটি ক্রশড্ চেকে পরিণত হয়।

ক্রশড্ চেক ভাঙ্গাইবার নিয়ম : প্রদর্শিত নমুনা চেকে নাম অনুযায়ী দেবাশিস দাশগুপ্ত ব্যাঙ্কে গিয়া সরাসরি টাকা পাইবেন না। যে ব্যাঙ্কে তাহার নিজের নামে অ্যাকাউন্ট আছে, সেই ব্যাঙ্কে উহা জমা দিতে হইবে। তখন সেই ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া হইতে ঐ চেক ভাঙ্গাইয়া সেই টাকা দেবাশিস দাশগুপ্তের হিসাবে জমা করিয়া লইবে। দেবাশিস দাশগুপ্ত ইচ্ছা করিলে, কোনও বেয়ারার চেক দ্বারা তাহার নিজের অ্যাকাউন্ট হইতে প্রয়োজনে তখনই তুলিয়া লইতে পারেন।

যদি দেবাশিস দাশগুপ্তের কোনও ব্যাঙ্কেই অ্যাকাউন্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে তাহার কোনও আত্মীয় বা বন্ধু যাহার কোনও ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব আছে উহার নিকট চেকখানি স্বত্ব হস্তান্তরিত (এণ্ডোর্স) করিয়া দিবে। সেই লোক চেকখানি নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিবার পর ঐ পরিমাণের টাকা একটি বেয়ারার চেকের সাহায্যে তুলিয়া দেবাশিস দাশগুপ্তকে দিবে। **দুইটি ব্যাঙ্কের ভিতর লেন-দেন থাকে বলিয়া ইহাতে জাল-জুয়াচুরীর ভয় থাকে না ; তাই অন্যান্য চেক অপেক্ষা ক্রশড্ চেক অধিকতর নিরাপদ।**

নিম্নলিখিত কারণে চেক বাতিল হইয়া যায় ঃ

(ক) যত টাকার জন্য চেক লিখিত, ব্যাঙ্কে জমাকারীর তত টাকা না থাকিলে।

(খ) ব্যাঙ্কের নিকট যে স্বাক্ষর নমুনা হিসাবে থাকে চেকের সহির সহিত উহার মিল না হইলে।

(গ) চেকে লেখার কোনও ভুল থাকিলে।

(ঘ) চেক ভাঙ্গানোর পূর্বেই যদি চেক-লেখকের মৃত্যু হয়।

পোস্ট অফিস

ব্যাঙ্ক ছাড়া পোস্ট অফিসেও টাকা জমা রাখা যায়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হইবার পর উহার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার খুব ভয় ছিল। বহু জমাকারীর মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কের দোষে নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পোস্ট অফিসেই রাখিয়া দিত। সরকারের উপর এই টাকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বলিয়া ইহা সব সময়ই নিরাপদ। ব্যাঙ্কের মত পোস্ট অফিসেও প্রথম টাকা জমা রাখার সময় অর্থাৎ হিসাব খুলিবার সময় **জমাকারীর সহির একটি নমুনা পোস্ট অফিস রাখিয়া দেয়।** প্রতিবার টাকা তুলিবার সময় এই সহি মিলানো হয়। **টাকা** জমা ও তোলার হিসাব রাখিবার জন্য পোস্ট অফিস গচ্ছিত-কারীকে একটি পাশ বই দেয়। **পাশ বই-এর প্রথমেই সমস্ত নিয়মাবলী লেখা থাকে।** এই পাশ বই-এর দুই পৃষ্ঠা জুড়িয়া **সাতটি স্তম্ভ** থাকে। প্রথম স্তম্ভে **তারিখ,** দ্বিতীয় স্তম্ভে **পোস্ট অফিসের ছাপ,** তৃতীয় স্তম্ভে **টাকার পরিমাণ,** যে টাকা জমা পড়ে বা তোলা হয়। টাকার পরিমাণ এখানে কথায় লিখিতে হয়। চতুর্থ স্তম্ভে **জমার পরিমাণ,** পঞ্চম স্তম্ভে **যে টাকা উঠানো হয় তাহার সংখ্যা,** ষষ্ঠ স্তম্ভে **যে টাকা বাকী থাকে তাহার পরিমাণ,** সপ্তম অর্থাৎ **শেষ স্তম্ভে পোস্ট-মাস্টারের সহি** থাকে।

সরকার নিজে এই অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়া পোস্ট অফিসের গচ্ছিত অর্থ অত্যন্ত নিরাপদ। গচ্ছিতকারী আপন প্রয়োজনমত এই অর্থ তুলিয়া লইতে পারেন। Postal withdrawal form-এর নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল। টাকা তুলিবার সময় শূন্যস্থানগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়।

S. B. I.

APPLICATION FOR WITHDRAWAL

To

The Post Office Savings Bank..................................P. O.

Account No...................

Existing balance, Rupees (in words)..................................

Please pay the sum of Rupees (in words)..........................

....to me/us/messenger named below and debit the amount to my/our S. B. account mentioned above.

PARTICULARS OF MESSENGER

Name of the Messenger..

Signature of the Messenger..

....

Signature of identifier (if necessary)	*Signature/Thumb-impression of depositor (s)*
Dated.......................	*Dated*............................

N. B.—The attention of the depositor is drawn to the instructions printed on the cover of the Pass Book.

CAUTION

The receipt for payment is to be signed only at the time of actual payment. The Post Office will not accept any liability for any loss sustained by the depositor as a result of disregard of this direction.

Date of withdrawal..................

WARRANT OF PAYMENT

Account No....................Ledger folio..............................
passed for payment of Rupees (in words)...........................
..............................Rupees in figures..............................

Post Office Date-Stamp. *Signature of Postmaster*

Closed Account Calculations
Balance...
Interest from 1st April.............. ......
to.........
Total

Receipt for Payment

1. Received payment of Rupees (in words)......................
..............................only Rupees (in figures)

2. The up-to-date interest on the account has been received more and the account is finally closed.

....

Signature of identifier (if necessary)

....

Signature/Thumb-impression of the depositor (s) or messenger

Dated...........

Dated...............

***IMPORTANT.—To be scored through when the account is not finally closed.**

AUDITED

Initials / Signature of the Auditor

পোস্ট অফিসের সুদের হার ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অনেক কম। টাকা গচ্ছিতকারী বা তাহার মনোনীত যে-কোনও ব্যক্তি টাকা তুলিতে পারে, কিন্তু সেই ব্যক্তিরও ফর্মে সহি থাকিবে। আমানতকারী বা জমাকারীর সহি মিলাইবার পর পোস্ট অফিস পুনরায় বাহকের সহি ফর্মে করাইয়া যাচাই করিয়া লয়। সমস্ত সই মিলিয়া গেলে টাকা দেওয়া হয়।

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট

জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পে সরকার সঞ্চয়মূলক এক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে বিভিন্ন মেয়াদে এককালীন কিছু টাকা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট বৎসরে উহা সুদ সহ ফিরাইয়া- দেয়। ইহাতে জনসাধারণের সুবিধা এই যে, সুদ সহ এককালীন সঞ্চয়ের মোটা টাকা পায়। সরকারের সুবিধা জাতির উন্নতিকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা লইয়া টাকা খাটাইতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় পরিকল্পনা রহিয়াছে। **এই সকল সঞ্চয়ের বড় সুবিধা এই যে ইহা আয়কর-মুক্ত।**

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ৫ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সমস্ত পোস্ট অফিসে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার মেয়াদ ১২ বৎসর। ১২ বৎসর পর চড়া সুদ সহ আসল টাকাটা পাওয়া যায়।

পোস্ট অফিস ছাড়া ট্রেজারীতেও একপ্রকার সেভিংস ডিপোজিটের ব্যবস্থা আছে। ১০ বৎসরের জন্য একটি নির্দিষ্ট টাকা ট্রেজারীতে জমা রাখিলে একখানি **"ট্রেজারী ডিপোজিট সার্টিফিকেট"** পাওয়া যায়। ১০ বৎসর পর বার্ষিক ৪% টাকা সুদ সহ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়।

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট জীবন বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার মত মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা জমা দেওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। মেয়াদ যত বেশি হইবে আসল ছাড়া সুদের টাকার পরিমাণও সেই তুলনায় বেশী হইবে।

বীমা প্রতিষ্ঠান

যে প্রতিষ্ঠান মাসিক, ত্রৈমাসিক অথবা বাৎসরিক কিছু দেয় টাকার বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী মানুষের জীবনের এবং সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসাবে এককালীন কিছু টাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করে সেই প্রতিষ্ঠানকে বীমা কোম্পানী বলে। পূর্বের ন্যায় বীমা এখন আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নাই, উহা রাষ্ট্রায়ত্তীকরণ হইয়াছে। **মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে বীমার সাহায্যে টাকা জমা রাখা সুবিধাজনক।** ব্যাঙ্কে

মাসে মাসে নিয়মমত টাকা জমা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বীমার প্রিমিয়াম বাধ্যতামূলক বলিয়া আবশ্যিক জমা হিসাবে উহার গুরুত্ব দেওয়া হয়। পূর্বাপেক্ষা বীমার মাধ্যমে সঞ্চয়ের সুদ বেশী হইলেও ব্যাঙ্কে মেয়াদী জমার তুলনায় উহার সুদ অনেক কম।

বীমা করার প্রয়োজনীয়তা

মধ্যবিত্ত পরিবারে অনেক সময় দেখা যায় গৃহকর্তার অকালমৃত্যুতে পরিবারের অবস্থা খুবই অসহায় হইয়া পড়ে; এক্ষেত্রে বীমা করা থাকিলে কিছু সম্বল হাতে আসার ফলে গৃহকর্ত্রী সংসারটিকে কোনও প্রকারে দাঁড় করাইয়া রাখিতে সক্ষম হয়।

বীমার প্রকারভেদ

বীমা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়—**জীবন বীমা ও মেয়াদী বীমা**। জীবন বীমার টাকা বীমাকারীর মৃত্যুর পর উহার মনোনীত ব্যক্তি পায়। মেয়াদী বীমার সময় নির্দিষ্ট থাকে। সময় যত বেশি প্রিমিয়াম তত কম; বৎসর কম হইলে প্রিমিয়ামও বেশি দিতে হয়। মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে বীমাকারী নিজেই টাকা পান। মেয়াদের পূর্বে যদি বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে তবে নির্দিষ্ট সময়ে উহার মনোনীত ব্যক্তি ঐ টাকা লাভ করিবে, কিন্তু মেয়াদ শেষ হইবার পুর্বে টাকা পাওয়া যায় না।

বীমা করিবার নিয়ম

বীমা করিতে হইলে প্রথমে বীমা কোম্পানীর ডাক্তারের দ্বারা বীমাকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোথায়ও কোনও ত্রুটি না থাকিলে **স্ট্যাণ্ডার্ড জীবন** বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তখন বীমাকারীর সহিত জীবন বীমা কর্পোরেশনের একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তি-পত্রে কত বৎসরের জন্য কত প্রিমিয়ামে, কত টাকার বীমা করা হইতেছে ঐ সকল বিস্তৃত ভাবে লেখা থাকে, ইহাকেই **পলিসি বলে**। এই পলিসি অত্যন্ত যত্নের সহিত বীমাকারীর নিকট গচ্ছিত থাকে। মেয়াদ ফুরাইবার পর শেষ প্রিমিয়াম দিয়া বীমাকারীর পলিসি সহ জীবন বীমা কর্পোরেশন অফিসে যোগাযোগ করিতে হয়। ইহার পরই প্রাপ্য টাকার সুদ সহ একখানি ক্রশড্ চেক পাওয়া যায়।

রুগ্ন ব্যক্তির জীবন বীমার জন্য বেশি প্রিমিয়াম দিতে হয়। বয়স বেশী হইয়া গেলে সে ক্ষেত্রেও যে-কোনও সময় মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বলিয়া প্রিমিয়াম বেশি দিতে হয়। ইহা ছাড়া কোনও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় কর্মরত থাকিলে সেই খাতে উহাদের প্রিমিয়াম বেশী দিতে হয়। এই কারণে ট্রেনের ড্রাইভার, বিমান-চালক, ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী প্রভৃতি ব্যক্তিদের বীমা করিবার জন্য প্রিমিয়াম বেশী লাগে।

সাধারণ বীমা ছাড়া গৃহকর্তা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও বিবাহ বীমাও করিতে পারেন। বিবাহ বীমার সেই কন্যার মৃত্যু ঘটিলে অপর কন্যার নামে পিতা পরিবর্তন

করাইয়া লইতে পারেন অথবা যে টাকা দেওয়া হইয়াছে ঐ পরিমাণের টাকা ফিরিয়া পায় ; তবে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে উহা ফেরৎ পাওয়া যায় না। **বিবাহ-বীমা, শিক্ষা বীমা** ছেলেমেয়েদের নামে হইলেও বীমাকারী পিতা নিজেই, কেননা প্রিমিয়ামের টাকা পিতাই দিয়া থাকেন। এই সকল বীমা ছাড়া **গাড়ী, বাড়ী** বা অন্যান্য **সম্পত্তিও** বীমা করিয়া রাখা যায়। কোনও কারণে এইগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই ধরনের বীমায় প্রিমিয়াম অনেক বেশী লাগে। সঙ্গীত যাহাদের পেশা, তাহারা অনেক সময় কণ্ঠস্বর বীমা করিয়া রাখে ; কোনও কারণে কণ্ঠস্বরের বড় রকমের ক্ষতি হইলে রোজগারের পথটি বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষেত্রে বীমা চুক্তি অনুযায়ী ঐ লোককে বীমার টাকা দেয়।

কোম্পানীর শেয়ার : ভাল কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান দেখিয়া শেয়ার ক্রয় করিলে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে না। একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থ বিনিয়োগ করিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করিয়া লয়। কোম্পানীর মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করিয়া লয়। **এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধন এক একটি শেয়ার।** শেয়ার বিক্রয় করিবার সময় দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

শেয়ার ক্রয় করিতে হইলে প্রবেশ-মূল্য সহ একটি আবেদন-পত্র জমা দিতে হয়। আবেদন মঞ্জুর হইলে ঐ ব্যক্তি শেয়ারের মূল্য বাবদ টাকা মিটাইয়া **শেয়ার-হোল্ডার** হয়। শেয়ারের টাকা খাটাইবার পর যে লভ্যাংশ তাহা শেয়ার-হোল্ডার পায়। **ভাল কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিলে ক্ষতির পরিবর্তে অনেক লাভ হয়।**

শেয়ার ইচ্ছামত **হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যায়।** যে দামে শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে সেই দামে বিক্রয় করিলে উহাকে **অ্যাট পার** (at par) বলে। শেয়ার লোকসান দিয়া বিক্রয় করার নাম **অ্যাট ডিসকাউন্ট** (at discount), আবার লাভ সমেত শেয়ার বিক্রয় করিলে উহাকে **অ্যাট প্রিমিয়াম** (at Premium) বলে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবারের তন্তু নির্বাচন

গৃহিণীর তন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে পরিবারে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদি নির্বাচনে ত্রুটি থাকিয়া যায়। নানা প্রকারের তন্তু আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সকল তন্তু সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। এক্ষণে বিভিন্ন তন্তুর আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আলোচনা করা হইবে।

বয়নতন্তুর কতকগুলি **প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য** থাকে, উহা লক্ষ্য করিয়া তন্তু নির্বাচন করিতে হয়। **স্থিতিস্থাপকতা, কুচকানো,** ও **দৃঢ়তা**—সাধারণতঃ এইগুলির উপর কাপড়ের মোটামুটি গুণাগুণ নির্ভর করে। **স্থিতিস্থাপকতা** তন্তুর একটি বিশেষ গুণ। ইহা **রেশম ও পশমে** দেখা যায়, **সূতি ও লিনেনে** এই গুণটি নাই বলিলেই চলে। রেশম অপেক্ষা পশমে স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশী। **এই তন্তু টানিলে বাড়ে এবং ছাড়িয়া দিলে কমিয়া যায়।** এইজন্য পশমের পোশাক-পরিচ্ছদ **কাটিবার পূর্বে মাপ লিখিয়া রাখিতে হয়।** আবার ধুইবার পর অস্বাভাবিক ভাবে যাহাতে বাড়িয়া না যায় সেইজন্য **ঝুলাইয়া শুকাইতে হয় না।**

চোখের সাধারণ দৃষ্টিতে সুতি, রেশম ও পশম তন্তুর পার্থক্য অনায়াসেই ধরা যায়। আমাদের দেশে সুতির কাপড়ই বেশি ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতির বস্ত্র বেশী মোটা হইলে উহা টেকসই হয় না, আবার সুতা নরম থাকিলেও বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া যায়। সেইজন্য ক্রয় করিবার সময় সুতা তুলিয়া ছিড়িয়া পরীক্ষা করিতে হয়, বস্ত্রটি টেকসই হইবে কিনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান

তন্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলে উহা নির্বাচনে অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা তন্তু সম্বন্ধে নানা প্রকার জ্ঞান লাভ করা যায়। তন্তু বিচারে বিভিন্ন পরীক্ষা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—**ভৌত পরীক্ষা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা** এবং **রাসায়নিক পরীক্ষা।**

ভৌত পরীক্ষা

ভৌত পরীক্ষা : সাধারণতঃ **ভাঁজ-করা, পোড়ানো** এবং **সিক্ত করা** এই সকল প্রক্রিয়ার সাহায্যে মোটামুটি ভাবে পার্থক্য ধরা যায়। **আঙ্গুলের সাহায্যে বস্ত্র চাপিয়া ধরিয়া ভাঁজ করিলে রেশম ও পশমে কোনও ভাঁজ পড়িবে না। লিনেনে সুস্পষ্ট**

ভাবে ভাঁজ পড়িবে কিন্তু সূতির বস্ত্রে লিনেন অপেক্ষা ভাঁজের দাগ কম পড়িবে। আবার অনেক সময় কলপ দেওয়া কাপড় হইলে সুতির বস্ত্রেও পরিষ্কার ভাঁজ পড়ে।

আগুনের প্রভাব

বস্ত্র হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিলে শিখা সহ জলিতে থাকিলে এবং কাগজ-পোড়া গন্ধ বাহির হইলে বুঝা যাইবে ইহা সুতির তন্তু। ইহা পুড়িবার পর ছাই হয়। লিনেন, পাট, র‍্যামি, রেয়ন সমস্তই পুড়িলে সুতির মতই অবস্থা হয়। অ্যাসিটেট তন্তু পোড়াইলে শক্ত গুটিতে পরিণত হয়। রেশম এবং পশম তন্তু প্রাণিজ তন্তু বলিয়া উহা পোড়াইলে কুণ্ডলী পাকাইয়া আঠালো মত হইয়া ছোট ছোট গুটির মত হইয়া যায় এবং পুড়িবার সময় চুল-পোড়া গন্ধ বাহির হয়।

তাপের প্রভাব

গরম ইস্ত্রির সাহায্যেও বিভিন্ন তন্তুর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। ইস্ত্রি খুব গরম করিয়া সুতি এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তন্তুর উপর ধরিলে লালচে পোড়া দাগ পড়িবে কিন্তু নাইলন, ডেক্রন, টেরিলিন প্রভৃতির উপর ধরিলে সেই অংশ গলিয়া যাইবে।

লিনেন ও সুতির পার্থক্য

জলে ভিজানো পরীক্ষাটির সাহায্যে কেবলমাত্র লিনেন ও সুতির পার্থক্য ধরা যায়। এক টুকরা লিনেন কাপড়ে এবং অন্য টুকরা সুতির কাপড়ে একই সময় কয়েক ফোঁটা জল ফেলিলে সুতি অপেক্ষা লিনেন তাড়াতাড়ি জল শোষণ করিয়া লইবে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন তন্তুর ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দেখা যায়। তন্তুর এই প্রকৃত রূপ খালি চোখে ধরা পড়ে না। তন্তুর আকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই উপায়টি সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহা অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা না হইলে যথাযথ রূপটি ধরা পড়ে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুতির তন্তু চ্যাপ্টা ফিতার মত দেখা যায়। লিনেন তন্তুর আকৃতি অনেকটা বাঁশের মত মাঝে মাঝে গাঁট বা বন্ধনী, আবার কোনও কোনও লিনেন তন্তু সরু নালীর মত আকৃতিও দেখা যায়। রেশম তন্তুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় একটি কাচের দণ্ডের মত। উপর দিকটা খুব মসৃণ। পশম তন্তুর আকৃতি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় লম্বালম্বিভাবে উপরের দিকে মাছের আঁশের মত খোলস দ্বারা আবৃত। রেয়ন তন্তু অনেকটা রেশমের মত কিন্তু রেশম অপেক্ষা

ইহা প্রায় চারগুণ মোটা। নাইলন তন্তু অনেকটা রেয়ন তন্তুর মতই মনে হয়। নাইলন তন্তু চিনিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় আগুনে পুড়াইয়া পরীক্ষা করা। এই তন্তু পুড়াইলে গলিয়া শক্ত দানা বাঁধে।

রাসায়নিক পরীক্ষা : রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারাও আমরা তন্তু সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জন করিতে পারি। একটি লিনেন কাপড়ের টুকরা **সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আনিলে লিনেন তন্তু দ্রবীভূত হইবে কিন্তু সেই তুলনায় সুতির তন্তুর বিশেষ ক্ষতি হইবে না।** রেয়ন তন্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভিসকোস এবং অ্যাসিটেট রেয়ন এই দুই তন্তুর রাসায়নিক উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুতরাং রাসায়নিক বিক্রিয়াও ভিন্ন রকম হয়। শতকরা ১ ভাগ অ্যামোনিক্যাল সিলভার নাইট্রেটের সহিত ভিসকোস তন্তু উত্তপ্ত করিলে উহা বাদামী রঙের হয়।

অ্যাসিড পরীক্ষণ

আবার আয়োডিন ও ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইলে ভিসকোস্ তন্তু নীলবর্ণ হইয়া যায়। **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত আয়োডিন মিশাইয়া উহার ভিতর রেয়ন তন্তু ডুবাইলে ভিসকোস রেয়ন গাঢ় নীল এবং অ্যাসিটেট হলুদ বর্ণ হয়।**

কষ্টিক পটাশ দ্রবণে রেশমে দাগ পড়ে না, কিন্তু কৃত্রিম রেশমে একটা হলুদ দাগ পড়ে। **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে রেশম দ্রবীভূত হয়।** কষ্টিক পটাশ দ্রবণে পশমও সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত হয় কিন্তু **হাইড্রোক্লোরিক দ্রবণে পশমের তন্তুগুলি স্ফীত হইয়া উঠে কিন্তু গলিয়া যায় না। নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে পশম হলুদ বর্ণ ধারণ করে।**

শতকরা ১০ ভাগ কষ্টিক সোডার দ্রবণে নাইলনের কোনও ক্ষতি হয় না। মৃদু অ্যাসিড নাইলন তন্তুর ক্ষতি করিতে পারে না কিন্তু শতকরা ৭ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অথবা সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে নাইলন তন্তু ডুবাইলে উহা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

নাইলন তন্তুর উপর ক্ষারের প্রতিক্রিয়া

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা মিশ্রতন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান

রেশম ও তুলা : ১৫০ সি. সি. পরিস্রাবণ জলে ১৬ গ্রাম **কপার সালফেট** দ্রবীভূত করিয়া উহাতে ১০ গ্রাম **গ্লিসারিন** মিশাইবার পর ড্রপারের সাহায্যে **কস্টিক সোডার দ্রবণ** মিশ্রিত করিলে সমস্ত মিলাইয়া যে একটি দ্রবণ প্রস্তুত হইল, উহার

ভিতর রেশম ও তুলার মিশ্রিত বস্ত্রটি ডুবাইলে দেখা যাইবে রেশম দ্রবীভূত হইয়াছে, আর তুলা অপরিবর্তিত ভাবে আছে। এই পরীক্ষায় পশমেরও কোন পরিবর্তন হয় না।

পশম ও রেশম ঃ (১) **গরম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ভিতর** বস্ত্রটি ডুবাইলে দেখা যাইবে রেশম দ্রবীভূত হইয়াছে কিন্তু পশমের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

(২) জলের ভিতর **সামান্য সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া** উহার ভিতর মিশ্রিত তন্তুটি ডুবাইলে পশমের কোনও ক্ষতি হয় না ; কিন্তু রেশম **বাদামী রঙের একটি দ্রব্যে পরিণত হইবে।**

পশম ও তুলা ঃ (১) সুতি-মিশ্রিত একটি পশমের টুকরা সালফিউরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণে ডুবাইলে সুতা সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হইবে, তলায় পশম পড়িয়া থাকিবে।

(২) **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘন দ্রবণে** তুলা নষ্ট হইয়া যায়, পশম অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

(৩) **কস্টিক সোডার দ্রবণে সূতি মিশ্রিত একটি পশম বস্ত্র ডুবাইলে পশম দ্রবীভূত হইয়া যাইবে আর সূতি পড়িয়া থাকিবে।**

বিভিন্ন তন্তু সম্বন্ধে তুলনামূলক চার্ট

	সূতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
(১) রাসায়নিক উপাদান	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন,	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন ও সালফার	কার্বন, অক্সিজেন, হাই-ড্রোজেন	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন,
(২) তন্তুর আকৃতি	মোচড়ানো ফিতার মত	নলাকৃতি ও মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী রহিয়াছে।	নলের মত কোনও বন্ধনী নাই। এক প্রান্ত অপর প্রান্ত অপেক্ষা সরু।	মাছের আঁশের মত খাঁজ-কাটা।	রেশমের মত কিন্তু রেশম অপেক্ষা চারগুণ মোটা।	অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পার্থক্য ধরা যায় না, অনেকটা রেয়নের মত

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
(৩) জলীয় বাষ্প শোষণ করিবার ক্ষমতা	জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে।	সুতি অপেক্ষা আরও বেশী শোষণ ক্ষমতা আছে।	সুতি ও লিনেন অপেক্ষা বেশী।	জলীয় বাষ্প শোষণ করিবার ক্ষমতা পশমের সর্বাপেক্ষা বেশী।	সুতি ও লিনেন অপেক্ষা শোষণের ক্ষমতা বেশী।	জলীয় বাষ্প শোষণ করিবার ক্ষমতা অনেক কম।
(৪) স্থিতি-স্থাপকতা	স্থিতি-স্থাপকতা কম এবং এই জন্য কুচকাইয়া গেলে বা ভাঁজ থাকিলে সেই দাগ সহজে মিলাইয়া যায় না।	স্থিতিস্থাপ-কতা সুতি অপেক্ষাও কম।	সুতি ও লিনেন অপেক্ষা স্থিতি-স্থাপকতা বেশী।	স্থিতিস্থাপ-কতা ইহাতে অনেক বেশী বলিয়া কোনও ভাঁজের দাগ পড়ে না।	পশম ও রেশম অপেক্ষা কম।	পশমের ন্যায় স্থিতিস্থাপক শক্তি কম; ইহাতে ভাঁজের দাগ হয় না।
(৫) কুঞ্চন	স্বাভাবিক ভাবে সুতির কোনও কুঞ্চন নাই; কাপড় বুননের দোষে থাপিয়া যায়।	সুতির মতই সহজে কুঞ্চিত হয় না।	সংকুচিত হইবার কোনও ক্ষমতা নাই।	সাধারণ ভাবে কুঞ্চিত হয় না, কিন্তু কাচার দোষে অর্থাৎ অতিরিক্ত তাপ ও চাপের সংস্পর্শে কুঞ্চিত হয়।	কুঞ্চন হয়	রেয়নের মতই অনেক সময় কুঞ্চিত হইতে দেখা যায়।

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
(৬) চাকচিক্য	কোনও চাক্‌চিক্য নাই	সুতি অপেক্ষা সামান্য চাকচিক্য	অত্যন্ত চাকচিক্য	চাকচিক্যের অভাব	চাকচিক্য আছে।	রেয়নের মত চাকচিক্য আছে।
(৭) তাপ পরিবহন ক্ষমতা	তাপ সুপরিবাহী	অধিকতর তাপ সুপরিবাহী	তাপ কুপরিবাহী এই কারণে শীতের দেশের লোক রেশম বস্ত্র বেশী ব্যবহার করে	তাপ কুপরিবাহী, এই জন্য এই তন্তু দ্বারা শীতের পোশাক হয়	তাপ সুপরিবাহী।	তাপ সুপরিবাহী।
(৮) তাপের প্রতিক্রিয়া	সোডা গরম জলে ফুটানো যায় এবং ইস্ত্রির তাপ ৫০০° ফারেনহাইট পর্যন্ত চলে	সুতির মত সাধারণ তাপে ক্ষতি হয় না।	বেশী উত্তাপ দিলে নষ্ট হইয়া যায়। ইস্ত্রির তাপ ৩০০° ফাঃ এর বেশী হওয়া উচিত নয়।	বেশী তাপ এই তন্তুরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে।	সুতির মত বেশী তাপ সহ্য করিতে পারে না। ইস্ত্রির তাপও অপেক্ষাকৃত কম হওয়া উচিত।	উত্তাপে নষ্ট হয়। বেশী উত্তাপে গলিয়া যায়।
(৯) ক্ষারের প্রতিক্রিয়া	সকল প্রকার ক্ষার সহ্য করার ক্ষমতা আছে।	মোটামুটি ভাবে ক্ষার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।	ভাল সাবান ব্যতীত কড়া ক্ষার সহ্য করিতে পারে না।	তীব্র ক্ষার পশমের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও বোরাক্স পশমে দেওয়া যাইতে পারে।	তীব্র ক্ষার ক্ষতিকর	ক্ষার প্রয়োগে তন্তু নষ্ট হইয়া যায়।

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
(১০) অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া	তীব্র অ্যাসিডে নষ্ট হইয়া যায়। লঘু অ্যাসিড দ্রবণ দাগ তোলার জন্ত প্রয়োগ করা যায়।	সুতির ন্তায়	তীব্র অ্যাসিড প্রয়োগে ক্ষতি হয়	রেশমের অনুরূপ	ক্ষতি হয়	লঘু অ্যাসিডে ক্ষতি হয় না
(১১) দাহ্যতা	শিখা সহ সহজেই জ্বলিয়া উঠে এবং পুড়িবার পর হাল্কা ছাই পুড়িয়া থাকে।	একই রকম	ধীরে ধীরে পোড়ে এবং পুড়িবার সময় পালক পোড়া বা চুল-পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়	রেশমের মত	তাড়াতাড়ি জ্বলে এবং ছাই থাকে। কিন্তু অ্যাসিটেট তন্তু গলিয়া শক্ত কালো মত গুটি বাধে	আগুন জ্বলে না গলিয়া যায়।
(১২) কাপড় কাটার পোকার প্রভাব	পোকায় কাটে না।	পোকায় কাটে না।	মথ পোকায় কাটে	মথ পোকায় কাটে	পাকায় কাটে না	কোনও পোকায় কাটে না

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবারে পরিচ্ছদ পরিচালনার দায়িত্ব

গৃহস্থ পরিবারে পরিচ্ছদ পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণতঃ গৃহিণীর উপরই থাকা উচিত। সুগৃহিণী এই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পরিচালনা করিলে উহার কতকগুলি বিষয় চিন্তা করিতে হয়। আবহাওয়া অনুযায়ী যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়, **পোশাক-পরিচ্ছদের প্রাচুর্য ঘটিয়া আলনা যাহাতে স্তূপীকৃত হইয়া না যায় সেজন্য অব্যবহার্য পোশাকগুলি বাক্স বা আলমারীতে তুলিয়া রাখিতে হয়।** গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু শেষ হইয়া যখন শীতের আগমন ঘটে তখন **সুতির অনেক পোশাক তুলিয়া রাখা যায়।** আবার শীত বিদায় নিলে গরম জামা-কাপড় কাচিয়া তুলিয়া রাখা উচিত। এইভাবে ঋতু অনুযায়ী জামা-কাপড় কিছু কিছু তুলিয়া না ফেলিলে ঐগুলি দ্বারা গৃহে স্থান সংকুলান যেমন অসম্ভব হইয়া পড়ে তেমনই আবার পোশাক-পরিচ্ছদও নষ্ট হইয়া যায়।

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পোশাক **গৃহকর্ত্রীর নির্দিষ্ট বাজেটের ভিতর উহাদের পছন্দ অনুযায়ী ক্রয় করা উচিত।** আয়ের সীমা ছাড়াইয়া পারিবারিক মান অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় না করিলে গৃহিণীর সংসারের ব্যয়-পরিচালনা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। পরিবার-পরিজন বা ছেলেমেয়েদের যাহাতে **অতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করার দিকে প্রবণতা না থাকে সেদিকে গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হয়।** পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে বিলাসিতা এড়াইতে না পারিলে উহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে। গৃহকর্ত্রীর সর্বক্ষণ লক্ষ্য থাকা উচিত **পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে যাহাতে কোনও অপব্যয় না হয়।**

পরিচ্ছদ পরিচালনা

কোনও ছেলে বা মেয়ের জামা-প্যাণ্ট ছোট হইয়া গেলে সেটি অব্যবহার্য হিসাবে ফেলিয়া না রাখিয়া পরবর্তী শিশুর জন্য রাখিতে হয়। তবে নূতন একটা কিনিবার প্রয়োজন হয় না। আবার মজবুত কোনও জামা ছিড়িয়া গেলে সেই জায়গায় অন্য কাপড়ের টুকরার সাহায্যে অ্যাপ্লিকের নক্সায় তালি দেওয়া যাইতে পারে। বড় কোনও জামা নূতন করিয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করিয়া পরবর্তী শিশুর পরিধানযোগ্য করিয়া তোলা যায়। অর্থনৈতিক সমস্যার যুগে পোশাক-পরিচালনার ইহা এক-প্রকারের আধুনিক পদ্ধতি।

আটপৌরে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যতীত কিছু ভাল পোশাক তুলিয়া রাখিতে হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত বেশী দামের হইলে ক্ষতি নাই, কেননা বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে পরা হয় বলিয়া ইহা তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায় না; ফলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায়। **সিল্কের জামা-কাপড়, নাইলন, টেরিলিন, টেরিকটন ইত্যাদির বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ দামী হইলেও কোনও উৎসবে ব্যবহারের জন্য দুটা-একটা ক্রয় করা যাইতে পারে।**

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা একটু বড় হইলেই মায়েদের কর্তব্য উহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বয়স অনুযায়ী নির্বাচন করা। মেয়েরা বড় হইলেই শাড়ী-ব্লাউজের ব্যবস্থা করা উচিত। অপরপক্ষে ছেলেরা বড় হওয়ার সাথে সাথে ঢিলা পায়জামা ও ফুলপ্যান্টের ব্যবস্থা করিতে হয়। তখন আর হাফ-প্যান্ট চলে না।

পরিচ্ছদ সংরক্ষণ

পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখা একটি বড় কাজ। গৃহিণী এই কাজটি ভালভাবে করিতে পারিলে জামা-কাপড় সহজে পোকায় কাটে না, যত্নের জন্য ঐগুলির **চাকচিক্য বজায় থাকে, বিবর্ণ হইয়া যায় না**, ফলে অধিক দিন ব্যবহার করা যায়। বর্ষাতে স্বভাবতঃ সবকিছুই স্যাঁতসেঁতে হইয়া যায়। স্তরাং **বর্ষার পর ভাদ্রমাসের কোনও কড়া রৌদ্রে বাক্সের যাবতীয় জামা-কাপড় শুকাইয়া গরম করিয়া লইয়া তুলিয়া রাখিতে হয়।** দামী দামী পোশাকী জামা-কাপড় নিজেরা কাচিতে না পারিলে দোকানে বেশী মজুরি দিয়া কাচাইয়া আনিতে হয়। **রেশম ও পশম বস্ত্রে সাধারণতঃ পোকায় কাটিবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।** সুতরাং ঐ সকল পোশাক **খবরের কাগজ** অথবা **মার্কিন কাপড়ে** জড়াইয়া আলমারী অথবা ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিতে হয়। নূতন কাপড় এবং খবরের কাগজের ছাপার কালির গন্ধে সহজে পোকায় ধরিতে পারে না। ইহা ছাড়া কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে **ন্যাপথলিন, নিমপাতা, তামাক-পাতা** প্রভৃতিও রাখা যাইতে পারে। কাপড়ে দাগ না লাগার জন্য ঐগুলি ন্যাকড়ায় পুটুলী বাঁধিয়া রাখা উচিত। এইভাবে গৃহের পোশাক-পরিচ্ছদ যত্ন করিয়া সংরক্ষণ করিলে সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বস্ত্রাদি ধৌত ও পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতি

শুষ্ক ধোলাই এবং বস্ত্রের দাগ তোলা।

সাধারণভাবে আমরা পোশাক-পরিচ্ছদ সাবান-সোডার সাহায্যেই পরিষ্কার করি। সাবান ছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থের ভিন্নভাবে পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ঐ সকল পদার্থ দ্বারা পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া আমরা প্রয়োগ করিতে পারি। নিম্নে কাপড়-জামা পরিষ্কারের কয়েকটি দ্রব্য ও উহার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) **সালফোনেটেড ফ্যাটি অ্যালকোহল :** অ্যাসিড দ্বারা তৈরী হইলেও ইহা দেখিতে সোপ পাউডারের মত। কাপড়-জামা পরিষ্কার করিবার ইহা একপ্রকার অ্যাসিড দ্রবণ ; ইহা কখনও গরম জলে মিশাইতে হয় না। ঈষদুষ্ণ জলে পদার্থটি পরিমাণ মত মিশাইয়া নাড়িলেই ফেনা হইবে ; খুব ভাল ফেনা সৃষ্টি হইবার পর দ্রবণটির ভিতর পোশাকটি ডুবাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয় এবং কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবার পর কাচিয়া শেষ বারের মত ধৌত করিয়া মেলিয়া দিতে হয়। উহা খুব দামী বলিয়া যাহাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সাধারণতঃ রঙ্গীন পোশাক ইহার সাহায্যে পরিষ্কার করিলে ভাল হয়। পশম বস্ত্র ইহা দ্বারা ধুইলে পশম নষ্ট হইতে পারে না।

(২) **অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ :** পশমের কোনও কোট বা প্যান্ট ধৌত করিবার জন্য এই দ্রবণটি বিশেষ উপযোগী। প্রথমে সামান্য জলের ভিতর এক চামচ আন্দাজ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লইয়া গরম করিতে হয়। এই মিশ্রিত গরম দ্রবণটি পরে উপযুক্ত পরিমাণে গরম জলে মিশাইয়া পোশাকটি ১৫ হইতে ২০ মিনিট পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবার পর আলতোভাবে নিঙ্গড়াইয়া শেষ বারের মত গরম জলে ধৌত করিতে হয়।

(৩) **বস্ত্র পরিষ্করণে প্যারাফিন :** নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির সাহায্যে পোশাকটি ধৌত করিতে হয়।

গরম জল = ২ গ্যালন

সোডিয়াম কার্বনেট = ১ আউন্স

ভাল সাবান = ২ আউন্স

প্যারাফিন = ২ চামচ।

জলের ভিতর সাবান মিশাইয়া ফুটাইয়া লইতে হইবে। সাবান ভালভাবে গলিয়া গেলে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিবার জন্ম রাখিয়া দিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে উহার ভিতর প্যারাফিন মিশাইয়া পোশাকটি ডুবাইতে হয়। কিছু সময় ভিজাইয়া রাখিবার পর উহা আধঘণ্টার মত ফুটাইতে হয়; ফুটাইবার সময় মাঝে মাঝে কিছুর সাহায্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয়। তৈলাক্ত পদার্থযুক্ত স্থতির পোশাক এই পদ্ধতিতে ধৌত করিলে খুব ভাল পরিষ্কার হয়।

(৪) **বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার তরল দ্রবণ:** নিম্নলিখিত উপকরণ দ্বারা এই দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। **সাবান, অ্যামোনিয়া, গ্লিসারিণ, মেথিলেটেড স্পিরিট** এবং **জল**। প্রথমে কিছু সাবানের টুকরা গরম জলে দ্রবীভূত করিয়া তরল করিয়া নিতে হয়। দ্রবীভূত সাবানের ভিতর উল্লিখিত সমস্ত উপকরণ মিশ্রিত করিয়া ঝাঁকাইয়া লইলেই কাপড় পরিষ্কার করার একটি দ্রবণ প্রস্তুত হইবে। এই দ্রবণে রেশম ও পশম বস্ত্র ভাল পরিষ্কার হয়।

শুষ্ক ধোলাই: সাধারণভাবে সাবান-জলে কাচার পরিবর্তে পশম ও রেশমের দামীদামী পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষতি নিবারণের জন্য বিভিন্ন তরল পদার্থের সাহায্যে যে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা হয় তাহাকেই **শুষ্ক ধোলাই** বলা হয়।

শুষ্ক ধোলাইর কাজে অনেক রকমের তরল ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু কতকগুলি বিষয় চিন্তা করিয়া ইহা নির্বাচন করা আবশ্যক। পোশাকের **তৈলাক্ত ময়লা দ্রবীভূত করার ক্ষমতা আছে কিনা** সর্ব প্রথম ঐ বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। তরল পদার্থ বেশী উদ্বায়ী হইলে উহা তাড়াতাড়ি উবিয়া যায় ফলে ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিতে না পারিলে ব্যয় অনেক বেশী হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার পর অবশিষ্ট তরলের সাহায্যে যাহাতে পুনরায় কাজ করা যায় এইরূপ তরলই নির্বাচন করা প্রয়োজন। **খারাপ গন্ধযুক্ত তরল ব্যবহার না করাই ভাল।**

শুষ্ক ধোলাইর জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তরল ব্যবহৃত হয়। এইগুলির ভিতর স্থবিধা অস্থবিধা চিন্তা করিয়া নির্বাচন করা স্থগৃহিণীর কর্তব্য। **পেট্রোল, ইথার, বেঞ্জিন, অ্যাসিটোন, স্পিরিট, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড** প্রভৃতি তরল পদার্থের সাহায্যে জামা, কাপড় পরিষ্কার করা যায়। এইগুলির ভিতর অম্ল বা ক্ষারীয় পদার্থের অভাব বলিয়া পোশাকের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

শুষ্ক পদ্ধতিতে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সরঞ্জামাদি ও ধৌত প্রণালী

(১) বড় দুইটি ধাতব গামলা।

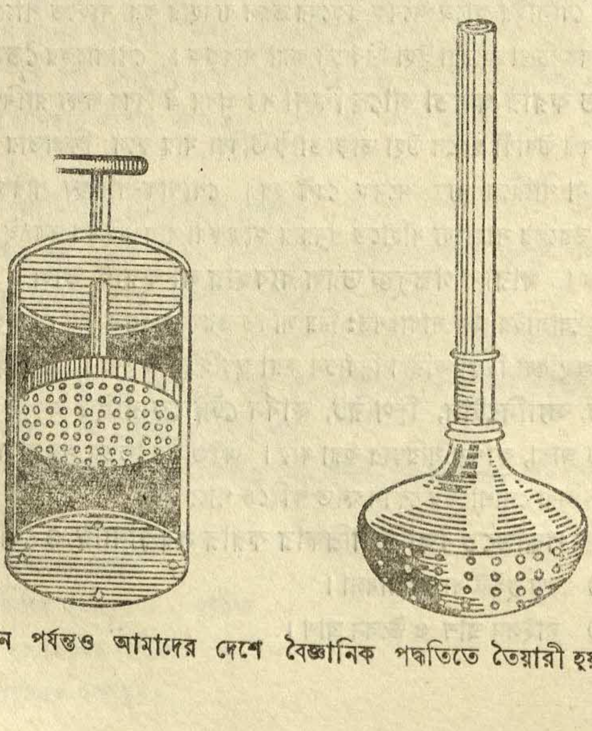
(২) নাইলন ব্রাশ ও উলেন ব্রাশ।

(৩) তরল ব্যবহারের জন্য স্প্রেয়ার

(৪) কাঠের হ্যাঙ্গার ও ক্লিপ।

পোশাকটি যদি পাতলা হয় তাহা হইলে গামলায় তরল ঢালিয়া উহাতে ডুবাইয়া নাড়াচাড়া করিলেই ময়লা দ্রবীভূত হইয়া তরলের ভিতর মিশিয়া যাইবে। আলাদা ভাবে চাপিয়া তরল গামলায় ফেলিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে পোশাকটি হ্যাঙ্গারে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। ভারী পোশাক হইলে স্প্রেয়ারের সাহায্যে তরল বিভিন্ন অংশে স্প্রে করিয়া **ব্রাশের সাহায্যে** আস্তে আস্তে ঘষিতে হয়। **রেশমী বা কৃত্রিম রেশম বা সিনথেটিক তন্তু** হইলে **নাইলন ব্রাশ** দ্বারা ঘষিতে হয় এবং পশমের পোশাক হইলে উলেন ব্রাশ বা শক্ত ব্রাশ দ্বারা ঘষিতে হয়। সাধারণত কলার, হাতের কাফ, বেল্ট প্রভৃতি বিশেষভাবে ব্রাশের সাহায্যে ময়লা তুলিতে হয়। যে কোনও তরলই ব্যবহার করা হউক না কেন **অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ সম্পন্ন করিতে হয়** তাহা না হইলে তরল অনেক বেশি লাগে। তরলগুলির বেশির ভাগই **দাহ্য পদার্থ**। অতএব অত্যন্ত সাবধানতার সহিত অগ্নির সংস্পর্শ হইতে অনেক দূরে এই কাজ করা উচিত। সুতরাং বদ্ধ জায়গা অপেক্ষা খোলা জায়গায় এই কাজ করিলে বিপদের আশঙ্কা কম।

ড্রাইক্লিনিং পাম্প ও শোষক যন্ত্র ঃ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সাজ-



সরঞ্জামদি এখন পর্যন্তও আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈয়ারী হয় নাই।

আমরা সাধারণ জিনিসের সাহায্য লইয়া অনেক কাজ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য দেশে শুষ্ক ধোলাই কাজ ড্রাই ক্লিনিং পাম্প এবং পোষক যন্ত্র বা সাক্‌সন ওয়াশার ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্তও ইহা দুষ্প্রাপ্য। আমরা যে ভাবে খোলা পাত্রে এই কাজ করি তাহাতে অনেক সময় অপচয় হইয়া থাকে কারণ শুষ্ক ধৌতির তরলগুলি বেশির ভাগ উদ্বায়ী। ইহা ব্যতীত দাহ্য বলিয়া যে কোনও সময় কোনও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। উপরোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় পরিষ্কার করিলে সুবিধা-জনক তো বটেই ; আবার অপচয় বন্ধ হয়, অপর পক্ষে নিরাপত্তাও বজায় থাকে।

যন্ত্র ব্যবহারের প্রণালী : কাজ আরম্ভের পূর্বে ড্রাই ক্লিনিং পাত্রটির ভিতর পেট্রোল ঢালিতে হয়। ময়লা কাপড়গুলি ইহাতে রাখিয়া স্ক্রু আটকাইয়া দেওয়া হয়। হাতলের সাহায্যে সাক্‌সন ওয়াশার ১৫ হইতে ২০ মিনিট উঠা নামা করিতে হয়। ময়লা বেশী হইলে সময়ও বেশী লাগে। পোশাকগুলি পরিষ্কার হইয়া গেলে কল খুলিয়া ফিলটার কাগজের ভিতর দিয়া তরল লওয়া হয়। ঢাকনার স্ক্রু খুলিয়া পোশাকগুলি বাহির করিয়া বায়ুতে রাখা হয়। যন্ত্রটির হাতল কাঠের হইলে মরিচা পড়ার ভয় থাকে না।

বিভিন্ন তরলের গুণাগুণ :

পেট্রোল : শুষ্ক ধোলাইর ব্যাপারে ইহা একটি উৎকৃষ্ট তরল। অন্যান্য তরল অপেক্ষা ইহার দাম কম। ইহা কম উদ্বায়ী বলিয়া অন্যান্য তরল অপেক্ষা ইহা দ্বারা কাজ করিতে সুবিধা হয়। বাতাসে ইহার গন্ধ দূর হয়। সুতরাং পোশাকে ইহার গন্ধ স্থায়ী হয় না। তৈলাক্ত ময়লা দ্রবণ ক্ষমতা ইহার বেশী। পেট্রোলের সাহায্যে কাজ করিবার সময় খোলা জায়গায় কাজ করা ভাল কেননা ইহা খুব দাহ্য পদার্থ। অন্যান্য তরল অপেক্ষা ইহার দাম কম।

ইথার : ইহা অত্যন্ত উদ্বায়ী তরল। ইহা দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করিতে গেলে খরচ অনেক বেশী হয় এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। পেট্রোলের ন্যায় ইহাও দাহ্য পদার্থ। সুতরাং যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক।

বেনজিন : ইহা দ্বারা তৈলাক্ত ময়লা সহজেই পরিষ্কার করা যায়। পরিষ্কারের পক্ষে তরলটি ভাল হইলেও পেট্রোলের তুলনায় ইহার দাম অনেক বেশী। ইহাও একটি দাহ্য পদার্থ।

স্পিরিট : অন্যান্য তরলের মত স্পিরিটের সাহায্যে পোশাক পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। কারণ ইহা অত্যন্ত উদ্বায়ী এবং দ্রবণ ক্ষমতাও অন্যান্য তরল অপেক্ষা কম। সাধারণতঃ কলার ও হাতের কাফের তৈলাক্ত ময়লা স্পিরিটের সাহায্যে ব্রাশ দ্বারা ঘষিয়া ময়লা তোলা হয়। ইহাও দাহ্য পদার্থ।

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড : ইহা একপ্রকার অদাহ্য বস্তু। বেনজিন অপেক্ষা ইহার দ্রবণ করার ক্ষমতা অনেক বেশী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত মূল্যবান তরল সুতরাং কাপড় পরিষ্কারে ইহা ব্যবহার করিলে ব্যয় অত্যন্ত বেশী হয়।

পোশাক পরিচ্ছদে দাগ ও দাগ তোলা

পোশাক পরিচ্ছদে নিজস্ব কোনও রং ব্যতীত অন্য কোনও বিজাতীয় রং চিহ্নিত হইলে উহাকে দাগ বলে।

নানাকারণে কাপড় চোপড়ে দাগ লাগে। গৃহে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিতে গেলে অসতর্কতা বশতঃ কাপড় চোপড়ে দাগ লাগিয়া যায়। যেমন তরকারী কুটিবার সময় **কাঁচকলার দাগ, মোচার দাগ, কচুর দাগ, রোগীকে ঔষধ দেবার সময় বিভিন্ন রকম ঔষধের দাগ,** বর্ষার সময় স্যাঁতস্যেঁতে কাপড় চোপড় অযত্নে রাখিবার ফলে **চিতি পড়ার দাগ,** আর্দ্র লোহার তারে কাপড় চোপড় শুকাইতে দিলে **মরিচার দাগ,** লেখার সময় **কালির দাগ,** ইহা ছাড়া দেহের কোনও অংশ কাটা-ছেড়ার ফলে **রক্তের দাগ,** গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার দেহ-নিঃসৃত **ঘামের দাগ** প্রভৃতি দাগ পোশাক পরিচ্ছদে অহরহই লাগিতেছে।

দাগগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) প্রাণিজ, (২) উদ্ভিজ্জ (৩) খনিজ ও (৪) বিবিধ।

প্রাণিজ দাগ : রক্ত, বমি, ডিম প্রভৃতি। এই দাগগুলি তুলিতে হইলে গরম জলের পরিবর্তে শীতল জল ব্যবহার করিতে হয় কারণ ঐ সকল দাগ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ হইতে উদ্ভূত বলিয়া উহাতে আলবুমেন আছে। গরমের সাহায্যে অ্যালবুমেন কঠিন হইয়া বস্ত্রাদিতে আরও স্থায়ী ভাবে লাগিয়া যাইবে এবং দাগ তোলা কঠিন হইয়া পড়িবে।

উদ্ভিজ্জ দাগ : চা, কফি, ফল, তরিতরকারী প্রভৃতি ও মদ জাতীয় দাগ উদ্ভিজ্জ দাগের পর্যায় পড়ে। ইহা সাধারণতঃ ক্ষার জাতীয় পদার্থের মিশ্রণে উঠিয়া যায়।

খনিজ পদার্থের দাগ : লোহা, ছাপার কালি, বিভিন্ন প্রকারের ঔষধের দাগ প্রভৃতি এই পর্যায়ের দাগ। ক্ষার এবং অম্ল দুই জাতীয় পদার্থ এই শ্রেণীর দাগ তুলিবার জন্য প্রয়োজন হয়।

বিবিধ দাগ : যেমন চর্বির দাগ, ঘামের দাগ, ঘামের দাগ, পেইন্টের দাগ প্রভৃতি। বিভিন্ন পদার্থ প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল দাগ তুলিতে হয়।

দাগ উঠাইবার প্রণালী : বস্ত্রে চা, কফি, কোকো প্রভৃতির দাগ লাগিলে একটি বাদামী রং ধারণ করে। সাবান জলে এই দাগ সাধারণতঃ ওঠে না। সূতি বা লিনেন বস্ত্রে এই দাগ লাগিলে সোহাগা মিশ্রিত জলে কিছু সময় ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সাবান জলে ধুইয়া ফেলিলে দাগটি উঠিয়া যায়। কাপড়টি রেশম বা পশমের হইলে এক টুকরা ন্যাকড়া অ্যালকোহল মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া দাগযুক্ত স্থানে আস্তে আস্তে ঘষিতে হয়। কিছুক্ষণ ঘষার পর কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিণ মিশাইয়া ১৫।২০ মিনিট ভিজাইয়া রাখিবার পর আস্তে আস্তে ঘষিলেই দাগটি মিলাইয়া যাইবে। ইহার পর শেষবারের মত বস্ত্রটি ঈষদ উষ্ণ জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

ফলের দাগ : ডাবের জল এবং অন্যান্য ফলের রসের দাগ সদ্য অবস্থায় গরম জলের সাহায্যে ধুইয়া ফেলিলে দাগটি উঠিয়া যায়। একটি গামলায় কাপড়ের দাগ-যুক্ত স্থানটি টান টান করিয়া উহাতে ফুটন্ত গরম জল কেটলীর নলের সাহায্যে একটু উপর হইতে ঢালিলে ঐ দাগ মিলাইয়া যায়। কিন্তু দাগ পুরাতন হইলে এই পদ্ধতিতে দাগ উঠিবে না। পুরাতন দাগ সাবানেও উঠিবে না। এক্ষেত্রে প্রথমে সাবান দ্বারা ধুইবার পর ঐ জায়গায় **গ্লিসারিণ** মাখাইয়া কয়েক ফোঁটা ভিনিগার মাখাইয়া কিছু সময় রাখিবার পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যায়। এই পদ্ধতিতে সূতি, লিনেন ও পশম বস্ত্র হইতে ফলের দাগ তোলা যায়। বেশী পুরাতন দাগ হইলে **জ্যাভেলী অপসারক** দ্বারা তুলিতে হইবে। কিন্তু রেশম ও পশমে জ্যাভেলী অপসারকের পরিবর্তে সোহাগা ব্যবহার করা যায়।

৫০০ গ্রাম জলের ভিতর ২৫০ গ্রাম কাপড় কাচা সোডা মিশাইয়া গুলিয়া নেওয়ার পর উহার ভিতর ১০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার মিশাইয়া লইলেই জ্যাভেলী অপসারক দ্রবণ প্রস্তুত হইয়া যায়। জ্যাভেলী অপসারক কখনও **রঙ্গীন বস্ত্রে, রেশমে ও পশমে ব্যবহার করিতে নাই।**

ঘাসের দাগ : ঘাস বা সবুজ পাতার ভিতর ক্লোরোফিল আছে বলিয়া ইহা **উদ্ভিজ্জ দাগের পর্যায় পড়ে না।** এই দাগ সদ্য সদ্য তুলিতে হইলে গরম সাবান জলেই উঠিয়া যাইবে। দাগ পুরাতন হইলে জ্যাভেলী অপসারক দ্বারা তুলিতে হইবে। রঙ্গীন কাপড়ের জন্য সোহাগার পাউডার ব্যবহার করিতে হয়।

আয়োডিনের দাগ : সূতি বা লিনেন কাপড় হইতে এই দাগ সাবান জলে না উঠিলে ন্যাকড়ায় **অ্যালকোহল** মিশ্রিত করিয়া দাগযুক্ত স্থানে ঘষিয়া লইলে দাগ উঠিয়া যাইবে। রেশম ও পশমের বেলাতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

মরিচার দাগ : **লেবুর রসের ভিতর লবণ মিশাইয়া** দাগযুক্ত স্থানে লাগাইয়া বস্ত্রটি রৌদ্রে দিতে হয়, কিছুক্ষণ পর দাগ মিশাইয়া গেলে সাবান জলে বস্ত্রটি ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে না উঠিলে **অক্স্যালিক অ্যাসিড দ্রবণে** ভিজাইয়া রাখিয়া সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে অনেক পুরাতন মরিচার দাগও উঠিয়া যায়।

ঘামের দাগ : ঘামের দাগ সঙ্গে সঙ্গে না উঠাইলে উহা সাবান জলে উঠানো যায় না। ঘামের দাগের উপর **সোহাগার পাউডার** ছড়াইয়া দিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিলে দাগ মিলাইয়া যায়। **লঘু হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইডের দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিলেও এই দাগ উঠিয়া যায়।** ঘামের দাগ তুলিবার এই পদ্ধতি যে-কোনও তন্তুতেই চলে। প্রাণিদেহ থেকে নিঃসৃত পদার্থ হইলেও এই দাগকে প্রাণিজ দাগ হিসাবে ধরা হয় না।

কালির দাগ

লিখিবার কালি : বস্ত্রে কালির দাগ লাগিবামাত্র **টেলকম** পাউডার ছড়াইয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর **ব্রাশের সাহায্যে** ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। সূতি বা লিনেন বস্ত্রের কালির দাগ **গ্লিসারিনে ভিজাইবার** পর সাবান দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয়। ফাউন্টেন পেনের কালি তুলিবার জন্য অনেক সময় **লেবু ও লবণের প্রয়োজন** হয়, দাগ না উঠিলে **অক্সালিক অ্যাসিড** ব্যবহার করিতে হয়। এক আউন্স জলের ভিতর তিন চামচ অক্সালিক অ্যাসিডের পাউডার মিশাইয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। অ্যাসিড ব্যবহারের পর বস্ত্রটি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

ছাপার কালি : দাগ সমেত কাপড়খানি **তার্পিন তেলে** কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবার পর সামান্য রগড়াইলেই দাগ উঠিয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় দাগ না উঠিলে পেট্রোল ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া উহার উপর ঘষিয়া দিতে হয়। এইভাবে **রেশম, পশম, রেয়ন, সূতি**, লিনেন ইত্যাদি সকল প্রকার বস্ত্রের ছাপার কালির দাগ উঠিয়া যায়।

ইনডিয়া বা ড্রইং কালি : সূতি ও লিনেন বস্ত্রে এই দাগ **অ্যামোনিয়া দ্রবণে** রগড়াইয়া সাবান জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। রেশম, পশম, রেয়ন বস্ত্র হইতে এই কালির দাগ তুলিবার জন্য **কার্বন টেট্রাক্লোরাইড** বা **বেন্‌জিনের** প্রয়োজন হইবে।

দাগ	অবস্থা	সাদা সূতি ও লিনেন	রঙীন সূতি ও লিনেন	রেশম ও পশম	কৃত্রিম তন্তু
চর্বি-জাতীয় দাগ	প্রথম অবস্থা	গরম সাবান জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়।	সাদা স্থূতির পদ্ধতি	(১) প্রথমে সাবানের দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। (২) ফ্রেঞ্চ চক দাগের উপর দেওয়া হইবে। এবারে দাগযুক্ত কাপড়কে ব্লটিং কাগজ দিয়া চাপ দিতে হইবে। সর্বশেষে গরম ইস্ত্রির সাহায্যে চাপ দিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।	রেশম ও পশম বস্ত্রের মত।
চর্বির দাগ	পুরাতন	সাবানের দ্রবণ ব্যবহার করিতে হয়।	স্থূতির পদ্ধতি।	প্রথম পদ্ধতি	"
রক্তের দাগ	প্রথম অবস্থা	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়।	সাদা স্থূতি ও লিনেনের পদ্ধতি।	স্থূতি ও লিনেনের পদ্ধতি	একই পদ্ধতি
রক্তের দাগ	পুরাতন	লবণ-মিশ্রিত ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। গরম জল নিষিদ্ধ	সাদা স্থূতির মত একই পদ্ধতি।	জলে ধোয়া যায় এরূপ পোশাক স্থূতি ও লিনেনের মত পদ্ধতি। ভারী পোশাক হইলে অর্থাৎ ধোয়া সম্ভব না হইলে স্টার্চের লেই প্রস্তুত করিয়া বারে বারে ঐ স্থানে দিলে দাগ উঠিয়া যায়।	রেশম ও পশমের পদ্ধতি

দাগ	অবস্থা	সাদা সূতি ও লিনেন	রঙীন সূতি ও লিনেন	রেশম ও পশম	কৃত্রিম তন্তু
খয়েরের দাগ	প্রথম অবস্থা ও পুরাতন দাগ	দাগযুক্ত স্থানটিতে চূণের প্রলেপ দিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর ধুইয়া ফেলিয়া জ্যাভেলী দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে, চূণের পরিবর্তে কষ্টিক সোডায়ও সিদ্ধ করিয়া লওয়া যায়।	পটাসিয়াম আইও-ডাইড ও সালফিউ-রিক অ্যাসিড সলিউসনে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে দাগ উঠিয়া যায়।	রঙ্গীন সূতি ও লিনেনের পদ্ধতি	একই পদ্ধতি
ডিমের দাগ	প্রথম অবস্থা	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া পরে গরম সাবান জলে ধুইলেই দাগ উঠিয়া যায়	সাদা সূতির মত	সাদা সূতির মত।	সাদা সূতির মত
ডিমের দাগ	পুরাতন	লবণ দ্বারা ঘষিয়া গরম জল ঢালিয়া দিলে দাগ উঠিয়া যায়।	সাদা সূতির পদ্ধতি	দাগ না ওঠা পর্যন্ত ঠাণ্ডা লবণ জলের দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।	রেশম ও পশমের পদ্ধতি।
কাপড়ে চিতি বা ছাতা পড়ার দাগ	প্রথম অবস্থা ও পুরাতন অবস্থা	সাবান সোডায় সিদ্ধ করিয়া অল্প সময় জ্যাভেলী দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।	দাগযুক্ত স্থানটি লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিয়া সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়।	রঙ্গীন সূতির মত	রঙ্গীন সূতির মত

দাগ	অবস্থা	সাদা সুতি ও লিনেন	রঙান সুতি ও রঙীন লিনেন	রেশম ও পশম	কৃত্রিম তন্তু
বার্নিশের দাগ	প্রথম অবস্থা ও পুরাতন অবস্থা	মেথিলেটেড স্পিরিটের সাহায্যে	সাদা স্থুতির মত	সাদা স্থুতির মত	সাদা স্থুতির মত।
পীচ ও আল-কাতরার দাগ	প্রথম অবস্থা	দাগযুক্ত স্থানে কেরোসিনের দ্বারা ভিজাইয়া রাখিবার পর সাবান দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয়	সাদা স্থুতির মত।	বেঞ্জিন বা ইথারের সাহায্যে	রেশমের মত।
পীচ ও আল-কাতরার দাগ	পুরাতন অবস্থা	বেঞ্চিন বা ইথারের সাহায্যে	একই পদ্ধতি	"	"

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহ-শুশ্রূষাকারী হিসাবে গৃহ-রচয়িত্রী

গৃহকর্ত্রী হইতেছে গৃহ-রচয়িত্রী। গৃহ রচনায় বিভিন্ন কাজের ভূমিকায় গৃহটি সুন্দর ও সুখের আকর হিসাবে গড়িয়া ওঠে। গৃহের বিভিন্ন কাজের ভিতর সেবা-শুশ্রূষা একটি প্রধান ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সেবা-শুশ্রূষার জন্য প্রয়োজন হয় বুদ্ধিমত্তা, নৈপুণ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্যশীলতা, সর্বোপরি একটি সংবেদনশীল কোমল মন। আদর্শ গৃহকর্ত্রী দ্বারাই এই কাজটির সুষ্ঠু সম্পন্ন আশা করা যায়। আদর্শ গৃহকর্ত্রীর যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, সেই সকল গুণ দ্বারাই তিনি রোগীর মন জয় করিয়া শুশ্রূষার কাজে সাফল্য অর্জন করিতে পারিবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদর্শ শুশ্রূষাকারীর গুণাবলী এবং কর্তব্য সমূহ

গৃহস্থ পরিবারে সাধারণ কোনও রোগের শুশ্রূষা করার জন্য দায়িত্ব সাধারণতঃ বাড়ীর গৃহিণীর উপরই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং সেবা-শুশ্রূষার নিয়ম-কাননগুলি প্রত্যেক গৃহকর্ত্রীর জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। বয়স্ক মেয়েদের এবং প্রয়োজন হইলে ছেলেদেরও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। গৃহকর্ত্রী অসুস্থ হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোক তাহার সেবা যত্ন করার দায়িত্ব লইবে। সেবাশুশ্রূষার কাজে কেবলমাত্র কর্মপটুতা থাকিলেই চলে না, উহার জন্য প্রয়োজন হয় রোগীর প্রতি আন্তরিক দরদ আর আবশ্যকীয় কতকগুলি গুণ। দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়া রোগীর মেজাজ স্বভাবতঃ খিটখিটে হইয়া যায়; ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত রোগীকে সেবা করা প্রয়োজন। শুশ্রূষাকারীর যথেষ্ট **বুদ্ধিমতী, দরদী, কষ্টসহিষ্ণু,** ও **ধৈর্যশীল** হওয়া আবশ্যক। কর্কশ স্বভাবসম্পন্ন নারী কখনও সেবা-শুশ্রূষার কাজে সুনাম অর্জন করিতে পারে না। **আদর্শ শুশ্রূষাকারী তাহার মিষ্ট স্বভাবে রোগীর রুক্ষ ব্যবহার ও বিরক্তিকর অভিব্যক্তি হাসি, গল্প ও হাল্কা কথাবার্তার ভিতর দিয়া উপেক্ষা করিয়া রোগীর প্রতি কর্তব্য কর্মসমূহ সম্পন্ন করিয়া যায়।** রোগীর কর্তব্য কাজগুলির সুষ্ঠু সমাধানে হাসি, গল্পের প্রয়োজন মাঝে মাঝে ঘটিতে পারে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে লঘু আমোদ-প্রমোদ যেন তাহার সেবার আদর্শ ও নিষ্ঠাকে কখনও ম্লান করিতে না পারে। **সহানুভূতি, সময়নিষ্ঠা, একনিষ্ঠতা, ধৈর্যশীলতা, আনুগত্য, পরিচ্ছন্নতা** এই গুণগুলি না থাকিলে আদর্শ শুশ্রূষাকারী হওয়া সম্ভব হয় না।

সময়ানুবর্তিতা : সময় সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার ফলে শুশ্রূষাকারী অনেক ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঔষধ-পত্র এবং পথ্য ডাক্তার রোগীর জন্য ব্যবস্থা করেন তাহার কোনও ফল হয় না, উপরন্তু অসময়ে দেবার জন্য রোগীর ক্ষতি হয়। **সময়মত ঔষধ এবং পথ্য দেওয়া রোগীর রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।** ঔষধ-পথ্য ছাড়া রোগীর গা মোছানো, দেহের তাপ নেওয়া, বেডপ্যান দেওয়া প্রভৃতি রোগীর সব কাজের ভিতরই শুশ্রূষাকারীর সময় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত।

সহানুভূতি : রোগীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারা রোগীর সেবা কখনই সম্ভব হয় না। রোগকালীন অবস্থার মানুষ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায়

খিটখিটে হইয়া অধৈর্য হইয়া পড়ে; এক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীর রোগীর কষ্ট উপলব্ধি করিয়া যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। রোগীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া রোগ সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া তোলা বাঞ্ছনীয় নয়।

ধৈর্যশীলতা: রোগীর সেবা করিতে গিয়া অধৈর্য হইয়া পড়িলে সেবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ধৈর্যশীলতা শুশ্রূষাকারীর একটি আবশ্যকীয় গুণ। **রোগীর অবস্থা ধৈর্যের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হয়।** ধৈর্য ছাড়া পর্যবেক্ষণ শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে না। সেবাকারীর ধৈর্যের অভাবে অনেক সময় রোগীও বিরক্তি বোধ করে। চঞ্চলতা অধৈর্যের লক্ষণ। রোগীর সেবা করিতে গিয়া শুশ্রূষাকারী যদি অহেতুক তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে চায় তাহা হইলে রোগী অসন্তোষ প্রকাশ করিবে এবং সেবার উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

আনুগত্য: রোগীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া রোগীর রুক্ষ ব্যবহার ও মনের বিরক্তিকর অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সহজভাবে হাসি-গল্পের ভিতর দিয়া রোগীর মনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যকে ফিরাইয়া আনিতে হয়। রোগীর প্রতি ও চিকিৎসকেরপ্রতি আনুগত্যের অভাব ঘটিলে সেবা-শুশ্রূষায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। চিকিৎসকের আদেশ ও নির্দেশ না মানিলে শুশ্রূষাকারীর ভুল-ত্রুটির জন্য রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতে পারে। **শুশ্রূষাকারীর আচরণে বিরক্তির আভাস দেখা দিলে রোগীর মনে আঘাত লাগে এবং অনেক সময় রোগী সঙ্কুচিত হইয়া তাহার শারীরিক অবস্থা অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা করে।**

রোগীর প্রতি ও চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্য

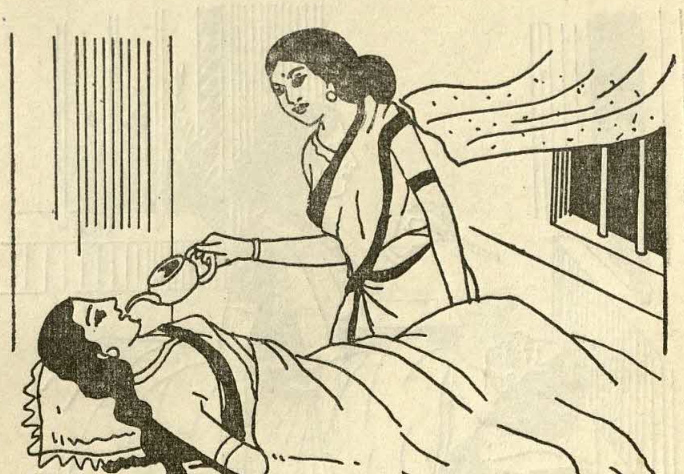
পরিচ্ছন্নতা: রোগীর শুশ্রূষা করিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। রোগীকে এবং রোগীর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখিলে রোগীর শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই উহা রোগ নিরাময়ের সহায়ক হইবে। রোগীর **বিছানাপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র** সর্বোপরি **রোগী-কক্ষ** পরিষ্কার রাখিলে রোগী স্বভাবতঃ প্রফুল্ল থাকিবে। অপরিচ্ছন্ন শুশ্রূষাকারী দ্বারা নিখুঁত সেবা-শুশ্রূষা আশা করা যায় না।

শুশ্রূষাকারীর কর্তব্যসমূহ: আদর্শ শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য কেবলমাত্র রোগীর সেবা-শুশ্রূষা সম্পর্কিত কাজকর্ম দ্বারাই সম্পন্ন হয় না। রোগীর মঙ্গলের জন্য তাহাকে অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকিতে হয়। সুতরাং তাহার কর্তব্যগুলি মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—(১) রোগীর প্রতি, (২) শুশ্রূষাকারীর নিজের প্রতি, (৩) চিকিৎসকের প্রতি, (৪) রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি।

(১) **রোগীর প্রতি কর্তব্য :** রোগীর কাজগুলি যান্ত্রিকভাবে করিয়া গেলে রোগীর মন পাওয়া যাইবে না ; সুশ্রূষাকারীর সর্বপ্রথমে তাহার মধুর ব্যবহারে রোগীর মন জয় করিয়া উহার বিভিন্ন কর্তব্য সমাধানে মনোযোগী হইবে। শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের রোগী শুশ্রূষাকারীর আন্তরিকতা ও কর্মনৈপুণ্য লক্ষ্য করে। যেখানে এই দুই-এর অভাব দেখা যায় সেখানে রোগীর কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। **রোগীকে সময়মত ঔষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করানো, রোগীর বিছানা তৈরী করা** প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজের ভিতর সুশ্রূষাকারীর যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় থাকা দরকার। রোগী সাধারণতঃ ঔষধ খাইতে আপত্তি জানায়। **দরদী ও সংবেদনশীল মন নিয়া শুশ্রূষাকারী মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া তখন তাহাকে ঔষধ খাইতে রাজী করাইবে।** আবার অনেক সময় দেখা যায় ; রোগীর সামনে শুশ্রূষাকারী কতকগুলি পথ্য আনিয়া রাখিয়া দেয় রোগীর খাইবার জন্য। এই খাদ্যদ্রব্যের প্রতি রোগী কখনও আকৃষ্ট হইবে না। রোগীকে **খাদ্য পরিবেশনের জন্য সুন্দর একটি ট্রেতে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রোগীর কাছে আনিলে রোগী স্বভাবতঃ খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।** সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। রোগীর ব্যবহারের বাসনপত্র ঝকঝকে এবং সুন্দর হওয়া যুক্তিসঙ্গত। রোগীর খাদ্য-দ্রব্যের পাশে **ট্রের উপর ছোট একটি ফুলদানীতে এক গুচ্ছ ফুল রাখিতে পারিলে রোগীর মনের বিষণ্ণতা ও গ্লানি দূর হইয়া যায়।** এইভাবে রোগীর প্রত্যেকটি কাজে অগ্রসর হইবার পূর্বে রোগীর মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হাল্কা আলাপ-আলোচনা, হাসিগল্পের ভিতর দিয়া কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করিতে হয়। রোগীকে তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাহার কাজগুলি করিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আদর্শ ও বুদ্ধিমতী শুশ্রূষাকারী যেমন **নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত রোগীর কাজগুলি করিতে পারে তেমনই আবার কাজ করিতে যাইয়া রোগীর বিরক্তি সৃষ্টি না হয় সেদিকেও তাহার লক্ষ্য থাকে।** জুতার খট্‌খট্ শব্দ, অলঙ্কারাদির শব্দ, জোরে দরজা-জানালা বন্ধ করার শব্দ, বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ অনেক সময়ই রোগীর মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করিয়া দেয়। রোগীর সেবা করিবার সময় শুশ্রূষাকারীর বেশী অলঙ্কার পরিধান করা উচিত নয়। **হাতের চুড়ি, আংটি প্রভৃতির দ্বারা রোগী আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে।**

(২) **শুশ্রূষাকারীর নিজের প্রতি কর্তব্য :** রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে হইলে শুশ্রূষাকারীর কেবলমাত্র রোগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই কর্তব্য ফুরাইয়া যায় না,



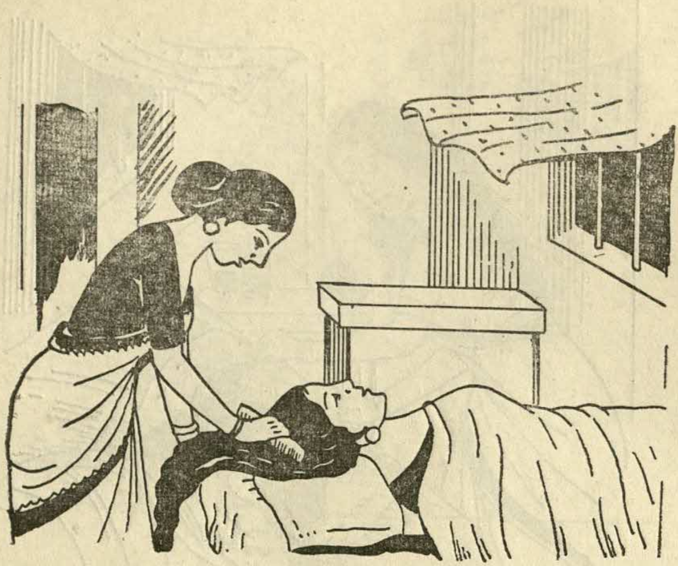














তাহার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে কখনও রোগীর সেবা করা যায় না। সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিলে **রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকা চাই।** প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য **উপযুক্ত খাদ্য, নিদ্রা ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।** প্রত্যেক শুশ্রূষাকারীর রোগীকে শুশ্রূষা করার সময় ছাড়া কিছু সময় নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য রাখা দরকার। এই কারণে হাসপাতালে নার্সদের কাজের তালিকা এমনভাবে নির্ধারিত থাকে যাহাতে একবেলা করিয়া তাহারা প্রত্যেকে বিশ্রাম পায়। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোনও স্ত্রীলোক পরিবারে কাহারও অসুখ হইলে দিন-রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে রোগীর কাছে থাকিয়া তাহার বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করে ; ইহার ফলে অনিদ্রা, পরিশ্রম, সময়মত খাদ্য গ্রহণ না করিবার জন্য অচিরেই তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন **সেবা-শুশ্রূষার কাজটি একজনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া না হয়।**

সেবা করিতে হইলে শুশ্রূষাকারী যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া **নির্বীজক ঔষধ ও সাবানের সাহায্যে ভালভাবে হাত-পা ধুইয়া** কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। রোগীর ঘর হইতে সরাসরি অপর ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করা উচিত নয়। শুশ্রূষাকারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হইলে রোগী তাহার কাজে সন্তুষ্ট থাকিবে না। ইহা ছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রোগ নিরাময়ের একটা উৎকৃষ্ট উপায়। নখ বড় হইলে উহা কাটিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। **বেশভূষা ও চুলের পারিপাট্য না থাকিলে রোগীর শুশ্রূষার প্রতিটি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা।**

(৩) চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য ঃ চিকিৎসকের প্রতি শুশ্রূষাকারীর যে বিরাট কর্তব্য রহিয়াছে তাহা অবহেলা করিলে একনিষ্ঠভাবে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা সবই ব্যর্থ হইয়া যায়। চিকিৎসক দিনে একবার হয়তো দেখিয়া যান। কিন্তু শুশ্রূষাকারীর নিকট হইতে রোগী সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জ্ঞাত হইয়া চিকিৎসক সাধারণতঃ রোগীকে চিকিৎসা করেন। সেক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারী যদি সমস্ত তথ্যাদির বিবরণ যথাযথভাবে না রাখিতে পারেন তাহা হইলে চিকিৎসার বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। সুতরাং রোগীর মঙ্গলের জন্য চিকিৎসকের প্রতি আস্থা রাখিয়া ধৈর্যশীলতার সহিত রোগীকে পর্যবেক্ষণ করিয়া **তাহার রোগ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া চিকিৎসককে দেখাইতে হয়।** বিভিন্ন সময়ে **জ্বরের তাপ, নাড়ীর গতি, মল-মূত্র ঠিক ভাবে হইতেছে কিনা, ক্ষুধাবোধের রকম, শরীরের কোনও উপসর্গ**

প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া পরিষ্কারভাবে চার্টের আকারে লিখিয়া রাখিতে হয় যাহাতে ডাক্তার আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীর রোগ সম্বন্ধে সহজেই বুঝিয়া লইতে পারেন। চিকিৎসকের নির্দেশ মত ঔষধ ও পথ্য রোগীকে সেবন করাইতে হয়। **ডাক্তারের নির্দেশ অবহেলা করিয়া রোগীকে কোনও ঔষধ বা পথ্য নিজেদের ইচ্ছামত দেওয়া উচিত নয়। রোগীর শারীরিক কোনও অস্থিরতা প্রকাশ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দিতে হয়।** চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে শুশ্রূষাকারী রোগীর সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে আগ্রহী, তাহাকে আমরা আদর্শ শুশ্রূষাকারী হিসাবে গণ্য করিব।

(৪) **রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য :** রোগীর পারিপার্শ্বিক বলিতে রোগী-কক্ষ, আসবাবপত্র, রোগীর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, বিছানাপত্র প্রভৃতিকে বুঝায়। রোগী-কক্ষটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য। রোগীর মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিলেই চলিবে না, উহার সাজ-সজ্জার প্রতিও শুশ্রূষাকারীর লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। রোগীর ঘরে **রঙীন পর্দা, পুষ্পবিন্যাস ও দেওয়ালে চিত্র সন্নিবেশ করিয়া** কক্ষটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা যাইতে পারে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে রোগী-কক্ষটি যেন আবার প্রসাধন করিতে গিয়া আসবাব-পত্রের বাহুল্যে ভারাক্রান্ত হইয়া না পড়ে। রোগীর কক্ষে যাহাতে **সূর্যকিরণ ও বায়ুর অভাব না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।** রোগীর বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় প্রতিদিনই সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। **জীবাণুনাশক ঔষধের সাহায্যে রোগীর ঘর পরিষ্কার করিতে হয়।** রোগীর ব্যবহৃত বেডপ্যান, ইউরিন্যাল, পিকদানী ও অন্যান্য বাসনপত্র ধুইয়া মাজিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। রোগীর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতেও পরিচ্ছন্নতা ও উপযোগিতার প্রতি শুশ্রূষাকারীর লক্ষ্য রাখিতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোগী-কক্ষ, কক্ষনির্বাচন ও ব্যবস্থা

রোগী-কক্ষের প্রয়োজনীয়তা

গৃহে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে উহার জন্য একটি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। পরিবারের অন্যান্য পরিজনের সহিত রোগীকে একই ঘরে রাখিলে রোগীর শুশ্রূষার ব্যাঘাত ঘটে এবং **রোগের জীবাণু রোগীর দেহ হইতে অন্য দেহে ছড়াইয়া পড়ে। রোগীর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও রোগীর একখানি স্বতন্ত্র কক্ষের প্রয়োজন** আছে।

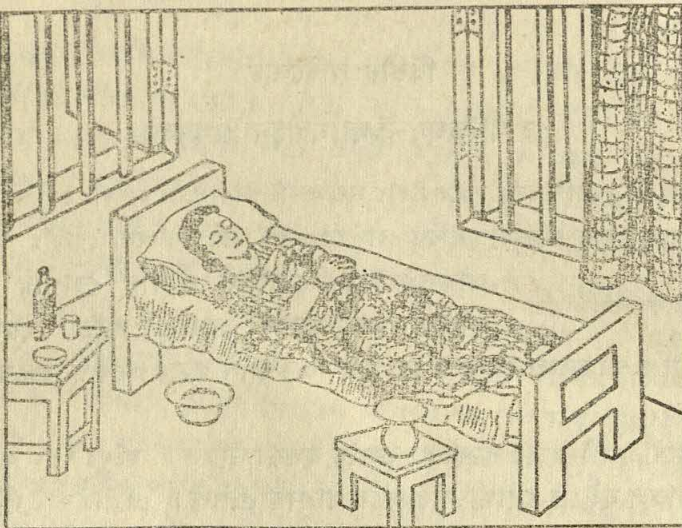
রোগীকক্ষ নির্বাচন

রোগী-কক্ষটি বাড়ীর **সর্ব্বোচ্চ তলায় হওয়া উচিত।** যতদূর সম্ভব বাইরের **কোলাহল হইতে রোগী-কক্ষ দূরে থাকাই প্রশস্ত।** রোগীর ঘরটি **দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী, বা দক্ষিণ-পূর্ব মুখী হইলে ভাল হয়।** ইহাতে আলো-হাওয়া সহজেই রোগীর গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। রোগীকক্ষ যথেষ্ট বড় না হইলে ঘরটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিচার করিলে **রোগী কক্ষটির মাপ হওয়া উচিত ১০ ফুট দৈর্ঘ্য, ১০ ফুট চওড়া এবং অন্ততঃ ১০ ফুট উচ্চ।** রোগীর ঘরে যথেষ্ট **রুজু রুজু জানালা** ও দরজা থাকা উচিত। **ভেন্টিলেটার বা বায়ুসঞ্চালনের** ব্যবস্থাও রোগী-কক্ষে থাকা উচিত।

রোগী-কক্ষের সুব্যবস্থা

রোগীকক্ষে সুব্যবস্থার জন্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব-পত্র স্থান না পায়। রোগীর উপযোগী একখানা খাট দেওয়াল হইতে কিছু দূরে সন্নিবেশ করিতে হয়। বাসনপত্র ও খাদ্য দ্রব্য রাখার জন্য একটি **ছোট আলমারী কক্ষের একপাশে থাকিলে ভাল হয়। একটি ছোট টেবিল ও চেয়ার রোগীর ঘরে না থাকিলে সুব্যবস্থা সম্ভব হয় না।** টেবিলে একটি ছোট ঘড়ি, রোগীর চার্ট লিখিবার খাতা, কালি, কলম, ঔষধ-পত্রাদি, থার্মোমিটার প্রভৃতি রাখার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসক আসিলে বসিবার জন্য চেয়ারের প্রয়োজন হয়। রোগীর ঘরের **দরজা-জানালায় বড় বড় পর্দা থাকা সমীচীন।** প্রয়োজনে **পর্দাগুলি কখনও গুটাইয়া**

রাখা হইবে কখনও বা মেলিয়া দেওয়া হইবে। **বাইরের দমকা হাওয়া যাহাতে**



রোগীকক্ষ

রোগীর গায়ে না লাগে সেইজন্য দরজায় ভারী পর্দা থাকা আবশ্যক।

রোগী-কক্ষের প্রসাধন

রোগীর ঘরটিতে যাহাতে বিষণ্ণতার ভাব ফুটিয়া না ওঠে সেইজন্য **কিছু পুষ্প-বিন্যাসের প্রয়োজন।** দেওয়ালগুলিও শুধু শূন্য রাখিলে রোগীর মন স্বভাবতঃ বিমর্ষ হইয়া উঠিবে। কোনও উত্তেজক ছবি না টাঙ্গাইয়া দেওয়ালে দু একটি ক্যালেণ্ডার এবং **প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কয়েকখানি রঙ্গীন ছবি সন্নিবেশ করা যাইতে পারে।**

পৃথক একটি প্রকোষ্ঠের প্রয়োজনীয়তা

রোগীর সাজ-সরঞ্জামের অভাব নাই ; সুতরাং এই সরঞ্জামগুলি পার্শ্ববর্তী কোনও প্রকোষ্ঠে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। রোগীকক্ষ-সংলগ্ন কোনও প্রকোষ্ঠ না থাকিলে **ঐ ঘরের এক পাশে পর্দা টানাইয়া জিনিসপত্র রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।** রোগীর **পিকদানী, গামলা, মগ, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, ডুশ, রোগীর পানীয় জল**—এই সকল সরঞ্জাম এই স্থানে রাখা যাইতে পারে। রোগীর বেডপ্যান ও ইউরিন্যাল জীবাণুনাশক কোনও ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বাইরে কোনও স্থানে রাখিতে হয়। প্রতিদিন ঐগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে ভাল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোগী বিছানায় থাকাকালীন অবস্থায় শয্যা তৈরী এবং রোগী ছাড়া শয্যা তৈরী

রোগীর শয্যা তৈরী করিবার সময় শুশ্রূষাকারীর প্রধান দৃষ্টি থাকিবে সুন্দর বিছানা প্রস্তুত করিয়া কিভাবে রোগীকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম দেওয়া যায়। অপরের সাহায্য ছাড়া রোগীর বিছানার পারিপাট্য সৃষ্টি করা কষ্টকর হইয়া ওঠে। **শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছানা তৈরী করার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হইবে।** রোগীকে অযথা নড়াচড়া করাইয়া যাহাতে কষ্ট দেওয়া না হয় সেইজন্য নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত কাজটি করিতে হয়।

শয্যা রচনার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির প্রয়োজন হয়।

(১) **চাদরযুক্ত শক্ত গদী।** চাদরটি গদীর চারিদিকে মুড়িয়া দেওয়া হইবে।

(২) গদীর নীচে পাতিবার জন্য **একটি কম্বল।**

(৩) একটি ছোট **ম্যাকিনটোস চাদর।** চাদরটি আড়াআড়ি ভাবে রাখা হইবে এবং বালিশের ঠিক নীচ হইতে রোগীর হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে।

(৪) **বদল করিবার চাদর।** ইহা নীচের চাদর এবং গদী রক্ষা করিবার জন্য এবং রোগীকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ময়লা লাগিলে সহজেই বদলাইতে পারা যায়। একটি সাধারণ চাদর লম্বালম্বি ভাবে ভাঁজ করিয়া ইহা করা যায়। ইহা দ্বারা ম্যাকিনটোসটি সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে। বিছানার এক পার্শ্বে চাদরটি গুঁজিয়া দিতে হইবে। চাদরটি পাতিয়া বাকী অংশ মুড়িয়া দিয়া অপর পার্শ্বে বিছানার নীচে গুঁজিয়া দিতে হইবে।

রোগীর বিছানা তৈরীর পদ্ধতি

(৫) **ওয়াড় সহ দুইটি বালিশ**—দরজার দিকে সম্মুখীন করিয়া রাখিতে হইবে।

(৬) **রোগীর গায়ের উপরের চাদর।** এই চাদর রোগী শুইবার পর নিম্ন দিকে ভালভাবে গোঁজা হইবে এবং পার্শ্বদেশ অর্দ্ধেক গোঁজা হইবে।

(৭) **দুইটি হালকা এবং গরম কম্বল।** এইগুলির উপরিভাগ বালিশের অর্দ্ধেক পর্যন্ত রাখা হইবে, যাহাতে সেগুলি গলা পর্যন্ত ঢাকিয়া দেওয়া যায়।

প্রত্যেকটি বিভিন্নভাবে বিছানার তলদেশে গোঁজা হইবে এবং পার্শ্বদেশ অর্ধেক পর্যন্ত যাইবে কিন্তু এরূপভাবে আঁটা হইবে না যাহাতে রোগীর স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

শয্যাগত রোগীর বেলায় উপরোক্ত প্রণালীতে বিছানা তৈরী সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীকে অপর কোনও ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়।

(১) রোগীর পরিত্যক্ত ময়লা কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য একটি বড় পাত্র রাখা হইবে।

(২) বিছানা তৈরী করিবার পূর্বে দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া লইতে হইবে।

(৩) শয্যার নিকটে পায়ের দিকে দুইটি চেয়ার পিঠাপিঠি করিয়া রাখা হইবে।

(৪) প্রথমে বিছানার চাদর তুলিয়া উপরের বালিশটা সরাইয়া রাখা হইবে।

শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছানা তৈরী করা

(৫) সমস্ত চাদর সরাইবার পর রোগীকে একটি কম্বল অথবা চাদর দিয়া ঢাকা হইবে। বিছানার চাদরগুলি শৃঙ্খলাভাবে সরাইয়া রাখা হইবে। প্রত্যেকটি জিনিস দুই ভাঁজ করিয়া চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে রাখিতে হইবে যেন চাদর প্রভৃতির ঝুলানো অংশ চেয়ারের আসনে গিয়া পড়ে।

(৬) রোগীর পা উঁচু করিয়া বিছানার নীচের ভাগে কোনও খাবারের টুকরা বা আবর্জনা পড়িয়া থাকিলে ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

(৭) নীচের চাদরটার তলদেশ দৃঢ়ভাবে টানিয়া লইয়া গুজিয়া দিতে হইবে।

(৮) শুশ্রূষাকারী বিছানার পাশে বালিশটি লইয়া যাইবে যেখানে বদলাইবার চাদরের ছোট দিকটা আছে এবং রোগীকে গড়াইয়া তাহার পাশে লইয়া আসিবে যাহাতে সে শুশ্রূষাকারীর দিকে মুখ করিয়া শুইতে পারে। শুশ্রূষাকারী এইভাবে রোগীকে রক্ষা করিবে।

(৯) শুশ্রূষাকারীর সাহায্যকারী নীচের দিকের চাদরটা শক্তভাবে তাহার দিকে টানিয়া গুজিয়া দিবে। ইহার পর সে বদলাইবার চাদরটার শেষ অংশ গুজিয়া দিবে এবং অবশিষ্টাংশ রোগীর গায়ে জড়াইয়া দিবে যাহাতে তাহার তলার দিক টানিয়া লইতে পারা যায়।

(১০) এই সময় শুশ্রূষাকারীর নিজের রোগীকে ধীরে ধীরে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিতে হইবে এবং সহায়ক শুশ্রূষাকারী তাহার নিকটবর্তী বিছানার অংশে একটি বালিশ সজ্জিত করিয়া তাহার দিকে রোগীকে গড়াইয়া দিয়া উহাকে ধরিয়া

রাখিবে। শুশ্রূষাকারী তখন তাহার পার্শ্বের বিছানার অংশটি করিয়া লইবে যেমন অপর শুশ্রূষাকারী করিয়াছে, সেইরূপে বদলাইবার চাদরখানি টানিয়া লইয়া বেশ শক্তভাবে গুজিয়া দিবে।

(১১) যতক্ষণ পর্যন্ত একজন শুশ্রূষাকারী বালিশগুলি ঠিক করিয়া রাখিয়া না দিবে ততক্ষণ **অপর শুশ্রূষাকারীর রোগীকে ধরিয়া রাখিতে হইবে।**

(১২) রোগীর সুবিধামত তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া বিছানার উপরের চাদরগুলি বদলাইয়া দিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহ পরিচালনা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য

(ক) মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় যত্ন

বর্তমানে আমাদের দেশে **দশ হাজারের মত মাতৃসদন এবং শিশুসদন স্থাপিত হইয়াছে।** ইহা ছাড়া সুচিকিৎসার জন্য যাহাতে উন্নত ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়, সেজন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। **বহু গবেষণাগার ও ঔষধের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে।** অপর পক্ষে যাহাতে জাল ঔষধ বিক্রয় না হয়, সেজন্য আইন করিয়া কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে। **শিশু-মৃত্যুর হারও পূর্বাপেক্ষা কম।** কিন্তু জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে জন সাধারণকে আরও সচেতন হইতে হইবে। **অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার** এখনও সাধারণ লোককে বিপথে চালিত করিতেছে। এ বিষয়ে শিক্ষার ও প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন। শিশু-মৃত্যুর ব্যাপকতার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার রহিয়াছে। **ভুতে পাওয়া, পেঁচোয় পাওয়া** ইত্যাদি মনে করিয়া পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা সময়মত শিশুর চিকিৎসা করায় না; ফলে শিশু-মৃত্যু ঘটে। অনেকে আবার শিশু ও মাতাকে হাসপাতালে পাঠাইতে ভয় পায়, ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারায়।

শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন হইতেই মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতিসাধনের প্রতি সচেতন হইতে হয়। মায়ের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর একটি সুন্দর সুস্থ শিশুর জন্মলাভ নির্ভর করে। শিশু জন্মাইবার পূর্বে মায়ের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে **প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন** জাতীয় খাদ্য থাকা

প্রয়োজন। ইহা ছাড়া মায়ের খাদ্যে এই সময় অন্ততঃপক্ষে ২৫০০ হাজার গ্রাম ক্যালোরী থাকা প্রয়োজন। **মায়ের খাদ্য হইতেই শিশুর পুষ্টি ও গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়।** প্রত্যেক মাতার এই সময় সকল রকমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মনের প্রফুল্লতাও বজায় থাকে। মাতার গর্ভকালীন অবস্থায় **সামান্য হাটা-চলা, হাল্কা কাজ-কর্মের ভিতর দিয়া তাহাকে সামান্য পরিশ্রম করিতে হইবে** কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কোনও **ভারী কাজ করা, যানবাহনে চড়িয়া বেশি যাতায়াত করা এগুলো একেবারে বর্জন করিতে** হইবে। এই সময় প্রসূতি যাহাতে কোনও রোগে আক্রান্ত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। বাড়ীতে কোনও সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগী থাকিলে প্রসূতিকে তাহাদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে হইবে। **শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মাতাকে মাসে দুইবার করিয়া, প্রয়োজনবোধে সপ্তাহে একবার করিয়া চিকিৎসকের অধীনে থাকিতে হইবে।** ৩ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাতার **ওজন লওয়া, প্রস্রাব পরীক্ষা রক্তের চাপ,** পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে হইবে। প্রসূতির খাদ্য-তালিকা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। শিশু জন্মের পরেও যতদিন পর্যন্ত শিশুর মাতৃদুগ্ধই একমাত্র খাদ্য ততদিন পর্যন্ত মায়ের খাদ্যের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি শিশুর মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া মায়ের খাদ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিবে। শিশুর জন্মের পূর্বে যেখানে মায়ের খাদ্যে ক্যালোরি হওয়া উচিত ২৫০০ গ্রাম, সেখানে শিশুর জন্মের পর মায়ের খাদ্যে ক্যালোরির মাত্রা হইবে **৩০০০ গ্রাম ক্যালোরি।** এই ভাবে শিশু মাতৃদুগ্ধ হইতে তাহার উপযুক্ত ক্যালোরি গ্রহণ করিতে পারিবে। মায়ের খাদ্য কম হইলে শিশুরও যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টি না হইয়া সে রুগ্ন হইয়া পড়িবে।

মায়ের খাদ্য

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্বরকমের যত্নের ব্যবস্থা করিতে হয়। **খাওয়ানো, স্নান করানো, উপযুক্ত পোশাক পরিধান করানো, সুনিদ্রার পরিবেশ সৃষ্টি করা** সমস্তই পরিবারের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। শিশুকে অবহেলা না করিয়া তাহার প্রতিটি কাজে গুরুত্ব দিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। শিশু-পালনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখিলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটে। শিশুর ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তরে উহার শারীরিক অসুস্থতা

শিশুর যত্ন

লক্ষণ পায়। সাধারণতঃ শিশুদের ভিতর জ্বর ও পেট খারাপের লক্ষণ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। যে কোনও রোগই হউক না কেন **রোগের প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসকের অধীনে রাখিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে**। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর প্রতি মাসে তাহার ওজন লইয়া তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি অবনতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(খ) **শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যত্ন :** বর্তমানে আমাদের দেশে শিশুর মৃত্যুর হার খুবই কম। বহু সংখ্যক মাতৃ সদন এবং শিশু সদন সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হওয়াতে বহু প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুর নানাপ্রকার মারাত্মক অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইতেছে। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এখনও জনসাধারণকে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে বিপথে চালিত করিতেছে। সহরের তুলনায় গ্রামের পরিস্থিতি এখনও খুব খারাপ তাই আধুনিক সভ্য সমাজে বাস করিয়াও কেবলমাত্র অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বশতঃ উপযুক্ত পরিচর্যা ও খাদ্যাদির অভাবে বহু প্রসূতির মৃত্যু ঘটিতেছে। **শিশু মৃত্যুর ব্যাপকতার মূলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার রহিয়াছে।** অনেকে **ভুতে পাওয়া, পেঁচোয় পাওয়া** ইত্যাদি মনে করিয়া সময় মত শিশুর চিকিৎসা করায় না ফলে শিশুর মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। পল্লীগ্রামে অনেক প্রসূতিকে হাসপাতালে না পাঠাইয়া বাড়ীতে রাখা হয়। অশিক্ষিত ধাত্রী দ্বারা প্রসব কার্য করানো হয় ফলে অনেক দোষত্রুটি থাকার জন্য প্রসূতির মৃত্যু ঘটে।

শিশু পালনে অজ্ঞতা

শিশু যখন মাতৃগর্ভে আসে তখন হইতেই শিশু এবং মাতা উভয়ের মঙ্গলের জন্য মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া একান্ত আবশ্যক। মায়ের স্নান **আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম** প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে পরিবারের প্রত্যেকের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। গৃহিনী তখন পরিবারে অতিথির স্থান গ্রহণ করিবে। শিশু জন্মাইবার পূর্বে মায়ের খাদ্যে **২৫০০ গ্রাম** ক্যালেরি থাকা প্রয়োজন। স্বাভাবিক অবস্থায় মায়ের খাদ্যে যেখানে ২০০০ ক্যালোরি হইলেই চলে সেখানে শিশুর জন্য বাড়তি ৫০০ গ্রাম ক্যালোরি মায়ের খাদ্যে থাকিতে হইবে। **ভাত, রুটি, দুধ, মাছ, ডিম, মাখন, ফল** ইত্যাদি খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পরিবেশন করিতে পারিলে এই বাড়তি খাদ্যের অভাব পূরণ করা যাইবে। শিশুর **দন্ত, অস্থি ও চর্মের সুস্থতার** জন্য মায়ের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে **প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাম, লৌহ ও ভিটামিনের** প্রয়োজন। শিশু মাতৃগর্ভে থাকা কালীন অবস্থায় মায়ের হজম শক্তি কমিয়া যায় সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে সমস্ত খাদ্যই যেন লঘুপাক হয়।

শিশু জন্মাইবার পূর্বে মায়ের খাদ্য

খাদ্য হজম করিতে না পারিলে মাতা এবং শিশু উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর, উপরন্তু হজমের অভাবে শিশুর দেহও পরিপুষ্ট হইতে পারিবে না। **খাদ্য হজমের জন্য এবং ক্লেদ নিঃসরণের জন্য মায়ের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে জলীয় খাদ্য থাকা চাই।** ইহা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা মাতা এই সময় অনেক বেশী জল পান করিবে। মাতার খাদ্য গ্রহণের সময় ও বারের প্রতিও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গর্ভবতী মায়ের উপযুক্ত বিশ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব প্রথমেই বলিতে হয় পরিশ্রম ব্যতীত একটানা শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করা গর্ভবতী মায়ের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। **সামান্য হাটা চলা হাল্কা কাজ কর্মের ভিতর দিয়া দৈনিক কিছু অঙ্গচালনার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।** ইহাতে গর্ভস্থ শিশুর সবল ও স্বাস্থ্যবান হয়। শিশু জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে মাতার শারীরিক কষ্টও ইহাতে অনেক লাঘব হয়। সামান্য পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তাকে উপলক্ষ্য করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে গর্ভকালীন অবস্থায় মাতা যেন সিঁড়ি দিয়া ওঠা নামা না করেন। বাস, ট্রেন, রিক্সায় বেশী ঘোরাফেরা না করেন এবং ভারী কোনও জিনিষ উত্তোলন বা বহন না করেন। ইহাতে অনেক সময় গর্ভস্থ ভ্রূন নষ্ট হইয়া গর্ভপাত ঘটে ; ইহা অত্যন্ত বিপদজ্জনক অবস্থা। আবার গর্ভাবস্থার শেষের দিকে মাতার এই সকল অসাবধানতার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুর মৃত্যু ঘটে। **মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিনীদের গর্ভকালীন অবস্থায় সাংসারিক হাল্কা কাজ কর্মের ভিতর দিয়া ব্যায়ামের কাজ হয় কিন্তু অবস্থাপন্ন পরিবারের গৃহিনীরা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমন করিয়া, ব্যাডমিণ্টন বা টেনিস খেলিয়া দৈনিক কিছু অঙ্গ চালনার ব্যবস্থা করিতে পারে।** গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজ ও অঙ্গচালনার ভেতর দিয়া পরিশ্রমের পর দৈনিক কয়েক ঘণ্টা একটানা বিশ্রামের প্রয়োজন। সুনিদ্রার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পরিবারের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে **গর্ভবতী মাতা যেন প্রতিদিন রাত্রে নির্দিষ্ট সময় ঘুমাইবার সুযোগ রাত্রে পায়। ভাল ঘুম না হইলে ডাক্তরের পরামর্শ নেওয়া উচিত।**

কাজের মাধ্যমে ব্যায়াম

একটি সুস্থ মাতা সুস্থ শিশুর জন্ম দান করিতে সক্ষম হয়। মাতার নিজের এবং শিশুর মঙ্গলের জন্য মাতাকে যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। প্রতিদিন স্নান করিয়া দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। শীতের সময় সামান্য উষ্ণ জলে স্নান করা বাঞ্ছনীয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রসূতির যাহাতে সর্দি কাশি বা জ্বর না হয় সে দিকে বিশেষ সতর্ক লইতে হয়। মনে রাখিতে হইবে মায়ের যে কোনও প্রকারের

ক্ষতি উহা শিশুর পক্ষেও সমান ক্ষতিকর। কেবলমাত্র দৈহিক পরিচ্ছন্নতা নহে, মনের শুচিতাও একান্তভাবে প্রয়োজন। **গর্ভবতী মাতার মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।** কোন খারাপ দৃশ্য বা কোনও ভীতপ্রদ দৃশ্যের সম্মুখীন না হইয়া আনন্দ দায়ক ও কোনও প্রীতিসূচক পরিবেশের ভিতর ভাবী মাতাকে রাখিতে হয়। মানসিক কোনও অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হইলে সন্তানের প্রতি উহা বিষময় ফল হইয়া ওঠে। **সৎ চিন্তা, সৎ আলোচনা ও সৎ পরিবেশের ভিতর কাটাইতে পারিলে মাতাও একটি সুন্দর সুস্থ ও সবল শিশুর জন্ম দান করিতে সক্ষম হইবে।**

সুস্থ পরিবেশে সুস্থ শিশু

বাড়ীর পরিবেশে ও মাতার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পালন ছাড়াও গর্ভকালীন অবস্থায় ৯।১০ মাস চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞের অধীনে থাকিতে হয়। তৃতীয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রসূতির ডাক্তারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। চিকিৎসকের নির্দিষ্ট তারিখে প্রসূতির **প্রস্রাব পরীক্ষা, দেহের ওজন লওয়া রক্তের চাপ পরীক্ষা করা** মাঝে মাঝে হওয়া উচিত। শারীরিক অবস্থার কোনও অবনতি প্রকাশ পাইলে অবিলম্বে চিকিৎসকের অধীনে উহার নির্দেশমত থাকিতে হইবে।

যেখানে হাসপাতাল নাই সেই সব ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে শিশুর জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য একটি আতুড় ঘরের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আগেকার দিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী রমণীদের ব্যবস্থাপনায় অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার একটি আঁতুর ঘরে সন্তান প্রসব করিয়া অনেক মাতা ও শিশুর মৃত্যুর ঘটনা বিরল নহে। মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আতুড় ঘরটি হওয়া উচিত **আলো বাতাস যুক্ত শুকনা ও খটখটে।** শিশুর পোশাক পরিচ্ছদ, বিছানা পত্র, মশারী যাবতীয় সরঞ্জামাদি সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। শিশু জন্মিবার পর দশ মাস পর্যন্ত উহার প্রধান খাদ্য মাতৃ দুগ্ধ। উপযুক্ত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ না পাইলে শিশু দুর্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং শিশুর জন্মগ্রহণ করার পরও মায়ের খাদ্যের প্রতি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। মায়ের খাদ্যে এই সময় ৩০০০ **ক্যালোরি** থাকা উচিত। **মাতৃদুগ্ধ হইতে উপযুক্ত ক্যালোরি গ্রহণ করিয়া শিশুর বৃদ্ধি সাধন সম্পন্ন হয়।** শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বের মত মায়ের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ও ভিটামিন প্রভৃতি উপাদান থাকা একান্ত প্রয়োজন। **শিশুর অস্থিগঠন, দন্ত-গঠন চর্মের সুস্থতা,**

উপযুক্ত আতুড় ঘরের প্রয়োজনীয়তা

শিশু জন্মাইবার পর মায়ের খাদ্য

রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা এ সকলই মাতৃদুগ্ধের উপর নির্ভর করে। শিশু মাতৃদুগ্ধ ছাড়িবার পর মায়ের খাদ্যে অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান-গুলির আর প্রয়োজন হয় না অধিকন্তু এই বাড়তি ক্যালোরি মায়ের খাদ্যে থাকিলে দেহে মেদ বৃদ্ধি হইবে।

শিশুর কয়েক মাস পর্যন্ত তাহার মাতৃদুগ্ধই একমাত্র খাদ্য। সুতরাং তাহার পুষ্টি, বৃদ্ধি তখন মায়ের খাদ্যের উপরই নির্ভর করে। মাতৃদুগ্ধ ছাড়িবার পর উপযুক্ত পরিমাণে গো-দুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাকে **ফলের রস, ডিমের কুসুম, পাউরুটি, আলুসিদ্ধ, বিস্কুট** ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শক্ত খাদ্যদিতে হইবে। খাদ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বারে শিশুকে বিভিন্ন খাদ্য খাওয়াইতে হয়। **শিশু বোতলে দুধ খাইলে উহা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়।** অপরিচ্ছন্ন বোতল ব্যবহার করিলে শিশু নানাবিধ পেটের পীড়ায় ভুগিতে থাকিবে। শিশুর পেটের কোনও রোগ দেখা দিলে কোনও রকম অবহেলা না করিয়া চিকিৎসা করাইতে হয়। শিশুর কোনও রোগ দেখা দিলে পরিবারের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে কি কি কারণে শিশুর রোগ দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত কারণ বুঝিতে পারিলে সেই কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। **শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির হার কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে উহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট তারিখে দেহের ওজন লওয়া আবশ্যক।** খাদ্য ব্যতীত নিদ্রাও শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক। শিশু যাহাতে ভাল ঘুমাইতে পারে সেজন্য বাড়ীর প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখিতে হয়। শিশুর ঘুমের সময় অযথা তাহাকে সজাগ রাখিয়া আদর করার ভিতর কোনও যুক্তি নাই। তাহা ছাড়া শিশুর ঘুমের জন্য সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। কোনও রকম জোর আওয়াজ, চীৎকার, জোরে জোরে কথাবার্তা শিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে। এই সকল বিষয় শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপযুক্ত যত্নের প্রয়োজন হয়। শিশু অবস্থায়, তাহার সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুই সে বুঝাইতে পারে না। স্নান, খাওয়া, নিদ্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান এ সকল কাজই তাহাকে মায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। **শিশু জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং ভবিষ্যৎ জাতিকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব একান্ত ভাবে মায়েদের উপর।** দেহ এবং মনের দিক হইতে একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ শিশু গড়িয়া তুলিতে হইলে শৈশব হইতেই উহার উপযুক্ত যত্নের প্রয়োজন। পরিবারে শিশুকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া উচিত যাহাতে সে শৈশব হইতেই তাহার নিরাপত্তা বোধ উপলব্ধি করিতে পারে। নিরাপত্তার অনুভূতি ব্যতীত মানুষ

শিশুর খাদ্য

শিশুর ঘুমের উপযুক্ত পরিবেশ

আদর্শ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। **শিশুর সমস্ত কাজের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা না হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে।** শিশুর পোশাক নির্বাচনের সময় তাহার স্বাস্থ্যের হানি যাহাতে না ঘটে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই কারণে কোনও রকম আঁট পোশাক এবং চর্মের ক্ষতিকর এরূপ কোনও পোশাক শিশুকে পরিধান করাইতে হয় না। **ঋতু অনুযায়ী শিশুর পোশাক পরিচ্ছদ হওয়া উচিত।** উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদের অভাবে যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি, কাশি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। সে সব শিশুর ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকে তাহাদের চিকিৎসকের অধীনে রাখিয়া ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিতে হয়। শৈশবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার শরীর কোনদিনই সবল হইতে পারে না। দুর্বল শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয় এবং হাসিখুশীর পরিবর্তে তাহাকে সর্বদা বিষন্ন দেখা যায়। এই সকল চিন্তা করিয়া শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। শিশুর মল মূত্র যাহাতে ভালভাবে নিঃসরণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিশুর প্রস্রাবের বার ও মাত্রা কমিয়া গেলে বারে বারে জলপান করাইতে হইবে। উহাতে কাজ না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া তাহার নির্দেশমত কাজ করিতে হইবে। শিশু কথা বলিতে পারে না, সুতরাং তাহার শারীরিক নিরাপত্তার জন্য সকল রকম সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। ডিপথেরিয়া রোগে বহু শিশুর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু বর্তমানে এই রোগ প্রতিরোধ করার ইনজেকসন বাহির হইয়াছে। শিশুকে ৩ মাস বয়সেই এই ইনজেকসন দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে শিশু এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইবে না। শিশুকে কয়েকমাস বয়সের ভিতর বসন্তের টিকা লওয়ারও ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুকে যাহাতে অপুষ্টি জনিত রোগে আক্রান্ত হইতে না হয় সেজন্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তাহার বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। শিশুর খাবারের সঙ্গে কডলিভার অয়েল অথবা অ্যাবডেক এবং অ্যাডিক্সলিন প্রভৃতি ভিটামিন জাতীয় ঔষধ খাওয়াইলে ভাল হয়। এই সকল রিকেট প্রতিরোধকারী ঔষধে শিশুর অস্থিগুলি পুষ্ট হইবে অপর দিকে মাঝেমাঝে সর্দি কাশির আক্রমণ হইতেও শিশুকে রক্ষা করা যাইবে। শিশুর শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য শিশুর দেহে তেল মাখাইয়া রৌদ্রে কিছুক্ষণ শোওয়াইয়া রাখিতে পারিলে খুব ভাল হয়। **সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সেবন করাইলে শিশুর রিকেট রোগ নিবারণের সাহায্য করে;** তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যেন দুপুরের রৌদ্র শিশুর

শিশুর উপযুক্ত পোশাক

রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা

গায় না লাগে। শিশুর দেহের কতকগুলি গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের অভাব ঘটিলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায় ঘটে। **থাইরয়েড গ্রন্থির ঠিকভাবে অন্তঃক্ষরণ না হইলে শিশুর দৈহিকবৃদ্ধি সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। এই গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের ফলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি লবণ জাতীয় উপাদান নিয়ন্ত্রিত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত থাইরক্সিনশিশুর দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য।** শিশুকে লালন পালন করিবার সময় উহার প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই মায়ের একমাত্র কাজ নয়। কতকগুলি অসতর্কতার মূলে অনেক সময় শিশু জীবনের তরে পঙ্গু হইয়া থাকে। শিশু যখন নিজে নিজে সরিতে শেখে তখন তাহাকে কখনও একা অবস্থায় খাটেরউপর শোওয়াইতে হয় না। খাট হইতে পড়িয়া গেলে মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় আবার অনেক সময়মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা বিকলাঙ্গ হইতেও দেখা যায়। শিশু প্রতিপালনে এই রূপ সাধারণ বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে অনেক সময় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

শিশুর অনাক্রম্যতা ও দাঁতের যত্ন: বয়স্কদের অপেক্ষা শিশুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেক কম। শিশু যাহাতে বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইতে না পারে, সেইজন্য কৃত্রিম উপায়ে তাহার দেহে অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা করিতে হয়। অনাক্রম্যতার জন্য যে সমস্ত টিকা এবং ইনজেকসনের প্রয়োজন তাহা শিশুকে এক বৎসর বয়সের পূর্বে দিতে পারিলেই ভাল হয়। সমস্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য শিশুকে টিকা দিলে কয়েক দিনের ভিতর টিকা উঠিয়া যায় তবে এই সময় শিশু কয়েকদিন অসুস্থ থাকে। জ্বর, সর্দি কাশি, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এ অবস্থায় শিশুকে আরামে রাখিতে হয় এবং বারবার মাথা ধোওয়াইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। **শিশুর দেহে কোনও প্রকার খোস পাঁচড়া থাকিলে এবং পেটের রোগ থাকিলে উহা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত টিকা নেওয়া উচিত হয় না। ইহাতে অনেক সময় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।**

টিকা লওয়ার সাবধানতা

ছোট শিশুদের ডিপথেরিয়া একটি মারাত্মক রোগ। শিশুর ৯ মাস বয়সের পূর্বেই এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ইনজেকসন লইতে হয়। **ডিপথেরিয়ার জীবাণু হইতে তৈয়ারী ডিপথেরিয়া টক্সাইড নামক একপ্রকার ঔষধ ইনজেকসনের ভিতর দিয়া শিশুর দেহে প্রবেশ করানো হয়।** সাধারণতঃ এই ইনজেকসন ১ মাস অন্তর তিনবার দিতে হয়। কয়েক বৎসর পরেও এই ইনজেকসন

পুনরায় দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা তাহা চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সেই মত ব্যবস্থা করিতে হয়।

শিশু কোনও আঘাত প্রাপ্ত হইলে অনেক সময় তাহার দেহের কোনও স্থান হয়তো কাটিয়া যায়। এই কাটা ক্ষত হইতে **ধনুষ্টঙ্কার** রোগ হইতে পারে। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য **টিটেনাস অ্যান্টিটক্সিন ইনজেকসন দেওয়া হয়।** কিন্তু ইহার একটা অসুবিধা আছে এই যে অনেক সময় এই রোগ প্রতিরোধকারী ঔষধটির কার্যকরী ক্ষমতা কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহ বজায় থাকে; সুতরাং বর্তমানে চিকিৎসকেরা এই রোগের অনাক্রম্যতার জন্য **ডিপথেরিয়া টক্সঅয়েডের মত** নতুন একটা ঔষধ ইনজেকসনের জন্য আবিষ্কার করিয়াছেন। **ইহা ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু হইতে তৈরী।** বাইরে কোথাও কাটিয়া রক্তপাত ঘটিলে অধুনা চিকিৎসকেরা যে কোনও বয়সেই এই টিটেনাস টক্সয়েড ইনজেকসন দিয়া থাকেন। কিন্তু **ডিপথেরিয়া এবং হুপিংকাশির সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধের এই ইনজেকসনটি দিতে হইলে কেবলমাত্র শিশু বয়সেই চলে। ইহাকে ট্রিপল ইনজেকসন বলে। হুপিং কাসি, ডিপথেরিয়া এবং ধনুষ্টঙ্কার এই তিনটি রোগ প্রতিরোধের জন্য একই সঙ্গে শিশুকে ইনজেকসন দেওয়া হয়।** এক মাস অন্তর তিনবার এই ইনজেকসন শিশুকে দেওয়াইতে হয়। এই সকল ইনজেকসন দেওয়ার প্রত্যেকটা তারিখ নোটবুকে লিখিয়া রাখিতে হয়। ভবিষ্যতে কোনও দুর্ঘটনায় শিশু আহত হইলে ডাক্তারকে ইনজেকসনের তারিখ জানাইতে হইবে। প্রয়োজন বোধে ডাক্তার পুনরায় ঐ ইনজেকসন দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করিবে।

বয়স্কদের মত শিশুদেরও পক্ষাঘাত রোগ হয়। এই রোগকে **পোলিও মাইল্যাটিস বলে।** সাধারণতঃ খুব বেশী জ্বর অথবা পাতলা পায়খানা উপসর্গ লইয়া এই রোগের সূচনা দেখা দেয়। শিশু কথা বলিবার পূর্বে এবং হাঁটিতে শেখার পূর্বে এই রোগ হইলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে না। জ্বর এবং পেটখারাপ বেশী হইলে মায়েদের লক্ষ্য রাখিতে হয় শিশু ঠিকভাবে হাত পা নাড়িতেছে কিনা। প্রথম অবস্থায় ধরা পড়িলে এই রোগ আজকাল নিরাময় হইলেও বহু ক্ষেত্রে এখনও ইহা চিকিৎসায় কোনও ফল পাওয়া যায় না। বর্তমানে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য একপ্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে। **ভাইরাস জীবাণুনাশক এই ঔষধটি ইনজেকসনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ না করাইয়া এক মাস অন্তর তিনবার শিশুকে খাওয়াইয়া দিতে হয়।** এই ওর‍্যাল ভ্যাক্সিন শিশুকে হাসপাতালে নিয়া

খাওয়াইয়া আনিতে হয়। ১০/১২ বৎসর পর্যন্ত এই ঔষধ খাওয়ানো চলিতে পারে। একমাস অন্তর তিনমাস ঔষধ খাওয়াইবার পর পুনরায় চার বৎসর অন্তর অন্তর আরও দুবার ডাক্তারের নির্দেশ মত এই ঔষধটি দিতে হয়।

টাইফয়েড এবং কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে কোনও ইনজেকসন শিশুদের দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। শিশু যদি তাহার পিতামাতার সহিত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বা বাস করার উদ্দেশ্যে কোথায়ও গমন করে এবং সেখানকার পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তাহা হইলে সেইস্থানে যাইবার পূর্বে শিশুকে টাইফয়েড ও কলেরার ইনজেকসন দিবার প্রয়োজন হয়।

দাঁতের যত্ন : শিশু জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বেই ২০টি দুধে দাঁত মাড়ির নীচে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ সাত আট মাসের পূর্বে একটি দাঁতও মাড়ি হইতে বাহির হয় না। **প্রথমে নীচের পাটির মাঝের কৃন্তক দাঁত দুইটি বাহির হয়। আট নয় মাসের ভিতর উপরের মাড়িতে দুইটি কৃন্তক দাঁত বাহির হয়। দশ মাসের ভিতর উপরের মাড়িতে আরো দুইটি করিয়া কৃন্তক দাঁত বাহির হয়। ১২ হইতে ১৬ মাসে নীচে এবং উপরের মাড়িতে দুইটি করিয়া চারিটি পেষক দন্ত উঠে। ১৬ হইতে ২০ মাসে নীচ ও উপরের মাড়িতে চারিটি শ্বদন্ত বাহির হয়।** চব্বিশ হইতে ত্রিশ মাসের ভিতর উপরে ও নীচে কষের দিকে চারিটি পেষক দন্ত বাহির হয়। এইরূপে একটি শিশুর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকিলে আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যে প্রায় সমস্ত দাঁতই বাহির হয়। **দাঁত উঠিতে বেশী দেরী হইলে বুঝিতে হইবে শারীরিক কোনও অসুস্থতার জন্য শিশুর দাঁত উঠিতে দেরী হইতেছে।** এ অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে।

দাঁত উঠিবার সময় শিশুকে নানা রকম রোগে ভুগিতে দেখা যায় ; যেমন, পেটের অসুখ, জর, তড়কা ইত্যাদি। কিন্তু দাঁত উঠিবার সঙ্গে এই সকল রোগের কোনও সম্পর্ক নাই। শিশুর মাড়ি সুড়সুড় করে। সে সর্বদা কিছু চিবাইতে চায়, হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়—ইহার ফলে অনেক সময় পেট খারাপ হয়। এই সময় শিশুকে কেবলমাত্র দুধ খাওয়াইলেই চলিবে না। উহাকে শক্ত খাদ্য দিতে হইবে। **বিস্কুট, সেঁকা পাউরুটি, কলা, মুড়ি** এই খাদ্য চিবাইলে শিশু কুড়াইয়া কিছু মুখে দিবে না। শিশুর দাঁত যাহাতে ভালভাবে গঠিত হয় সেইজন্য শিশুর জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব হইতেই মায়ের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে **ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন এ, সি ও ডি-এর ব্যবস্থা রাখিতে হয়।** শিশুর জন্মগ্রহণ করিবার

পর মাতৃদুগ্ধ হইতেই সে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম পায়। ভিটামিন এ এবং সি খাওয়াইবার জন্য শিশুকে কমলালেবুর রস দিতে হয়। ভিটামিন ডি-এর অভাব পূরণের জন্য শিশুকে কডলিভার অয়েল খাওয়াইলে শিশুর দাঁত ও অস্থি ভাল-ভাবে গঠিত হয়। এই সমস্ত উপাদান ছাড়া দাঁত উঠিবার পর শিশুর খাদ্য তালিকার পরিবর্তন আবশ্যক। গোরুর দুধের সহিত অন্যান্য কঠিন খাদ্য দিনের বিভিন্ন সময়ে শিশুকে খাইতে দিতে হইবে। ভাত, আলু সিদ্ধ, পেঁপে সিদ্ধ, পাউরুটি, কলা, বিস্কুট সুজির মণ্ড, অর্ধসিদ্ধ ডিম, সন্দেশ ইত্যাদি খাদ্য শিশুর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখা আবশ্যক। এই সকল খাদ্যে একদিকে যেমন শিশুর পুষ্টির সহায়তা করিবে, অপর পক্ষে উহার দাঁতের গঠন ও স্বাস্থ্য ভাল হইবে। শিশুর দাঁত ব্যথা, দাঁতে পোকা অর্থাৎ দন্তক্ষত। মাড়ি ফোলা ইত্যাদি উপযুক্ত খাদ্যো-পাদানের অভাবে হইয়া থাকে। শিশুর দাঁত ভাল রাখিবার জন্য প্রতিদিন দাঁত, মুখ ও জিভ পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

শিশুর উপযুক্ত খাদ্য

(গ) গৃহে অসুস্থতার লক্ষণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান : সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজন লইয়া সংসার করিতে গেলে নানাপ্রকার শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হইতে হয়। গৃহকর্ত্রী যদি সুবিবেচক, বুদ্ধিমতী এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সামান্য ছোটখাটো ব্যাপারে ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হয় না। গৃহিণী তাহার সাধারণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া অনায়াসেই এই সকল রোগীদের সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন। রোগের কোনও লক্ষণ যদি নিজের জ্ঞানের বাইরে মনে হয় তাহা হইলে সে সব ক্ষেত্রে নিজে কোনও চেষ্টা না করিয়া ডাক্তারকে অবশ্যই খবর দিতে হইবে।

বেশীর ভাগ পরিবারে ছেলেমেয়েদের এবং বয়স্কদেরও মাথা ধরার রোগটা খুব প্রকটভাবে দেখা যায়। অত্যধিক গরম এবং ঠাণ্ডায় মাথা ধরে, চোখ খারাপ থাকিলে মাথা ধরে, আবার অনেক সময় কোষ্ঠ কাঠিন্যের জন্যও মাথা ধরে। সাধারণতঃ সর্দি এবং ঠাণ্ডার জন্য মাথা ধরিলে ঠাণ্ডা গরম পর পর তোয়ালে ভিজাইয়া কপালে এবং মাথায় কিছু সময় রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা এবং গরমের সংস্পর্শে জমা সর্দি তরল হইয়া নামিয়া আসিবে, ফলে মাথা ধরা দূর হইবে। কোষ্ঠ কাঠিন্যের জন্য হইলে হাল্কা জোলাপ লইতে হইবে। যে-কোনও কারণেই হউক না কেন রোগীর নীরবে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাথা ঘোরা : অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং মানসিক চিন্তায় অনেক সময় মাথা

ঘোরে। সেক্ষেত্রে পূর্ণ বিশ্রামই সুস্থ রাখার একমাত্র উপায়। পেটে গ্যাস হইলেও মাথা ঘোরে, দোকানের সীল করা সোডা ওয়াটার সীল ভাঙ্গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে ঐ জল খাওয়াইয়া দিলে কিছুক্ষণের ভিতর মাথা ঘোরা কমিয়া যায়। **মাথা ঘোরা প্রায়ই হইলে চিকিৎসকের অধীনে রোগীকে রাখিতে হইবে। রক্তের চাপ খুব কম হইলে শারীরিক দুর্বলতার জন্য এবং রক্তাল্পতার জন্যও অনেক সময় মাথা ঘোরে।** চোখে অনেক সময় অস্বস্তি দেখা দেয়। চোখ লাল হয়, সামান্য ফুলিয়া ওঠে এবং পিচুটি পড়ে। চোখের এই প্রাথমিক অবস্থায় গৃহকর্ত্রী রোগীকে সামান্য উষ্ণ জলে (জল পরিষ্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক) বরিক তুলা ভিজাইয়া চোখে সেক দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবে। তারপর চোখে এক ফোঁটা করিয়া গোলাপ জল দিয়া কিছু সময় রোগীকে চোখ বন্ধ করিয়া রাখিতে বলা হইবে। **চোখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে বা অতিরিক্ত রৌদ্রের তাপ লাগিলে, অথবা ভিতরে কোনও ঘা থাকিলে এইরূপ অবস্থা হয়।** দুই একদিনের ভিতর অবস্থার পরিবর্তন না হইলে নিজেদের খুসীমত মলম না লাগাইয়া ডাক্তারের কাছে যাইতে হইবে। কানে ব্যথা অনেক ছোট ছেলেমেয়েদের ভিতর ব্যাপকভাবে দেখা যায়। **কানে জল গেলে, খৈল বা ময়লা জমা হইয়া থাকিলে অথবা সর্দির জন্য ইউষ্টেসিয়ান নল বন্ধ থাকিলে কানে ব্যথা হয়।** অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলেও কানে ব্যথা হয়। কানে ব্যাথা হইলে গরম সেক দিলে আরাম পাওয়া যায়। আবার সর্দির জন্য হইলে নুন জলের সাহায্যে গার্গল করিলেও উপকার পাওয়া যায়। খৈল জমা হইয়া থাকিলে কোনও প্রকার খোঁচাখুঁচি না করিয়া **খাঁটি সরিষার তৈল সামান্য গরম করিয়া অথবা গ্লিসারিন সামান্য উষ্ণ করিয়া ফোঁটা কাটিয়া দুই ফোঁটা কর্ণরন্ধ্রের ভিতর দিতে পারিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।** টনসিল যাহাদের বড় তাহাদের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। সামান্য ঠাণ্ডাতেই গলা ব্যথা হইয়া যায়, এক্ষেত্রে রোগীর গলা মাফলারের সাহায্যে জড়াইয়া দিতে হইবে এবং গলায় কুলকুচার জন্য নুন জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কুলকুচা বা গার্গল দিনে কম পক্ষে চারবার করিতে হয়। ঔষধ খাওয়া অপেক্ষা এই প্রক্রিয়াটি অধিকতর উপকারী।

খাওয়া দাওয়ার গোলযোগ ঘটিলে অনেক সময় বাড়ীতে কাহারও পেট খারাপ হইতে দেখা যায়। এই সকল রোগীকে কোনও পথ্য না দিয়া কয়েকঘণ্টা পূর্ণ বিশ্রামে রাখিতে হইবে। পায়খানা বন্ধ হইলে এবং পেটের অস্বস্তি কমিয়া গেলে সরবৎ, ডাবের জল, ছানার জল ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। পেট স্বাভাবিক

হইলে কোনও সব্জী ছাড়া মাছের ঝোল ভাত দেওয়া হইবে। **পেটে কোনও রকম ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হইলে ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে।** বদহজম হইতে বমি হইলেও রোগীকে কিছু খাইতে না দিয়া বিশ্রামে রাখিতে হয়। প্রয়োজন স্থলে কেবলমাত্র তরল পথ্য দেওয়া চলিবে। বাড়ীতে কোনও বিশেষ খাদ্যের জন্য যদি কেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে। কিন্তু গৃহকর্ত্রী সচেতন থাকিবে যাহাতে ভবিষ্যতে উহাকে সেই খাদ্য ভুলক্রমে দেওয়া না হয়। **সাধারণতঃ ইলিশ মাছ, চিংড়ী মাছ, ডিম, কাঁকড়া, মাংস, কলাইর ডাল, টমেটো, গরম মসলা ইত্যাদি খাদ্য হইতে ব্যক্তি বিশেষের অ্যালার্জি হয়।** অনেক সময় বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানেও এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যে কারণেই হউক গৃহিণীর এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া রোগীর প্রতি যথেষ্ট সচেতন থাকিতে হয়।

বাড়ীতে কোনও হাঁপানী রোগী থাকিলে উহার রোগের লক্ষণ চিন্তা করিয়া গৃহকর্ত্তা তাহাকে বিশেষ যত্নে রাখার চেষ্টা করিবেন। তাহাকে যথাসম্ভব পুষ্টিকর ও তরল খাদ্য দিতে হইবে। তাহাকে কোনও রকম বিরক্ত না করিয়া উঁচু বালিশের ব্যবস্থা করিয়া যতটা সম্ভব আরাম দিতে হইবে। একবারে বেশী খাদ্য না দিয়া তাহাকে বারে বারে তরল খাদ্য দিতে হইবে। টানের প্রকোপ কমিয়া গেলে দুধ ভাত, মাছের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে। **যে কারণে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় সেই সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। রোগীকে অধিক রাত্রে কোনও পথ্য দেওয়া চলিবে না। ইহাতে তাহার হজমের ব্যাঘাত হইয়া শ্বাসকষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে।** বাড়ীতে কোনও মৃগী রোগী থাকিলে হঠাৎ অসুস্থ হইলে যাহাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বাড়ীতে **ব্লাডপ্রেসার এবং ডায়বেটিসের রোগী থাকিলে উহাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইলে সে সমস্ত রোগীর খাদ্য কখনই গুরুপাক হওয়া উচিত নয় এবং নুন ছাড়া উহাদের পথ্য তৈরী করা উচিত। ডায়বেটিস বা বহুমূত্র রোগীদেরও নুন কম খাওয়া উচিত এবং মিষ্টি একেবারেই বর্জন করা উচিত। শর্করা জাতীয় অর্থাৎ চিনি, আলু, ভাত এ সকল খাদ্যই উহাদের বর্জন করা প্রয়োজন।** ডাক্তার চিকিৎসা করে কিন্তু পথ্য নিয়ন্ত্রণ গৃহের ব্যবস্থাপনায় হওয়া উচিত।

(ঘ) **গৃহে বৃদ্ধ এবং অসমর্থের যত্ন ঃ** অনেক সময় বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী লইয়া গৃহকর্ত্রীর সংসার করিতে হয়। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন না কিন্তু

উহাদের ইহকালের সামান্য কয়েকটা দিন যদি শান্তিতে ও তৃপ্তিতে কাটাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সেটা গৃহের পক্ষেই মঙ্গল। বাড়ীর গৃহিণী যদি শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেন এবং উহাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন তাহাহইলে বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও তাহাদের ঠাকুরমা, ঠাকুর্দাকে ভালবাসিবে এবং শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। ভাল ব্যবহার না পাইলে বৃদ্ধ বয়সে উহাদের সুখ-সুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেনা। বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময় খাওয়ার রুচি থাকে না আবার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা খাদ্যের প্রতি লোভ থাকে। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত উহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি জানিয়া লইয়া সেইভাবে আহারের ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা যে কত সন্তুষ্ট হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। **বৃদ্ধ বয়সে ঠিক শিশুর মতই অবস্থা হয়। ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না। সামান্য কারণেই চটিয়া যায়, এক্ষেত্রে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হইয়া উহাদের মনোভাব বুঝিয়া লইতে হইবে।** শারীরিক ক্ষমতা, আর্থিক ক্ষমতা কিছুই প্রায় থাকে না তাই মনোবলও ভাঙ্গিয়া যায় ফলে সামান্য কারণেই তাঁহাদের অভিমান হয়, এবং উহাদের ধারণা সংসারে তাহারা কেহই নয়। এই ধারণা দূর করিবার জন্য গৃহে উহাদের বিভিন্ন দায়িত্বের কাজ দিয়া তাঁহাদের মর্যাদা দিতে হয়। কোনও বিষয়ে উহাদের সঙ্গে পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে হয়। সংসারে উহাদের উপস্থিতির এই মূল্য পাওয়াতে উহারা মনে তৃপ্তিলাভ করিবেন। এই সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ব্যাপারে কখনই উদাসীন থাকা উচিত নয়। এই সকল মানসিক আনন্দ ছাড়া উহাদের শারীরিক যত্নের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইবে। **উহাদের খাওয়া-দাওয়া, স্নান, নিদ্রা সকল বিষয়ের প্রতি যত্ন লওয়া আবশ্যক।** বৃদ্ধদের সব সময় মুখরোচক ও লঘুপাক খাদ্য দিতে হইবে। উহাদের ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম, সুতরাং দিনের বেলা ও রাত্রে শিশুর মতই উহাদের খাদ্য ব্যবস্থা সর্বপ্রথমে হওয়া কর্তব্য। উহাদের স্নানের তেল, জল ও গামছা হাতে হাতে গুছাইয়া দিতে হইবে। এ সমস্ত ছোট খাটো কাজ বাড়ীর মেয়েদের উপরই থাকা কর্তব্য। ঠাকুরমা, ঠাকুরদার ফাই ফরমাইশ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পালন করা একান্ত কর্তব্য। বৃদ্ধ ঠাকুরমা অথবা ঠাকুরদার একা এক ঘরে শুইবার ব্যবস্থা না করিয়া আগেকার প্রথা অনুযায়ী নাতি-নাত্নী লইয়া উহাদের শয়নের ব্যবস্থাটি খুবই ভাল ছিল। অধুনা সে ব্যবস্থা লুপ্ত প্রায়। শিশুরা ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। আবার কত ঠাকুরমা নাতি নাত্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া, পাখার হাওয়া করিয়া উহাদের ঘুম পাড়াইয়া দিত এবং নিজেরা ঘুমাইয়া পড়িত। এমন অপূর্ব স্নেহসিক্ত আচরণ মায়ের কাছেও

দুর্লভ। বৃদ্ধা শাশুড়ী অনেক সময় উহার পুত্রবধূ অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর উপর অহেতুক খারাপ ব্যবহার করেন কিন্তু উহাদের বয়সের কথা বিবেচনা করিয়া সেবাশুশ্রূষা দ্বারা উহাদের মন জয় করাই গৃহিণীর কর্তব্য। গৃহকর্তা কর্মব্যস্ততায় বেশীর ভাগ সময় বাইরে কাটায়। অতএব এ গুরুদায়িত্ব একান্তভাবে গৃহকর্ত্রীরই। গুণের মাধুর্যে অনেক সময় বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট পুত্র অপেক্ষা পুত্রবধূই অধিক আদরের হইয়া থাকে। মন দ্বারা মন জয় করিয়া লইতে হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। বৃদ্ধেরা অনেক সময় পুত্রবধূর ভ্রমণ করা, সিনেমা থিয়েটার দেখা ইত্যাদি বিষয়গুলি ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারে না ; কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক হইতে চিন্তা করিলে উপলব্ধি করা যায় যে উহারা বৃদ্ধ হইয়া অসমর্থ হইলেও সাধ, আহ্লাদ, আকাঙ্ক্ষা ইহাদেরও আছে, অতএব আধ্যাত্মিক কোনও ভাল সিনেমার বই আসিলে মাঝে মাঝে উহাদেরও মনস্তুষ্টির জন্য দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার গৃহস্বামীর যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে লইয়া তীর্থস্থান দর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে যাইতে হয়। এই সকল মানসিক তৃপ্তিতে তখন আর উহাদের সংসারে কাহারও উপর ক্ষোভ থাকিবেনা।

বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী ছাড়া আর এক শ্রেণীর অসমর্থ আত্মীয় অনেক পরিবারেই দেখা যায়। উহারা জীবিকার দিক থেকে ঐ পরিবারের উপর নির্ভরশীল। নিঃসন্তান বিধবা মাসী-পিসী বা দূরসম্পর্কের কোনও আত্মীয়া। আবার অনেক সময় পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় বালক-বালিকা-ও কোনও কোনও গৃহে আশ্রিত হিসাবে বাস করে। ইহাদের সংসারের বোঝা স্বরূপ মনে করা উচিত নয়। ইহাদের দ্বারাও অনেক সময় অনেক উপকার পাওয়া যায়। এই সমস্ত ছেলে-মেয়েদের প্রতি গৃহকর্ত্রীর সন্তানের মতই ব্যবহার করিতে হয়। উহাদের সুখে-দুঃখে রোগে-ভোগে কাছে থাকিয়া জননীর মতই স্নেহ দ্বারা প্রতিপালন করিতে হয়। বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা ওরা স্বতন্ত্র, এই মনোভাব যেন উহাদের ভিতর না আসে। সংসারের অনেক কাজ করিয়া উহারা অনেক উপকারে আসে। পড়াশুনা করিবার মত মস্তিষ্কের ক্ষমতা থাকিলে উহাদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিতে হয়। অন্যথায় অন্য কোনও কাজ শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া উহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রুজি রোজগারের পথ করিয়া দিতে হয়। এইরূপ কোনও আশ্রিতা বালিকা থাকিলে উহার বিবাহের ব্যবস্থা ঐ পরিবারের উপরই দায়িত্ব।

শ্বশুর-শাশুড়ী ছাড়া পরিবারে কোনও বয়োবৃদ্ধ আত্মীয় পরিজন আশ্রিতা হিসাবে থাকিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মতই যত্ন করিতে হইবে। তাঁহাদের অবহেলা করা হইতেছে এই ভাব যেন তাঁহারা কখনও মনে পোষণ না করেন। গৃহকর্ত্রীর গুণে এই সকল আত্মীয়-পরিজনরা তিনিও গৃহেরই একজন এইরূপ মনে করিবেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাহাদের একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিতে শিখিবে। তাহাদের যত্ন করিলে এবং তাহাদের প্রতি সদ্ আচরণ দেখাইতেপারিলে তাহারাও সংসারের কল্যাণ কামনা করিবে। উহাদের দ্বারা সংসারের অনেক কাজ সাধিত হয়, ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষন করা, কৃষি বাগান ও ফুলবাগানের তদারক করা, চালডাল ঝাড়িয়া বাছিয়া দেওয়া, আনাজ-তরকারী কুটিয়া দেওয়া, ইত্যাদি হাল্কা কাজ অনায়াসেই তাহারা সম্পন্ন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে ; সংসারে সেও একজন এই চিন্তায় ঐ সংসারের প্রতি তাহার আসক্তি জন্মে। কোনও পুরুষ আশ্রিত থাকিলে তাহাদের দ্বারা, হাট-বাজার করানো, দোকান-পাট করানো, রেশন তোলা, বাগান তৈরী ইত্যাদি কাজ হইতে পারে তবে স্মরণরাখিতে হইবে কাজটি তাহার ক্ষমতা ও সামর্থ অনুযায়ী হওয়া চাই। ঝি-চাকরের পর্বায় ফেলিয়া তাহাদের যেন কখনও ভারী কাজ সম্পন্ন করিতে দেওয়া না হয়। আবার নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলে উহাদের মনে অভিমান জাগিতে পারে। এই সকল বয়োবৃদ্ধদের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহাদের বেশভূষার পারিপাট্য ঐ পরিবারের মান অনুযায়ী হওয়া উচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিম্নলিখিত অবস্থায় প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা

আকস্মিক দুর্ঘটনা : দৈনন্দিন জীবনে বহু আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। রাস্তায় পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙ্গা, গাড়ী চাপা পড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অচৈতন্য হইয়া যাওয়া, অসুস্থতা বশতঃ রাস্তায় পড়িয়া যাওয়া, গায়ে আগুন

লাগা, জল মগ্ন হওয়া, সাপে কামড়ানো প্রভৃতি বহু রকমের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানুষ বিপদের সম্মুখীন হইয়া অনেক সময় অকাল মৃত্যু বরণ করে। এই সকল দুর্ঘটনায় যদি উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত চিকিৎসক আনিবার পূর্বে অথবা হাসপাতালে পাঠাইবার পূর্বে উপযুক্ত ভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান দেওয়া যায় তাহা হইলে অনেক সময় রোগী অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করিতে হয়।

(১) রোগীর রক্তপাত ঘটিলে যে কোনও উপায়ে অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক প্রতিবিধান

(২) রোগী শক পাইলে শরীর গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কম্বল চাপা দিয়া রোগীকে তরল কোনও গরম খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) ভীড় সরাইয়া দিয়া রোগীর দেহে নির্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

(৪) রোগীর দেহে আঁটসাট জামা থাকিলে উহা আলগা করিয়া দিতে হইবে। জুতাও পা হইতে খুলিয়া দিলে রোগী আরাম বোধ করিবে।

(৫) নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৬) প্রাথমিক ব্যবস্থা করিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

মচকানো ও অস্থিভঙ্গ : অসাবধানতা বশতঃ চলাফেরার জন্য অনেক সময় পায়ের পাতা, গোঁড়ালি, হাতের কব্জি, আঙ্গুল প্রভৃতি মচকাইয়া যায়। আকস্মিক আঘাতের ফলে হাড়ের সন্ধি স্থানের চারিদিকের স্নায়ুতন্তুর উপর প্রচণ্ড টান পড়িয়া স্নায়ুতন্তুগুলি অথবা সন্ধি বন্ধনীগুলি ছিঁড়িয়া যায়। এই রূপে **তন্তু ছিঁড়িয়া যাওয়াকেই মচকানো বলে।**

মচকানো স্থানটি ফুলিয়া ওঠে, নাড়াইতে গেলে ব্যথা হয়। অনেক সময় স্থানটি বিবর্ণ হইয়া যায়।

প্রতিবিধান : মচকানো স্থানটি ভিজা ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয়। ব্যাণ্ডেজটি শুকাইয়া গেলে পুনরায় ভিজাইয়া দিতে হয়। শীতল ব্যাণ্ডেজ-এ আরাম বোধ না হইলে অথবা ব্যথার উপশম না হইলে ঐ স্থানে গরম জলের সেঁক দেওয়া যায়। গরম চূণ হলুদ লেপনেও উপকার পাওয়া যায়।

অস্থিভঙ্গ : অস্থিভঙ্গ তিন প্রকারের হয়। (১) **সিম্পল ফ্রাকচার বা**

সরল ভঙ্গ। যেখানে চর্মের বা মাংসপেশীর কোনও ক্ষতি হয় না কেবলমাত্র অস্থিই ভাঙ্গিয়া যায়।

(২) **কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার বা জটিল ভঙ্গ:** এক্ষেত্রে অস্থিভঙ্গতো হয়ই, উপরন্তু সেই ভগ্ন অস্থি মাংস ও স্নায়ু প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চর্ম ভেদ করিয়া বাহিরের হাওয়ার সহিত মিলিত হইয়া আহত স্থানে রোগ জীবাণু প্রবেশের উপায় করিয়া দেয়। আহত স্থান হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণও হইতে থাকে।

(৩) **কম্প্লিকেটেড ফ্র্যাকচার বা কুটিল ভঙ্গ:** ইহাতে অস্থিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক কোনও যন্ত্র (যেমন মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি) বা কোনও প্রধান ধমনী, শিরা বা স্নায়ু আহত হয়।

জটিল এবং কুটিল ভঙ্গ আবার দুই রকমে ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রকারের যে কোনও একটি ভঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ বা সরল অস্থি ভঙ্গ অনেক সময় রোগীর অসাবধানতা বশতঃ সেই অঙ্গ নাড়াচাড়ার ফলে এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর অজ্ঞতাবশতঃ একটি সরল ভঙ্গ কুটিল এবং জটিল ভঙ্গে পরিণত হয়।

আঘাতের পরিমাণ অনুসারে অস্থি ভঙ্গ আবার পৃথক তিন প্রকারের হইতে পারে।

(১) **কমিনিউটেড:**—যেখানে অস্থি টুকরা টুকরা হইয়া যায়।

(২) **গ্রীনষ্টীফ:**—শিশুদের অস্থি দৃঢ় না হওয়ায় উহাদের অস্থি স্বভাবতঃই কোমল, আঘাতের ফলে সম্পূর্ণ না ভঙ্গিয়া বাঁকিয়া যায় ও চীড় ধরে।

(৩) **ইমপ্যাক্টেড:**—অস্থির ভগ্নাংশগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে।

অস্থিভঙ্গের সাধারণ চিহ্ন এবং লক্ষণ:

(১) আহত স্থানে ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে বেদনা।

(২) আহত অঙ্গের শক্তিলোপ।

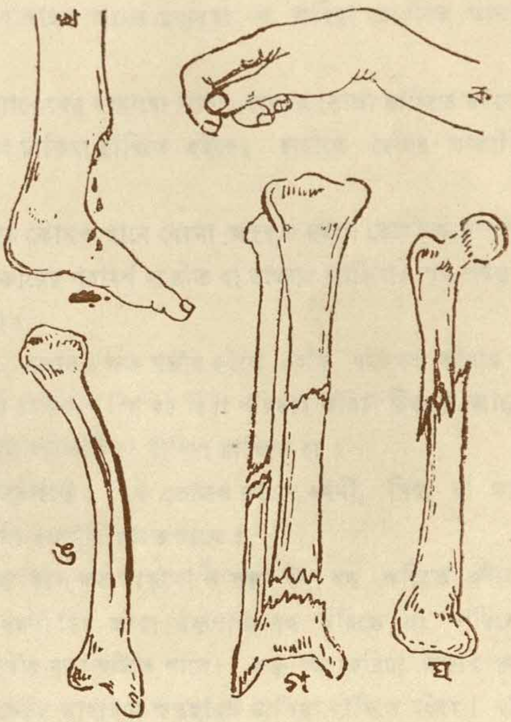
(৩) আহত স্থানের চারিদিকে ফোলা।

(৪) আহত অঙ্গের বিকৃতি।

(৫) অস্থির অসমতা।

(৬) অনেক সময় অস্থির খট্ খট্ শব্দ। ভগ্ন অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত ঘর্ষিত হইলে এইরূপ শব্দ হয়। ইহাকে **ক্রিপিটাস্** বলে।

অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক প্রতিবিধান: অস্থিভঙ্গে প্রধান দুইটি বিষয় লক্ষ্য



অস্থিভঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা

ক) সরল ভঙ্গ, (খ) জটিল এবং কুটিল ভঙ্গ।

গ) কমিনিউটেড, (ঘ) ইম্প্যাকেটেড।

ঙ) গ্রীলষ্টীক।

রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, নূতন কোনও ক্ষতির প্রতিরোধ করা ; দ্বিতীয়তঃ, সরলভঙ্গ যাহাতে কুটিল ভঙ্গে রূপান্তরিত হইতে না পারে।

(১) অবিলম্বে ডাক্তারকে ডাকা।

(২) রক্তক্ষরণ বন্ধ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা আহত স্থান ঢাকিয়া, স্পিন্ট ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সুবিধা থাকিলে তাহার ব্যবস্থা করা।

(৩) যতদূর সম্ভব আহত স্থানের সুব্যবস্থা না করিয়া রোগীকে স্থানান্তর করা উচিত নয়।

(৪) স্পিন্ট ও ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে আহত স্থানকে সোজা রাখিতে হইবে।

(৫) রোগীর দেহ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে ; যাহাতে দেহের স্বাভাবিক তাপ হ্রাস না পায়।

বেদনা : দেহের কোনও স্থানে বেদনা অনুভূত হইলে রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিতে হইবে। ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত বা ডাক্তার আসিবার পূর্ব পর্যন্ত কোনও ঔষধ দেওয়া চলিবেনা।

কাটা বা ক্ষত : কোনও ক্ষত গভীর হইলে রোগ সংক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষত স্থানটির চারিপাশ স্পিরিট দিয়া পরিষ্কার করিয়া **টিঞ্চার আয়োডিন** অথবা **টিঞ্চার বেঞ্জিন** লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

ক্ষত হইতে রক্তপাত : যে কোনও কারণে ধমনী, শিরা বা ক্যাপিলারি ছিন্ন হইলে ক্ষতমুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে।

রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উহা বন্ধ করিতে হইবে। বাহু, উরু বা স্কন্ধের প্রধান ধমনী ছিন্ন হইয়া রক্তপাত বন্ধ করিতে না পারিলে কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। রক্ত বন্ধ করিয়া টিঞ্চার আয়োডিন, টিঞ্চার বেঞ্জিন অথবা ডেটল লাগাইয়া ক্ষতস্থানটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। বরিক কটন ছাড়া অন্য কোনও তুলা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা উচিত নয়।

কোনও ধমনী ছিঁড়িয়া রক্তপাত ঘটিলে বিভিন্ন উপায়ে রক্ত বন্ধ করা যায়।

(১) অঙ্গুলি দ্বারা প্রেসার পয়েন্টে চাপ দিয়া।

(২) প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ এবং টুর্নিকেট ব্যবহার করিয়া।

(ক) আহত স্থানের উপরে এবং (খ) প্রেসার পয়েন্টের উপরে।

(৩) অঙ্গের সংকোচন (ফ্লেক্সন) দ্বারা।

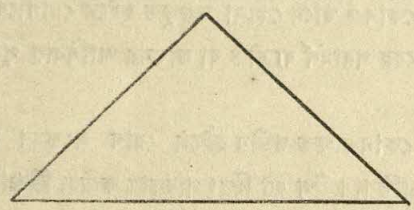
প্রথমে অঙ্গুলির চাপ দিয়াই রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইবে, তাহাতে সমর্থ না হইলে বা রোগীকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করিতে

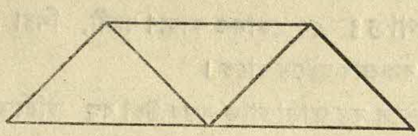
হইবে। তবে অঙ্গুলির চাপ ত্যাগ করা উচিত নয়। ইহাতে বন্ধ না হইলে টুর্নিকেট ব্যবহার করিয়া ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে।

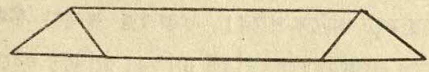
আহত স্থানে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার প্রণালী ঃ ছড়ি বা কাঠের টুকরা এবং এক টুকরা স্পিণ্ট বা পরিষ্কার কাপড় বা একখানি রুমাল লইয়া ভাঁজ করিয়া শক্ত প্যাডের মত করিয়া যে স্থানহইতে রক্ত নিঃসৃত হইতেছে ঠিক তাহার মুখে রাখিয়া, একটি ব্যাণ্ডেজ দিয়া আহত অঙ্গের সহিত ঐ প্যাডকে দৃঢ়রূপে বাঁধা হইবে।

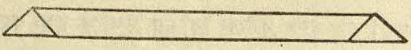
টুর্নিকেট প্রস্তুত ও তাহার প্রয়োগ বিধি ঃ প্রেসার পয়েণ্ট বা চাপের স্থানের উপরে একটি দৃঢ় প্যাড দিয়া একটি সরু ব্যাণ্ডেজের মধ্যস্থল প্যাডের উপর রাখিয়া আহত অঙ্গ জড়াইয়া রাখা হইবে।

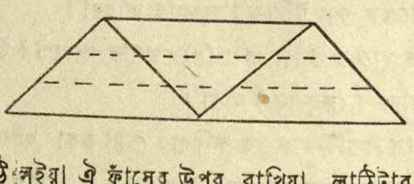
ব্যাণ্ডেজের দুই প্রান্ত প্যাডের বিপরীত দিকে একটি মাত্র ফাঁস দিয়া বাঁধা হইবে।


ক


খ


গ

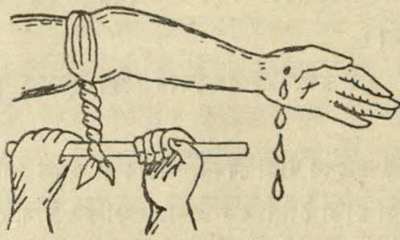

ঘ


ঙ

ইহার পর একটি লাঠি লইয়া ঐ ফাঁসের উপর রাখিয়া, লাঠিটার উপরে একটি রিফ

নটের সাহায্যে বাঁধা হইবে। লাঠিটি দিয়া ব্যাণ্ডেজে পাক দেওয়া হইবে, ইহাতে আর্টারির উপর প্যাডের চাপ পড়িবে--এইরূপে রক্তপাত বন্ধ হইবে।

স্মরণ রাখিতে হইবে টুর্নিকেটের প্যাডটি প্রেসার পয়েন্ট বা চাপের স্থানের ঠিক



উপরেই যেন বসে অর্থাৎ প্যাডের সম্পূর্ণ চাপ যেন ধমনীর উপরে পড়ে। নতুবা রক্ত-ক্ষরণ বন্ধ হইবেনা। উপরন্তু শিরাগুলিও টুর্নিকেটের চাপে বন্ধ হইয়া দূষিত রক্ত হৃদপিণ্ডে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। ফলে, আহত স্থানে অত্যাধিক স্ফীতি এবং রক্তের জমাট ঘটিবে।

টুর্নিকেট ব্যবহার কালে শুধু রক্তস্রোত বন্ধ করিতে যেটুকু চাপ দেওয়া দরকার তাহার বেশী অযথা চাপ দেওয়া উচিত নয়।

রোগী সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় পালন করিতে হইবে।

(১) রোগীকে আরামে বা সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিতে হইবে।

(২) যে অঙ্গ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে সেই অঙ্গ উর্ধ্বে তুলিয়া রাখা হইবে। ইহাতে রক্ত বেশী নির্গত হইতে পারে না।

(৩) ক্ষতস্থান হইতে ধূলিকণা, কাচ ভাঙ্গা, কাপড়ের টুকরা, চুল প্রভৃতি ক্ষত হইতে সাবধানে বাহির করিতে হইবে অবশ্য চোখে না পড়িলে ক্ষত ফাটিয়া ঐ সকল পদার্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে যাওয়া একেবারেই অসঙ্গত।

(৪) ক্ষত স্থানে বেশী ময়লা থাকিলে উহা পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক এবং দৃঢ় শোষক ড্রেসিং দ্বারা ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখা হইবে। ড্রেসিং দিবার পূর্বে ক্ষত স্থানের চারিপাশে টিঞ্চার আইওডিনের প্রলেপ ও ক্ষত স্থানে টিঞ্চার আয়োডিনের জল দিলে ভাল হয়। এইবারে ড্রেসিং প্যাডের উপরে দৃঢ় রূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইবে।

শিরার রক্ত: ইহা দেখিতে কালচে লাল এবং ধীরে ধীরে একটানা পড়িতে থাকে। ক্ষত স্থান হইতে শিরার রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রোগীকে বিশ্রামে রাখিতে হইবে। আহত স্থান উর্ধ্বে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ দ্বারা ক্ষত স্থানটি বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

ক্যাপিলারির রক্তস্রাব : এই রক্ত লোহিত বর্ণ। একটানা স্রোতের ন্যায় দ্রুত-ভাবে অথবা ধীরে ধীরে নির্গত হয়। সামান্য চাপেই এই রক্তপাত বন্ধ করা যায়।

কোনও পাত্রে গরম জল রাখিয়া ১০।১২ মিনিট ক্ষতস্থানটি ভিজাইয়া রাখিলে এই রক্তপাত বন্ধ হয়। অনেক সময় বরফ জলেও কাজ হয়। কিন্তু অল্প গরম বা অল্প ঠাণ্ডায় কোন কাজ হয় না।

দাহ বা পোড়া : দুই রকমে দেহের কোনও অঙ্গ পুড়িতে পারে। যেমন, শুষ্ক তাপ ও ভিজা তাপ।

(১) **শুষ্ক তাপ :** শুষ্ক তাপের দ্বারা যেমন, আগুন বা উত্তপ্ত লৌহ বা অন্য কোনও ধাতব পদার্থ দ্বারা। তাহা ছাড়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত ট্রাম, রেল প্রভৃতি তারের সাহায্যে। সালফিউরিক বা নাইট্রিক প্রভৃতি তীব্র অ্যাসিড দ্বারা, এবং কষ্টিক সোডা, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি তীক্ষ্ণ ক্ষার দ্বারা। আবার শক্ত নূতন জুতার ঘষাতেও শুষ্ক তাপে পায়ের আঙুল বা গোড়ালীতে ফোস্কা পড়িতে দেখা যায়।

(২) **ভিজা তাপ :** ফুটন্ত তরল পদার্থের সাহায্যে যেমন—ফুটন্ত জল, ভাতের ফেন, গরম দুধ, বার্লি, তেল এবং আলকাতরা।

দাহের লক্ষণ : আগুনের বা তাপের তেজ অনুযায়ী দাহের লক্ষণ বিভিন্ন হয়। অল্প তাপে চর্ম লালবর্ণ হয়। বেশী উত্তাপে ফোস্কা পড়ে। অত্যধিক আগুনের বা তাপের সংস্পর্শে দেহের আভ্যন্তরিক তন্তুগুলি পুড়িয়া অঙ্গারের ন্যায় হয়। সময়ে সময়ে দগ্ধ অঙ্গে বস্ত্রাদি লাগিয়া থাকে। নাইলন, টেরিলিন ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তু নির্মিত বস্ত্রাদি পরিহিত অবস্থায় কোনও মহিলার শাড়িতে আগুন ধরিলে উহা চামড়ার সহিত লাগিয়া পড়ে। উহা সরাইতে গেলে অধিকতর ক্ষতি হয়। আগুনের তাপে স্নায়বিক যন্ত্রে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে রোগী সকে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে সকের চিকিৎসা করিতে হয়।

প্রতিবিধান : সামান্য দাহে দগ্ধ স্থানে বাতাস লাগিতে না দিয়া কাপড় কাচার সোডার জলে সেই অংশ ভিজাইয়া রাখিলে সুফল পাওয়া যায়। চুনের জল ও তেল সমভাবে ভাল করিয়া মিশাইয়া বাঁধিয়া দিলে উপকার হয়।

গুরুতর অবস্থায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয় :

(১) বস্ত্রাদি কখনও টানিয়া না খুলিয়া কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। যদি দেহে লিপ্ত অবস্থায় থাকে তাহা হইলে উহাতে বিশুদ্ধ নারিকেল তেল দিয়া পরে আলগা হইলে তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

(২) ফোস্কা কখনও গলিয়া ফেলা উচিত নয়।

(৩) দগ্ধ স্থানে যাহাতে বাতাস লাগিতে না পারে সেজন্য ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। ড্রেসিং এর জন্য লিণ্ট বা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড লইয়া ভেসলীন অথবা কোল্ডক্রীম এবং কম পরিমাণ চূণের জলের সহিত তিসির তৈল অথবা নারিকেল তৈল মিশাইয়া ঝাঁকিয়া লিণ্টকে ভিজাইয়া ক্ষতের উপর দিতে হইবে। ঐ তেল একটু গরম করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। **এই তেলকে ক্যারন তেল বলে। এই তেল তৈরী করার অসুবিধা থাকিলে একটি কাঁচা আলু ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তাহার ভিতরের অংশ বাহির করিয়া জল না দিয়া বাঁটিয়া লইয়া লিণ্টের উপর রাখিয়া দগ্ধ স্থানে দিলে রোগী আরাম বোধ করিবে।** হাতের কাছে এইগুলি তাড়াতাড়ি না পাইলে দগ্ধ স্থানে ময়দা বা আটা ছড়াইয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পরে ঐ তেলে ভিজাইয়া রাখা হইবে। **পুড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কলার বাসনার রস দিলেও ফোস্কা বা যন্ত্রণা হইবে না।**

তীব্র অ্যাসিডে দগ্ধ হইলে ঈষদুষ্ণ জলে সেই অঙ্গ ডুবাইয়া রাখিলে ভাল হয়। **তীব্র অ্যাসিডে দগ্ধ হইলে এই জলে বড় এক চামচ বেকিং সোডা এবং তীব্র ক্ষারে দগ্ধ হইলে ভিনিগার বা লেবুর রস জলের ভিতর মিশাইতে পারিলে ভাল হয়।** আঙ্গুল পুড়িয়া গেলে প্রত্যেকটি আঙ্গুলের জন্য পৃথক পৃথক ড্রেস করিতে হইবে। তাহা না হইলে আঙ্গুলগুলি সব একটার গায়ে একটা লাগিয়া যাইতে পারে।

খুব গরম চা অথবা দুধ গিলিয়া ফেলিলে গলা ও মুখ ভিজাইবার জন্য দুধের ভিতর অল্প ঘি, অথবা রেড়ীর তেল মিশাইয়া অল্প অল্প খাওয়াইতে হইবে। বরফ চুষিতে দিলেও উপকার পাওয়া যায়। গলার উপরেও বরফের টুকরা রাখা যয়।

পরিধেয় বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলেঃ তৎক্ষণাৎ যাহাতে অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বগামী হয় এমনভাবে, অর্থাৎ সম্মুখের বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে চিৎ করিয়া এবং পশ্চাতের বস্ত্রাদিতে হইলে উপুড় করিয়া, মাটিতে শোওয়াইয়া রাখিতে হইবে। কারণ অগ্নিশিখা স্বভাবতঃই ঊর্ধ্বগামী; সুতরাং দাঁড়াইয়া থাকিলে অগ্নিশিখা মুহূর্ত মধ্যে ঊর্ধ্বগামী হইয়া দেহের অপরাপর অংশ এবং মুখমণ্ডল দগ্ধ করিয়া দেয়।

মাটিতে ফেলিবার পর কম্বল, কোট, বিছানার চাদর, লেপ, তোষক অথবা কোনও বস্তা হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহা দিয়াই চাপিয়া ধরিতে হইবে। ইহাতে বায়ুর সহিত অগ্নির সংযোগ বন্ধ হইয়া অগ্নি শীঘ্রই নির্বাপিত হইবে। কখনও গায়ে

জল ঢালা উচিত নয়। বেশী আগুন হইলে প্রতিবিধানকারীর ভিজা তোয়ালে বা কম্বল নিজের গায়ে জড়াইয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সময় কাছে সাহায্যকারী যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে নিজেই মাটিতে গড়াগড়ি যাইবে। এবং হাতের কাছে কিছু থাকিলে তাহা নিজের দেহ চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবে। কখনও খোলা জায়গায় ছুটাছুটি করা উচিত নয়।

দেহের কোনও অঙ্গে বিজাতীয় পদার্থ (Foreign bodies) **প্রবেশ করিলে ঃ** চক্ষুর মধ্যে কিছু পড়িলে গুরুতর হউক বা না হউক তৎক্ষণাৎ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। রোগীকে চক্ষু রগড়াইতে দেওয়া হইবে না। রোগী যদি শিশু হয় তাহা হইলে হাত দুইটি বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে রগড়াইতে না পারে।

চক্ষুর নীচের পাতায় জিনিসটি থাকিলে চক্ষের পাতা টানিয়া রোগীকে উপরের দিকে তাকাইতে বলিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে পদার্থটি দেখা যায় কিনা। দেখিতে পাইলে নরম তুলি দ্বারা বা কাপড়ের বা রুমালের কোণ দ্বারা তুলির মত করিয়া উহা বাহির করিয়া লইতে হইবে।

পদার্থটি উপরের পাতায় থাকিলে উপরের পাতা উপরের দিকে টানিয়া ধরিয়া এবং নীচের পাতা উপরের পাতার নীচে পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাতে নীচের পাতার লোমগুলি উপরের পাতার মধ্যে গিয়া বুরুশের কার্য করিয়া পদার্থটিকে নড়চড় করিয়া বাহির করিয়া দিতে পারে। খুব সাবধানে পর পর কয়েকবার এরূপ করা যাইতে পারে। ইহাতে কোনও ফল না হইলে, অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে। চিকিৎসকের অভাব ঘটিলে নিম্নলিখিত উপায়-গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

রোগীকে মুখ আলোর দিকে করিয়া বসাইয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া উহার মাথা প্রতিরোধকারীর বক্ষের উপর দৃঢ়ভাবে ঠেস দিয়া রাখিতে হইবে। এক্ষণে দেশলাইয়ের কাঠির মত ছোট কিছু উপরের পাতার উপরে কিনারা হইতে আধ ইঞ্চি দূরে রাখিয়া পিছনের দিকে চাপিয়া ধরিতে হইবে এবং পরে উপরের পাতা, লোম ধরিয়া, দেশলাইয়ের কাঠির উপর তুলিয়া ধরিতে হইবে; ইহাতে উপরের পাতা উল্টাইয়া যাইবে। রোগীকে নীচের দিকে তাকাইতে বলা হইবে।

এক্ষণে পদার্থটি বাহির করিয়া আনিতে হইবে। কোনও ইস্পাত বা ধাতুর টুকরা বা শক্ত জিনিস চক্ষুগোলকে বিঁধিয়া গেলে—নীচের পাতা নীচের দিকে টানিয়া চক্ষুর মধ্যে কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল ঢালিয়া দিয়া চক্ষু বুজাইয়া নরম তুলার প্যাড দিয়া

ঢাকিয়া এমনভাবে ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধ দিতে হইবে যাহাতে রোগী চক্ষুগোলক সহজে ঘুরাইতে না পারে—তবে খুব বেশী জোরেও আবার বাঁধা উচিত নয়। এই অবস্থায় সত্বর চিকিৎসকের কাছে রোগীকে লইয়া যাইতে হইবে।

কর্ণরন্ধ্রে কোনও জিনিস প্রবেশ করিলে ঃ চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে কখনও ইহার প্রতিকার নিজেদের করা উচিত নয়। রোগী শিশু হইলে তাহার হাত বাঁধিয়া দিতে হইবে, যাহাতে কানে হাত দিতে না পারে। **কানে কোনও পোকা ঢুকিলে অলিভ অয়েল বা গরম সরিষার তেল ঢালিয়া দিলে পোকা ভাসিয়া উঠিবে এবং সহজেই বাহির করা যাইবে।** কান কখনও কিছু দ্বারা খোঁচান উচিত না।

নাসিকা রন্ধ্রে কোনও দ্রব্য প্রবেশ করিলে রোগীকে দাঁড় করাইয়া বা বসাইয়া নাকের ভিতর **লঙ্কার গুঁড়া বা নস্যি প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য দিয়া রোগীকে হাঁচাইতে হইবে এবং সজোরে নিঃশ্বাসে ফেলিতে বলা হইবে।** ইহাতে ফল না পাইলে সত্বর চিকিৎসকের কাছে নিয়া যাইতে হইবে।

শিশুরা কোনও জিনিস হঠাৎ গিলিয়া ফেলিলে ঃ জিনিষটি পেটের মধ্যে চলিয়া গেলে ব্যস্ত হইয়া বমি করানো বা জোলাপ দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারকে খবর দিয়া শিশুকে বিশ্রামের জন্য শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। **এক্ষেত্রে পাউরুটি, শুকনা রুটি খই-এর মণ্ড প্রভৃতি খাওয়াইয়া রাখিলে জিনিসটি মলের সহিত বাহির হইয়া যায়।** তবে প্রতিবার মল পরীক্ষা করিতে হয়। পয়সা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ পেটে গেলে কোনও অম্ল জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে ধাতু দ্রবীভূত হইয়া দেহের ভিতর বিষক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে।

জিনিসটি পেটের ভিতর না গিয়া গলায় আটকাইয়া থাকিলে ঃ প্রথমে মুখ নীচু করাইয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া জিনিসটি টানিয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে বমি হইয়াও জিনিষটি বাহির হইতে পারে। একটি রুমাল দিয়া জিভটি টানিয়া রাখিলে আঙ্গুল ব্যবহারে সুবিধা হয়—নরম জিনিস হইলে নীচের দিকে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ফল না হইলে, নিজের দুই হাঁটু দিয়া শিশুকে ধরিয়া তাহার পেট, চাপিয়া পিঠে দুই একটি জোরে চাপড় দিলে অনেক সময় সেই ধাক্কায় জিনিসটি বাহির হইয়া আসে। অথবা শিশুর পা দুইটি এক হাতে ধরিয়া মাথা নীচু করিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া ধরা হইবে, এবং পিঠে সজোরে দুই এক চাপড় দিলে, ইহাতে সহজে জিনিসটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। মাছের ছোট কাঁটা বিঁধিলে শক্ত ভাত বা রুটি বা পাউরুটির ডেলা গিলিতে দেওয়া হইবে। শক্ত বড় কাঁটা কোনও খেলনা, বা ভাঙ্গা

দাঁত হইলে যাহাতে তাহা মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সামান্য চেষ্টার ভিতরে ডাক্তারকে খবর দিয়া আনিতে হইবে।

চামড়ার নীচে বঁড়শি বিঁধিয়া গেলে : যে দিক দিয়া বিধিয়াছে সেই দিক দিয়া খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হয় না। প্রথমে সুতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া বা খুলিয়া বঁড়শির পিছনে চাপ দিয়া নূতন চর্ম ভেদ করিয়া মুখটি বাহিরের দিকে আনতে চেষ্টা করিতে হইবে। পরে মুখ ধরিয়া টানিয়া বঁড়শিটি বাহির করিয়া লইয়া বোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত গরম জলে তুলা ডুবাইয়া ক্ষতস্থানে তাহা বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহাতে রোগী আরাম পাইবে। রক্ত বাহির হইলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অবশ্যই অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকসন লইতে হইবে।

কাঁটা বা অন্য জিনিস চর্মের নীচে বিদ্ধ হইয়া বাহির না হইলে সেই স্থানে কোমেণ্ট করিলে সহজে বাহির করা যায়।

নখে কাঁটা বা অন্য কিছু বিঁধিলে দুই একদিন পুলটিস দিলেই, সহজে বাহির হইয়া আসিবে।

দংশন

সর্প-দংশন—বিষাক্ত সর্পের উভয় চক্ষুর পশ্চাতে বিষগ্রন্থি আছে। সম্মুখ ভাগের উপর দুইটি দন্তের সহিত ইহা যুক্ত। বিষাক্ত সর্প কোনও লোক বা জীবকে দংশন করিবার সময় উহার দাঁত দুইটি দেহে বিদ্ধ করিয়া দেয় এবং পরক্ষণেই বিষ গ্রন্থি হইতে ঐ দন্তদ্বয়ের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম নলীর সাহায্যে দংশিত স্থানে বিষ আসিয়া পৌছায় এবং রক্তে মিলিত হইয়া সর্বশরীর হৃদপিণ্ডে ও মস্তিষ্কে চালিত হইয়া বিষক্রিয়া উৎপাদন করিয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়।

বিষাক্ত সর্প দংশনের চিহ্ন : দংশিত স্থানে ১ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধানে দুইটি সূক্ষ্ম দন্ত-বিদ্ধ চিহ্নিত রক্তাক্ত ছিদ্র থাকে। দুইটির অধিক ছিদ্র থাকিলে হয় সাপটি বিষাক্ত নয় অথবা কোনও বিষ দন্তের দংশন নয় অনুমান করা যাইবে। কোনও কারণে সাপ দংশিত স্থানে বিষ সঞ্চার করিতে না পারিলে উহা ভয়ের কারণ থাকে না; কিন্তু সেই অনুমানে কখনও চিকিৎসা বন্ধ রাখা উচিত নয়।

সর্প দংশনে বিষক্রিয়ার লক্ষণ :

প্রাথমিক লক্ষণ : আকস্মিক তীব্র বেদনা, ক্রমশঃ দুর্বলতা, **ঘুমের ভাব এবং কখনও কখনও বমি।**

পরবর্তী লক্ষণ : শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, বাক্‌রোধ, ঢোক গিলিতে কষ্ট ;

মুখে ফেনা, নাড়ী দ্রুত এবং মাঝে মাঝে পাওয়া যায়; মাংসপেশীর আক্ষেপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গদের শক্তি লোপ। ক্রমশঃ সর্বশরীরে বিষ সঞ্চালিত হইতে থাকে। আহত অঙ্গে রক্ত বহা নলীগুলি স্ফীত ও লাল হইয়া উঠে। ঘাম দেখা দেয়, খিচুনী আরম্ভ হয়, রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোনও কোনও স্থলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে না কিন্তু রক্ত বিষাক্ত হইয়া কয়েকদিন পরে মৃত্যু ঘটে—সেক্ষেত্রে ক্ষত স্থান ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়। আহত অঙ্গ, বগল, কুঁচকি বা শরীরের অন্যান্য স্থান ফুলিয়া উঠে ও ঘা হয়। সেখান থেকে পুঁজ রক্ত বাহির হইতে থাকে। কখনও কখনও পেটের অসুখ এবং কখনও বা নাক ও মুখ দিয়া অথবা প্রস্রাব বা দাস্তের সহিত রক্ত নির্গত হয়।

প্রতিবিধান: রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়। তাহার পূর্বে ক্ষত হইতে একটু উপরে একটি বা ততোধিক বন্ধনী দিতে হইবে। এই বন্ধনী খুব জোরে হওয়া আবশ্যক যাহাতে বিষ উপরের দিকে উঠিয়া হৃদপিণ্ড বা মস্তিষ্কে যাইতে না পারে। ক্ষত স্থানে রক্ত ক্ষরণের জন্য ক্ষতের আশপাশ চিরিয়া উপর হইতে নীচের দিকে লম্বালম্বি সিকি ইঞ্চি গর্ত করিয়া সম্ভব হইলে সেই স্থান উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে অথবা উষ্ণ জলের ধারা দিতে হইবে। ছুরি বা ধারাল অস্ত্র ব্যবহারের পূর্বে আগুনে পুড়াইয়া লইতে হইবে।

বিষাক্ত সর্পের দংশনে **পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ক্ষত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া ঘষিয়া দিতে হইবে।** এবং হাসপাতালে দেওয়ার পূর্বে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট চূর্ণ মিশ্রিত উষ্ণ জলে ক্ষতস্থান নিমজ্জিত রাখিতে হইবে।

ক্ষত স্থান নিম্নমুখী করিয়া। উর্ধ্বাঙ্গ হইলে অঙ্গটিকে ঝুলাইয়া রাখা হইবে। এবং নিম্নাঙ্গ হইলে, রোগীকে পা দিয়া মাটি চাপিয়া বসিতে বলা হইবে।

চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হইলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া দিতে হইবে। **কস্টিক পটাশ, কার্বলিক অ্যাসিড, নাট্রিক অ্যাসিড** প্রভৃতি দ্বারা অথবা **লৌহ শলাকা বা চাবি পোড়াইয়া লাল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত স্থান দগ্ধ করিয়া দিতে হইবে।** সাধারণ ভাবে কষ্টিক পটাশ লাগাইলে কোনও কাজ হয় না। সুতরাং **ইহা ক্ষতের নীচে (যেখানে বিষ থাকে সেখান পর্যন্ত) পৌছাবার জন্য মুখ সুঁচাল কোন কাঠি দ্বারা কস্টিক পটাস ক্ষতের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়।** উপরিলিখিত প্রয়োগ অবলম্বনের পর বন্ধনীগুলি খুলিয়া দিতেহইবে।

কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার ড্রেসিং দ্বারা ক্ষতস্থান ঢাকিয়া দেওয়া হইবে। রোগীকে

স্থিরভাবে থাকিতে দিতে হইবে, অনর্থক নড়াচড়া করাইয়া রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ঘটাইয়া বিষ চলাচলের সুবিধা যাহাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

মদ্য জাতীয় কোনও জিনিস রোগীকে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ; কারণ অ্যালকোহলে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি দুর্বল হইয়া পড়ায় উহারা বিষক্রিয়ায় বাধা দিতে পারিবেনা। রোগীর অবসাদ ভাব দূর করিবার জন্য প্রথমে গরম চা বা কফি দেওয়া যাইতে পারে।

মূর্চ্ছার ভাব হইলে মুখে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে হইবে। পেটে ও বুকে হৃদপিণ্ডের ঠিক উপরে সরিষার পুলটিস দিতে হইবে। রোগীর মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য ভীড় সরাইতে হইবে। ঘরে থাকিলে দরজা জানালা খুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে বিশেষ করিয়া, নিম্নাঙ্গে যেন ঠাণ্ডা না লাগে। বিষবাহী লালবর্ণ শিরা দেখা গেলে বা বগল ও কুঁচকি ফুলিয়া উঠিলে তাহাতে ফোমেন্ট করিতে হইবে। রোগী একটু সুস্থ বোধ করিলে গরম দুধ একটু একটু করিয়া দেওয়া হইবে।

স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনও অসুবিধা লক্ষ্য করিলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে।

দংশনের অনেক পরে রোগী যদি বাঁচিয়া থাকে এবং দংষ্ট অঙ্গ এবং রক্তবহা শিরা সকল যদি ফুলিয়া ওঠে এবং রোগী যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অচৈতন্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে উত্তেজক পানীয় এবং পুলটিসের উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে।

ক্ষিপ্ত কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, বেজী প্রভৃতির দংশন: জন্তুটি ক্ষিপ্ত না হইলে—সাধারণতঃ ক্ষতস্থানে গরম জল ও টিঞ্চার আইওডিন বা ডেটল দিয়া ধুইয়া নিমপাতা বাটিয়া পুলটিস দিলেই সারিয়া যায়। অবশ্য কোনও ধমনী বা শিরা আহত হইলে রক্তস্রাব সর্বাগ্রে বন্ধ করিতে হইবে। এ সব স্থলে কখনও বা ক্ষত দূষিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের উপর ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

জন্তুটি ক্ষিপ্ত হইলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ, ক্ষিপ্ত জন্তুর মুখের লালায় রোগ জীবাণু থাকে এবং অনেক সময় থাবাতেও এই লালা লাগিয়া থাকে সুতরাং সামান্য কামড় বা আঁচড়েই দংশিত স্থান বিষাক্ত হইয়া ওঠে এবং তাহা অবহেলা করিলে জলাতঙ্ক রোগের সৃষ্টি হয়। লালা কোনক্রমে শরীরস্থ হইলেই ভয়।

জলাতঙ্ক রোগের মত এমন যন্ত্রণাদায়ক রোগ আর নাই। সাধারণতঃ দেহ

মাসের মধ্যেই (কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ মাসের মধ্যে) রোগের উপসর্গ দেখা দেয় এবং তথায় ৩।৪ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। কখনও কয়েক ঘণ্টার ভিতর রোগীর প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যেমন রুক্ষ মেজাজ, ভয়, ঘাড় শক্ত হওয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট। কখন কখন জিহ্বার নীচে ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখা যায় ; ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্যান্য উপসর্গ ইহার অনেক পরে দেখা যায়। শরীরে একবার বিষ সঞ্চারিত হইলে বহুদিন এমন কি কয়েক বৎসর পরেও এ রোগ দেখা দিতে পারে, সুতরাং এ বিষ নিঃশেষে শরীর হইতে দূর করিবার জন্য অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইনজেকসন লওয়া কর্তব্য। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি উন্মাদগ্রস্ত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

প্রথমদিন কিছু অস্থির ভাব দেখা যায়, সহজেই রাগিয়া ওঠে, এক কোণে পড়িয়া থাকে, খাইতে চায় না। চক্ষু লাল হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে। চাহনি কুটিল হয় ; যাহা সম্মুখে পায় তাহাই কামড়াইতে থাকে। গৃহপালিত পশু হইলে রোগের প্রথম অপ্রকাশ অবস্থায় আপন মনিবের প্রতি খুব অনুরক্ত হয় কিন্তু তারপর প্রথমেই তাঁকে কামড়ায়। ক্রমশঃ স্বর অস্বাভাবিক হয়। লোম সোজা হইয়া ওঠে। মুখের দুধার দিয়া লালা ঝরিতে থাকে কান দুইটি ঝুলিয়া পড়ে। ঘাড় গুজিয়া এক গোঁয়ে দৌড়াইতে থাকে। শেষে পিছনের পা দুইটি অবশ হওয়ায় টানিয়া টানিয়া চলিতে থাকে ; জল পাইলেই জিভ দিয়া চাটিতে থাকে কিন্তু তাহা গিলিতে না পারায় মুখ হইতে গড়াইয়া পড়ে। প্রায় বর্ষার শেষ ও শরৎকালের প্রথমে জন্তুগুলি ক্ষিপ্ত হয়।

উন্মাদের লক্ষণ উপস্থিত দেখা না গেলেও, এবং যে কারণেই হউক **কুকুর, বিড়াল কামড়াইলে কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়।** অন্ততঃ ১০ দিন জন্তুটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি ইতিমধ্যে হঠাৎ মরিয়া যায় বা উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার ভিতর রোগ বীজ ছিল—উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই সেই জন্তুকে মারিয়া ফেলিতে হয়।

প্রতিবিধান : উর্দ্ধ বা নিম্নাঙ্গে দংশন হইলে এবং বন্ধনী দিবার সুবিধা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে হইবে এবং ক্ষতস্থান চাবি পোড়াইয়া অথবা তীব্র কার্বনিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর পরিষ্কার ড্রেসিং দ্বারা ঢাকা রাখিতে হইবে।

প্রধানতঃ মনে রাখা দরকার যে বন্ধনী দিয়া, ক্ষতস্থান চিরিয়া রক্তস্রাবের সঙ্গে শরীর হইতে বিষ বাহির করিয়া এবং ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া বিষ নষ্ট করিয়া যাহাতে বিষ রক্তস্রোতের সহিত দেহের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালিত হইতে না পারে

অবিলম্বে তাহাই করিতে হইবে। দংশনের ফলে কোনও শিরা বা ধমনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তস্রাব রোগের ব্যবস্থা করিতে হয়।

রোগীকে যতদূর সম্ভব প্রফুল্ল মনে রাখিতে হইবে। যাহাকে কোনও ভয়ের ভাব রোগীর মনে উদয় না হয়। এখন প্রায় সব হাসপাতালেই ইহা প্রতিরোধের ইনজেকসন বাহির হইয়াছে। সুতরাং হাসপাতালের দূরবর্তী কোনও অঞ্চলে হইলে রোগীকে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া হাসপাতালে নিয়া আসিতে হইবে।

কীটপতঙ্গের দংশন

কাঁকড়া বিছা বা তেঁতুল বিছার দংশন বা হুল ফুটান—ইহাদের লেজের অগ্রভাগে হুলের অতিশয় সূক্ষ্ম নলী আছে। ঐ নলী বিষগ্রন্থির সহিত সংযুক্ত। হুলের মধ্যস্থ নলের ভিতর দিয়া হুল ফুটান স্থানে বিষ প্রবেশ করে। এই বিষ ছোট ছোট বালক বালিকাদের দেহে প্রবেশ করিলে তাহাদের হৃৎপিণ্ডের গতি হঠাৎ বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

এই জাতীয় জীবের বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে হুল ফুটান স্থানে তীব্র বেদনা, স্ফীতি এবং শরীরে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য হয়; সময়ে সময়ে ক্ষত গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়।

প্রতিবিধান : হুল বা কাঁটা থাকিলে চাবির ফুটার সাহায্যে তুলিয়া ফেলিতে হয়। ইহাছাড়া অ্যামোনিয়া ও চূণ একত্রে মিশাইয়া জলে গুলিয়া ক্ষতস্থান বারে বারে ধুইয়া দিতে হইবে। বাইকার্বনেট অফ্ সোডা এবং স্যালভোলেটাইল একত্র মিশাইয়া পেষ্ট করিয়াও ক্ষতস্থানে লাগানো যায়। নুন জল অথবা সোডা বা পটাস পারমাঙ্গানেট জলে গুলিয়া অথবা পিঁয়াজ বা তামাক পাতার রস ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে বা ব্লু-ব্যাগ ব্যবহার করিলেও যন্ত্রণার লাঘব হইবে। কালো তুলসীর রসও খুব উপকারী। গুরুতর অবস্থা হইলে হাসপাতালে নিতে হইবে। অনেক সময় ইনজেকসন না পড়িলে রোগীকে বাঁচানো কষ্ট হয়।

মূর্চ্ছা বা অবশাঙ্গ হওয়া : বিভিন্ন কারণে মূর্চ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এবং মূর্চ্ছার লক্ষণও বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। সাধারণতঃ মৃগী, হিষ্টিরিয়া, ইউরিমিয়া প্রভৃতি রোগীরা মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যায়। কোনও কোনও রোগী এই অবস্থায় হাত পা ছোড়ে, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া যায়। আবার কাহারও কাহারও চোখ লাল হইয়া যায়। মুখ দিয়া ফেনা ওঠে, কখনও কখনও বা গোঙ্গানি শব্দ হয়, দেহ

বাঁকিয়া যায়। অনেক সময় রোগী মূর্চ্ছা ভাব দূর হওয়ার পরও দুই তিন দিন খুব দুর্বল থাকে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান: যতদূর সম্ভব রোগীর কাপড় জামা আলগা করিয়া দিতে হয়। ভীড় সরাইয়া মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা করিতে হয়। রোগীর দাঁত ফাক করিবার জন্য অযথা চেষ্টা করা উচিত না। ইহাতে প্রতিবিধানকারীর আঙ্গুল কাটিয়া যাইতে পারে। রোগীর জিৎ যাহাতে না কাটে সেজন্য সম্ভব হইলে দাঁত ফাক করিয়া চামচ অথবা রুমাল দুই পাটি দাঁতের নীচে রাখিতে হইবে। লঙ্কা অথবা ব্লটিং কাগজ পোড়াইয়া নাকের কাছে ধোয়া দিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। বাড়ীতে স্মেলিং সল্টের শিশি থাকিলে রোগীর নাকের কাছে ধরিলে উপকার পাওয়া যায়। হিষ্টিরিয়া রোগীর প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া হাসপাতালের ভয় দেখাইয়া বা শাসনের স্বরে কথা বলিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত গরমে, ভীড়ের চাপে, রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা, ক্ষুধা প্রভৃতি কারণ হইতেও অনেক সময় মূর্চ্ছা দেখা যায়। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই সংজ্ঞা লোপ পায়। এরূপ অবস্থায় ভীড় সরাইয়া মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া দিতে হয়। হাত পা, ঠাণ্ডা হইলে গরম সেকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাথায় ও চোখে জলের ঝাপটা দিলে ভাল হয়। জামা কাপড় আলগা করিয়া দিতে হয়। রোগীর জ্ঞান আসিবার পর দুধ, হরলিক্স্, চা, কফি, ইত্যাদি দেওয়া যায়। রোগীকে স্মেলিং সল্ট শোঁকাইবার পরও যদি জ্ঞান না আসে তবে অবিলম্বে ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর ক্রমবিকাশ এবং পরিচালনা পদ্ধতি

শিশুর জীবনকে মোটামুটি ভাবে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। শিশু অসহায়, অপরের সাহায্যে ধীরে ধীরে বড় হইয়া ওঠে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিভিন্ন স্তর পার হইতে হয়। যেমন—শৈশব, কৈশোর, যৌবনাগম ইত্যাদি। বিভিন্ন স্তরে ভাগ করিলেও একটি সাত বছরের বালকের সহিত ছয় বছরের বালকের মানসিক প্রভেদ খুব সহজে ধরা পড়ে না আবার বার বছরের একটি ছেলের সহিত এগার বছরের

বালকের পার্থক্যও সব সময় বোঝা যায় না। তবে একথা সত্যি যে কয়েক বছরের পার্থক্যে শিশুর বুদ্ধি, উপলব্ধি অনেক বাড়িয়া যায় এবং শিশু তাহার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়। এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় উন্নীত হওয়ার মাঝে কোনও ফাঁক নাই। একদিনে চট করিয়া কেহ বড় হয় না আবার পরিবর্তনগুলিও বিশেষভাবে অনুভূত হয় না। অত্যন্ত ধীরে ক্রমশ: এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় আসে ; শৈশবের পর বাল্য তারপর কৈশোর। এই পরিবর্তনের গতি ধীর, এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থার মধ্যে কোনও সীমা রেখা নাই। একথা মনে রাখিয়া শিশুর জীবনকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হইয়াছে।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন **মাতৃস্নেহ** এ বিষয়ে কোনও দেশের মনস্তত্ত্ব বিদ্‌দের ভিতরই কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু বর্তমান জগতে নারীজাতি আর ঘরে বসিয়া নাই। অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় উহারা বাইরের জগতে বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দেয়। শিশু পালনের ভার থাকে বেতনভোগী লোকের কাছে। আবার আড়াই বৎসর কিংবা ৩ বৎসর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে বিভিন্ন নার্সারীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাহার খেলার মাধ্যমে নানা-প্রকার শিক্ষা লাভ হয় বটে কিন্তু **শিশু মায়ের সঙ্গ পায়না। ফলে মায়ের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হয়।** যে সব মায়েরা বাড়ীতে থাকে, তাহারও ছেলে-মেয়েকে নার্সারীতে পাঠাইয়া নিজেরা ঝাড়া হাত পায় থাকিতে চায়। ছেলেমেয়েদের বায়না, আবদার, কৌতূহল, জেদ এগুলি মায়েরা এখন আর সহ্য করিতে পারে না। অথচ প্রাচীনকালের মায়েরা একসঙ্গে ৪।৫টি সন্তান সমানভাবে শাসনে স্নেহে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। এখনকার মত উহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতাও ছিলেন না। কিন্তু ছিল শুধু **অন্তরের স্নেহ ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা।** সন্তান পালনের কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। তাই সন্তানকে তাঁহারা দূরে সরাইয়া দিতেন না। এই সকল শিশুদের ভবিষ্যতে মানুষ হওয়ার পথে কোনও সমস্যাই ছিল না। শিশু পালনে, আধুনিক যুগে গবেষণামূলক যতই তথ্য বাহির হউক না কেন **যে শিশু মায়ের সঙ্গ লাভ করিতে না পারিয়া মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত সে সুস্থ মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না।**

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু পর্যবেক্ষণ ও উহার যত্ন

(ক) সমগ্র শৈশব কাল শিশুর সুস্থ ও মনোহর পরিবেশে অবস্থিতি।

শিশুর সুস্থ ও মনোহর পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিণত জীবনের সুস্থ ও সবল বিকাশ, ঠিক একই কারণে বলা যায় শিশুর মানসিক বিরোধ অনেক সময় পরিণত জীবনের বিকার ও অসঙ্গতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বয়স্কদের মত শিশুর কাজও থাকে, আবার কাজের মধ্যে অবসরও আছে। খাওয়া, খেলা, ঘুমানো এই তিনটি শিশুর প্রধান কাজ। অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের কিছু সময় আবার লেখা পড়ার ভিতর কাটে। কিন্তু এই লেখা পড়ার যাবতীয় বিষয় মোটামুটি খেলার মাধ্যমে বা চিত্তাকর্ষক কোনও পরিবেশের মধ্যে হইলেই ভাল হয়। কিছু সময় শিশু একেবারেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। এই অবসর সময় শিশু চুপচাপ কাটাইয়া দিলে শিশুর মন বিষন্নতায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। এই সময়টা শিশুর চিত্তবিনোদনের কাজে লাগাইতে পারিলে শিশুর দেহ ও মন দুইই সুস্থ থাকিবে। শিশুর কাজের ভিতরও আবোল তাবোল গল্প ও গানের অনেক মূল্য আছে। ঘুম পাড়ানী গান শিশু জগত হইতে কোনদিনই দূর হইবে না। অনেক শিশুর খাবার সময় আবোল তাবোল কথা এবং গান শুনিতে না পারিলে আহারে তাহাদের আগ্রহ থাকে না। **শিশুর জীবনে যান্ত্রিক ভাবে কোনও কাজ করানো করিতে গেলে উহার মানসিক বৃত্তিগুলি ভাল ভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে না।** ছোট বেলার ঘুম পাড়ানী গান ও ছড়া শুনিতে শুনিতে যে শিশু তন্ময় হইয়া পড়ে—ভাবী জীবনে সেই শিশুই অনেক সময় বড় সাহিত্যক, কবি দেশ প্রেমিক অথবা সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে। শিশু ছড়া ও কবিতার ভিতর অনেক অর্থ খুঁজিতে চেষ্টা করে। **তাহার জীবনে ছড়া, কবিতা ও সঙ্গীতের প্রভাব অসামান্য।** ভাই, বোন, মা ইহাদের মুখে ছড়া শুনিতে শুনিতে শিশুর মনে সেগুলি দানা বাঁধিয়া থাকে। অনেক সময় সে তাহার পছন্দ মত গান বা ছড়া শুনিবার জন্য বায়না ধরে এবং আধো আধো ভাষায় সেও বলিতে চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার মনে যে কি অপরিসীম আনন্দ সৃষ্টি হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। **শিশুর জীবনে এই ছড়া ও সঙ্গীত চিরন্তন—পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।** যে শিশু এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত, সে প্রকৃতই হতভাগা। ছড়া, সঙ্গীত গুলির একটা বিশেষ স্থর

শিশুর জীবনে ছড়া সঙ্গীতের প্রভাব

আছে। যাহা শিশু মনকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে ; একটু বড় হইয়া শিশু এই ছড়ার সুরের ছন্দে তাহার দেহখানিকে আন্দোলিত করে। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ইতিহাস এই ছড়া সঙ্গীতের ভিতর বিদ্যমান।"

শিশুর জীবনে ছড়া সঙ্গীতের মত খেলাও একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। খেলার ভিতরেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শিশুর খেলার সামগ্রীর নির্বাচনে ত্রুটি থাকিলে শিশুর খেলার ভিতর আনন্দ পায় না এবং সেই খেলা কখনই ফলপ্রসূ হয় না। বালক বালিকা ভেদে, বয়সের তারতম্য ভেদে এবং শিশুর একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী উহার খেলার উপকরণ যোগাইতে হয়। শিশুর জীবনে খুব কম সংখ্যক খেলনা যেমন উহার মনের স্পৃহা দমন করিতে ব্যর্থ হয় অপরপক্ষে অহেতুক রাশি রাশি খেলনা দ্রব্য অনেক সময় শিশুকে হতভম্ব করিয়া তোলে এবং কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা গ্রহণ করিবে সে বিচার করিতে পারে না। তাহা ছাড়া শিশুর জীবনে কম পাওয়ার বেদনা যেমন ক্ষতিকর আবার বেশী পাওয়ার অভ্যাসও শিশুর চরিত্র গঠনে ক্ষতি সাধন করে। অতএব অপর্য্যাপ্ত খেলনা শিশুকে দেওয়া উচিত নয়। **খেলাধূলার ভিতর দিয়া শিশুর দল গঠনের মনোভাব সৃষ্টি হয়। সঙ্গী সাথীদের সহিত খেবাধূলা করিয়া শিশুর সামাজিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়।** শিশু তাহাদের ভালবাসতে শিখে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং তাহাদের সহযোগিতা পছন্দ করে। **খেলার ভিতর দিয়া শিশুদের বুদ্ধিমত্তা, ক্ষিপ্রতা, চাতুর্য, গঠন নৈপুণ্য, সক্রিয়তা ও দক্ষতা এই গুণগুলি আয়ত্ত হয়।**

খেলার প্রভাব

ছেলেরা বল, ব্যাটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলিতে ভালবাসে। শিশু একটু বড় হইলে খেলার এই উপকরণগুলিই উহাদের উচ্চতা অনুযায়ী ও বয়স অনুযায়ী দেওয়া উচিত। যে খেলনা শিশুর পক্ষে নাড়া চাড়া করা অসুবিধা জনক তাহা উহাকে দেওয়া উচিত নয়। মেয়েদের উপযোগী খেলনা হাড়ি, কলসী, থালা বাটি, হাতা, খুন্তি এ সকলই ছোট বালিকারা পছন্দ করে। বিভিন্ন রকমের পুতুলও মেয়েদের আকর্ষণীয় খেলার বস্তু। উহারা পুতুলের বিয়ে দেয়। পুতুলের ঘর সংসার গোছায় আর নিজের মাকে অনুকরণ করিয়া পাকা পাকা কথা বলে। ইহাতে উহারা এক নতুন আস্বাদ লাভ করে। শিশুরা একটু বড় হইলে ছেলে মেয়ে উভয়ই ছুটাছুটি করিয়া বিভিন্ন খেলা খেলিতে ভালবাসে। গোল্লাছুট, কাবাডি, হাডুডু, খো খো প্রভৃতি উহাদের প্রিয় খেলা এইসকল **খেলার মাধ্যমে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি**

এবং সুগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস, মনের দৃঢ়তা, বৃদ্ধি পায়। মানসিক জড়তা হীনমন্যতা প্রভৃতি দূর হয়।

ইহার পরেই আসে গল্পের কথা। গল্প ভালবাসে না এমন শিশু বিরল। শিশু তাহার সময় কাটাইতে গল্প শুনিয়া। একেবারে শিশু অবস্থায় যে শিশু আবোল তাবোল কথাবার্তায় এবং ছড়া-কবিতায় মাতিয়া থাকে; সেই শিশুই একটু বড় হইলে ঠাকুরমা, পিসীমা ও দিদিমাকে পাগল করিয়া তোলে একের পর এক গল্প বলার জন্য। গল্প পাইলে সে তখন আহার-নিদ্রা সবই ভুলিয়া যায়। শিশু অতি বিস্ময়ের সঙ্গে পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতের গল্প, 'ঠাকুরমার ঝুলির' ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গামীর গল্প, রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প, আবার ভূতের গল্প, রাক্ষসের গল্প সবই সত্যিবলিয়া মনে করিয়া আগ্রহেরসহিত শুনিতে চায়। একথা সত্যি যে রূপকথা ও পৌরাণিক গল্প শোনার মাদকতা সেকালের শিশু অপেক্ষা একালের শিশুদের অনেক কম। এ দোষ এখনকার ঠাকুরমা, দিদিমা ও মায়েদের। ঠাকুরমা, দিদিমারা এখন যতই শিক্ষিত হউক না কেন কাল্পনিক গল্পগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার বাচন ভঙ্গীটি এখন আর পূর্বেকার মত নাই। তাই এখনকার শিশুরা ঐ ধরনের গল্প শুনিলে কিছুটা অবিশ্বাসের ভাব লইয়া নানা রকম প্রশ্ন করে। এখন ঐ সকল গল্প তাহাদের মনে বিস্ময় ও দোলা দিতে পারে না। বর্তমান যুগে ছেলে-মেয়েরা জন্তু-জানোয়ারের গল্প শুনিতে ভালবাসে। কলিকাতার মত শহরে আসিলে প্রথমেই তাহাদের চিড়িয়াখানা দেখাইতে হয়। শৈশবের গল্প শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিতে অনেক সাহায্য করে। **গল্পের ভিতর দিয়া শিশুর কল্পনা-শক্তি বৃদ্ধি পায়।** উপদেশের দ্বারা শিশুকে নীতি শিক্ষা শেখানো যায় না, কিন্তু **নীতিমূলক ভাল ভাল গল্প শিশুকে শোনানো হইলে সেই আদর্শ শিশুর জীবনে বদ্ধমূল হইয়া ভবিষ্যতে প্রভাবান্বিত হইতে পারে।** গল্পের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে শিশুকে মাতৃভক্তি, সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দেশাত্মবোধক এবং কোনও বীরত্বমূলক গল্প শুনাইতে পারিলে শিশু বড় হইয়া কোনও ডিটেকৃটিভ বা রহস্যমূলক কোনও বই পড়িতে ভালবাসিবে না। গল্প নির্বাচন করিতে না পারিলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন আদর্শরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। শিশুর অবসর সময় কাটাইবার জন্য এবং তাহার জীবনে সুস্থ ও মনোহর পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইলে ছড়া, কবিতা, সঙ্গীত, খেলা এবং ভাল ভাল গল্প একান্ত অপরিহার্য।

শিশুর জীবনে গল্পের প্রভাব

(খ) **জন্ম, শৈশব ও পরিণত প্রথম বারো বৎসর:** ছোট্ট অসহায় শিশু একদিন বড় হয়। সমাজে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া দশজনের ভিতর একজন হইয়া

ওঠে। শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করে। শিশুদের জীবন লইয়া একটি সুসঙ্গত ধারা আবিষ্কার করিতে গেলে প্রত্যেকটি শিশুর জীবনের ধারাই পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। আবার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধারার গতিও একরূপ হয় না বলিয়া একটি নির্দিষ্ট শিশুর বিভিন্ন বয়সের বিকাশের গতিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিলেই শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি

ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর ওজন সাধারণতঃ ৬/৭ পাউণ্ড হইয়া থাকে; এবং ২০ ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা হয়। একটি সুস্থ শিশু দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া ৫।৬ মাসে তাহার ওজন প্রায় জন্ম-সময়ের ওজনের দ্বিগুণ হয়। আবার এক বছর বয়সে শিশুর ওজন জন্মের ওজনের ৩ গুণ বেশী হয়। উচ্চতা সকল শিশুর একরূপ হয় না তবে ঠিকমত বৃদ্ধি হইলে একবছর বয়সে অন্ততঃ ২৮ ইঞ্চি লম্বা হওয়া উচিত। শিশুর জন্মের প্রথম বছরেই মাথার বৃদ্ধি খুব দ্রুত হইতে থাকে। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে **হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, যকৃৎ**, এবং অন্ত্র সকলই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জন্মগ্রহণ করিবার সময় শিশুর কোনও দাঁত থাকে না। শিশুর ৭।৮ মাস বয়স হইতে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। আড়াই বৎসর বয়সের ভিতর শিশুর সমস্ত দাঁত বাহির হইয়া যায়। **দাঁত ওঠার কোনও ব্যতিক্রম দেখা গেলে বুঝিতে হইবে শিশুর দেহে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের অভাব রহিয়াছে।**

শিশুর একমাস বয়স হইতে চার মাস বয়স পর্যন্ত শিশু সাধারণতঃ হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে। তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে এ বয়সে তাহারা কোনও কাজ করিতে পারে না। **একেবারে শৈশব অবস্থায় শিশুর কাজগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ামূলক হইয়া থাকে।** কেহ মুখের দিকে তাকাইলে সেও হাসে; সে তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী হাসে না। ৪ মাস বয়স হইতে শিশু অনেকটা শক্ত হয়, তাহাকে খাড়াভাবে কোলে নেওয়া যায়; তাহার ঘাড় মোটামুটি শক্ত হইয়া যায়। ৭।৮ মাস বয়সে হাতের ভর ছাড়াই বসিতে পারে। এই বয়সে লোকজনও চিনিতে পারে। অচেনা লোকের কাছে যাইতে চায় না; তাহার মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে। খেলনার রং সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান হয়। ৮ হইতে ১০ মাসের ভিতর হামা দেয় এবং এক বৎসর বয়সেই হাঁটিতে আরম্ভ করে। ১৫।১৬ মাসের ভিতর হাঁটিতে না পারিলে অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার **অনেক সময় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগের জন্য শিশুর বৃদ্ধি ঠিকভাবে হয় না এবং উপযুক্ত বয়সে তাহার বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, কোনটাই আরম্ভ হয় না।**

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কাজগুলিও শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে হয় না। জন্মিবার পর শিশুর দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ থাকে। ৩।৪ সপ্তাহের ভিতর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ইহার পূর্বে শিশু প্রায় চোখ বন্ধ করিয়াই থাকে। শিশুর চোখে তীব্র কোনও আলো সহ্য হয় না। **শিশুর শ্রবণশক্তি জন্মের ৫।৬ দিন পর প্রখর হয়।** কোনও জোর আওয়াজ শুনিলে সে তখন ঘুমের ভিতরও চমকাইয়া ওঠে। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক আছে কিনা এবং ক্রমশঃ প্রখর হইতেছে কিনা এ বিষয়ে মায়ের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কোনও প্রকার সন্দেহ জাগিলে চিকিৎসক ডাকিয়া চিকিৎসা করানো অথবা তাহার নির্দেশ পালন করা একান্ত কর্তব্য।

একেবারে ক্ষুদ্র শিশুর কোনও ভাষা নাই; কান্না দিয়াই সে তাহার মনের ইচ্ছা বুঝাইতে চায়। সেইজন্য শারীরিক অসুস্থতার কান্না, ক্ষুধার কান্না, নিদ্রা যাইবার কান্না অনেক সময় বিভিন্ন রকমের হয়। ৩।৪ মাস বয়সে শিশু মুখ দিয়া কয়েকটি শব্দ বাহির করে মাত্র। কিন্তু ৬।৭ মাস বয়সে কথা বলিবার চেষ্টার ছলে মা, বাবা, দাদা ইত্যাদি কথাগুলি শিশুর মুখ হইতে বাহির হয়। এক বৎসর বয়সে শিশু কয়েকটি স্পষ্ট ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা উচ্চারণ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এক বৎসর বয়সের ভিতর শিশুর মুখ দিয়া কোনও রকম শব্দ উচ্চারিত না হইলে বোঝা যাইবে শিশু বোবা বা কালা। এ অবস্থায় চুপচাপ না থাকিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপনায় শিশুর চিকিৎসা করাইতে হইবে।

শিশুর ক্রমবিকাশে যত্ন ও শিক্ষা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শিশুর শারীরিক অবস্থা ও বাইরের পরিবেশ তাহার ক্রমবিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। **শিশুর ক্রমবিকাশের মূলে আছে শিশুর উপযুক্ত খাদ্য, যত্ন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সূর্যালোক, মুক্ত বায়ু ও নির্মল আবহাওয়া। শিশুর জীবনে ইহার কোনও একটির অভাব ঘটিলে ক্রমবিকাশের ধারার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।** শিশুর উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশু নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া উহার বাড় বন্ধ হইয়া যায়। **উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশুর চোখের রোগ, দাঁতের রোগ, কানের রোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।** যে শিশু অনবরতই গলা ব্যথায় ভোগে, তাহার কারণও অভাবজনিত অপুষ্টি। শিশুদের ভিতর অনেক সময় চর্ম-রোগের প্রকোপ দেখা যায়। খাদ্যে ভিটামিনের অভাব ঘটিলে শিশুর চর্মরোগ হয়। অনেক সময় সচ্ছল পরিবারের শিশুদের এই সকল রোগ দেখা যায়। ইহার কারণ অজ্ঞতা ও অযত্ন।

খাদ্য ছাড়া নিদ্রাও শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

সুনিদ্রা না হইলে শিশুর স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয় না ; ইহাতে দেহও ঠিকভাবে গঠিত হয় না। শিশুকে নিয়মমত স্নান করাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। স্নান না করাইলে শিশুর ভাল ঘুম হয় না। তেল মাখাইয়া স্নান করাইলে শিশুর দেহে রক্ত-চলাচলের সুবিধা হয় ; ইহাতে চর্মরোগ হইতে পারে না।

শিশুকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত পোশাকের। একেবারে ছোট শিশুদের পোশাকের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনও অনুভূতি থাকে না এবং পোশাকের শ্লীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যও তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। কেবলমাত্র স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই এই সময় আবহাওয়া অনুযায়ী জামা-কাপড়ের প্রয়োজন। ছোট শিশুকে কখনই জামা না পরাইয়া রাখা উচিত নয়, ইহাতে তাহার ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে। উহার ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খুবই কম। শিশু একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার পোশাক-পরিচ্ছদ এমনভাবে হওয়া উচিত যাহাতে সে নিজেই খুলিতে পারে ; ইহাতে শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে।

শিশুর ক্রমবিকাশের ধারা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিলেও সকল শিশুর ক্রমবিকাশ একই ধারায় হয় না। **কোনও কোনও শিশু অতি সহজেই এক একটি কাজ আয়ত্ত করিয়া ফেলে।** বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, কথা বলা সবই তাহারা আগে আগে শেখে। ইহার কারণ **উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ অপেক্ষা বেশী।** আবার কোনও কোনও শিশু সব কিছুই অনেক দেরীতে আয়ত্ত করে। সাধারণ অপেক্ষা উহাদের বুদ্ধি অনেক কম।

যে পরিবারে আরও পাঁচটি শিশুর কলকাকলী শোনা যায়, সেই পরিবারের ক্ষুদ্রতম শিশুটি তাহাদের অনুকরণে তাড়াতাড়ি কথা শেখে এবং আরও অনেক কাজই তাহাদের অনুকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলে। অনুকরণের মাধ্যমে বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে শিশুর ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হয়। শিশু যে পরিবারে যে পরিবেশে থাকে সেই পরিবেশের ভাষাই আয়ত্ত করে। তাই বাঙালী শিশু কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই মা, বাবা, দাদা, মামা, কাকা ইত্যাদি উচ্চারণ করে। এর পূর্বে তাঁহার আধো আধো শব্দগুলি বুঝিয়া ডাকে না, তাহার অজ্ঞাতেই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। **শিশু যখন কথা বলিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট কোনও বিকৃত উচ্চারণ বা অশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে নাই ; ইহা শুনিতে শুনিতে শিশু ভুল ও কদর্য উচ্চারণই শিখবে।** শিশুর জীবনে ছড়া কবিতার প্রভাব খুব বেশী। ছড়া-কবিতা শুনিতে শুনিতে শিশু তাড়াতাড়ি ভাষা শিখিয়া ফেলে ; এই কারণেই পরিবেশের

উপর শিশুর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়। শিশুদের সঙ্গে কখনও আধো আধো উচ্চারণে কথা বলিতে নাই। ইহাতে শিশু কোনদিনই স্পষ্ট উচ্চারণ শিখিতে পারিবে না। অধিকন্তু শিশুর বয়স বাড়িয়া গেলেও এই উচ্চারণে অভ্যস্ত হইলে উহাতে প্রশ্রয় না দিয়া শোধরাইয়া দিতে হয়।

জন্ম হইতে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর সামাজিক চেতনার ক্রমবিকাশ

শিশু জন্মের **প্রথম সপ্তাহে** মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়ে এবং হাঁচে, কাসে ও হাই তোলে; ২।৩ সপ্তাহ পর শব্দ লক্ষ্য করে, স্থির জিনিসের প্রতি তাকাইয়া থাকে। **দ্বিতীয় মাসে** গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে, মা'র গলার স্বর ভালভাবে চেনে, মাঝে মাঝে মুখ দিয়া অস্ফুট ধ্বনি বাহির হয়। মানুষ কাছে থাকিলে খুশী হয়, এবং হাসে। কাঁদিলে, কেহ কোলে করিলে চুপ করে। **তৃতীয় মাসে** উপুড় হয়, জিনিস ধরিতে চেষ্টা করে, আনন্দ প্রকাশ করে। শব্দ শুনিলে বুঝিতে পারে কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, ঘাড় ফিরাইয়া শব্দ লক্ষ্য করে। সঙ্গী চায় এবং আবোল-তাবোল কথা বলিয়া এবং গান গাহিয়া ভুলাইতে হয়। **চতুর্থ মাসে** মাথা খাড়া করে, হাতে লোলা বা খেলনা দিলে মুখে দিতে চেষ্টা করে, নানারকম শব্দ উচ্চারণ করে। আদর বুঝিতে পারে। জোরে ধমক দিলে ঠোঁট ফুলাইয়া দুঃখ জানায়। **পঞ্চম মাসে** কোনও কিছু অবলম্বন করিয়া বসিতে পারে, খুশী ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে পারে। চেনা-অচেনার পার্থক্য ভালভাবে বোঝে; নূতন গলার স্বর বোঝে। **ষষ্ঠ মাসে** কিছু অবলম্বন না করিয়া অল্প সময় বসিতে পারে। নিজের পা মুখে দিয়া খেলা করিতে চায়। নাম ধরিয়া ডাকিলে বুঝিতে পারে। কোলে ওঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হাত বাড়ায়, অপর শিশু মা'র কোলে উঠিলে সহ্য করিতে পারে না, হিংসার ভাব জাগে। আদর করিলে আদর বোঝে। **সপ্তম মাসে** নিজে নিজে অবলম্বন ছাড়া বসিতে পারে, কাহারও সাহায্য পাইলে দাঁড়াইতে চায় এবং কোনও কাজে কৃতকার্য হইলে আনন্দ প্রকাশ করে। দূরে জিনিস ধরিতে চেষ্টা করে। আপন মনে খেলনা দিয়ে খেলা করে। **অষ্টম মাসে** দাঁড়ান অবস্থা হইতে পড়িয়া না গিয়া বসিতে পারে। বড়দের নকল করিয়া কাহারও যাইবার সময় টা-টা করিয়া দেয় এবং হাতের কব্জি ঘুরাইতে শেখে; "হাত ঘুরাইলে নাড়ু দেবো" বলিলে হাত ঘুরাইতে থাকে। হাতে তালি বাজাইতে বলিলে বাজায়। **নবম মাসে**

হামাগুড়ি দেয়, দাদ্দা, মাম্মা উচ্চারণ করে ; লুকানো জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। **দশম মাসে** বসা অবস্থা হইতে নিজে দাঁড়াইতে পারে। জিভ দিয়া শব্দ করিলে সেই শব্দ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, অপর শিশুর হাবভাব নকল করে, তাহার অপেক্ষা ছোট শিশুকে আদর করিতে চায়। খেলনা কাড়িয়া নিলে রাগ হয়। **একাদশ মাসে** ধরিয়া হাঁটাইলে, হাঁটি হাঁটি পা পা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে থাকে। কোনও কিছু দিতে বলিলে, বা কোনও কিছু বারণ করিলে বোঝে। দুধের গ্লাস নিজে মুখে তুলিতে পারে। কোনও কিছু কাজ ভাল বলিলে উৎসাহের সহিত আবার করে এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে। **দ্বাদশ মাসে** নিজের চেষ্টায় দাঁড়ায়, কিছু ধরিয়া উঠিতে পারে। অর্থপূর্ণ শব্দ ছাড়া ছাড়া ব্যবহার করে। আদেশ, নির্দেশ এগুলি মোটামুটি বোঝে।

শৈশব ঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু পৃথিবীতে আগমন করে নিতান্ত অসহায় ভাবে। সে সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল। এই বয়সে শিশু ইন্দ্রিয় সাহায্যে অনুভূতির দ্বারা কেবলমাত্র উপলব্ধি করে, বুদ্ধি বা যুক্তি বিশেষভাবে খাটাইতে পারে না। স্নেহ, ভালবাসা, ভয়—এই ভাবাবেগগুলিই তাহার ভিতর প্রধানভাবে লক্ষিত হয়। মাকে কাছে পাইয়া সে তৃপ্তিলাভ করে ; মার আদরের স্পর্শে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে, একমাত্র মাকে পাইলেই শিশুর মনে আসে পরম নিরাপত্তার ভাব। **শৈশবে মাতৃহারা হইয়া মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলে শিশু ভবিষ্যতে স্বাভাবিক ও সুস্থ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না,** ফলে তাহার জীবন সুখময় হয় না। শিশু যেমন ভালবাসা চায়, আবার ভালবাসিতেও চায়। ডাঃ সাটি নামক এক মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন—**'পরিণত জীবনে ঘৃণা, উদ্বেগ, অহেতুক ভয়ের মূল কারণ হইতেছে শৈশবের স্বাভাবিক স্নেহাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির অভাব।**

দুই হইতে চার বৎসরের শিশু নিজেকে এই সময় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মনে করে না। জগৎটা তাহার কাছে অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। এই সময় শিশু কৌতূহল-প্রিয় হইয়া সব কিছু জানিতে চায়। **ডাঃ হ্যাডফিল্ড এই সময়ের শিশুকে বৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়াছেন।** চার বছরের শিশুর ইন্দ্রিয় এই সময় খুব প্রখর হয়। শিশুর অহংবোধ বেশী থাকে। কোনও কিছু বায়নাকে উপলক্ষ্য করিয়া সে তার-স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। অধিকন্তু তাহার দিকে মন না দিলে আরও চটিয়া যায়। শিশুর জীবনে এই বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পিতামাতা এবং বাড়ীর অন্য পরিজনদের শিশুর আচরণের প্রতি গুরুত্ব দিয়া তাহার প্রতি মনোযোগী হইতে হয়। শিশুর জেদকে অবহেলা করিতে নাই ; ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে

না। ছোটবেলার জেদী প্রকৃতির শিশু পরিণত বয়সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইয়া থাকে। **এই বয়সের শিশু কৌতুহলপ্রিয় বলিয়া সব কিছুর সম্বন্ধে কেবল প্রশ্ন করে। পিতামাতার তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া উচিত, তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া কোনও অনিচ্ছা বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে নাই।**

শিশুর এই বয়সে সে যে পরিবেশে প্রতিপালিত হয় সেই গৃহের আদর্শ নিজের অজ্ঞাতেই গ্রহণ করে। বালকেরা পিতার আদর্শ এবং বালিকারা মায়ের আদর্শ অনুকরণ করে; তাই পিতামাতার মধ্যে কলহ কিংবা উহাদের নৈতিক শিথিলতা শিশুর জীবনে প্রভাবান্বিত হয়। শিশুর জীবন সুন্দর ও আদর্শরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে পিতামাতার জীবনও সুন্দর ও নির্মল হওয়া উচিত।

৪ হইতে ৭ বৎসর: এই বয়সে শিশু খানিকটা স্বাধীনচেতা হয়; আবার মাঝে মাঝে নির্ভরশীলও হইতে দেখা যায়। বড়দের আদেশ মত কাজ করিতে ভালবাসে। **নিজের খুশীমতও অনেক কাজ করে, ইহাতে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। শিশুর এই নিজে নিজে কাজ করিবার ভিতর তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ হয়।** এই বয়সে শিশু প্রকৃতিকে খুব ভালবাসে; গাছ-পালা, পশু-পাখী তাহার কাছে প্রিয় হইয়া ওঠে। **এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা বিড়াল, কুকুর, মুরগী, টিয়া প্রভৃতি পশুপক্ষী পুষিয়া আনন্দ পায়। শিশুদের এই ইচ্ছা দমাইয়া না রাখিয়া উৎসাহিত করিয়া তুলিতে হয়।**

শারীরিক পরিবর্তন

শারীরিক পরিবর্তনও এই বয়সে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। উহাদের পেশীগুলি পূর্বাপেক্ষা পুষ্ট হয় এবং উহারা সক্রিয় হইয়া ওঠে। এই বয়সে শিশুরা অনেক সময় বিদ্যালয়ে এবং খেলার ক্লাবে ছোট ছোট খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় নাম দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, এবং অনেক সময় ইহাতে কৃতিত্ব অর্জন করে। শিশুরা এই বয়সে নূতন ভাষা ব্যবহার করে। অনেক সময় এমন সব কথা বলে, মনে হয় যেন অপর কেহ তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে। খানিকটা যুক্তি-তর্ক দিয়াও সে এই সময় কথা বলিতে পারে। এই বয়সের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, শিশুরা কল্পনা করিতে ভালবাসে কিন্তু কাল্পনিক বস্তু যে বাস্তবিক পক্ষে সত্য নয়, সে বোধও তাহাদের কিছুটা থাকে। অন্য শিশুদের প্রতি এই সময় আকর্ষণ থাকে না এমন কি তাহাদের উপর অনেক সময় হিংসার ভাব পরিলক্ষিত হয়। উহারা কিছুটা অসামাজিক হইয়া পড়ে।

কৈশোর বা পরিণত (৮—১২ বৎসর): এই বয়সের শিশুদের পরিবেশের

পরিধি অনেক বাড়িয়া যায়। গৃহে পিতামাতার ভালবাসার প্রতি তখন আর ততটা আগ্রহী থাকে না। ছোট ভাইবোনেদের প্রতিও পূর্বের ন্যায় হিংসার ভাব থাকে না। সে অনেক বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করে। এখন আর সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, অপরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলিতে ভালবাসে, দল গঠন করে। **পিতা-মাতা ও শিক্ষকের মতামত অপেক্ষা বন্ধুদের মতামত বেশী পছন্দ করে। এইভাবে সে সামাজিক হইয়া উঠে।** ভাল পরিবেশে পরিচালিত না হইলে অনেক সময় অসৎসঙ্গে পড়িয়া খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে। **দলের প্রতি প্রবল আনুগত্য থাকায় বয়স্কাউট, ব্রতচারী নৃত্য, গানবাজনা প্রভৃতি শিক্ষা লাভের সুযোগ দিয়া আরও পাঁচটি শিশুর সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগ দিতে হয়।** গৃহে এবং বিদ্যালয়ে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব দিয়া এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে হয়।

এই বয়সে শিশু নানা জিনিস সঞ্চয় করিতে ভালবাসে। ডাকটিকিট, গুলি, ছবি, পাথরের নুড়ি, রবার, পেন্সিল ইত্যাদি আরও কত কিছু বলিয়া শেষ করা যায় না। জামার পকেট সম্বন্ধে এই বয়সের ছেলেরা খুব সচেতন থাকে, এবং পকেট হয় অফুরন্ত জিনিসের ভাণ্ডার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়া গিয়াছেন নিয়ামত আলি খলিফার নিকট তাঁহাদের আবেদনের কথা ; এই বয়সের সব শিশুরই ঐ একই আবেদন, জামায় যেন পকেট থাকে।

এই বয়সে শিশু গল্প শুনিতেও ভালবাসে আবার সমবয়সীদের কাছে গল্প বলিতেও ভালবাসে। নূতন কিছু জানিবার এবং নূতন কিছু দেখিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই বয়সের শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। লম্বায় কিছুটা বড় হয়। মনের আনন্দে সর্বক্ষণ হাসিখুশী থাকে এবং খেলাধুলা করিতে ভালবাসে। মাংসপেশী সবল থাকার জন্য কাজ করিবার শক্তি বাড়ে এবং ছোটখাটো পরিশ্রমের কাজ তাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই সময় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য পৃথক ডেস্ক, চেয়ার ও টেবিলের ব্যবস্থা করিলে উহারা খুব খুশী হয় এবং পড়াশুনায় মনোযোগী হয়।

বয়ঃসন্ধিকাল (Pubery and Growth) **: ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়স কৈশোর ও যৌবনের বয়োসন্ধিকাল। এই বয়সে পৌঁছাইবার পরেই শৈশবের সমাপ্তি ঘটে।** ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ভিতর বালক-বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়া যদি যৌবনের পূর্বাভাস লক্ষিত না

হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেহের কোনও গ্রন্থি-সংক্রান্ত ত্রুটি আছে। সুতরাং এ অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

ঠিক কোন্ বয়সে শিশু কৈশোর থেকে যৌবনে আসিয়া পৌঁছায় তাহার সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। ব্যক্তিবিশেষের বয়সের সামান্য পার্থক্যে ইহা ঘটিয়া থাকে। শিশুর ক্রমবিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইতেছে এই বয়ঃসন্ধিকাল। শিশুর মনের পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে হয় যে ঠিক কখন কৈশোর পার হইয়া বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়, তাহা বলা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। বিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিকের মতে বয়ঃসন্ধিকাল মেয়েদের শুরু হয় প্রথম মাসিক ঋতুর সঙ্গে এবং ছেলেদের বেলায় দেহের কয়েকটি স্থানবিশেষে রোম দেখা দিলে। দেশ অনুযায়ী, আবহাওয়া অনুযায়ী, জাতি অনুযায়ী প্রথম মাসিক ঋতু ভিন্ন ভিন্ন বয়সে হয়। **সমস্ত দিক বিচার করিয়া মনস্তাত্ত্বিকেরা বয়ঃসন্ধিকালের বয়স মোটামুটি ১১ বৎসর হইতে ২০/২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত ধরিয়াছেন।** ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনাগম আগে হয়, আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা যৌবনাগম আগে হয়।

এই সময় ছেলেদের গলার স্বরের পরিবর্তন হয়, গোঁফ-দাড়ির রেখা বাহির হয় এবং বগলের নীচে রোমোদ্গম দেখা দেয়। সাধারণতঃ যৌবনাগম সময় হইতে শুরু করিয়া পূর্ণাঙ্গ যুবক-যুবতী হইয়া পর্যন্ত কালকে বয়ঃসন্ধি বা অ্যাডোলেসেন্স বলা হয়। যৌবনাগমের কিছু পূর্বে শারীরিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া গেলে সেই অনুপাতে ওজন কম থাকে। হাত ও পায়ের হাড়গুলি এতো তাড়াতাড়ি লম্বা হয় যে কিছু দিনের ভিতর উহাদের দৈহিক আকৃতি কিছুটা অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। যৌবনাগমের পর দৈহিক বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমিয়া আসে এবং কয়েক বছরের ভিতর একেবারেই কমিয়া যায়। এই অবস্থাকেই পূর্ণ যৌবন বলা হয়।

শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের তুলনায় লম্বা হয়, কিন্তু পরে হঠাৎ ছেলেরা মেয়েদের অপেক্ষা অনেক লম্বা হইয়া পড়ে। সমাজের সঙ্গে ইহারা তখন ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে না। এই সময় মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ সমান ভাবে গঠিত হয় না বলিয়া **ছেলেরা দেখিতে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। মুখে কাঠিন্যের ছাপ পড়ে, চোয়ালের হাড় যেন উঁচু হইয়া বাহির হইয়া আসে। মেয়েদের মুখ এই সময় লাবণ্যযুক্ত হয়।** মেয়েদের গলার

স্বরের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না। ছেলেদের কণ্ঠস্বর কর্কশ, মোটা ও বেসুরা হইয়া পড়ে। ছেলেমেয়েদের এই সময় আত্মসচেতনতা বোধ আসে।

রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন হইয়া যৌনগ্রন্থি হইতে রসক্ষরণ হয়, ফলে আসে **যৌন চেতনা। ইহাছাড়া রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পরিপাকযন্ত্রগুলিও পরিবর্তিত হয়।** এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা বাড়িয়া গেলেও মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, বুকধড়ফড় করা ইত্যাদিলক্ষণ ছেলেমেয়েদের ভিতর দেখা যায়। এই লক্ষণগুলি যাহাতে বেশী দিন স্থায়ী না হয় সেইজন্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত এবং পরিশ্রমের তুলনায় তাহারা যাহাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধির বিকাশ সব থেকে বেশী হয়। বুদ্ধির বিকাশ অপেক্ষাওবিভিন্ন আবেগ প্রবলভাবে দেখা দেয়। ইহারফলে সর্বক্ষণই উহাদের মনে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই সময় একটা মানসিক স্থৈর্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বয়সের ছেলেরা অনেক সময় একটা হঠাৎ বীরত্বের কাজ করিয়া ফেলে। গুরুজনদের শাসন তাহারা মানিতে চায় নাঅধিকন্তু কিছুটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে।

শৈশবে ভালবাসার অভাব ঘটিলে কিশোর বয়সে সেই অভাবের পুনরায় অনুভূতি জাগে এবং উহা পূরণ করে বাইরের সমবয়সী বন্ধুদের ভালবাসিয়া; আবার পরবর্তী বঃসন্ধিকালে এই আকর্ষণ গিয়া পড়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি। মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেরা এবং ছেলেদের সম্বন্ধে মেয়েরা বিশেষ সচেতন হইয়া ওঠে এবং উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে। **যৌন জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা অস্বাভাবিক কৌতূহল মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর।** এ বিষয়ের যথেষ্ট সুশিক্ষার প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ বই পাঠ করাইয়া এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করানোর কোনও প্রয়োজন হয় না বরং ইহা ক্ষতিকর। **পাঠ্য বিষয়ের সাহিত্য, জীববিজ্ঞান, প্রভৃতি পাঠ করিবার প্রসঙ্গে পিতামাতা অথবা শিক্ষক এ বিষয়ে আলাচনা করিয়া বুঝাইয়া দিত পারেন।** এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ভিতর অহংবোধ ও হীনমন্যতা একসঙ্গে দুই ভাবেরই উদয় হয়। ফলে মনের ভিতর একটি সংঘাত সৃষ্টি হয়। গুরুজনদের কাছে তাহারা তাহাদের মনমত ব্যবহার পায় না। বয়স্করা কখনও তাহাদের নিতান্ত বালক বলিয়া উড়াইয়া দেয়, কখনও তাহাদের বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথা শুনিয়া জ্যাঠামী বলিয়া তিরস্কার করে। উহারা কোন্ পথে বিচরণ করিবে নিজেরা বুঝিতে পারে না। তাহাদের মনে আসে এক দ্বন্দ্ব, তাহাদের প্রায়ই ধারণা হয়, কেহ তাহাদের ভালবাসে না; নিজেদের অসহায় মনে করে। গুরুজনদের নিকট হইতে ভালবাসা চায় কিন্তু প্রকাশ করিতে

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের উপর বয়স্কদের ব্যবহার

পারে না, ফলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া পড়ে; কারণে অকারণে তাহারা প্রকাশ্য ভাবে পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। তাহারা কিছুটা চিন্তাশীল ও খিটখিটে হইয়া পড়ে। ইহাদের চলাফেরাও খানিকটা অস্বচ্ছন্দ হইয়া পড়ে। পিতামাতা ও বয়স্ক আত্মীয়স্বজনেরা ইহাদের অস্তিত্ব যেন সহ্য করিতে পারে না। উহাদের প্রধান দোষ গলার স্বরের বিকৃতি এবং লাবণ্যের অভাব। সংসারে উহাদের অবস্থিতি একটা বেখাপ্পা মনে হয়। পিতামাতা ও আত্মীয় পরিজনের এই দরদহীন ব্যবহার তাহার মনে পীড়া দেয়, নিজেকে সে হীন মনে করে, কোথায়ও নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না অথচ সে স্নেহ-ভালবাসা পাইবার জন্য লালায়িত থাকে।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরকে পরিচালনা এবং উহার উপযুক্ত পরিবেশ : পিতা-মাতা বা অন্যান্য গুরুজনদের সচেতন থাকিতে হইবে এই বয়সে যাহাতে ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত শাসন না করা হয়। এর পূর্ববর্তী বয়সে শাসন করিবার উপযুক্ত সময়। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে দমাইয়া দিলে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হইতে পারে না এবং সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। শাস্ত্রে আছে পুত্র ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করা উচিত। একটি সুস্থ, সুন্দর গৃহ-পরিবেশ তাহার জন্য প্রয়োজন। তাহার মনের অবস্থা যখন ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ তখন একটি সুন্দর গৃহ-পরিবেশ তাহাকে নিরাপত্তা আনিয়া দেয়। এই বয়সে অনুভূতি প্রখর হওয়াতে পিতামাতার সুখ-দুঃখের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। **নিজের মাতা-পিতা এবং গৃহ-পরিবেশ সম্বন্ধে কিশোরের গর্ব থাকিলে ভবিষ্যতে সে সুস্থ নাগরিক হিসাবে গঠিত হইতে পারে।** গৃহ-পরিবেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পিতামাতার। যে গৃহে শান্তি নাই সেই শিশুর জীবনে অসঙ্গতি ও বিকার ঘটিবে ইহাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!

বিদ্যালয়ের জীবন এই বয়সে চরিত্র-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। বিদ্যালয় একটি সমাজ। এখানে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পরিবেশের বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিশিয়া আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইয়া তৃপ্তিলাভ করে। মনের জড়তা কাটে। **খেলাধুলা, তর্ক-বিতর্ক, নাটক অভিনয়, গান-বাজনা, দল বাঁধিয়া বেড়ানো প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের ভিতর দিয়া আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হয়, নেতৃত্ব ও দায়িত্ব বোধ আসে এবং আত্মনির্ভরশীল হয়।** এই সকল ক্ষমতা অর্জন ছাড়া এই বয়সে যে একটা মানসিক সংঘাত সৃষ্টি হয় আনন্দের ভিতর দিয়া মনের সেই জটিলতা ও সংঘাত দূর হয়।

বিদ্যালয়ে শাস্তি দেবার রীতি আধুনিক যুগে কমিয়া গেলেও একেবারে দূর হয় নাই। শাস্তিদানে শিক্ষকদের স্মরণ রাখিতে হয় যাহাতে অন্যায়ের তুলনায় গুরু শাস্তি না দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া দৈহিক শাস্তি না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। শাস্তি পাওয়ার পূর্বে শাস্তি সম্বন্ধে শিশুর যে ভয় তাহা যেন উহাকে পঙ্গু করিয়া দেয়, **ভয় থেকে শিশুর মনে জড়তা ও তোৎলামী আসে।** অনেক সময় শাস্তি পাইতে পাইতে তাহার দোষত্রুটি শোধরানোর পরিবর্তে নূতন দোষ সৃষ্টি হয়। তাহার মনে এমন হীনমন্যতা আসে যে অনেক সময়ই ঐ কিশোর মনে করে তাহা দ্বারা কিছুই হইবেনা, সে একটি বাজে ছেলে। এই মূল্যহীনতা অপর দিকে তাহাকে বিদ্রোহ করিয়া তোলে; শাস্তি দিলেও তাহার ভিতর যেন স্নেহ মিশ্রিত থাকে। **আত্মমর্যাদা নষ্ট হয় এরূপ শাস্তি কোনও বয়সের শিশুকেই দেওয়া উচিত নয়।** কিশোর বয়সে কোনও কিছু গড়িয়া তোলার দিকে ঝোঁক দেখা যায়; যেমন—বাগান করা, মাটির মূর্তি গড়া, কাঠ ও টিন দিয়া খেলনা তৈরী করা; এই বয়সের মেয়েরা অনেক সময় খাবার তৈয়ারী করিতে ভালবাসে, আবার কেহ কেহ সেলাই-ফোঁড়াই নিয়া ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে কোনও কাজই ধৈর্য ধরিয়া উহারা বেশী দিন করিতে পারে না; তাহা সত্ত্বেও **বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক কাজের ভিতর দিয়া তাহাদের মানসিক আনন্দের ব্যবস্থা করিতে হয়।** এই বয়সের শিশুরা কিছু একটা করিতে চায়। উহাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তির যাহাতে অপচয় না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। অতএব শিক্ষা-ব্যবস্থাটি কর্মকেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন। অধুনা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কর্মশিক্ষার যে পাঠ্যসূচী হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে ইহা খুবই আনন্দের কথা।

কোন কারণে কিশোর অপরাধী হইলে উহার দরদী বন্ধু হিসাবে পিতা-মাতা ও শিক্ষকের সহানুভূতির সহিত তাহার কার্যকলাপের খারাপ ফল বুঝাইয়া দিতে হইবে। ধীরে ধীরে এ বিষয়ে সেও ইহার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহার বিপরীতটাই দেখা যায় আমাদের দেশে অপরাধী ছেলেমেয়েদের উপর সমাজ, পিতামাতা ও শিক্ষক সহানুভূতিশীল না হইয়া নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য আচরণ করে। পড়াশুনায় অমনোযোগী এরূপ কোনও ছেলেমেয়েকে যদি এই বয়সে শিক্ষক ভৎর্সনা করিয়া বলেন'—'গোল্লায় গেছে, এ দ্বারা কিছু আর হবে না" ; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার অমনযোগী হওয়ার পথ আরও সুগম করা হইয়াছে। **সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে অপরাধমূলক কাজ করার মূলে শিশুর অস্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশ।**

উত্তর কৈশোর ও অপরাধীদের সমস্যা : যে বয়স অতিক্রম করিয়া ছেলে-

মেয়েরা যৌবনে পদার্পণ করে তাহাকেই বলে বয়ঃসন্ধিকাল। দেহে ও মনে উহারা এই বয়সে বড় হইয়া উঠে। এই বড় হওয়াটা অনেক সময় হঠাৎই মনে হয়। **দেহে ও মনে একসঙ্গে বড় হওয়ার জন্য উহাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হইয়া পড়ে। দেহটাকে নিয়াও তাহারা যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়ে।** মনের বিভিন্ন পরিবর্তন আসে ; এই সময় ছেলেমেয়েরা কিছুটা স্বাধীন হইয়া পড়ে, তাহার ফলে প্রতি পদক্ষেপে শাসনের বাধা আসিয়া পড়ে এবং বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তাহাদের জীবনে। পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য তাহাদের সমস্যাগুলি বুঝিয়া যত-দূর সম্ভব উহা সমাধানের উপায়ের পথ দেখাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে সাহায্য করা।

মেয়েরা এই সময় লাবণ্যময়ী হয় ; সাজ-পোশাকের প্রতি উহাদের ঝোঁক থাকে। যতদূর সম্ভব উহাদের সাজ-পোশাকের চাহিদা মিটাইতে হয়। নিজের দেহখানি হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়াতে দেহখানি ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, খানিকটা দেহে ও মনে জড়তা আসে, ফলে কুঁজা হইয়া যায়। এই সময় মা মেয়েদের সুষ্ঠু ভঙ্গীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া আঁট পোশাকের কুফল সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিবেন।

এই বয়সে মানসিক সমস্যা একটি বড় সমস্যা। বিশেষতঃ মেয়েদের মন আবেগপূর্ণ হয়। সামান্য আদরে যেমন উহাদের মন বিগলিত হয় আবার সামান্য তিরস্কারেই অভিমানে চোখের জল দেখা যায়। পরিবারে উহারা সব সময় খাপ খাওয়াইতে পারে না। ছেলেমেয়েরা এই সময় রঙ্গীন স্বপ্ন দেখে। পিতামাতা সেই সব অবাস্তব কল্পনার ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝাইয়া উহাদের সমস্যা দূর করিবেন। মনে যাহাতে আঘাত না পায় সেইভাবে তাহাদের বুঝাইতে হইবে। মন হইতে অবাস্তব কল্পনা দূর করিবার জন্য উহাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার সুযোগ দিতে হইবে ; যেমন,—**সমাজ সেবামূলক কাজ, ব্রতচারী, সাঁতার, গার্লগাইড, রেডক্রস সোসাইটি প্রভৃতি।**

যৌন সমস্যা ঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণে দেহ ও মনে যৌবনের আবির্ভাব ঘটে। মেয়েদের মনে ভালবাসার ভাব ঘনীভূত হয়। এই সময় মেয়েদের সঙ্গীসাথী নির্বাচনে সতর্ক হইয়া নির্বাচন করিতে হয়। এই সকল ব্যাপারে ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের সমস্যা বেশী। অতিরিক্ত শাসন করিয়া ঘরে আটকাইয়া রাখিলে ফল আরও খারাপ হয়। উহার পরিবর্তে মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়া ভালমন্দ বিচারে কিছুটা ছাড়িয়া দিতে হয়। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত উহার সমস্যাগুলি চিন্তা করিয়া সমাধানের পথ বলিয়া দিতে হয়।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের যৌন কৌতূহল আসে। অশ্লীল পুস্তক পড়িয়া, সমবয়সী বন্ধুদের নিকট হইতে শুনিয়া এবং বাজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে জ্ঞানলাভ না হওয়াতে ভুল ধারণা জন্মিয়া খারাপ ফল হয়। **প্রত্যেক পিতামাতার উচিত ইহাকে নিষিদ্ধ ব্যাপার মনে না করিয়া খোলাখুলি ভাবে উহাদের নিকট যতটা সম্ভব আলোচনা করিয়া এসম্বন্ধে বুঝাইয়া দেওয়া।** উত্তর **কৈশোরের আর একটি ব্যাপক সমস্যা কর্ম-সংস্থান ও জীবিকার পথ নির্দেশ।** পূর্ব হইতেই পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। বৃত্তি নির্বাচন সঠিক ভাবে না হইলে অর্থাৎ নিজ ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী কর্মের সংস্থান না হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। [আমাদের দেশে ১৯৫৮ সনে যে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস তৈরী হইয়াছিল তাহাতে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী পথ নির্দেশের জন্য পরীক্ষা লইয়া সেইভাবে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়াতে এই সিলেবাসের কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। ইহার ফলে এই সিলেবাস তুলিয়া কর্তৃপক্ষ নূতন সিলেবাস তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। আমরা আশা করি উচ্চ মাধ্যমিকের এই সিলেবাস দ্বারা ছেলেমেয়েরা উহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশের সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। সাধারণ বুদ্ধির মাপ যাহাদের নীচের দিকে, তাহাদের জন্য **ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক সিলেবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।** উচ্চ মাধ্যমিকে এই সিলেবাস শেষ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলে চাকুরীতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবে। জীবিকার পথ নির্দেশের জন্য বিদেশে খুব সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে **ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধির মাপ গ্রহণ, বিশেষ ক্ষমতার মাপ নিরূপণ, ভবিষ্যতে কোন্ বিষয়ে কে কতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে তাহার মাপ, স্কুল, কলেজে কে কতটা অগ্রসর হইতে পারিতেছে তাহার হিসাব, স্বাস্থ্য ও চেহারা, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা** ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশের ব্যবস্থা করিতে হয়। বিভিন্ন কর্ম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উহাদের জ্ঞানদান করাও কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য।]

অপরাধীদের সমস্যা: অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণ জীবনে একটা সমতা ও সামঞ্জস্যের অভাব। এই সকল বালক-বালিকাদের মনে সব সময়ই একটা অস্থিরতা থাকে। অনেক সময় দৈহিক ত্রুটি থাকার জন্য সমাজে তাহাদের প্রতি অন্য রকম

ব্যবহারের জন্য উহাদের মনে যে হীনমন্যতা আসে তাহার ফলে অনেক সময় তাহারা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। অপরাধী ছেলেমেয়ে অনেক সময়ই বুদ্ধিতে অপরিণত থাকে, বিচার-ক্ষমতা উহাদের কম, ফলে নীতি জ্ঞানও কম।

গৃহের পরিবেশ খারাপ হইলে অপরাধ-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবসর সময়ে দুর্নীতিমূলক আমোদ-প্রমোদে সময় কাটানো, এক বাড়ীতে বিভিন্ন চরিত্রের লোকের সমাবেশ, সংসারে আর্থিক অনটন, এই সমস্ত কারণ মিলিয়া অপরাধ-প্রবণতার অনুকূল পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য **দারিদ্র্য সব সময় অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণ হয় না।**

কিশোর-কিশোরী যাহাতে অসৎ সঙ্গে মিলিত না হয় সেইদিকে পিতামাতার লক্ষ্য রাখা উচিত। উপযুক্ত সুশাসনের অভাবেও ছেলেমেয়েরা অপরাধী হয়। উপযুক্ত সময়ে স্নেহ-মিশ্রিত শাসনে ছেলেমেয়েরা অপরাধী না হইয়া সৎভাবে জীবন যাপন করিবার শিক্ষা পায়। **অতিরিক্ত কড়া শাসন এবং অতিরিক্ত প্রশ্রয় —দুইই বালক-বালিকাদের মানুষ হওয়ার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।** পিতা-মাতা সৎ চরিত্রের হইলে এবং গৃহের পরিবেশ ভাল হইলে উহাদের সন্তান সাধারণতঃ অসৎ পথে যাইতে পারে না। যেখানে **গৃহ বিপর্যস্ত, পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ, যৌন নীতিহীনতা, মদ্যপান, কলহ, অশান্তি প্রভৃতি গৃহ-পরিবেশকে কলুষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে সেখানে ছেলেমেয়েরা কখনই সৎ হইতে পারে না।**

বহু মনস্তত্ত্ববিদ্ এই সকল অপরাধীর মানসিক অসুস্থতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের প্রতি মনঃসমীক্ষা চালাইয়া উহাদের এই রোগ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জীবনে সমতা ও সামঞ্জস্যের অভাবই যে অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণ—ইহা সমর্থন করিয়া মনস্তত্ত্ববিদ্ বাউলি বলিয়াছেন—আকাঙ্ক্ষা যেখানে পরিতৃপ্ত হয় না যেখানে অস্বাভাবিক পথে সে তৃপ্তি লাভ করিতে চায়। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের ভিতর দিয়া সে তাহার মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতে চায়।

অপরাধ-প্রবণতা কৈশোরেই দেখা যায়। অতএব কৈশোর জীবনে অপরাধ-প্রবণতা একটি বড় সমস্যা। ইহারা কোনও কিছুতে মানাইয়া নিতে না পারায় সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে পারে না। কুসংসর্গ এবং চৌর্য বৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল অপরাধী ছেলেমেয়েদের জন্য একটি সুন্দর গৃহ-পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। উহাদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইহাতে উহাদের মানসিক শক্তি অপচয় না হইয়া সৎ কাজে ব্যয়িত হইবে।

শিক্ষক, পিতামাতা, অভিভাবক, বন্ধু প্রত্যেকেই অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত সন্তর্পণে ঐ সকল কিশোর-কিশোরীর সমস্যা সমাধানে রত থাকিবে। উহাদের অপরাধ দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে দরদী পথ-প্রদর্শকের। তাহাদের প্রতি তিরস্কার করিলে অথবা ঘৃণার ভাব দেখাইলে উহাদের ভুল পথ হইতে ফিরাইয়া আসা যাইবে না। **রাশিয়ার শিক্ষাবিদগণ এই অপরাধ-প্রবণতা ব্যক্তিগত সমস্যা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া ইহা একটি সামাজিক সমস্যা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই সমস্যার মূল কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা;** ইহারই ফলে পারিবারিক দারিদ্র্য, অশান্তি ও অপরিচ্ছন্ন গৃহ-পরিবেশ। সুস্থ পরিবেশ কিশোরকে সুস্থ ও সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশু পরিচালনার নীতি ঃ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আবেগ সম্বন্ধে জানিতে হয়। আবেগ মানসিক ব্যাপার হইলেও, ইহা দৈহিক ব্যাপারের সহিতও জড়িত। কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী বলিয়া থাকেন, আমরা যখন কোন উত্তেজনামূলক বিষয়ের প্রভাবে চঞ্চল হইয়া উঠি তখন আমাদের দেহের ভিতর পরিবর্তন ঘটে। ঐ পরিবর্তনের ফলে আমাদের মধ্যে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহাকেই আমরা আবেগ বলি। আবেগ নানা প্রকারের হইতে পারে। সাধারণতঃ **ভয়, উৎকণ্ঠা, ক্রোধ, প্রেম, ঘৃণা**—এই সকল আবেগ শৈশবে ভালভাবে পরিচালিত না হইলে পরিণত বয়সে শিশুর মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি হয়। পরিণত বয়সে এই মানসিক বৈকল্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী **পিতা-মাতা অভিভাবক ও শিক্ষক।**

ভয় ও নিরাপত্তা বোধের অভাবে সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, **বর্তমান জগতের বহু সমস্যার মূলে রহিয়াছে অহেতুক ভয়।** ভয় মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। শিশুকে ভয় দেখাইয়া বশ করার মত কাপুরুষতা ও মূঢ়তা আর কিছু নাই। ভয় হইতে অনেক মুদ্রাদোষের সৃষ্টি হয়। **ভয় এবং উৎকণ্ঠা হইতে কিশোর, অনেক সময় তোৎলা হইয়া যায়।** মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারিলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি অতি সহজেই ঘটানো যাইতে পারে। শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়া বন্ধনের নাগপাশ হইতে উহাদের মুক্ত রাখিতে হইবে। শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভয়কে চাপিয়া রাখিলে মনো-বৈকল্য সৃষ্টি করা হয়। মনঃসমীক্ষণ দ্বারা শিশুদের চালিত করিতে হইলে এ বিষয়ে পিতা-মাতা ও শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান

থাকিতে হয়। বিশেষজ্ঞ না হইলে শিশুরা ভুল পথে চালিত হইবে, অতএব মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত কোনও শিশুকে মনোসমীক্ষণে বিশেষজ্ঞ এরূপ কোনও চিকিৎসকের অধীনে রাখিয়া উহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

বিদ্যালয়ে অনেক শিশুদের নখ কামড়ানো অভ্যাস দেখা যায়। পিতা-মাতা বা শিক্ষকেরা গালাগালি ও প্রহার করিবার ফলে মনের ভিতর অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই মুদ্রাদোষটি আয়ত্ত হয়। নিজের উপর ভরসা হারাইয়া ফেলিয়া অসহায় হইয়া পড়ে ; এরূপ অবস্থায় শিশু বদরাগী শিক্ষক ও পিতামাতার উপর প্রতিশোধ তুলিবার আকাঙ্ক্ষা নিজের নখ কামড়ানোর ভিতর দিয়া পরোক্ষ ভাবে মিটায়। এই সকল মুদ্রা দোষের চিকিৎসা হইতেছে **শিশুর জীবনে ভয়, রাগ ও অশান্তির কারণ খুঁজিয়া কোনও মানসিক ভয় উহাদের মন হইতে দূর করা।** শাস্তি বা ভয় দেখাইয়া এ সকল দূর করা যায় না। অনর্থক ভয় শিশুর মন হইতে সব সময়ই দূর করিতে হয়। শৈশবের কোনও ভয় পরিণত বয়সে মানসিক বিকারের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মনস্তাত্ত্বিকের মতে **মানুষের অবচেতন মন চেতন মানসকে প্রভাবান্বিত করে।**

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর ভিতর অনেক সময় এক ধরনের মানসিক বিকার পরিলক্ষিত হয় ; ইহাকে মনস্তত্ত্ববিগদ্‌ণ **ক্লিপটোম্যানিয়া রোগ নাম দিয়াছেন।** ইহা দ্বারা ছেলেমেয়েরা অনর্থক ছোটখাটো জিনিস চুরি করে। অনেক সময় সচ্ছল ও ধনী পরিবারের সন্তানদের ভিতরও এই চুরির অভ্যাস দেখা যায়। শৈশবে পিতা-মাতার নিকট হইতে উহাদের ইচ্ছাগুলি পূরণ না হওয়ায় পরিণত বয়সে সেই শাসনের প্রতিবাদ হিসাবে তাহাদের এই অভ্যাস গঠিত হয়। **অবচেতন মনের ক্ষোভই এই মানসিক বিকারের কারণ।**

অবচেতন মনের বিক্ষোভ হইতে হিষ্টিরিয়া রোগ হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েডের মতে পরিণত জীবনের অশান্তির মূল কারণ শৈশবের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। **শিশু জীবনের কোনও অবরুদ্ধ আবেগ পরবর্তী জীবনের বহু অসঙ্গতির কারণ।** শিশুর ভিতর যৌন আকাঙ্ক্ষা থাকে। শিশু বুড়ো আঙুল চুষিয়া আনন্দ পায় ; ফ্রয়েড বলিয়াছেন ইহা শিশুর একপ্রকার যৌন তৃপ্তি। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যৌন চেতনা বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক পরিণতি যেখানেই বাধা প্রাপ্ত হয় সেখানেই মানসিক বিকৃতি ঘটে। যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি হইতে অনেক সময় অল্প বয়স্ক মেয়েদের ভিতর হিষ্টিরিয়া রোগ দেখা দেয়। **এই সকল রোগী হাসি, কান্না ও রাগ সহজে দমন করিতে**

পারে না। এই রোগ মানস-যন্ত্রের বিকারজনিত কারণে হইয়া থাকে।

শৈশবে ও কৈশোরে শিক্ষার মাধ্যমে যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করানো যৌন সমস্যা দূর করার প্রধান উপায়। ছেলেমেয়েদের কিশোর মনে এই সমস্যা যাহাতে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে না পারে সেই জন্য প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া উচিত। পাঠ্য পুস্তকের জীব-বিজ্ঞান বিষয়টি উপযুক্ত ভাবে পাঠ দানের ব্যবস্থা থাকিলে ঐ বিষয় হইতেই ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে। এ বিষয়ে শিক্ষক ও মাতাপিতারও বিশেষ শিক্ষা দানে সাহায্য করিতে হইবে।

অ্যাডলীর নামক মনস্তত্ত্ববিদ্ মানুষের মনের হীনতাবোধকে মানসিক বিকারের কারণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। আত্মমর্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য নিজের অক্ষমতা শারীরিক ব্যাধির অজুহাতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়া লয়। এই মনোভাব দূর করিবার জন্য শিশুর মনে সাহস জন্মাইয়া দেওয়া এবং তাহার প্রকৃত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা কর্তব্য; এ দায়িত্ব একান্ত ভাবে শিক্ষকের। পড়াশুনার মাধ্যমে অন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের মনে হীনমন্যতার ভাব আসে। এই মনোভাব অস্বাভাবিক রূপ নিলেই মানসিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজনস্থলে মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে লওয়া একান্ত আবশ্যক।

শৈশবে নিরাপত্তার ভাবের অভাব হইলে, সেই অভাববোধ কৈশোরে আবার দেখা যায়। যে শিশু মাতৃস্নেহের নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় গড়িয়া উঠিল না, কৈশোর ও যৌবনে সে নিজেকে অসহায় মনে করে। **মনস্তাত্ত্বিকগণ সর্বদাই মানসিক ব্যাধির কারণ খোঁজেন শৈশবের ইতিহাসে।** মানসিক ব্যাধির মূল কারণ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, ভালবাসা পাওয়ার অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা শিশু সম্পূর্ণ অসহায়, যিনি তাহাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহার আন্তরিক স্নেহ শিশুর জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় কাম্য। **শৈশবে স্নেহ-যত্নের অভাব ও তাহার ফলে নিরাপত্তা বোধের অভাব—ইহাই মানসিক দুইটি ব্যাধির কারণ। একটি বদ্ধ ঘরের ভয়, ক্লস্ট্রোফোবিয়া; অপরটি কোলাহলপূর্ণ উন্মুক্ত স্থানের ভয়, অ্যাগেরাফোবিয়া।**

মাতৃস্নেহে বঞ্চিত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি আগেকার তুলনায় এখন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শৈশবে মায়ের আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইলে সেই শিশু ভবিষ্যতে সুস্থ জীবন যাপন করিবে ইহাই মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত।

সপ্তম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ গৃহ-রচয়িত্রীর জন্য পারিবারিক শিক্ষা

বাড়ীর বড় বড় মেয়েরা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে গৃহিণীর দায়িত্ব লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইবে ; সুতরাং পূর্বেই তাহারা যাহাতে এ বিষয়ে কিছু কিছু দক্ষতা অর্জন করিয়া লইতে পারে সে দায়িত্ব পরিবারে একান্তভাবে মায়েদের। পারিবারিক কাজ-কর্ম কিছু কিছু মেয়েদের দিয়া করাইয়া লইলে মায়েদের পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হয়, এবং মাতার প্রতি তাহারা সহানুভূতিশীল হইয়া নিজেরা কাজে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবে। এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও তাহাদের সাংসারিক কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করিতে বেগ পাইতে হয় না। মেয়েরা যদি কখনও কখনও সপ্তাহের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজেরাই খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারী করে তাহা হইলে উহাদের মনের তৃপ্তির সঙ্গে দক্ষতাও অর্জন করিতে পারিবে। পারিবারিক বাজেট সম্বন্ধে মেয়েদের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কোনও কিছু কাজের পরিকল্পনা করিতে গেলে তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাজেটের অঙ্ক ছাড়াইয়া না যায় ; এই দৃষ্টি-গুলি পূর্ব হইতেই মেয়েদের শিখিয়া লইতে হয়। পরিবেশনের কাজটি বাড়ীর বড় বড় মেয়েরা করিতে পারিলে ভাল হয় ; ইহার রীতিনীতি সম্বন্ধে উহাদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়। সাধারণ অসুখ-বিসুখের সেবা-শুশ্রূষার কাজটি বালিকাদের উপর ছাড়িয়া দিলে ভাল হয়। পীড়িতের প্রতি মমতা, সহানুভূতিশীলতা ও সংবেদনশীলতা গুণগুলি উহাদের ভিতর উদয় হইবে। কোমল মন দ্বারা রোগীকে ঔষধ খাওয়ানো, থার্মমিটারের সাহায্যে জ্বরের তাপ নির্ণয় করা, গা স্পঞ্জ করা, মাথা ধোয়ানো ইত্যাদি কাজের ভিতর তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইবে। কেবল-মাত্র যে অভিজ্ঞতা অর্জন তাহা নহে, ইহাতে মেয়েদের মনোবল সৃষ্টি হয়। মনোবল না থাকিলে উপযুক্ত গৃহকর্ত্রী হওয়া যায় না। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম যেমন ঘরের আলনা গোছানো, বিছানাপত্র পরিষ্কার করা, ছোট ভাই-বোনদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করা, সন্ধ্যায় ধূপ, বাতি দেওয়া ; এইভাবে পরিবারে মায়ের কাজের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সংসারের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য অর্জন করিতে পারিবে এবং ভবিষ্যৎ গৃহ-রচয়িত্রী হিসাবে সার্থকতা লাভ করিয়া স্বামীর পরিবারে সুনাম অর্জন করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাংসারিক দায়িত্বের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতি

গার্হস্থ্য জীবনের শুরুতে বিবাহ। দারপরিগ্রহ না করিলে গার্হস্থ্য জীবনের প্রবেশের অধিকার আদৌ জন্মে না, ইহাই ছিল আমাদের বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থার রীতি। **এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। একক জীবনে প্রসার আসে না। নারী বা পুরুষ ইহাদের স্বতন্ত্র জীবনের মূল্যও নাই, সার্থকতাও নাই।** ইহারা সফলকাম হয় মিলনে। নরনারীর মিলনে স্থাপিত হয় এক অপূর্ব সামঞ্জস্যের, সৃষ্টি হয় এক বিপুল কর্মশক্তির। সংসারে ও সমাজের সকল কর্মই নরনারীর পরস্পর সাহচর্য সাপেক্ষ। **পুরুষ যে কর্মের পথে ছোটে, নারী দেয় সেই কর্মের প্রেরণা।** নারীর এই প্রেরণা না পাইলে কর্মজীবনে পুরুষ ক্লান্ত হইয়া উঠিত। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তাহা নয়, ইহাতে তাহার কল্যাণ।

মেয়েদের ভিতর এমন কতকগুলি হৃদয়বৃত্তি রহিয়াছে যাহা দ্বারা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহাদের পক্ষে সহজ হয়। নারী তাহার কোমল হৃদয়বৃত্তির গুণে বুদ্ধিমত্তা, নৈপুণ্য, ত্যাগ ও আত্মসংযম দ্বারা সংসারে একটি সুন্দর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আনিতে সমর্থ হয়।

হিন্দু সমাজে বিবাহ সংঘটনে অনেক সমস্যা বা অসুবিধা দেখা যায়। জীবনের একান্ত কাম্য এই মিলনের পথ বহু আবর্জনায় পরিপূর্ণ, ইহার পথও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। **পণ-প্রথা বিবাহ অনুষ্ঠানে একটি বিরাট সমস্যা।** বর্তমানে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে, কিন্তু মানুষের মন উদার না হইলে এই প্রথা একেবারে দূরীভূত হইবে না। **আইন দ্বারা মানুষের মন সংশোধন করা যায় না।**

বিবাহ সংঘটনে সমস্যা ও প্রণপ্রথা

পণ ছাড়া জিনিসপত্রের দাবিও এখন চরম সীমায় উঠিয়াছে—এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ কন্যাদের বিবাহ ব্যাপার একটি বিরাট সমস্যা। অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ে এখনকার যুবকেরা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিতে রাজী হয় না; অনেক ক্ষেত্রে আদৌ বিবাহই করে না—এইরূপ ব্যর্থ জীবন যাপনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী অর্থ নৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা।

আমাদের সাধারণ সমাজে শুভ বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে পিতামাতা

বা অভিভাবকগণ। পাত্রপাত্রী বিশেষ করিয়া পাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য দেওয়া হয় না; তবে বর্তমানে শিক্ষা-জগতে এবং কর্ম-জগতে পুরুষের মত নারীও সমানভাবে অগ্রসর হইতেছে, ফলে অবাধ মেলামেশায় যুবক-যুবতী তাহাদের আপন আপন জীবন-সাথী নিজেরাই বাছিয়া লইতেছে। ইহার ফল যে সব সময়ই অশুভ এমন কথা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতার ব্যবস্থাপনার বিবাহেও পাত্র-পাত্রী বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারে না—এই অসুখী হওয়ার পশ্চাতে নানা কারণ জড়িত। ইহার মূল কারণ পরস্পর পরস্পরের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে না; ইহাছাড়া **অর্থনৈতিক সমস্যা, চারিত্রিক দোষ ও স্বাস্থ্যহীনতা বিবাহিত জীবনে সুখ ও শান্তির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।**

'বিবাহ' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। শব্দটির অর্থ "বিশেষভাবে বহন করা।" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, স্ত্রীর ভরণপোষণ, স্ত্রীর সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ। আবার স্ত্রীও সংসার পরিচালনার দায়িত্ব এবং আদর্শ মাতা হইবার কর্তব্য ও দায়িত্ব-গুলি গ্রহণ করেন। উভয়ের দায়িত্ব বহন করিবার গূঢ় অর্থটি শব্দটির ভিতর রহিয়াছে। আমাদের বৈদিক বিবাহের মন্ত্রের ভিতরও এই কথাগুলি রহিয়াছে। বিবাহের প্রস্তুতির পূর্বে ইহার সুবিধা, অসুবিধা সবই জানিয়া লইয়া পূর্বেই সচেতন হইতে হয়। বিবাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ নরনারী বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারে না।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আট প্রকারের বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। উহাদের ভিতর **ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্যই উল্লেখযোগ্য।** এই বিবাহপ্রথা-গুলি বিশেষ উন্নত ধরনের ছিল। শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন কোনও পাত্রকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া শ্রেষ্ঠ হিসাবে বরণ করিয়া যথারীতি পূজা করিবার পর কন্যা সম্প্রদান করা হইত, ইহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হইত। কোনও

বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ

যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক হিসাবে স্থির করিয়া পাত্রকে অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া কন্যাদানকে দৈব বিবাহ বলা হইত। বরের নিকট হইতে দুইটি কি তাহার বেশী গাভী গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্তে কন্যাকে দান করা হইত, ইহাই আর্য বিবাহ। বর ও কন্যাকে একসঙ্গে মিলাইয়া ধর্মাচরণ করিতে উপদেশ দিয়া পূজা অর্চনার মাধ্যমে যে কন্যা দান প্রচলিত ছিল তাহাকে বলা হইত প্রাজাপত্য বিবাহ। **এই সকল বিবাহকে আধ্যাত্মিক বিবাহ বলা হয়।**

এই আধ্যাত্মিক বিবাহ ছাড়া ভারতবর্ষে **পৈশাচ, রাক্ষস, আসুর** ও **গান্ধর্ব** এই চারিপ্রকার বিবাহ-প্রথাও পৌরাণিক যুগে প্রচলিত ছিল। সুরাপানে

অজ্ঞান করাইয়া ধর্ষণের পরে যে নারীকে বিবাহ করা হইত সেই বিবাহের নাম পৈশাচ বিবাহ। কোনও রাজাকে পরাজিত করিয়া সেই দেশের রাজকন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ-পদ্ধতি তাহাকে বলা হয় রাক্ষস বিবাহ। এই বিবাহেও কন্যার অনিচ্ছায় বিবাহ করা হইত। অর্থের বিনিময়ে নারী ক্রয় করিয়া বিবাহের রীতিকে আসুর বিবাহ বলা হইত। পিতামাতার অজ্ঞাতে যুবক-যুবতী প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যে বিবাহ সম্পন্ন করিত তাহাকে বলিত গান্ধর্ব বিবাহ। এই বিবাহে দুই-একজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। প্রাচীন কালের বিবাহ-পদ্ধতির বিভিন্ন উপাদান সংমিশ্রণে বর্তমানে আমাদের বিবাহ রীতি প্রচলিত। **বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইলেও ইহা সামাজিক অনুষ্ঠান। সমাজকে বাদ দিয়া বিবাহ সম্ভব হয় না।** বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিবাহ প্রথা রহিয়াছে। এক সমাজের বিবাহ অন্য সমাজ দ্বারা সমর্থিত নাও হইতে পারে।

(১) **এক-পত্নীক বিবাহ :** একই সময় অর্থাৎ পত্নীর জীবিত অবস্থায় আর এক পত্নী লাভ করা যায় না, ইহাকেই এক-পত্নীক বিবাহ বলা হয়। বর্তমান সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই বিবাহই প্রচলিত। এই বিবাহ সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়তা করে।

(২) **বহু-পত্নীক বিবাহ :** স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় একই সময়ে বহু স্ত্রী লাভ করিলে সেই বিবাহ প্রথার নাম বহু-পত্নীক বিবাহ। আমাদের দেশে হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণের ভিতর বহুবিবাহের চল ছিল। বর্তমানে এই প্রথা খুবই কম। আমাদের সরকার এক স্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় পুনরায় বিবাহ রীতি আইন করিয়া বন্ধ করিয়াছে।

(৩) **বহুভর্তৃক বিবাহ :** তিব্বতে এই বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশে প্রাচীন মহাকাব্যে মহাভারতে এই বিবাহের নিদের্শন স্বরূপ দ্রৌপদীর বহু স্বামীর পরিচয় পাওয়া পাই। পঞ্চ পাণ্ডবের সকলেই দ্রৌপদীর স্বামী। বহু পত্নীকের মত এ ক্ষেত্রেও সকল স্বামী স্ত্রীর সমান ভালবাসা পায় না।

(৪) **দলগত বিবাহ :** প্রাচীন ইতিহাসে এথেন্স, মিশর প্রভৃতি দেশে এই বিবাহের প্রচলন ছিল। বর্তমানে টোগা সম্প্রদায়ের ভিতর দলগত বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

বিবাহের স্থায়িত্বও নিয়ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। যৌনজ্ঞান লাভ হইবার পূর্বে বিবাহ উপযুক্ত বলিয়া মনে করা উচিত নহে। **বিবাহের পূর্বে উপযুক্ত যৌন-শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।** ইহা ছাড়া আত্মত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি লইয়া বিবাহে অগ্রসর হওয়া উচিত। পাত্র-পাত্রী উভয়েরই বিবাহের পূর্বে যে স্বাধীনতা

থাকে বিবাহের পরে তাহা কিছু পরিমাণে খর্ব হয় ; এই আত্মত্যাগের জন্য তাহাদের প্রস্তুত থাকিতে হয়। পরস্পর পরস্পরের জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারে এরূপ মানসিক প্রস্তুতিও থাকা উচিত। উভয় উভয়ের সহিত মানাইয়া চলিতে না পারিলে সংসার চিরদিনের মত অশান্তিময় হইয়া উঠে। আধুনিক যুগে শ্বাশুড়ীর পীড়নে জীবন অতিষ্ঠ হওয়ার ইতিহাস খুবই কম। মেয়েদের এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এতো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মাভিমানে ঘা লাগিলেই উহারা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; অপরপক্ষে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যার প্রভাবে অর্থ নৈতিক সমস্যা দূর হইয়া সংসার এখন সুন্দর ও শান্তির আকর হইয়া উঠিতেছে। **নারী জাতি যতই অর্থ সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক হউক গার্হস্থ্য জীবনে নারীর প্রধান স্থান গৃহে। গৃহস্থালীর কাজকর্ম সম্বন্ধে মেয়েদের বিবাহের পূর্বেই নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করিতে হয়।**

বিবাহিত জীবনে স্বাস্থ্যের স্থান

বিবাহিত জীবনে সুখ ভোগের জন্য নর ও নারীর উভয়েরই সুস্বাস্থ্য একান্ত প্রয়োজন। শারীরিক কোনও বড় রকমের ত্রুটি থাকিলে সেই ছেলে বা মেয়ের বিবাহ করিতে নাই। শারীরিক অসুস্থতা গোপনে রাখিলে উহা অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্যহীন পুরুষের সন্তান চিররুগ্ন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং **অনাগত সন্তানের জীবন অভিশপ্ত করিয়া দিবার নৈতিক অধিকার এই সকল স্বাস্থ্যহীন পুরুষদের কখনই নাই। এজন্য ভগ্নস্বাস্থ্য পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিবাহ না করে তবে সে সমাজের কল্যাণই সাধন করিবে।**

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা উচিত। বর্তমানে সরকার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নির্দিষ্ট একটি বয়স নির্ধারণ করা স্থির করিয়াছে। বিবাহে পাত্র-পাত্রীর বয়স এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। পূর্বে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন আসিত, এখন বর্তমান যুগে তাহা আর চলে না। সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজ-নৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিবাহে পাত্র-পাত্রীর বয়সের খুব বেশী পার্থক্যও এখন লক্ষ্য করা যায় না। পূর্বে ষোল বৎসরের কন্যার সহিত ত্রিশ বৎসরের পুরুষের বিবাহের প্রচলন তখনকার দিনে শাস্ত্র-সম্মত ছিল। দেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী বিবাহের বয়সের পার্থক্য হয়। পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। **বাল্য-বিবাহ কোন দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়।** বাল্যবিবাহের কুফল চিন্তা

বিবাহে বয়সের প্রশ্ন

করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইহার বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তন করার জন্য সরকারকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পর বাল্যবিবাহ আইন-বিরুদ্ধ করা হইল। **১৯৩০ সনে সর্দা আইন অনুসারে ১৪ বৎসরের নীচে কোনও বালিকার বিবাহ আইনত দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচনা করা হইল।** আইন থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্তও পল্লীবাংলার কোনও কোনও অঞ্চলে বাল্যবিবাহের প্রচলন দেখা যায়।

বাল্যবিবাহ যেমন স্বাস্থ্যের দিক হইতে এবং সমাজের দিক হইতে কল্যাণকর নয় সেইরূপ **প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ-প্রথাও নানা দিক হইতে মঙ্গলজনক হয় না।** বেশী বয়সে বিবাহের ফলে সন্তান পালনের সুষ্ঠু কর্তব্য সম্পন্ন করা যায় না, আর্থিক ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য বেশী হওয়ার ফলে মানসিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তির কারণ দেখা যায়। কন্যার বিবাহ ও পুত্রদের ভালভাবে মানুষ করার চিন্তায় মন সর্বদাই ভারাক্রান্ত থাকে। অতএব সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা উচিত।

উত্তম সন্তান লাভ করিবার জন্য চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিমান যুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। পুরুষ উপযুক্ত না হইলে, স্ত্রী যতই উপযুক্ত হউক না কেন, কখনই উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের আশা পোষণ করা যায় না; কতগুলি অমানুষ সন্তান দ্বারা সমাজের বোঝা বাড়িয়া চলে। ইহাতে সমাজের এবং দেশের কোনও উন্নতি আশা করা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব

পিতা ও মাতার দায়িত্ব ঃ নরনারীর শুভবিবাহে জীবন পূর্ণ হইয়া ওঠে রসে, গন্ধে, শোভায় ও মাধুর্যে। **সংসারে সন্তান-সন্ততির শুভ আবির্ভাবে বিবাহ সফল হইয়া উঠে।** মনুষ্য জীবনে মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রেরণার সঙ্গে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এই সন্তান আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাও জড়াইয়া আছে। ইহা চিরন্তন সত্য, ইহা মানুষের স্বভাবগত মৌলিক আকাঙ্ক্ষা। হিন্দু শাস্ত্রকার এবং সমাজ-নিয়ন্তাগণ এই মহাসত্য জানিতেন বলিয়াই বিবাহকে সন্তানলাভের পথ বলিয়া বার বার নির্দেশ

দিয়াছেন--"**পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।**" মিলনাকাঙ্ক্ষা যেমন স্বাভাবিক, সন্তান আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ স্বাভাবিক।

বিবাহের পরে সন্তান পালনের দায়িত্ব পিতামাতা উভয়েরই আছে। অসহায় শিশুকে লালন-পালন করিয়া মানুষ হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্যই সমাজে বিবাহের ব্যবস্থা। পিতার দায়িত্ব সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণের এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অভিভাবকত্বের। পিতার অভিভাবকত্বে এবং মাতার বাৎসল্য স্নেহে অসহায় শিশু বড় হইয়া উঠে এবং তাহার নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে অর্থ-সমস্যার যুগে সুন্দরভাবে শিশুকে গড়িয়া তুলিতে হইলে পূর্ব হইতেই পরিকল্পনার আবশ্যক। পূর্বেকার মত আজিকার দিনে বহু সন্তান কাহারই কাম্য নয়। **ব্যক্তিগত ভাবে পারিবারিক আয়-ব্যয় বিবেচনা করিয়া সন্তান জন্মদানে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তোলা আবশ্যক। আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে অধিক সন্তান দারিদ্র্যের সূচনা করিয়া সমগ্র পরিবারকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।** সেখানে মাতার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে, শিশু রুগ্ন হয় এবং পিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও সংসারে স্বস্তি লাভ করিতে পারে না। সন্তানের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য সকলই আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করে। শিশুর জন্মের জন্য শিশু দায়ী থাকে না, এই কথা চিন্তা করিয়া দুইটি কি তিনটি শিশুর জন্ম দান করিয়া প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য উহাদের সমস্ত রকম দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করিয়া সুস্থ ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তোলা।

সন্তান পালনে প্রধানতঃ আর্থিক দায়িত্ব পিতার উপর, অন্যান্য দায়িত্ব মায়ের উপর। মায়ের উপযুক্ত প্রতিপালনে কত শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে খ্যাতি অর্জন করিয়া দেশবরেণ্য হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। **মায়ের চরিত্র শিশুকে অতি সহজেই প্রভাবান্বিত করে।** অতএব সুমাতা সুসন্তানের জন্ম দিবে ইহা আর আশ্চর্যের কী? **পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পিতার। কন্যার শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্তির পর উহাকে সুপাত্রে দান করাও পিতার দায়িত্ব।** এই দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং বিবেচনাসাপেক্ষ। বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বপরায়ণ পিতা যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত চিন্তা করিয়া কন্যার বিবাহের সকল রকম কাজে অগ্রসর হন।

পিতামাতার কোনও রোগ অনেক সময়ই শিশুর উপর বর্তায়; এরূপ ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের পূর্বে সন্তানের জন্ম দেওয়া সমীচীন নয়। কোনও দুরারোগ্য রোগ থাকিলে উহাদের সন্তান না হওয়াই উচিত। পিতামাতার সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেওয়া একটি নীতিমূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবারের উদ্ভব

পরিবারের সূত্রপাত: আদিম যুগে পরিবার বলিতে কিছুই ছিল না, বিবাহ-প্রথাও এখনকার মত ছিল না। স্ত্রী-পুরুষেরা বিভিন্ন গোষ্ঠিতে দলভুক্ত ছিল। এক একটি দল চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক লইয়া গঠিত। প্রত্যেকটি দলের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভিতরই স্থানীয় দল তাহার খাদ্য আহরণ করে। দলের লোকেরা একত্রে বাস করিত, দলবদ্ধ ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিত, এবং একত্রে ঐ খাদ্য ভাগ করিয়া খাইত। উহারা দলবদ্ধ ভাবেই জীবিকা নির্বাহ করিত। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, বাস-গৃহ ও সংগৃহীত খাদ্য দলেরই সম্পত্তি। ইচ্ছামত কোনও লোক এক দল ছাড়িয়া অন্য দলে যোগদান করিতে পারিত, ইহাতে কোনও বাধা-নিষেধ ছিল না; দলগুলি আবার বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত ছিল। তবে পরিবার বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা ঠিক তাহা নয়। আমাদের সমাজের পরিবারগুলির মত ইহাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তানদের লইয়া এই সব পরিবার গঠিত। পরিবারগুলি স্থানীয় দলের অংশমাত্র। দলের অন্তর্গত অন্যান্য পরিবারের সহিত তাহারা একই বাসগৃহে বাস করিত, খাদ্য আহরণ করিত, অন্যান্য কাজ করিত, পান ভোজন এবং আমোদ-প্রমোদে যোগ দিত। ইহাদের বসবাসের নিয়ম মত। দলের অবিবাহিত যুবক বা বিপত্নীক ব্যক্তিরা একটি চালাঘরে বাস করিত আবার অবিবাহিত যুবতী এবং বিধবারা বাস করিত আর একটি চালঘরে! উঠানের একপ্রান্তে থাকে যৌথ রন্ধনশালা। উহার পাশেই বিপত্নীক ও অবিবাহিত যুবকদের থাকিবার স্থান; কারণ, তাহারাই দলের জন্য রান্না করিত। **এই সমস্ত জীবনকে আমরা পারিবারিক জীবন বলিতে পারি না।** দুগ্ধপোষ্য ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান পালন ব্যতীত পিতামাতার কর্তব্য আর বিশেষ কিছুই নাই। সন্তানরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই অন্যান্যদের সহিত বাড়ীর পৃথক অংশে বাস করিতে থাকে। **খাদ্যসংগ্রহ ও রন্ধন কার্যাদিও পারিবারিক ভিত্তিতে হয় না। খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের দায়িত্ব**

খাদ্য আহরণকারী যুগে পারিবারিক জীবনে দলের গুরুত্ব

দলের—পরিবারের নহে। ফলে পরিবারের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই, পরিবারগুলি দলের অংশমাত্র, দলই এখানে মুখ্য। দলবদ্ধ ভাবেই ভূমি, খাদ্য ও বাসস্থান ভোগ করে। সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের খুবই সম্মান করা হয়। তাহারাই স্থানীয় দলে ও সমাজে মাতব্বরের কাজ করে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দলবদ্ধ ভাবেই হয়। সকাল হইতে উহাদের দিনের কাজ শুরু হইয়া যায়। পূর্বদিনের যে খাদ্য বাঁচে, তাহা দিয়াই ভোরে রান্নার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রান্না হইলেই পুরুষরা শিকারে বাহির হইয়া যায়। মেয়েরা ফলমূল, ফুল, লতাপাতা, বীজ প্রভৃতি সংগ্রহের কাজ করিয়া থাকে। শিকার করিয়া শিকারীরা যাহা পায়। তাহা যৌথভাবেই বাসগৃহে লইয়া আসে। পুরুষেরা যখন শিকারে যায় তখন স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম সারে ও শিশুদের দেখাশুনা করে, ফলমূল প্রভৃতি সংগ্রহ করে, জালানি আনে, জল আনে, চুপড়ি, ঝুড়ি প্রভৃতি বোনে। তবে দুপুরে জোয়ান স্ত্রী-পুরুষ কেহই ঘরে থাকে না, সকলেই কাজে বাহির হইয়া যায়। কেবল বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও শিশুরা গৃহে থাকে। সন্ধ্যায় সকলেই গৃহে ফিরিয়া আসে ও প্রধান আহার শেষ করে। তারপর আঙ্গিনায় সমবেত হইয়া আমোদ-প্রমোদ ও গল্প-গুজব করে এবং রাত্রি গভীর হইলে নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিতে যায়।

খাদ্য উৎপাদনকারী সমাজ

খাদ্য আহরণকারীর সমাজের পর পশুপালক ও কৃষিকর লোক-সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। **খাদ্য আহরণকারী সমাজের দলের বা গোষ্ঠীর সমবেত প্রচেষ্টায় সকল কাজ সম্পন্ন হইত। কিন্তু পশুপালন ও কৃষিতে পরিবারগত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পাইল।** আহরণকারী সমাজে খাদ্য উদ্বৃত্ত হইত না, কিন্তু পরবর্তী উৎপাদক সমাজে খাদ্য উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। এই উদ্বৃত্ত দ্রব্য অধিকতর পরিশ্রমী ও অধিকতর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ও পরিবারের হস্তগত হওয়ায় সমাজে তাহাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। **এই শক্তি ও আধিপত্য দ্বারা এক শ্রেণীর লোক অপর এক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া ক্রমেই অধিকতর শক্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইল। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণার উদ্ভব হইল।** এর পূর্ববর্তী খাদ্য আহরণকারী সমাজের ভিতর ধনী দরিদ্র কোনও শ্রেণীভেদ ছিল না, দলবদ্ধভাবে কাজ করিত বলিয়া সেখানে সর্বত্র সাম্যের আদর্শ প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীভেদের পর সমাজে নানা প্রয়োজনীয় জিনিসও উৎপাদন হইতে লাগিল, ফলে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। নানা প্রকার কাঁচা মাল উৎপন্ন হওয়ায় শিল্পের উন্নতি হইল।

বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব

ক্ষেতের দেখাশুনা ও তদারক এবং ফসল তোলার কাজ মেয়েরাই করে। লাঙল চাষের কাজেও মেয়েরা সাহায্য করে। গৃহপালিত পশুদের পরিচর্যা এবং সংসারের যাবতীয় কাজ করিবার দায়িত্ব মেয়েদের। রন্ধনশালার নিকটে পতিত বীজ বা শস্য হইতে অঙ্কুরোদগম, উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও ফসলের ফলন লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীলোকেরাই সম্ভবতঃ কৃষিকর্ম প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছিল। খাদ্য আহরণকারী সমাজে ফলমূলাদি সংগ্রহের ভার প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের উপরই ন্যস্ত থাকিত; তাই স্ত্রীলোকদের পক্ষে কৃষির উদ্ভাবন ছিল স্বাভাবিক। স্ত্রীলোকেরা খোন্তা, নিড়ানি, দা প্রভৃতির সাহায্যেই কৃষিকার্য করিত। **স্ত্রীলোকেরা কৃষিকার্য উদ্ভাবন করায় কৃষির উৎপত্তির প্রাথমিক স্তরে পরিবারে স্ত্রীলোকদেরই প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল।**

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

সমাজে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রাধান্য দেখা দেওয়ায় যে সমাজ-ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ নামে পরিচিত। এই সমাজ-ব্যবস্থার শেষ চিহ্ন আধুনিক কাল পর্যন্তও বহু সমাজে লক্ষিত হইয়া থাকে। **পরে পুরুষরাও কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করিল, গৃহপালিত পশুকে ভূমিকর্ষণে ব্যবহার করা হইল, কৃষির দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। এখন কৃষিতে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য অধিক হওয়ায় কৃষি-প্রধান সমাজে স্ত্রীলোকের স্থলে পুরুষদেরই প্রাধান্য দেখা দিল। এই সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব থাকায়, ইহা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নামে পরিচিত।**

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

কৃষির উদ্ভাবনের ফলে সমাজে পরিবর্তন আসিল। কৃষির উন্নতির ফলে সমাজে যখন কোনও ব্যক্তি ও পরিবার প্রয়োজনের অপেক্ষাও অধিক খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ হইল, তখন কেবল লোক যে অবকাশ অবসর পাইল তাহাই নহে, বহু ব্যক্তি ও পরিবার এবারে পশুপালন ও কৃষি না করিয়াও খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইল এবং তাহারা কারিগরি এবং নানাবিধ শ্রমশিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে এবং বিভিন্ন কলাশিল্পে একান্তভাবে আত্মনিয়োগের সুযোগ পাইল। উদ্বৃত্ত খাদ্য এক শ্রেণীর লোকের হাতে অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ায় সমাজে তাহাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বাড়িল। তাহারা সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়াইতে লাগিল। তাহারা অপরকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে লাগিল। এইভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্র, সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। উৎপাদন বিষয়ে যাহারা অধিক জ্ঞান ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল, তাহারাও বিশেষ মর্যাদা

পাইল। ক্রমে তাহারা দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া সমাজে স্বীকৃত হইল। এইরূপে পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হইল এবং সমাজে উহারা শাসক হইল। এবং পুরোহিত হইতেই রাজার উৎপত্তি ঘটিল। এইভাবে সমাজে নানা শ্রেণী ও রাষ্ট্রীয় শাসনের উদ্ভব হইল।

পরিবার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আর্য সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন আর্য সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল পরিবার। পিতাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। ঋগ্‌বেদের স্তব হইতে জানা যায়, সন্তানের উপর পিতামাতার কঠোর নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল। অনেক সময় পিতা কঠোর দণ্ড দান করিতেন। প্রয়োজন বোধ করিলে অযোগ্য ও দুর্বৃত্ত পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিতেন ; তবে ইহার অর্থ এই নয় যে পিতামাতা ও সন্তানদের ভিতর স্নেহ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল না। প্রাপ্ত-বয়স্ক সন্তানের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। আর্য সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষ অবস্থায় শ্বশুরালয়ে জামাতার পরিবারে বাস করিতেন।

আর্য সমাজের পারিবারিক রীতি-নীতি

পরিবারে অতিথি খুব সম্মানিত হইতেন। পিতা-মাতা পুত্রই কামনা করিতেন। আর্য সমাজে পিতৃপ্রধান পরিবারের প্রচলন ছিল, তাই সেখানে পুত্রসন্তান কামনাই স্বাভাবিক। আবার কন্যার জন্ম হইলেও তাহাকে স্নেহমমতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইত না। স্ত্রীলোকদিগের কোনও না কোনও অভিভাবকত্বে বাস করিতে হইত। বিবাহের পূর্বে পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং বিবাহের পরে স্বামীর অধীনে তাঁহারা থাকিতেন। ইহাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। তাঁহারা সর্বদাই গৃহের অন্তরালে থাকিতেন না, নৃত্য-গীত ও উৎসবাদিতেও তাঁহারা যোগদান করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্তি হইবার পর তাহাদের বিবাহ হইত, আবার সারাজীবন অনূঢ়াও থাকিতে পারিতেন। সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ছিল খুব উচ্চে। তাঁহাদের শিক্ষালাভের কোনও বাঁধা ছিল না। বৈদিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, বিশ্ববরা, অপালা প্রভৃতি বহু বিদুষী রমণী তাহার প্রমাণ।

আর্যরা নিজেদের জীবনকে প্রধান চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, এক একটি ভাগকে আশ্রম বলা হইত। প্রথম জীবনে গুরুগৃহে থাকিয়া শুচিতা ও সংযমের ভিতর বাস করিত এবং সেখানেই শিক্ষালাভ করিত ; এই সময়টিকে বলা হইত 'ব্রহ্মচর্য'। শিক্ষাশেষে গৃহে ফিরিয়া তাহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হইত। ইহার নাম গার্হস্থ্য আশ্রম। প্রৌঢ় বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া ধর্মে মনোনিবেশ করিত। ইহাকে বলা হয় 'বানপ্রস্থ' আশ্রম। ইহার পর সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রম জীবন যাপন করিত।

চতুরাশ্রম

ব্রহ্মচর্য বলিতে বুঝায় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অভ্যাসের একটি স্তর। এই সময় দেহ ও মনের বিকাশের সকল দিক উন্মুক্ত করিয়া দিবার একটি শুভক্ষণ। ব্রহ্মচর্যের মুখ্য উদ্দেশ্যও বহু পূর্ব হইতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য এখন আর ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার দিকে আগাইয়া লইয়া যায় না। সাংসারিক জীবনের কর্মপ্রাচুর্যের উপযোগী যোগানও আর দেয় না।

মনুষ্য জীবনের বিকাশের স্রোত সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, সুতরাং সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে জীবনের প্রসার আর কি ভাবে সম্ভব হয়? দশের সঙ্গে সুখ-দুঃখের দান-প্রতিদানের ভিতর দিয়াই তো মনুষ্য জীবনের গতির প্রশস্ত পথ। পরস্পরের সম্পদ-বিপদের ভিতর দিয়াই মনুষ্য জীবনের গতির প্রশস্ত পথ। পরস্পরের সম্পদ-বিপদের সহিত আন্তরিক যোগাযোগ হইতেই জীবনের হয় স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা। এই স্বাভাবিক পথই অনুকূল পথ। আর জীবনের যাহা অনুকূল তাহাতেই অন্তর হইতে আসে সত্যিকারের প্রেরণা আর উহাই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে সুগম করিয়া তোলে।

ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্মুখে বিকশিত জীবনকে ফলে, ফুলে, শোভায় সম্পদে গরীয়ান্ ও মহীয়ান্ করিয়া তুলিবার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিবার প্রয়াসে। যেখানে ভবিষ্যতের কোনও লক্ষ্য নাই, জীবনের পথে কোনও প্রেরণা নাই, সেখানে ব্রহ্মচর্যের কোনই সার্থকতা নাই।

ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য

ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য এখনকার সমাজে চাপা পড়িয়াছে। এখন ব্রহ্মচর্য অর্থে বুঝায় সামাজিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ না করা। মনুষ্য জীবনের সমৃদ্ধির ভিত্তি সংযমে। শুধু ভোগে ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থতা আসে না, উহাতে ভোগ স্পৃহার দাবানলই বরং সৃষ্ট হয়। আগুনে ঘৃতাহুতির মত ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই চলে, শান্ত হয় না। তাই ইন্দ্রিয় বৃত্তির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়া যাইতে হয় সুন্দরের দিকে, শোভন পথে; এই সুন্দরের পথে লইয়া যাওয়াই ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে উৎকর্ষে রূপান্তরিত করা। ইহাতে মনে আনন্দ আসেও মানসিক শান্তিও বজায় থাকে। জীবনের প্রত্যেক স্তরেই ভিত্তিরূপে সংযম বিদ্যমান থাকে; সংযত জীবনের গোড়াপত্তন শিক্ষাদীক্ষার সহিত আরম্ভ হয় ব্রহ্মচর্যে। পরে বিবাহিত সাংসরিক জীবন এই বনিয়াদের উপরই দণ্ডায়মান হয়।

সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে সংযমের প্রয়োজন। অনেকের বদ্ধমূল ধারণা যে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের স্থান নাই। বাস্তবিক পক্ষে

সুসংযত সংসারী জীবনেই ব্রহ্মচর্যের আসল বিস্তার। নিয়মনিষ্ঠা এবং সংযমের মধ্য দিয়া এতো দিন যে সংযত জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বাস্তব সফলতার ক্ষেত্র সংসারেই, আর বিবাহিত জীবন ইহার কষ্টিপাথর। সুসন্তান জন্মদান ব্রহ্মচর্য সাধনার সার্থকতারই নিদর্শন। ব্রহ্মচর্যের সময় সুশিক্ষা লাভের সঙ্গে সংযম নিষ্ঠা অভ্যাসের ফলে শরীর, মন দৃঢ় সবল হইয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইরূপে দেহ-মন স্বতস্ফূত পরিপুষ্টি লাভ করিলেই সংসারী হইবার যোগ্যতা জন্মে। শৌর্য-বীর্য গরীয়ান পিতারই তেজস্বী, বলিষ্ঠ ও মেধাবী পুত্র-কন্যা লাভের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ পুত্র-কন্যা সমন্বিত সংসারই হয় সুখের।

সংযমের উপকারিতা

মানব জীবনের পরিবারের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ মানব শিশুর মত পরনির্ভরশীল আর কেহ নয়। অন্যান্য জীবজন্তু ও প্রাণী তাহার পিতামাতার উপর সামান্য কিছুদিন নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু মানুষ বয়ঃপ্রাপ্তি ও উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবকের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল হইতে হয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন, রীতিনীতি ও কার্যকলাপ তাই মানুষকে শৈশব হইতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অনুকরণের দ্বারাই শিশু শিক্ষালাভ করে। পরিবারের পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী বা অন্যান্য পরিজনদের কার্যকলাপ ও চালচলন সে যেমনটি দেখে, তেমনি শিখে। পরিবার মানব শিশুকে কেবল খাদ্য বস্ত্র ও আহার যোগায় না, তাহার মধ্যে তাহার ভবিষ্যতের বীজও বপন করে। পরিবারের মধ্যে মানবশিশু বা বালক-বালিকা যেমন খাদ্য বস্ত্র, আশ্রয়, স্নেহ-যত্ন ও শিক্ষা পাইয়া পরনির্ভরশীল হয়, অন্যদিকে সে আত্মত্যাগ করিবার, অপরের সহিত ভাগ করিয়া লইবার, অপরের সাহায্যে অগ্রসর হইবার প্রারম্ভিক শিক্ষাও লাভ করে। বালক বালিকার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক ধারণাও অঙ্কুরিত হয়। অসৎ ও কুৎসিৎ পারিবারিক পরিবেশ তাহাদিগকে সৎ ও সুন্দর জীবনেই অভ্যস্ত করে। মানুষের রুচি ও প্রবণতা তাহার পরিবারের প্রভাবে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। **সৎ ও সুন্দর পরিবেশে কতকগুলি গুণের অধিকারী হয় যেমন, ঐক্য, আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্বশীলতা, উদারতা প্রভৃতি বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।** এইভাবে পারিবারিক পরিবেশেই মানব চরিত্রের বনিয়াদ গড়িয়া ওঠে।

শিশু পালনে পরিবারের গুরুত্ব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক

(ক) **স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক:** আদিম যুগে স্ত্রীকে স্বামীর একান্ত ভোগ্য বস্তু হিসাবেই গণ্য করা হইত। স্ত্রীজাতি ছিল লালসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যন্ত্রবিশেষ। পরবর্তী যুগেও স্বামীর গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া সন্তানের জননী হইবার জন্যই স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল। আবার সে যুগের মাতৃপ্রধান পরিবারে স্ত্রীর ক্ষমতাই বেশী ছিল, সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া একাধিপত্য ভাবে তাহারা সন্তান ও স্বামীর প্রতি প্রতিপত্তি চালাইত, পিতা সেখানে সন্তানের জনক ছাড়া কিছুই নয়। আবার কৃষি যুগের শেষের দিকে যখন সমাজে পিতার ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখন পর্যন্তও পুরুষের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব থাকায় সন্তানের মাতার প্রতি পিতার কোনও অন্তরের যোগ ছিল না।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর ও আন্তরিক সম্পর্ক সভ্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতায় স্ত্রীকে স্বামীর **সহধর্মিণী** বলা হইয়াছে। স্ত্রী চিরদিনই স্বামীর **জীবন-সঙ্গিনী**। সাংসারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে আর্যসভ্যতা যে পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আদর্শস্থানীয়। আর্য সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান কল্যাণসূচক। ইহা স্বামী স্ত্রীর-জীবনকে মহীয়ান করিয়া তোলে। **সংসারের সকল কাজই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সাহচর্য্য-সাপেক্ষ**। স্বামী যে কর্মের পথে ছোটে, স্ত্রী দেয় সেই কর্মের অফুরন্ত প্রেরণা। স্ত্রীর এই প্রেরণা না পাইলে কর্মজীবনে স্বামী স্তব্ধ হইয়া যাইত। স্ত্রী স্বামীর কর্মে যোগান দেয় বলিয়াই সে সক্রিয় হইয়া উঠে। তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া যায় না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা ভারতীয় রমণীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না। তাহাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় পতিভক্তির বীজ লুক্কায়িত। অনেক সময় শিক্ষাদীক্ষার অভাবে বীজ-গুলি অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইহার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি মাধুর্য-পূর্ণ না হইয়া তিক্ত হইয়া ওঠে। রামায়ণে আছে—

> "ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
> ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতি সদা"॥

অর্থাৎ **পিতা, পুত্র, নিজ আত্মা, মাতা ও সখীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র গতি**। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের নিকট স্বামীর মত প্রিয়

জগতে আর কেহই নাই। বিবাহ-বন্ধনের গুরু গম্ভীর উৎসবের মধ্যে পিতা যখন কন্যার হস্তখানি তুলিয়া স্বামীর হস্তে একত্রিত করিয়া দেন,তখন পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রগুলির ভিতর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

"যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"

তাঁহারা সেইদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ইহকাল পরকালের জন্য হৃদয়ে বরণ করেন।

আজকাল অনেক মেয়েদের ভিতর দেখা যায়, বিবাহের পর পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, পিতামাতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং পিতৃকুলের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ অনেক স্বামীই পছন্দ করে না,—স্বামী-স্ত্রীর ভিতর মনোমালিন্যের ইহাও একটি বড় কারণ। অনেক স্ত্রীও স্বামীর পিতামাতার প্রতি অতিরিক্ত প্রীতির সম্বন্ধ পছন্দ করে না। উভয় পক্ষেরই হৃদয়ের আদান-প্রদানের গুণে একটি সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়। তবে একথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই যে পুরুষের তুলনায় নারীর চরিত্রে সহনশীলতা, আত্মত্যাগ, ধৈর্যশীলতা এই গুণগুলি অধিকভাবে পরিস্ফুট হওয়া দরকার। সংসারের দশজনের কথা চিন্তা না করিয়া অনেক স্ত্রী আত্মসুখের জন্য স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। স্বামীর অবস্থা খারাপ হইলে, পিত্রালয়ের সচ্ছল সংসারের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীর পরিবারের প্রতিটি কাজকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলিয়া হেয় মনে করে। সেখানে সুখ-সুবিধার অভাবের কথা প্রতিটি কাজে স্বামীকে সচেতন করিয়া তোলে। ইহার ফলে অনেক সময় বৎসরের বেশী সময় পিতৃগৃহেই কাটাইয়া দিতে চায়।

স্বামীর রুচি, অভিপ্রায় এবং মানসিক ভাবগুলির সঙ্গে স্ত্রীও আপন ভাবগুলি এক করিতে চেষ্টা করিয়া লইবে ইহাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ **স্বামী, স্ত্রীর অভিন্ন আত্মা**; একজনের ভাব আর একজনের ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইলে উভয়ের হৃদয় এক হওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয়। সংসারে স্ত্রীর ব্যক্তিগত মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, সুতরাং স্বামী যাহা ভাল দেখেন, স্ত্রীরও তাহা ভাল দেখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বামী যাহা ঘৃণা করে, স্ত্রীও তাহা ঘৃণা করিবে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা স্বামীর শত্রুকে শত্রু, এবং স্বামীর মিত্রকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। **স্ত্রী যদি বুঝিতে পারে স্বামীর শত্রু ব্যক্তি বাস্তবিক নির্দোষ শুধু তাহার স্বামীর দোষেই তাহাদের মধ্যে শত্রুতা জন্মিয়াছে, তথাপি শত্রুর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া স্বামীর ভুল সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।**

আর একটি কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। অনেক স্থলে দেখা যায়, মেয়েরা ধনী

স্বামীর সংসারের অর্থ অভাবগ্রস্ত পিতামাতাকে সাহায্য করিয়া উহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করে। অর্থের প্রাচুর্য থাকিলে ইহা অন্যায় কাজ নয় তবে স্বামীকে গোপন করিয়া করা উচিত নয়, স্বামীর চরিত্রের উদারতা না থাকিলে এই কাজে সে হয়তো মত দিবে না ; তাহার অমতে কখনই এই ধরনের কাজ করা উচিত নয়। একবার করিলে তাহার মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হইবে তাহা কোন কালেই দূর করা সম্ভব হইবে না।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর একটি বড় কর্তব্য **স্বামীর বিপদের সময় ও কষ্টের সময় সাহস ও সান্ত্বনা দেওয়া**। কোনও মহৎ কার্যেও তাহাকে সর্বদা উৎসাহিত করিয়া তুলিতে হয়। তাহার উন্নতির পথে কখনও নিজেদের স্বার্থের জন্য কোনওরূপ বাঁধা-বিঘ্ন জন্মানো উচিত নয়। স্বামীর যশ, স্বামীর পুণ্য, স্বামীর উন্নতি ক্রমশঃ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, প্রাণ দিয়া তাহাই করিতে হইবে। **শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিণী**। স্বামীর সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের অর্ধাংশের অধিকারিণী —স্বামীর পরিণাম উজ্জ্বল হইলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিণামও উজ্জ্বল হইবার কথা, সুতরাং **স্বামীর যাহাতে শুভ কর্মে মতি থাকে সর্বতোভাবে তাহা করাই বিধেয়**।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আদর্শ স্ত্রীর স্বামীর প্রতি ব্যবহার ও সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর কতকগুলি আন্তরিক কর্তব্য রহিয়াছে। **সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক পরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের আদর্শ এখন আর এককভাবে সম্ভব হয় না। স্বামী স্ত্রী উভয়ের কিছু কিছু আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া অন্তরের স্পর্শ লাভ করা যায়**। উভয়ের সহনশীল প্রকৃতির উপর সুখ-শান্তি নির্ভর করে। স্ত্রী যেমন সর্বপ্রকারে স্বামীকে সেবা করিবে, তাহার দুঃখ-কষ্ট দূর করিতে সচেষ্ট থাকিবে ; স্বামীও সেইরূপ সংসারে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহার সহিত সহযোগিতা রাখিয়া সকল কাজে তাহার পরামর্শ লইয়া নিজেদের সম্পর্কটি মধুর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। **সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করিয়া স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধার ভাব থাকিলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে না**।

(খ) মাতা-পিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক

মাতাপিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক ঃ মাতাপিতার সহিত সন্তানের যে স্নেহের সম্পর্ক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার নয়। সুসংযত স্নেহের ভিতর দিয়াই সন্তানকে বড় করিয়া আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হয়। বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব পর্যন্তই শিশুর জীবনের বড় প্রভাব গৃহ-পরিবেশ ; পিতা ও মাতা এই উভয়কে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ পরিবেশ গঠিত হয়। **পিতামাতার স্নেহ-মমতা, ভাইবোনদের সঙ্গ, তাহাদের ঝগড়া, ভালবাসা, পিতার আর্থিক সঙ্গতি, গৃহের স্বাস্থ্য সর্বোপরি পিতামাতার চরিত্র শিশুর জীবনে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।** গৃহ-পরিবেশ যেখানে স্নেহপূর্ণ, নিরাপদ, নির্মল ও উৎসাহ-পূর্ণ সেখানে পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক ভালভাবে গড়িয়া উঠে এবং শিশুও প্রকৃত মানুষ হইতে পারে। যেখানে পিতামাতা নিজেরাই কলহপরায়ণ, নির্মম, উৎপীড়ক, খামখেয়ালী সেখানে সন্তানেরও অসামাজিক ও বিদ্রোহী মনোভাব লইয়া গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। পিতামাতাদের ধারণা সন্তান পালনে উপযুক্ত শিক্ষা তাহাদের আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কথাটা মোটেই সত্য নয়।

পিতামাতার প্রতি শিশুর সম্পর্ক স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইলে উহার নিরাপত্তা-বোধ জাগাইয়া তুলিতে হয়। পিতা-মাতা উভয়েরই **স্নেহ-প্রীতি, প্রশংসা এবং নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য সকল কাজেই উৎসাহ দিতে হইবে।** শিশুর মনোবিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় পিতামাতার স্নেহ, স্বীকৃতি ও প্রশংসা। পিতা অপেক্ষাও মাতার প্রভাব শিশুর উপর বেশী প্রাধান্য বিস্তার করে। আবার **পিতা একেবারে উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকিলে পিতার প্রতি ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ কমিয়া যায়, ফলে তাহারা সংসারে পিতার ভূমিকার কোনও মূল্য দিতে চায় না।** পিতা ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তগুলিকে কল্যাণমুখী করিয়া তুলিবে। ছেলেমেয়েদের প্রবৃত্তি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দমননীতি দ্বারা সুপথে চালনা করিবে ; এই শিক্ষা সন্তানকে বন্ধুভাবে দেওয়া উচিত। প্রবৃত্তি স্বভাবের অঙ্গ ইহাকে অস্বীকার করিলে চলে না। সুতরাং **প্রবৃত্তি যাহাতে ঠিক ভাবে চালিত হয় সেদিকে পিতার স্নেহপূর্ণ দৃঢ় শাসনের প্রয়োজন হয়।** অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, শিশু পিতামাতার নিকট সমান বিচার পায় না, একটা অন্যায় মাতা

যেখানে সমর্থন করে পিতা সেখানে প্রতিবাদ করে। পিতামাতার এই দ্ব্যর্থ মনোভাব শিশুকে সুপথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহার মনে সন্দেহের দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করে, ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান জন্মে না। কোনও এক শিক্ষাবিদ্ বলিয়াছেন—"আমরা যেন আমাদের সন্তানদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস অর্জন করিতে পারি—আমরা যেন হই তাহাদের বন্ধু, যার কাছে যখনই প্রয়োজন তখনই যেন তাহারা আবেদন জানাইতে পারে। তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা শান্ত ও সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়া উপদেশ ও সাহায্যের জন্য যেন সদা প্রস্তুত থাকি। তাহাদের বাল্যকালে বিশেষভাবে আমরা যেন দরদ অথচ দৃঢ়ভাবে পরিচালনা করিতে পারি এবং সেই শাসনের সঙ্গে যেন থাকে স্নেহ-বিশ্বাস ও আনন্দের কোমল স্পর্শ।" সন্তানের প্রতি পিতামাতার সম্পর্ক এর থেকে আর কোনও বড় কথা হইতে পারে না।

পিতা-মাতার লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে ভয় দিয়া কোনও শাসন করা না হয়। ভয়ের মাধ্যমে শাসন করার সুবিধা এই যে ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায় কিন্তু ইহা সাময়িক। মনস্তত্ত্ববিদ্ লক্ বলিয়াছেন, "ইহা হইতেছে শাসন পরিচালনার সহজ অলস পন্থা।" ইহা ছেলেমেয়েদের চরিত্র-গঠনের পক্ষে একেবারেই মূল্যহীন। চরিত্র সংশোধন করাই শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বাইরের তাড়না থেকে সংশোধন, তাহা কখনও স্থায়ী হয় না। অপরাধী যখন মনে করিবে তাহার কাজের দ্বারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া অপরের ক্ষতি হইতেছে এবং শাস্তিকে যখন সে স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণের ন্যায্য উপায় বলিয়া গ্রহণ করিবে, তখনই সত্যিকারের সংশোধন হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "অপরাধ করলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করবে। শাস্তি পরের নিকট হতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজেদের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। **দণ্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করলে যে গ্লানি মোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হতেই হওয়া চাই —পরের নিকট নিজেকে দণ্ডনীয় করবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।**"

শাস্তির কুফল

পিতামাতার বিশেষ করিয়া মাতার লক্ষ্য রাখিতে হয় ছেলেমেয়েদেব বয়স অনুযায়ী কোনও কাজে যাহাতে নিয়োজিত করা হয়। শিশুদের জীবন্ত ও বাড়ন্ত দেহ-মনের অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্য যদি প্রকাশ ও স্ফুরণের অবকাশ না পায় তাহা হইলে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া তাহারা যে-কোনও প্রকারেই গৃহের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবে। অত্যন্ত কৌশলের সহিত তাহাদের বাড়তি কর্মশক্তিকে সৃজনাভিমুখী করিয়া মাতার কর্তব্য তাহাদের উপযোগী কোনও কাজে মনোযোগ আকৃষ্ট করা, অলস দেহ-মন শয়তানের

লীলাক্ষেত্র। অনেক পিতামাতা আছেন যাঁহারা মনে করেন সন্তান দ্বারা কোনও কাজ করানো অর্থ উহাদের অনাদর করা বা উহাদের উপর অবিচার করা ; ইহা যে কত বড় মূর্খতার পরিচয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ছেলেমেয়েদের কোনও ভাল কাজের প্রশংসা করিতে হয়। কাজের স্বীকৃতি পাইলে তাহারা নূতন উদ্যমে পুনরায় অন্য কোনও কাজে আগ্রহী হইবে। **কাজের ভিতর দিয়াই উহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি বিকাশ লাভের সুযোগ ঘটে।** ছেলেমেয়েদের বয়স ও ক্ষমতা অনুযায়ী গৃহের বিভিন্ন কাজ উহাদের ভাগ করিয়া দিতে হয়। বাইরের দোকান-বাজার করা, রেশন তোলা, ইলেক্‌ট্রিকের সাধারণ মেরামতীর কাজ প্রভৃতি ছেলেদের দ্বারা সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। মেয়েরা রান্না ও ঘর-সংসারের কাজে মাতাকে সাহায্য করিয়া নিজেরাও এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে। ছোট ভাইবোনকে দেখাশুনা করা, গৃহ প্রসাধন করা, পিতার ফাই-ফরমাস খাটা—ইত্যাদি বাড়ীর মেয়েদেরই কাজ। গঠনমূলক কোনও কাজের জন্য ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। উহাদের উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য পড়াশুনার ব্যাপারেও পুরস্কৃত করা যাইতে পারে, ইহাতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু বারে বারে পুরস্কারের লোভ দেখাইলে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হইবে না।

পুরস্কারের মূল্য

পুরস্কৃত করিবার সময় পিতামাতার লক্ষ্য রাখিতে হইবে ইহাতে যেন ভাইবোনের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও ঈর্ষার ভাব সৃষ্টি না হয়। সুতরাং পুরস্কার ব্যক্তিগত ভাবে না হইয়া দলগত ভাবেই হওয়া উচিত। যেখানে একাধিক সন্তান সেই পরিবারে ছেলে-মেয়েদের দলবদ্ধভাবে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়া কার্যের ফল দেখিয়া প্রত্যেককেই পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে পরস্পরের সহযোগিতা উৎসাহিত হয়। **ছেলেমেয়েদের শক্তি অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব দিলে এবং উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোনও কাজ ছাড়িয়া দিলে তাহারা আত্ম-নির্ভরশীল ও দায়িত্বশীল হইয়া কর্মঠ হইয়া উঠিতে পারে।**

সন্তান পিতামাতাকে ভালবাসিবে এবং শ্রদ্ধা করিবে ইহা উপদেশ বা নীতি শিক্ষা দ্বারা সম্ভব হয় না। পরিবারের দৃষ্টান্ত দ্বারাই সহজভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে এবং মাতাপিতার সহিত যে উহাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তির সম্পর্ক ইহা তাহাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হইবে। **যে গৃহ স্নেহপূর্ণ এবং যেখানে শিশুর ইচ্ছা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয় না, যেখানে তাহার কিছুটা স্বাধীনতা আছে অথচ শাসনও আছে সেখানেই সন্তানের সহিত পিতামাতার সম্পর্কের অনুকূল**

ক্ষেত্র। সব থেকে বড় কথা এই যে, পিতামাতার ভিতর মনের মিল থাকিলে এবং সংসারে তাহারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলে সন্তানের প্রতি তাহাদের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই মধুর হইয়া উঠিবে।

(গ) ভাইবোনের সম্পর্ক

সংসারে ভাইবোনের সম্পর্কও একটি মধুর সম্পর্ক। পিতামাতার পক্ষপাতিত্বহীন এবং নিঃস্বার্থ আচরণে ভাইবোনের স্নেহের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। ঝগড়া, কলহ, হিংসা, দ্বেষ, ইহার ভিতর দিয়াই পরিবারে ইহারা সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া ওঠে। ভাইবোনের ঝগড়া মারামারি বেশী সময় স্থায়ী হয় না, পরক্ষণেই পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গল্প-গুজব করে, খেলাধুলা করে। সংসারে তাহারা সামান্য জিনিসও ভাগ করিয়া খাইতে শিখে, একই মায়ের একাধিক সন্তান মিলিয়া মিশিয়া একত্রে মানুষ হওয়ার ভিতর শিশুদের কতকগুলি গুণ অর্জিত হয়। এই কারণে **এক সন্তান অনেক সময়ই সমস্যার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।** উহারা ভাগ করিয়া খাইতে জানে না, কাহাকেও কিছু দিতে জানে না, কেবল পাইতেই চায়। আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে এই সকল সন্তান স্বার্থপর হয়। আগেকার দিনে দশ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হওয়ার ফলে উহাদের পরিচালনা করা কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে একক পরিবারের এক সন্তান একটি পারিবারিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। **বৃহৎ পরিবারে মানুষ হইলে কতকগুলি গুণের অধিকারী হওয়া যায়।** বর্তমানে এই সমস্যা এড়াইতে হইলে পিতামাতার যথেষ্ট সচেতন হইতে হয়। অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় আবার অতিরিক্ত শাসন, দুইই এই সকল শিশুদের পক্ষে বিষতুল্য অনিষ্ট সাধন করিবে। **ইহাদের কোমল বৃত্তি বিকাশ জন্য সঙ্গী-সাথীদের ভিতর ছাড়িয়া দিতে হয়।** উহাদের সহিত খেলাধূলা করিয়া, গল্পগুজব করিয়া শিশু সামাজিক হইতে শিখিবে। গৃহের ক্ষুদ্রতর গণ্ডীতে তাহার বহু দোষগুণ, ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ হয় না। সঙ্গী সাথী নিয়া একসঙ্গে খেলা করা, একসঙ্গে গান করা, বিশ্রাম করা—ইহার ভিতর দিয়া শিশুর মানসিক স্ফূর্তি বজায় থাকে এবং হৃদয়বৃত্তি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়।

যেখানে একাধিক ভাইবোনের মিলনক্ষেত্র, সেখানে এ ধরনের সমস্যা নাই; বয়সের পার্থক্য হইলেও এখানে একে অপরের সঙ্গী। **মাতাপিতার ভিতর মনের মিল থাকিলে সন্তানদের পরস্পরের ভিতরও প্রীতির সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। সংসারের কলহ, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি শিশু মনকে ব্যথিত করিয়া তোলে ইহাই স্বাভাবিক।**

অনেক পরিবারে ছেলে এবং মেয়ের প্রতি আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, ইহা খুবই অন্যায়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়েদের মূল্যও এখন কম নয়। বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমানভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে হয়। **যে পরিবারে পুত্র সন্তানের অভাব, সেখানে মেয়েরাই উপার্জন করিয়া ভবিষ্যতে বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে অনেক আছে।**

ভাইবোনের কলকোলাহলে গৃহ-পরিবেশ মুখর হইয়া উঠে। তাহাদের আবেদন, নিবেদন, ঝাগড়া, নালিশ প্রভৃতি দ্বারা মাতাপিতাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। কখনও উহারা উত্তেজিত হইয়া শাসন করেন, আবার কখনও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে তাহাদের ঝগড়াঝাটি ও তর্ক-বিতর্কের মীমাংসা করেন; সংসারের এই চিত্র মাধুর্য পূর্ণ; ইহাতে ক্লান্তি থাকিলেও অবসাদ নাই। **যে গৃহে ভাইবোনের কলকোলাহল শোনা যায় না তাহা অরণ্য তুল্য। বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালি" গ্রন্থখানিতে অপু ও দুর্গার চরিত্র পাঠ করিলে ভাইবোনের মধুর সম্পর্কের কথা আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হয় না।** একই মাতার এ সকল সন্তান যখন বড় হয় তখন সুন্দর পরিবেশের প্রভাবে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। ছোট ভাইবোনের প্রতি দাদা অথবা দিদির স্নেহের আর অন্ত থাকে না। দিদির বিবাহের পর পরবর্তী ভাই বা বোনের একদিকে যেমন আনন্দ হয় অপরদিকে আবার বিচ্ছেদ বেদনায় সর্বাপেক্ষা মন মরা হইয়া পড়ে এই সকল ছোট ভাইবোন। দাদা, দিদি বড় হইলে ছোট ভাইবোনেদের অনেক দায়িত্ব হাসিমুখে বরণ করিয়া লয়। তাহাদের আবদার, অভিযোগ, বায়না এ সকলগুলিও সহানুভূতির সহিত মিটাইবার চেষ্টা করে। চাকুরী করা দাদার কাছে ছোট ভাইবোনের থাকে কতই না চাহিদা! **এই সকল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ঘটনা লইয়াই তো আমাদের ভারতীয় পরিবার মধুর হইয়া উঠিয়াছে।**

(ঘ) দাসদাসীর প্রতি গৃহকর্ত্রীর সম্পর্ক

কেবলমাত্র স্বামী ও সন্তান-সন্ততি লইয়াই একক সংসার গঠিত হয় না। গৃহস্থালীর কাজ কর্মের সাহায্যের জন্য ক্ষুদ্র পরিবারেও কাজের লোকের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। বর্তমানে ইহাদের এখন আর দাসদাসী বলা যায় না। সেকালের তুলনায় মানুষের মনোভাব এখন অনেক উদার হইয়াছে। **সামাজিক যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কাজের লোকেরা যথেষ্ট সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আত্ম-মর্য্যদায় আঘাত লাগিলে সেখানে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। দাসত্ব কথাটা এখন প্রায় অচল।**

যে সংসারে নিতান্তই পর তাহার সহিত অন্তরের যোগাযোগ রাখিয়া সহৃদয়তার সহিত আচরণ করা খুবই গুণের কথা। এরূপ আচরণ আধুনিক সমাজে বিরল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এই সকল **দাসদাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে গৃহের পক্ষে মঙ্গল**। তাহাদের সহিত ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহারা একে পর তাহার উপর নিরক্ষর; এমন অবস্থায় তাহাদের বাধ্য করিতে হইলে, তাহাদের ভাল বাসিতে হইবে এবং বিশেষ আদর যত্ন করিতে হইবে। পরিচারিকা বিশ্বাসী ও বাধ্য না হইলে গৃহস্থালী দুষ্কর হইয়া ওঠে। সুতরাং তাহাদের বাধ্যতার জন্য তাহাদের উপর সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। আদেশ করার পরিবর্তে অনুরোধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ সহজে আদায় করিয়া লওয়া যায়। গৃহকর্ত্রীর তাহাদের সহিত এমন ভাব দেখাইতে হইবে যেন তাহারাও গৃহেরই একজন, পর নয়। এরূপ না করিলে গৃহস্থালীর উপর এবং পরিবারের ছেলেমেয়ের উপর তাহাদের মায়া জন্মিবে না। তাহারা কোনও দোষ করিলে শাসন করিতে হইবে। নতুবা ইহার পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিবে। উপযুক্ত শাসন না করিলে কাজের লোকের উপর প্রভুত্ব রাখা সম্ভব হয় না। **শাসন করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে উহাদের আত্মমর্যাদা যেন ক্ষুন্ন করা না হয়।** প্রয়োজনীয় অল্প কথার মাধ্যমে শাসন করা ভাল। ভুরি ভুরি কথা উচ্চারণ করিয়া গেলে তাহারা যে সকল কথার কোনও মূল্য দিবে না। নিজের ছেলেমেয়েকে যে ভাবে শাসন করা হয় সেইরূপ তাহাদেরও স্নেহ-মমতাপূর্ণ ব্যবহারে শাসন করা কর্তব্য। ইহার ফলে তাহারা সংশোধন হইয়া পুনরায় আর অবাধ্য হইবে না। ইহাদের অভাব অভিযোগের কথায় যতদূর সম্ভব কর্ণপাত করা উচিত।

গৃহে ঝি-চাকরের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া **কখনও বদরাগী বা মুখরা লোক কাজের জন্য নিয়োগ করিতে হয় না। উহাদের সহিত তর্কবিতর্কে সময় নষ্ট হয় এবং পারিবারিক শান্তি বজার রাখা কষ্টকর হইয়া ওঠে।** এই সকল কাজের লোকের খারাপ আচরণ অনেক সময় বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপর বর্তায়। সুতরাং ইহারা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

অনেক আদর্শ ঝি চাকরের নিদর্শন পাওয়া যায় নানা সাহিত্যে। বাস্তব জগতের চরিত্রই তো সাহিত্যে স্থান পায়। **"স্বর্ণলতা" উপন্যাসে শ্যামার মত দাসী এখনকার দিনে বিরল।** বিধুভূষণের সংসারে সকল রকম সাহায্যের ভিতর পরিবারের চরম দুর্দিনে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতেও দেখা গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—"পুরাতন ভৃত্যের কেষ্টর মত চাকর এখন মেলে না। "খোকা বাবুর "প্রত্যাবর্তনের', রাইচরণ প্রভুর পরিবারের জন্য নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই বিসর্জন দিয়াছিল। মানুষে মানুষে এর থেকে আর বড় সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

গৃহে দাসদাসীর প্রতি গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর আচরণ মধুর হইলে পরিবারের বালক বালিকারাও তাহাদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করিতে শিখিবে। পিতামাতার শিক্ষা-দীক্ষায় উত্তম পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়া এই সকল ছেলে-মেয়েরা বাড়ীর ঝি চাকরকে আপন করিয়া লয়। উহাদের 'দাদা', 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করে। বাড়ীর কেহ উহাদের উপর খারাপ ব্যবহার করিলে তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করে। কাজের লোকেরাও উহাদের ছোট খাটো ফাই ফরমাস অনবরতই হাসিমুখে করিয়া যায়। **হৃদয় দিয়া হৃদয়কে জয় করিতে হয়। ইহাই মানবিকতার শেষ কথা।**

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে চেতনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য

দাম্পত্য জীবনের একটি সার্থকতা পুত্র কন্যার আবির্ভাবে। জীবন ধর্মের মূল ধারারই ইহা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। প্রাচীনকালের সমাজে জনবলই ছিল প্রধান বল ; তাই বহু সন্তানের জনক জননী নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিতেন। কিন্তু এখনকার সমাজে 'পপুলেসন' একটি মস্তবড় সমস্যা। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে অর্থ নৈতিক সমস্যা ও বেকার সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। **জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সকলপ্রকার উন্নয়নমূলক কল্যানকর প্রয়াস ব্যর্থ**

হইতেছে। দেশের দুর্বল শ্রেণীর জনগণের দ্রুত অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে জন্মহার হ্রাস করা একান্ত আবশ্যক। **দুর্বল শ্রেণীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা যদি পূর্ব থেকেই সচেতন করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে দেশ কখনই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারিবে না।**

জন্মের হার কমাইতে হইলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। **জন্ম নিয়ন্ত্রণের অর্থ জন্ম নিরোধ বা বন্ধ্যাতা নয়। ইহার উদ্দেশ্য পিতামাতার ইচ্ছা অনুযায়ী আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী মোট কয়টি সন্তানের জন্ম দিবে পূর্বেই সে সম্বন্ধে স্থির করিয়া লওয়া। সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে পূর্বে এই পরিকল্পনা নেওয়াকেই পরিবার পরিকল্পনা বলা হয়।**

পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা

পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে দেশের লোক সচেতন হইলে সমাজের স্বাস্থ্য ও অর্থ নৈতিক সমস্যা বহুল পরিমাণে দূর করা যায়। **পরিবার পরিকল্পনা একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম নিরোধ করে অপরদিকে বাঞ্ছিত শিশুর আগম সুগম করিয়া তোলে।** বস্তুতঃ ষাটের দশকের পর হইতেই জনবৃদ্ধির সমস্যা তীব্রতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। **প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জন্মহার ১ হইতে ২ শতাংশ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইাছিল তৃতীয় পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনার জন্মহার ২ হইতে ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পূর্বাভাষ দেওয়া হইয়ছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী ভাবে আমাদের দেশ জনগণকে সতর্ক করিয়া দেয়। এই সময়ে আমাদের জন সংখ্যা ৪৫ কোটি অতিক্রম করে।**

জন্ম হারের হিসাব

বর্তমানে দেশে প্রতি মিনিটে ৪০ টি শিশু জন্মলাভ করিতেছে এবং একদিনে ৫৮ হাজার এবং এক বছরে ২ কোটি ১০ লক্ষ শিশু ভূমিষ্ঠ হইতেছে। জন্ম হারের এরূপ অবস্থায় বর্তমানে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। জনসাধারণের কোনও কোনও শ্রেণীর কাছে কথাটি আপ্রিয় সত্য হইলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নিজের দায়িত্বের কথা অস্বীকার করিলে চলিবেনা। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাদের সকল প্রকার ভয় ভীতি দূর করিয়া কার্যকরী করিতে অগ্রদর হইয়া আসিতে হইবে। আজিকার দিনে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অপরিহার্য্যতা কাহারোই অবিদিত নয়। **মানুষের এই স্বল্প পরিসর জীবনে বহু সন্তান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে বহু অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।** একমাত্র সীমিত পরিবারের মাধ্যমেই মানুষের জীবন সুখ ও প্রাচুর্যে ভরিয়া

ওঠে। সীমিত পরিবারে শিশু আর্থিক সচ্ছলতায় ভালভাবে পুষ্টিলাভ করিয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যার যুগে নারী জাতিও আজ আর ঘরে বসিয়া নাই। উপার্জনের তাগিদে আজ তাহারাও নানা রকম কাজে যুক্ত আছে, বহু সন্তানের জননীর পারিবারিক নানা দায়িত্বে ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে গৃহস্থালীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া তাহার পক্ষে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করা একটি বড় সমস্যা। পরিবারটি ক্ষুদ্র হইলে খরচ বাঁচে, দুইটি কি তিনটি সন্তানকে উপযুক্তভাবে মানুষ করা যায়। প্রাচীন কালের মত এখন অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল নয় কেবলমাত্র শিশুর জন্ম দিলেই হয় না, তাহার উপযুক্ত খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পরিবারে ও সমাজে সে বোঝা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দারিদ্র্যের হাত হইতে কখনই রক্ষা পাওয়া যায় না। **রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় বর্তমানে যে লোক সংখ্যা তাহাতে দেশের খাদ্য বণ্টন করিলে কাহাকেও পুরা খাদ্য দেওয়া যায় না।** খাদ্য অন্য দেশ হইতে আমদানী করিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এইভাবে অর্থব্যয় করিতে গেলে দেশের কল্যাণ সূচক উন্নয়ন মূলক কোনও কাজে অর্থের অভাবে অগ্রসর হওয়া যায় না। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে স্বাভাবিক ভাবে দেশের মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেদিক হইতেও বর্তমানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। **অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে দারিদ্র্যেরই সূচনা হয়।** দারিদ্র্য জর্জ্জরিত অশান্তিপূর্ণ গৃহে সন্তান সন্ততি স্বাভাবিকভাবে রুগ্ন হয়। ভালভাবে ভাল পরিবেশে প্রতিপালিত না হওয়ার ফলে তাহাদের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সুপরিস্ফুট হয় না। ইহারা কোনও রকম শিক্ষা দীক্ষারও সুযোগ লাভ করিতে পারে না ফলে দেশের ভিতর অপরাধ প্রবণতার প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। **সুতরাং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।**

বহু সন্তানের সমস্যা

সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহারা জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। উপযুক্ত কোনও কর্মে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া শিক্ষিত শ্রেণীর যুবকেরা এখন কেহ বিবাহ করে না। সুতরাং ছেলেমেয়ে উভয়েরই একটু বেশী বয়সে বিবাহের ফলে দুইটি কি তিনটি সন্তানের বেশী আর এই সমস্ত পরিবারে দেখা যায় না। অনেক সময় আবার লক্ষ্য করা যায় উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তানের সংখ্যা একেবারেই কম। এই সকল পিতা-মাতার কাছে বহু সন্তান আর

মোটেই কাম্য নয়। কিন্তু নিম্ন স্তরের ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর সন্তান জন্মের হার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে, বর্তমান সমস্যা এই সকল শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়াই প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করিয়া দিনের পর দিন অবাঞ্ছিত সন্তানের পিতামাতা হইতেছে। সুস্থ সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য প্রত্যেকেরই সক্রিয় হইতে হইবে। **দুর্বল, লঘুচরিত্র এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রীপুরুষের যাহাতে সন্তান না জন্মে, অন্ততঃ যত কম জন্মে, তাহার জন্য দেশবাসীর সচেষ্ট হইতে হইবে।** ভাবী সুস্থ সমাজ গঠন করিতে হইলে অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা হ্রাস করিয়া উত্তম পুত্র কন্যা বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিয়া তোলা একান্ত আবশ্যক।

ভাবী সুস্থ সমাজ গঠনের উপায়

উত্তম উত্তম সন্তান লাভ করিবার জন্য চরিত্রবান্, স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিমান যুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। **পুরুষ উপযুক্ত না হইলে স্ত্রী যতই আদর্শ হউক না কেন, কখনই সুসন্তান লাভের আশা পোষণ করা যায় না। কতকগুলি ইতর সন্তান দ্বারা সমাজের বোঝাই বাড়িয়া চলে সমাজের ও দেশের উন্নতি আদৌ সেখানে আশা করা যায় না।**

গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত সমাজে স্বাস্থ্য পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে এই সমস্যা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। প্রশিক্ষণ সংগঠনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী যাহাতে একটি সার্থক গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থায় প্রয়াসী হইলে অদূরে ভবিষ্যতেই আমাদের দেশ হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দূর হইবে। **সরকারী প্রচেষ্টার সহিত জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যাই দূরীকরণে সহজ হয়।**

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে কোনও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীই নেওয়া হউক না কেন তাহাতে নারীর রহিয়াছে মুখ্য ভূমিকা। জন্ম নিয়ন্ত্রনে সচেতন করিয়া তোলা এবং সুপরিকল্পিত ভাবে পরিবারটিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তোলার নির্দেশ নারীদের উপর ছাড়িয়া দিলে অধিক ফলপ্রসূ হয়।

১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক যে বিশ্ব সংখ্যা বছর উদ্‌যাপিত হয় তাহাতে দেখা গিয়াছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে আজও লক্ষ লক্ষ লোক মানুষ্যেতর জীবন

বিশ্বজন সংখ্যা বছর উদ্‌যাপন

যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। শুরুতেই পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কে জোরদার ব্যবস্থা নিলে হয়তো আশা ব্যঞ্জক চিত্রই পাওয়া যাইত। **দেশ থেকে আজ আমরা দারিদ্র্য দূরীকরণে**

যে সুসংহত প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছি অথচ জন বহুলতার প্রবল চাপে তাহা বানচাল হইতে বসিয়াছে। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এই জনসংখ্যার চাপ রোধ করিতে পরিবার-পরিকল্পনাকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমরাও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে পুরোপুরি অগ্রসর হইতেছি। মানুষের চাপে পৃথিবীতে একদিন হাহাকার দেখা দিবে এই আশঙ্কাই আমরা সর্বক্ষণ করিতেছি এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্ম জন্ম শাসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় নিয়া নানা ভাবে আলোচনা করিতেছি। বিশ্ব সম্মেলনে এই কথা বলা হইয়াছিল যে জননীতি নির্দ্ধারণ করার অর্থ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নয়। কারণ কোনও একটি বিশেষ দেশে যদি জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই কম থাকে সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সেই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। জন্মশাসনের ধূয়া যখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে তখন ভারতের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যাইতেছে সেখানে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, এ অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য তাহাই ভাবিবার বিষয়। উড়িষ্যার ১৩টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। ১৯৭১ সালের আদম সুমারির হিসাবে বলা হইয়াছে যে দশ বছর আগের তুলনায় বীরহোর, হো, ভাগত ইত্যাদি গোষ্ঠীর আদিবাসীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ঠিক কি কারণে এই লোকসংখ্যা কমিয়াছে তাহা বোঝা যায় না। আবার পশ্চিমবঙ্গে টোটো উপজাতির কথা উল্লেখ করিলে লক্ষ্য করা যায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বংশ বিস্তারই এই সকল গোষ্ঠীর একান্ত কাম্য। কারণ ইহারা লোপ পাইলে জন সমষ্টির কয়েকটি বিশেষ ধারাই লোপ পাইতে বসিবে। আদিবাসীদের সুখ-সুবিধার জন্য সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করিতেছে। কিন্তু জন সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকিলে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা কি? যে সকল দেশে জন সংখ্যা কম সেই সব দেশের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি বর্জন করাই মঙ্গল জনক ব্যবস্থা সুতরাং জাতীয় জননীতি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ব্যতিক্রম রাখা একান্ত দরকার। আমাদের ভারত সরকার জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষ্যের সঙ্গে জন-সংখ্যার প্রশ্নকেও যুক্ত করিয়াছে। এই নীতি অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক করার কোনও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার এখনও গ্রহণ করে নাই। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা করিবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে। তাই দেশের প্রত্যেকটি লোক জাতিধর্ম নির্বিশেষে যাহাতে পরিবার-পরি-

বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার হ্রাস

কল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক আবার বংশলোপ যাহাতে না হয় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এই নীতির ব্যতিক্রমের কথাও চিন্তা করিতে হইবে।

পরিবার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত

পরিবার-পরিকল্পনার সম্বন্ধে নানা প্রকার বিরুদ্ধ মতবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। উহাদের মতে অন্তরের কোন প্রেরণা না থাকিলে কেবল বাহিরের চাপে সমাজের কখনও স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। **জন্ম নিয়ন্ত্রণ একটি যান্ত্রিক উপায়। যেখানে আত্মসংযম সম্ভব পর নয়, সেখানে এই উপায় অবলম্বন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।** তাহাছাড়া এই সব যান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করিলে অসংযমেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আর যেখানে অসংযম প্রশ্রয় পায় সেখানে দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়। মনও উচ্চতর প্রেমের দিকে অগ্রসর হয় না; বরং যৌন-মিলনের আবিলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সঙ্কীর্ণ ও মলিন হইয়া পড়ে। পিতামাতার যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের সাহায্য না লইয়া আত্ম নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হইতে হইবে। তবে যাহাদের শরীর মন স্বাভাবিকভাবে সুস্থ নাই তাহাদের জন্য এরূপ যান্ত্রিক উপায় প্রজনন শক্তি বিলোপ করিয়া দেওয়া সমাজের পক্ষে যে কল্যাণকর তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পরিবার-পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য

পরিবার ও দেশের স্বাস্থ্যের দিক হইতেও পরিবার-পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। বার বার সন্তার ধারণ করিতে হইলে মাতার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। রুগ্‌ন মাতা রুগ্‌ন শিশুর জন্মদান করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। **শিশু জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল। অসুস্থ শিশু দ্বারা কখনও সবল জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।** কয়েক বৎসরের ভিতর বারে বারে গর্ভবতী হইবার ফলে মাতার নানা প্রকার অভাব জনিত রোগ দেখা দেয়। **অষ্টাম্যালেসিয়া** রোগ এই সকল মায়ের ভিতর বেশী লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ ভিটামিন ডি এর অভাবে এই রোগ হয়। গর্ভকালীন অবস্থায় উপযুক্ত ভিটামিনের অভবে এই রোগ ছাড়া আরও নানা প্রকার রোগে মায়েরা আক্রান্ত হয়। বেশী সন্তান হওয়ার ফলে **রক্তশূন্যতা** রোগ মাতাদের ভিতর ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। **বারে বারে সন্তানের জন্ম দিলে স্ত্রীলোকের হৃদপিণ্ড ও যকৃত নষ্ট হইয়া যায়।** অর্থ-নৈতিক কারণে শিশু এবং মাতা কাহারও ভাল যত্ন বা বিকিৎসা হয় না। ইহার ফলে অনেক সময় শিশু ও প্রসূতির অকালমৃত্যু অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়।

আগেকার দিনে সন্তান ধারণে মায়ের স্বাস্থ্যের কোনও সমস্যাই ছিল না। লোক বলের জন্য বেশী সংখ্যক সন্তান ধারণে কোনও সমালোচনা ছিল না বরং গর্বের বিষয়

ছিল। তখন অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থাও অনুরূপ ছিল। বৃহৎ পরিবারে সাংসারিক কাজের কেনও সমস্যা ছিল না। খাদ্যের কোনও অভাব ছিল না। বিস্তৃত জায়গা লইয়া বসবাসের ফলে সহজে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। তখন অধিকাংশ সংসারই ছিল সচ্ছল। প্রচুর পরিমাণে দুধ, ঘি, মাছ, ডিম, শাক-সব্জী খাইবার ফলে পিতামাতার স্বাস্থ্য অটুট থাকিত। **বর্তমানে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক নীতির পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই পরিবার-পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।**

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা ছাড়াও দেশগত ভাবেও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে একটি ভয়াবহতা সৃষ্টি হইয়াছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে, বস্তিতে অপুষ্টি রোগে সাধারণ লোকে সন্তান-সন্ততি লইয়া এক অশান্তি ও অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করিতেছে। জন সংখ্যার বিপুল চাপ হইতে ইহাদের অব্যাহতি দিতে পারিলেই তাহাদের জীবনে আসিবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

পরিশিষ্টঃ প্রশ্নাবলী

Essay Type Questions :

প্রথম পত্রঃ প্রথম অধ্যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। মানব জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। বিভিন্ন প্রকার গৃহের বর্ণনা দাও।

২। বসত বাটি নির্মাণের জন্য কিরূপ জমি নির্বাচন করিবে? শহরের বাড়ী ও গ্রামের বাড়ীর পার্থক্য কি কি?

৩। বাসগৃহের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।

৪। গৃহ নির্মাণের মালমসলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। (ক) গৃহের অবস্থান কিরূপ হওয়া আবশ্যক?

(খ) গৃহের সংস্থিতি সম্বন্ধে তোমার মতামত প্রকাশ কর।

৬। পরিবহণ বলিতে কি বোঝ? তোমার লোকালয়ে পরিবহণের ব্যবস্থা কিরূপ? উপযুক্ত পরিবহণের ব্যবস্থার অভাবে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়?

৭। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত আলোর ক্রমোন্নতির একটি বিবরণ দাও।

৮। গৃহের আবর্জনা সমূহ দূর করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় প্রচলিত তাহার বর্ণনা দাও।

৯। বড় বড় শহরে দেহ-নিঃসৃত ক্লোদ সমূহ দূর করিতে যে সকল প্রণালী সাধারণ ভাবে প্রযুক্ত হয় তাহার বর্ণনা দাও।

১০। পয়ঃপ্রণালী কাহাকে বলে?

১১। গ্রামে তরল ময়লা অপসারণের ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

১২। একটি মলশোধনী পায়খানার নির্মাণ প্রণালী ব্যাখ্যা কর।

১৩। গৃহ নির্মাণে পরিকল্পনার স্থান নিরূপণ কর। পরিকল্পনাটি করিবার পূর্বে কোন্ কোন্ বিষয় চিন্তা করিবে?

১৪। একটি আদর্শ রন্ধন গৃহের পরিকল্পনার নক্সা দেখাইয়া সুবিধা আলোচনা কর।

১৫। বাসগৃহে কাপড় কাচা ঘরের প্রয়োজনীয়তা কি? ধোপাবাড়িতে কাপড়-চোপড় দেওয়ার অসুবিধা কি কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। শয়ন ঘরের গুরুত্ব আলোচনা করিয়া ঐ ঘরের নক্সা কিরূপ হওয়া উচিত উল্লেখ কর।

২। বৈঠকখানা ঘরের প্রয়োজনীয়তা কি? কক্ষটির পরিকল্পনা সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

৩। "শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব হিসাবে বাসগৃহের ভিতর একটি পাঠকক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য—আলোচনা কর।

৪। 'শিশুকক্ষ শিশুর দেহের ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে'—উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার করিয়া উহার পরিকল্পনা কিরূপ হওয়া উচিত সমালোচনা কর।

৫। একটি আদর্শ ভোজন কক্ষের পরিকল্পনা নিরুপণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। গৃহ সজ্জার মূলনীতি কি কি? গৃহ সজ্জায় এই নীতি কি ভাবে কার্যকরী হয় বুঝাইয়া দাও।

২। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আসবাবপত্রাদি কিভাবে নির্বাচন করিবে? আসবাবপত্র নির্বাচনে সাধারণ নিয়মগুলি উল্লেখ কর।

৩। গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সজ্জা সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ কর।

৪। মেঝের সজ্জা বলিতে কি বোঝ? মেঝের সজ্জার প্রয়োজন হয় কেন? মেঝের সজ্জা হিসাবে আলপনার স্থান নিরূপণ কর।

৫। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আলপনা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। লক্ষ্মীপূজার একটি আলপনার নক্সা দেখাইয়া উহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৭। (ক) গৃহ সজ্জায় পর্দার স্থান নিরূপণ কর।

(খ) "গৃহ প্রসাধনে পুষ্প বিন্যাস অপরিহার্য"—আলোচনা কর।

(গ) নিম্নলিখিত কক্ষগুলির সজ্জা সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ কর:—
বৈঠকখানা ঘর, শয়ন ঘর, পড়ার ঘর, শিশুর ঘর।

৮। একটি রন্ধন গৃহের এবং ভোজন গৃহের সাজ-সরঞ্জাম কি ভাবে রুচিসম্মত-ভাবে সন্নিবেশ করা যায় তাহা আলোচনা কর।

৯। গৃহ প্রসাধনে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পার্থক্য বিচার কর।

১০। পল্লীগ্রামে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহ সজ্জা কিরূপ হয় তাহার নক্সা বর্ণনা কর।

১১। গৃহপ্রসাধনে বর্ণের প্রাধান্য আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। 'গৃহিণীই গৃহের শ্রী'—আলোচনা কর। সুগৃহিণী কাহাকে বলে?

২। গৃহ কর্মে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি কি?

৩। গৃহিণীর গুণাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। গৃহকর্মে সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৫। কর্ম বিভাগ কি? গৃহ পরিচালনায় কর্ম বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

৬। কোন্ কোন্ বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম ভাগ করা উচিত? বৃহৎ পরিবার ও ক্ষুদ্র পরিবারের ভিতর পার্থক্য কি কি?

৭। 'গৃহকর্মে কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ একটি বড় কৌশল'—সমালোচনা কর।

৮। গৃহকার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

৯। সেকালের গৃহিণী ও একালের গৃহিণীর ভিতর প্রভেদ কি কি?

১০। গৃহকর্ত্রীর দৈনন্দিন কাজগুলি উল্লেখ কর। এই কাজগুলি গৃহকর্ত্রী কি ভাবে সম্পন্ন করিবে তাহা বুঝাইয়া দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। নিম্নলিখিত কক্ষগুলির দৈনন্দিন পরিষ্করণের প্রণালী বর্ণনা কর: (ক) শয়ন ঘর, (খ) বসিবার ঘর, রান্নাঘর।

২। তোমার গৃহের সাপ্তাহিক পরিষ্করণের প্রণালীটি কি ভাবে সহজ করিতে পার আলোচনা কর।

৩। বার্ষিক পরিষ্করণের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া তোমার গৃহের বার্ষিক পরিষ্করণের পরিকল্পনাটি আলোচনা কর।

৪। রন্ধন গৃহের বিভিন্ন ধাতু নির্মিত বাসন পত্রাদি কোন্‌টা কি ভাবে পরিষ্কার করা যায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। বাসগৃহের উপদ্রবকারী কয়েকটি কীট পতঙ্গের নাম কর। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ স্থলে উহারা আশ্রয় গ্রহণ করে ?

২। কীট পতঙ্গের কবল হইলে রক্ষা পাইবার উপায় কি কি ?

৩। মাছি আমাদের পরম শত্রু—আলোচনা কর। কিরূপে মাছি ধ্বংস করা যায় বর্ণনা কর।

৪। কয়েকটি কীট নাশক ঔষধের নাম কর। এইগুলি কি ভাবে প্রয়োগ করা হয় বর্ণনা কর।

৫। কোন্ পোকা সাধারণতঃ পোশাক-পরিচ্ছদ কাটে ? এই পোকা যাহাতে কাপড় চোপড় কাটিতে না পারে সেইজন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে ?

৬। মূল্যবান বইপত্র কি ভাবে কীট পতঙ্গের কবল হইতে মুক্ত রাখিবে আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। পোশাক কাহাকে বলে ? পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজীনয়তা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা কর।

২। পোশাক ব্যবহারে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তোমার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ কর।

৩। "পোশাক নির্বাচনে বয়স, স্ত্রীপুরুষ ভেদ ও পেশা প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক"—যুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দাও।

৪। "পোশাক-পরিচ্ছদে ঋতু একটি প্রধান স্থান অধিকার করে"—সমালোচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করার বিষয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপের নাম উল্লেখ কর।

২। একটি ছকের সাহায্যে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পোশাকের মাপ দেখাও। মাপ লইবার সাধারণ প্রণালী বর্ণনা কর।

৩। ১০ বৎসর বয়সের বালকের হাফ্‌প্যান্ট ও হাফ্‌শার্টের বিভিন্ন মাপ উল্লেখ কর।

৪। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মাপের নাম ও উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। কাটিং এর চিত্রসহ ৩৬ ইঞ্চি ছাতির একটি ব্লাউজের বিভিন্ন মাপ দেখাও।

৬। ২২ ইঞ্চি ঝুলের একটি ফ্রকের কাটিং সহ বিভিন্ন অংশের মাপ দেখাও।

৭। ১৭ ইঞ্চি ঝুলের একটি হাফপ্যাণ্টের সেলাই-এর প্রণালী বর্ণনা কর।

৮। ছোট মেয়েদের ১৮ ইঞ্চি ঝুলের একটি ইজারের বিভিন্ন মাপ উল্লেখ কর এবং মাপ অনুসারে মার্কিং দেখাও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। "রুচিসম্মত পোশাক নির্বাচনে তন্তুর সৌন্দর্য একটি অপরিহার্য বিষয়"—আলোচনা কর।

২। পরিচ্ছদের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকিলে পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।—যুক্তি সহ বিচার কর।

৩। বস্ত্রের সহজধৌতি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১। পুরাতন বস্ত্রের সংস্কারের প্রয়োজন হয় কেন? "একটি পোশাক রুচি-সম্মতভাবে সংস্কার করিলে উহাকে নবরূপ দান করা হয়"—বুঝাইয়া দাও।

২। কি কি কারণে পোশাক পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া যায়?

৩। পোশাক-পরিচ্ছদ সংস্কারে রিফু ও তালির পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪। সূতির তালির প্রণালী বর্ণনা কর।

৫। পরিচ্ছদ-সংস্কার সাধনে তোমার মন্তব্য আলোচনা কর।

৬। পশম জামার সংস্কার প্রক্রিয়া আলোচনা কর। পুরাতন পশমকে কি ভাবে নূতন করিয়া তোলা যায় তাহা উল্লেখ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। বিভিন্ন তন্তু উল্লেখ করিয়া উহার একটি চার্ট দেখাও।

২। প্রাণিজ-তন্তু বলিতে কি বোঝ? কয়েকটি প্রাণিজ-তন্তুর নাম কর। রেশম কীটের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা কর।

৩। রেশম ও পশম সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। উদ্ভিজ্জ-তন্তু কি কি? প্রত্যেকটি উদ্ভিজ্জ-তন্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। কৃত্রিম-তন্তু সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। সূতির পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করিবার জন্য যে সমস্ত তৈজসপত্র বাড়ীতে রাখা একান্ত প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা দাও।

২। কাপড় কাচায় জলের প্রাধান্য আলোচনা কর। কিরূপ জল এই কাজে নির্বাচন করিবে?

৩। খর জলের দোষ কি কি? জলের খরতা কি কি উপায়ে দূর করা যায়?

৪। কাপড় কাচার বিভিন্ন উপকরণের নাম কর এবং উহাদের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

৫। সাদা সূতির কাপড় কাচার প্রণালী বর্ণনা কর।

৬। রঙীন বস্ত্র ধৌত করিবার সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করিবে লিখ।

৭। রেশম বস্ত্র ধৌত করার প্রণালী বর্ণনা কর।

৮। পশম বস্ত্র কিভাবে ধুইবে? পশম বস্ত্র ধুইবার সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়?

৯। একটি কৃত্রিম রেশম বস্ত্র ধৌত করার পদ্ধতি আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। মাংসপেশী কাহাকে বলে? বিশ্লেষণ কর। তাহার কার্য কি? বিভিন্ন প্রকার পেশীর আকার ও অবস্থিতি বর্ণনা কর।

২। নরকঙ্কাল কাহাকে বলে? তাহার প্রয়োজনীয়তা কি?

৩। অস্থির উপাদান কি? উহার সাধারণ কার্য কি কি? অস্থি কত প্রকার ও কি কি? বয়স্ক লোকের সর্বশুদ্ধ কয়খানি অস্থি আছে?

৪। মেরুদণ্ড কাহাকে বলে? তাহার কার্য কি? তাহাতে কয়খানি অস্থি আছে? পর পর নাম কর। কিভাবে পরস্পর যুক্ত আছে? ভারটিব্রার গঠন বর্ণনা কর। মেরুমজ্জা কাহাকে বলে? তাহার কার্য কি?

৫। বক্ষের অস্থিটি বর্ণনা কর। পঞ্জরাস্থি কয়টি এবং কোথায় ও কিভাবে আছে? পঞ্জরাস্থি ও বক্ষের অস্থির কার্য কি?

৬। স্নায়ুতন্ত্র কাহাকে বলে? উহার কয়টি অংশ এবং কি কি? প্রত্যেকটির কার্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

৭। সুষুম্নাকাণ্ডের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

৮। গ্রন্থি কত প্রকার ও কি কি? দেহের ভিতর গ্রন্থিগুলির কাজ কি কি?

৯। নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:—থাইরয়েড, এড্রেনাল, পিটিউট্যারী।

১০। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি কি? ইহাদের সাধারণ কার্য কি?

১১। চক্ষুর গঠন প্রণালী বুঝাইয়া দাও। দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

১২। শ্রবণ যন্ত্র সুস্থ রাখার উপায় কি কি? ছবির সাহায্যে উহার গঠন ও আকৃতি আলোচনা কর।

১৩। ত্বক কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়? উহাদের কার্য কি কি? চর্ম সুস্থ রাখিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

১৪। কোন্ কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে দেহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়?

১৫। হৃদপিণ্ড কাহাকে বলে? উহার গঠন কিরূপ এবং কোথায় অবস্থিত চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ইহার কার্য কি কি? ইহার বাম ও দক্ষিণ ভাগ হইতে কোথায় রক্ত যায়?

১৬। ধমনী ও শিরার রক্তের পার্থক্য কিভাবে বুঝা যায়?

১৭। রক্তের উপাদান কি কি? রক্তের লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকার কার্য কি কি?

১৮। খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? কি কি যন্ত্র ও পদার্থের সাহায্যে এবং কিভাবে খাদ্য জীর্ণ হয় বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দাও। খাদ্যের অনাবশ্যক অংশ কি হয়?

১৯। যকৃৎ, কিডনী ও ফুসফুসের কার্য কি?

২০। দেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া কিরূপে হয় বর্ণনা কর। ইহাতে দেহের কি উপকার হয়? দেহে রক্ত স্রোতের গতি কিরূপ?

২১। দেহে বিশুদ্ধ রক্তের আবশ্যকতা কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। বায়ুর বিভিন্ন উপাদান কি কি? বায়ুর প্রধান প্রধান উপাদানগুলি কি পরিমাণে বায়ুতে আছে উল্লেখ কর।

২। দূষিত বায়ুতে সাধারণতঃ কি কি পদার্থ থাকে? বায়ু বাহিত কয়েকটি রোগের নাম কর। মুক্ত বায়ু সেবনের উপকারিতা কি কি?

৩। বায়ু সঞ্চালন কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের বায়ু সঞ্চালনের নাম কর।

৪। কি কি কারণে বায়ু বিশোধিত হয় বর্ণনা কর।

৫। "জলই জীবন"—কথাটির তাৎপর্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর।

৬। জল প্রাপ্তির বিভিন্ন উৎস উল্লেখ করিয়া সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।

৭। কি কি কারণে জল দূষিত হয়?

৮। পানীয় জল বিশুদ্ধ করণের পদ্ধতি চিত্র সহ বর্ণনা কর।

৯। কলিকাতার মত বড় বড় শহরে পানীয় জল কিভাবে পরিস্রুত করা হয় আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। "গৃহে শিশুর স্থান"—কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২। গৃহ পরিবেশ শিশুর দেহ ও মনের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে আলোচনা কর।

৩। শিশুর খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত? উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশুর কি কি রোগ হয়?

৪। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত শিশুর স্নানের প্রণালী বর্ণনা কর।

৫। শিশুর পোশাক সম্বন্ধে তোমার ধারণা মন্তব্য প্রকাশ কর। শিশুর পোশাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেন?

৬। শিশুর খেলাধূলা ও নিদ্রা কিরূপ হওয়া উচিত? বাচ্চা শিশুর খেলনা কি-রূপ হওয়া প্রয়োজন?

৭। শিশুর যত্ন ও পরিচর্যায় পিতার ভূমিকা কতদূর আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। শিশুর ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (জন্ম হইতে ১ বৎসর বয়স পর্যন্ত)।

২। শিশুর খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তনের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

শিশুকে বদলী খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? খাদ্য গ্রহণের ভিতর দিয়া শিশুকে কিভাবে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা যায় তাহা আলোচনা কর।

৩। "খেলা ও খেলনার ভিতর দিয়া শিশুর মানসিক চরিত্র বিকশিত হয়"—আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। গৃহে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে হইলে শুশ্রূষাকারীর কিভাবে প্রস্তুত হইতে হয় ?

২। রোগীর মাথা ধোওয়াইবার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। রোগীকে গা মোছাইবার প্রয়োজনীয়তা কি ? কিভাবে একটি রোগীকে গা মোছাইতে হয় আলোচনা কর।

৪। রোগীর মুখ ধোওয়াইবার সরঞ্জামাদির একটি তালিকা প্রস্তুত কর এবং মুখ পরিষ্কার করিবার প্রণালী বর্ণনা কর।

৫। বেডসোর কাহাকে বলে ? রোগীর পিঠের যত্নের সহিত বেডসোরের সম্পর্ক কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। রোগীর কক্ষ নির্বাচনে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবে ? রোগীর শুশ্রূষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাদির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২। একটি ছোট শিশুকে সেবা-শুশ্রূষা করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

৩। একজন স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা রোগকালীন অবস্থায় বয়স্ক ব্যক্তিকে সেবা-শুশ্রূষা করা অধিকতর কঠিন ব্যাপার কেন ?—আলোচনা কর।

৪। রোগীর খাদ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া কিভাবে খাদ্য প্রস্তুত করিবে উল্লেখ কর।

রোগীকে কখন কোন্ খাদ্য দেওয়া উচিত ?

৫। "একটি অসুস্থ বৃদ্ধকে শুশ্রূষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার"—কারণ উল্লেখ করিয়া আলোচনা কর।

৬। রোগীর দেহের তাপ লইবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

৭। রোগীর দেহের তাপ লিখিয়া রাখিবার গুরুত্ব কি ? তাপ লিখিয়া রাখিবার পদ্ধতি ছকের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৮। রোগীকে বেডপ্যান দেওয়ার ব্যাপারে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক ? বেডপ্যান দেওয়ার নিয়ম বর্ণনা কর।

৯। রোগীর শয্যা পরিবর্তনের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১০। রোগীর খাদ্য পরিবেশনের পদ্ধতি আলোচনা কর। "রোগীর পথ্য পরিবেশনে সৌন্দর্য সৃষ্টি রোগীকে খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার একটি সহজ পদ্ধতি" —বর্ণনা কর।

১১। রোগীকে ঔষধ দিবার নিয়ম কি কি? ঔষধ দিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক?

অষ্টম অধ্যায়

১। সাধারণতঃ শিশুদেরই হয় এরূপ কয়েকটি রোগের নাম কর। এই সকল রোগের কবল থেকে শিশুকে রক্ষা করিতে হইলে কি কি সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক আলোচনা কর।

২। শিশুর তড়কা হয় কেন? তড়কা হইলে শিশুকে সুস্থ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

৩। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা কর।

৪। সঙ্গরোধ কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ রোগে সাধারণতঃ সঙ্গরোধের প্রয়োজন হয়? সঙ্গরোধের নিয়ম বর্ণনা কর।

৫। নির্বীজন কাহাকে বলে? নির্বীজন সাধারণতঃ কত প্রকারের হয় এবং কি কি? প্রত্যেকটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

৬। অনাক্রম্যতা কাহাকে বলে? আমরা প্রধানতঃ কোন্ কোন্ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কৃত্রিম অনাক্রম্যতা গ্রহণ করি?

৭। জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা কি? এই শিক্ষা কি কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে লিখ।

৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) বিজ্ঞপ্তিকরণ, (খ) স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) পার-ক্লোরাইড অফ মার্কারী সলিউসন, (ঘ) পরিশেষ নির্বীজন।

নবম অধ্যায়

১। গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থার জন্য কোন্ কোন্ জিনিস প্রস্তুত রাখিবে?

২। প্রাথমিক প্রতিবিধান কাহাকে বলে? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর রোগী সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক?

৩। আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিতে কি বোঝ? কয়েকটি আকস্মিক দুর্ঘটনার নাম কর।

৪। ব্যাণ্ডেজ কাহাকে বলে? ব্যাণ্ডেজ কত প্রকার ও কি কি?

৫। ব্যাণ্ডেজের বন্ধনী কত প্রকারের হয় এবং কি কি? কোনটি তুমি সুবিধাজনক মনে কর?

৬। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত এরূপ একটি ব্যক্তিকে তুমি কি ভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান দিবে? ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার প্রণালীটি বর্ণনা কর।

৭। করতলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮। একটি ছেলের নীচের চোয়ালের অস্থিভঙ্গ হইয়াছে। তুমি তাহাকে কি ভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান দিবে আলোচনা কর।

৯। গৃহে বিষাক্ত ঔষধ সংরক্ষণ সম্পর্কে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করিবে উল্লেখ কর।

১০। গৃহে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স পরিচালনা সম্বন্ধে তোমার মতামত প্রকাশ কর।

Recall Type Questions

প্রথম অধ্যায়

এক কথায় উত্তর দাও:

১। লোহার ভাগ বেশী থাকিলে সেই মাটিকে কি মাটি বলা হয়?

২। দেওয়ালের কোন্ প্রান্ত থেকে ছাদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়?

৩। কোন্ আলোকে আমরা প্রাকৃতিক আলো বলি?

৪। শহর অঞ্চলে ময়লা অপসারণের দায়িত্ব কাহার উপর?

৫। শহরে বাড়ী বাড়ীর ময়লা যাহাতে ফেলা হয় সেটাকে কি বলে?

৬। কোন্গুলিকে কম্পোষ্ট সার বলা হয়?

৭। ময়লা অপসারণের কোন্ ব্যবস্থাকে ইনসিনারেশন বলা হয়?

৮। পয়ঃপ্রণালীর অর্থ কি?

৯। দেড়ফুট ব্যাসের একটি গর্ত পায়খানার গভীরতা কত হওয়া উচিত?

১০। শহরে বাড়ী করিবার জন্য কাহার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়?

১১। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কত লক্ষ বাড়ী নির্মিত হয়?

১২। তৃতীয় পরিকল্পনায় বাড়ি করার জন্য কত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়? এবং কত লক্ষ বাড়ী নির্মাণ করা হয়?

১৩। কোন্ আকৃতির রন্ধন গৃহ অধিকতর সুবিধাজনক।

১৪। সাধারণত অতিথি-অভ্যাগতদের কোন্ কক্ষে স্বাগত জানানো হয় ?

১৫। গৃহসজ্জার মূলনীতি কি কি ?

১৬। পাঠকক্ষ এবং শিশুকক্ষের রং কিরূপ হওয়া উচিত ?

১৭। আলপনাকে কি শিল্প বলা হয় ?

১৮। বাংলাদেশের আলপনায় কোন্ প্রতীক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ?

১৯। কোন্‌দেশের আলপনায় 'ডালি' একটি শিল্প চাতুর্যের পরিচয় দেয় ?

২০। রঙ্গোলী কোন্ দেশের আলপনাকে বলা হয় ?

২১। গৃহে পর্দা সন্নিবেশের প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি ?

২২। শয়ন ঘরের দেওয়ালের রং কিরূপ হওয়া উচিত ?

২৩। আদর্শ চুল্লীর নাম কি ?

২৪। রন্ধন গৃহের রং কিরূপ হওয়া উচিত ?

২৫। গৃহের কোন্ প্রয়োজনে রেফ্রিজারেটার রাখা হয় ?

২৬। সূর্যরশ্মির ভিতর কয়টি রং আছে ? উহাদের সংক্ষিপ্ত নাম কি ?

২৭। প্রান্তিক বর্ণ কাহাকে বলে ?

২৮। চোখের পক্ষে ক্ষতিকর রং কোন্‌টি ?

২৯। কোন্ কোন্ রং স্নিগ্ধ ?

৩০। কোন্ কোন্ রং উত্তেজক ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। কর্ম বিভাগের প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। পরিবার কতপ্রকার ও কি কি ?

৩। কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ কাহাকে বলে ?

৪। শ্রমলাঘবের দুইটি যন্ত্রের নাম কর।

৫। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা যায় এরূপ একটি দ্রব্যের নাম কর।

৬। প্রতিমাসে সঞ্চয় করিবার উপযুক্ত সময় কখন ?

৭। আসবাবপত্রের ময়লা পরিষ্কার করিবার একটি উপাদানের নাম কর।

৮। রন্ধন ঘরে উপদ্রব করে এরূপ কয়েকটি কীট পতঙ্গের নাম কর।

৯। কাচ পরিষ্কার করিবার সহজ পদ্ধতির একটি দ্রব্যের নাম কর।

১০। ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দ্বারা কি কাজ করা হয় ?

১১। বার্ষিক পরিষ্করণ সাধারণতঃ কোন্ কোন্ সময়ে হয় ?

১২। ষ্টীলের আলমারী পরিষ্কার করিবার জন্য কোন্ জিনিস ব্যবহার করিবে ?

১৩। চামড়ার সুটকেস পালিসের জন্য কি ব্যবহার করিতে পার ?

১৪। কোন্ জাতীয় বাসনপত্র পরিষ্কারের জন্য ব্র্যাসো ব্যবহার করিবে ?

১৫। পিতলের বাসনের পুরাতন দাগ তুলিবার জন্য কি দ্রব্য ব্যবহার করিবে ?

১৬। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে কোন্ জাতীয় খাদ্য দ্রব্য রাখা উচিত নয় ?

১৭। তামা পরিষ্কারের জন্য কি ব্যবহার করিবে ?

১৮। সাধারণতঃ কোন্ ঋতুতে লোহার কড়াইতে মরিচা ধরে ?

১৯। স্টেনলেস্ ষ্টীলের বাসন পরিষ্কার করিবার জন্য একটি পরিষ্কারক দ্রব্যের নাম কর।

২০। গৃহের পোকা মাকড়ও ধ্বংস হয় এরূপ একটি ঔষধের নাম কর।

২১। মাছি দ্বারা সাধারণতঃ কোন্ কোন্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

২২। উপমক্ষিকা কোন্ রোগ ছড়ায় ?

২৩। মশা কি কি রোগের বাহক ?

২৪। ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে কোন্ জাতীয় মশা ?

২৫। মশা কোথায় ডিম পড়ে ?

২৬। ছারপোকা ধ্বংসকারী একটি ঔষধের নাম কর।

২৭। উকুন দ্বারা কোন রোগ হয় ?

২৮। কি কারণে উকুন হয় ?

২৯। মথ কাহাকে বলে ?

৩০। বই কাটার পোকাকে কি বলা হয় ?

৩১। মথ পোকার কবল থেকে রক্ষা পাইবার জন্য কি কি জিনিস ব্যবহার করা যায় ?

৩২। যৌথ পরিবারের আর এক নাম কি ?

৩৩। ঘরের ধূলিকণা পরিষ্কার করার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের নাম কি ?

৩৪। ভিজা খবরের কাগজের সাহায্যে কি পরিষ্কার করা যায় ?

৩৫। পূর্ণ মশাতে পরিণত হইবার পূর্বের অবস্থায় মশার নাম কি ?

৩৬। টীক'২০' কীটনাশক ঔষধ কোন্ কীটকে মারার জন্য আমরা ব্যবহারকরি ?

৩৭। কোন্ পাতার গন্ধে কাপড় কাটার পোকার উপদ্রব বন্ধ হয় ?

৩৮। উপমক্ষিকা কাহাদের দেহে আশ্রয় লয় ?

৩৯। ইডিস মশা কোন্ রোগ ছড়ায় ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য কি ?

২। আদিম যুগে লজ্জা নিবারণ করা হইত কোন্ জিনিস দ্বারা ?

৩। বাঙ্গালী পুরুষের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হয় কোন্ পোশাকের মাধ্যমে ?

৪। পশমকে কোন্ জাতীয় তন্তু বলা হয় ?

৫। একটি কৃত্রিম রেশমের নাম কর।

৬। আঁট জামার প্রধান কুফল কি ?

৭। গ্রীষ্মের সময় কোন্ জাতীয় রং-এর পোশাক পরিধান করা যুক্তিযুক্ত।

৮। গভীর কালো বা নীল রং এর পোশাক কোন্ ঋতুতে পরিধান করা আরামপ্রদ ?

৯। যে কোনও পোশাকের বুকের ঘেরের মাপকে কি বলা হয় ?

১০। কোন্ জায়গার মাপকে মুহরী বলা হয় ?

১১। কোন্ গাছের আঁশ হইতে লিনেন প্রস্তুত হয় ?

১২। রেয়ন কোন জাতীয় তন্তু ?

১৩। উদ্ভিজ্জ তন্তুগুলি কি কি ?

১৪। শরন কি জাতীয় তন্তু ?

১৫। সৌন্দর্যের দিক হইতে কোন্ তন্তু শ্রেষ্ঠ ?

১৬। সুতায় মার্সারাইজেসন প্রক্রিয়া কে আবিষ্কার করেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। রেশম তন্তুর রাসায়নিক উপাদান কি কি ?

২। সেরিসিন পদার্থটি কি ?

৩। পশম তন্তুর রাসায়নিক উপাদান কি কি ?

৪। চীনা ঘাস থেকে কোন্ তন্তু প্রস্তুত হয় ?

৫। হেম্প কাহাকে বলে ?

৬। খনিজ তন্তু কি কি ?

৭। কাপড় কাচায় রিঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা কি ?

৮। রিঠাদ্বারা কোন্ জামা কাপড় পরিষ্কার করা হয় ?

৯। ভিনিগারের রাসায়নিক নাম কি ?

১০। পশম বস্ত্রে ইস্ত্রির তাপ কত হওয়া উচিত ?

পঞ্চম অধ্যায়

১। প্রোটোপ্লাজম্ কিরূপ পদার্থ ?

২। নিউক্লিয়াস কি ?

৩। করোটিতে কয়খানি অস্থি আছে ?

৪। রেডিয়াম্ কাহাকে বলে ?

৫। কোন্ অস্থির নাম আলনা ?

৬। মস্তিষ্কের কোন্ অংশকে সুষুম্নাশীর্ষক বলা হয় ?

৭। ডেনড্রাইট কাহাকে বলে ?

৮। পিটুইট্যারী গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত ?

৯। রেটিনা কাহাকে বলে ?

১০। কানের ইউষ্টেসিয়ান নল কোথায় থাকে ?

১১। বায়ুর প্রধান প্রধান উপাদানের নাম কি কি ?

১২। বায়ুবাহিত রোগ কি কি ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শিশুর রিকেট রোগ নিবারণের জন্য কোন্ জাতীয় ভিটামিন খাওয়ানো উচিত ?

২। কডলিভার অয়েল শিশুর পক্ষে উপকারী কেন ?

৩। শিশুর চর্মের সুস্থতার জন্য কোন্ ভিটামিন দেওয়া উচিত ?

৪। কোন্ ভিটামিনের অভাবে শিশুর অস্থি বিকৃতি রোগ হয় ?

৫। শিশুকে কোন্ সময় স্নান করানোর পক্ষে প্রশস্ত ?

৬। শিশুর স্নানের জলের তাপ কিরূপ হওয়া উচিত ?

৭। শিশুর দেহে সূর্যোদয়ের রৌদ্র সেবন করানো উচিত কেন ?

৮। শিশুর জামায় বোতাম লাগাইবার দোষ কি ?

৯। শিশুর দৈনিক কত ঘণ্টা ঘুমানো উচিত ?

১০। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই দেহের ওজন সাধারণতঃ কত থাকে ?

১১। জন্মাইবার পর শিশুর মুখে দাঁত দেখা যায় না কেন ?

১২। কোন্ বয়সে সাধারণতঃ শিশুরা হাঁটে ?

১৩। একেবারে শিশুর প্রধান খাদ্য কি ?

১৪। গোদুগ্ধ অপেক্ষা মাতৃদুগ্ধ সহজ পাচ্য কেন ?

১৫। শিশুর অতিরিক্ত দামী খেলনার প্রাচুর্য ঘটাইলে কি অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় ?

সপ্তম অধ্যায়

১। রোগীর মাথার উকুন ধ্বংস করিবার জন্য কোন্ জিনিষ ব্যবহার করা যায় ?

২। রোগীর মুখ পরিষ্কার করিবার একটি ঔষধের নাম কর।

৩। শয্যাক্ষত কাহাদের হয় ?

৪। শিশুর দেহের তাপ দেখিবার জন্য কোথায় থার্মমিটার রাখিতে হয় ?

৫। বয়স্ক ব্যক্তির বগল অপেক্ষা মুখে থার্মমিটার লাগানো ভাল কেন ?

৬। রোগীর খাদ্য ক্ষারধর্মী হওয়া উচিত কেন ?

৭। বৃদ্ধের খাদ্যে কি কি জিনিস বর্জন করা উচিত ?

৮। মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপ কত ?

৯। শিশুর দেহের তাপ বয়স্ক অপেক্ষা বেশী না কম ?

১০। রোগীর দেহ স্পঞ্জ করিবার সময় রগড়ানো উচিত না কেন ?

অষ্টম অধ্যায়

১। কয়েকটি শিশু-রোগের নাম কর।

২। শিশুর তড়কার প্রধান কারণ কি ?

৩। দুইটি সংক্রামক রোগের নাম কর।

৪। হুপিং কাশি প্রতিরোধের উপায় কি ?

৫। 'বিজ্ঞপ্তিকরণ' অর্থে রোগ সম্বন্ধে কাহাকে জানাইতে হয় ?

৬। প্রাকৃতিক পরিশোধন কিসের দ্বারা হয় ?

৭। বই-পত্র, চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতি কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা নির্বীজন করা যায় ?

৮। রোগাক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অর্জনের নাম কি ?

৯। কি কি ব্যবস্থায় দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয় ?

১০। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দানের অর্থ কি ?

নবম অধ্যায়

১। রোগীর দেহের রক্তপাত বন্ধ করার প্রধান উপায় কি ?

২। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর প্রথম ও প্রধান গুণ কি হওয়া উচিত ?

৩। ব্যাণ্ডেজের বন্ধনী হিসাবে কোন্ বন্ধনী উপযুক্ত ?

৪। ব্যাণ্ডেজ কতপ্রকার ও কি কি ?

৫। বিষ ঔষধ কোথায় রাখা উচিত ?

৬। পুরাতন ঔষধ কি করিবে ?

৭। কীট পতঙ্গ ধ্বংস করিবার একটি বিষাক্ত ঔষধের নাম কর।

Multiple Choice Type Questions

প্রথম অধ্যায়

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ভিতর যেটা ঠিক তার নীচে দাগ দাও।

১। সূর্যের আলোকপ্রদ রশ্মি/উত্তাপদায়ক রশ্মি/অতিবেগুনী রশ্মি জীবাণু ধ্বংস করে।

২। প্রতি সহরে ট্রাম/বাস/রিক্সা নাই।

৩। দিনের আলো প্রাকৃতিক আলো/কৃত্রিম আলো।

৪। ইনসিনারেশন এক প্রকার চৌবাচ্চা/চুল্লী।

৫। গ্রামে সাধারণতঃ মলশোধনী পায়খানা/খাটাপায়খানা দেখা যায়।

৬। ধূম নির্গমের জন্য চিমনী/জানালার দরকার।

৭। রন্ধন গৃহের সর্বাপেক্ষা ভাল নক্সা এল আকৃতির/ইউ আকৃতির/আই আকৃতির।

৮। ধোপাকাপড়ে সোডা/ব্লিচিং পাউডার দেয় বলিয়া কাপড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে।

৯। গানবাজনার আসর শয়ন কক্ষে/বৈঠকখানায়/পাঠকক্ষে হওয়া উচিত।

১০। মেঝের সজ্জা আলনার দ্বারা/সোফাদ্বারা/ছবিদ্বারা সম্ভব হয়।

১১। ফ্রেস্কো এক প্রকার দেওয়াল কাগজ/দেওয়াল চিত্র/দেওয়াল রং।

১২। শিশুর ঘরের রং হওয়া উচিত সোনালী/সাদা/নীল।

১৩। ম্যাটিং একপ্রকার পর্দা/গালিচা/পাপোষ।

১৪। রঙ্গোলী দক্ষিণ ভারতের/উড়িষ্যার আলপনাকে বলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেদের ভিতর কিছু কিছু কাজ ভাগ করিয়া দিলে উহাদের মনের হীনতা/প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

২। কোনও কার্য সুষ্ঠু সম্পন্ন করার বড় কৌশল কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ/কর্ম বিস্তৃতিকরণ।

৩। প্রেসার কুকারে রন্ধন করিলে খাদ্য দ্রব্য দুষ্পাচ্য হয়/সুপাচ্য হয়।

৪। বৈচিত্র্য খাদ্য/একঘেয়ে খাদ্য তাড়াতাড়ি হজম হয়।

৫। চৈত্রমাসে বাড়ী পরিষ্কার করার নাম শীতকালীন পরিষ্কার/বসন্তকালীন পরিষ্কার।

৬। মেঝের কার্পেটের সাহায্যে/আলপনার সাহায্যে বৈচিত্র্য আনা সহজ।

৭। সপ্তাহিক পরিষ্করণ কার্যটি সাধারণতঃ সোমবার/রবিবার হয়।

৮। ভ্যাকুয়াম ক্লীনার ব্যবহৃত হয় কাপড় পরিষ্কারের জন্য/ঘর পরিষ্কারের জন্য।

৯। ভিনিগারের রাসায়নিক নাম সালফিউরিক অ্যাসিড/অ্যাসেটিক অ্যাসিড/হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

১০। স্টেনলেস স্টীলের বাসন পরিষ্কার করার জন্য ছাই/সোডা/ভিম পাউডার/সার্ফ ব্যবহার করা উচিত।

১১। মাছি ম্যালেরিয়া রোগ/বসন্ত রোগ ছড়ায়।

১২। ইডিস্ মশা ফাইলেরিয়া/কলেরা রোগ ছড়ায়।

১৩। উকুন হইতে/ছারপোকা হইতে পৌনঃপুনিক জ্বর হয়।

১৪। উই পোকা শুষ্ক স্থানে/স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস করে।

১৫। সিলভার ফিস পোকা বই কাটে/কাপড় কাটে।

তৃতীয় অধ্যায়

১। পশম তন্তু তাপ সুপরিবাহী/কুপরিবাহী।

২। উদ্ভিজ তন্তু তাপ কুপরিবাহী/সুপরিবাহী

৩। লিনেন উদ্ভিজ তন্তু/প্রাণিজ তন্তু।

৪। রেয়ন প্রাকৃতিক তন্তু/কৃত্রিম তন্তু।

৫। গাঢ় নীল রঙের পোশাকে/গাঢ় সবুজ রঙের পোশাকে গরম অনুভূত হয়।

৬। কাঁধের মাপকে পুট বলে/পুট হাতা বলে।

৭। কব্জীর মাপকে/গলার মাপকে মুহুরী বলে।

৮। সুতি অপেক্ষা লিনেনের চাকচিক্য বেশী/কম।

৯। কৃত্রিম রেশম অত্যন্ত শক্ত/নরম।

১০। ভেলভেট একপ্রকার সুতির তন্তু/রেশম তন্তু।

১১। লিনেন তন্তু তাপ সুপরিবাহী/কুপরিবাহী।

১২। বর্ষার সময় সুতির শাড়ী/নাইলনের শাড়ী পরিধান করা ভাল।

১৩। শীত প্রধান দেশে/গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পোশাক-পরিচ্ছদ তাড়াতাড়ি ময়লা হয়।

১৪। সুতি অপেক্ষা রেশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি/কম।

১৫। ভেলভেট সুতি তন্তু/রেশম তন্তু।

১৬। শিশুর জামা বোতাম দেওয়া/বোতাম ছাড়া হওয়া উচিত।

১৭। অতিরিক্ত আঁটপোশাক দেহের ক্ষতিসাধন করে/দেহ গঠনের সাহায্য করে।

চতুর্থ অধ্যায়

১। মূককীট অবস্থায় গুটিপোকাগুলির মাথায় চারিটি রসস্রাবী/দুইটি রসস্রাবী গ্রন্থি থাকে।

২। কার্পাস তুলা হইতে/সিমূল তুলা হইতে ক্যাপক তন্তু তৈরী হয়।

৩। কাপড় কাচার পক্ষে খর জল/মৃদু জল ভাল।

৪। রঙীন কাপড় রিঠার সাহায্যে ধুইলে রং উঠিয়া যায়/রং ভাল থাকে।

৫। পশম উত্তাপ সুপরিচালক/কুপরিচালক।

৬। সিল্কের কাপড়ে কাঠিন্য আনার জন্য কলপের পরিবর্তে ইহাতে অ্যামোনিয়ার জলে/গঁদের জলে ডুবাইতে হয়।

৭। ভিনিগার/লবণ কাপড়ের রং উঠা বন্ধ করে।

৮। গুটি পোকার শূককীট/মূককীট অবস্থাকে কোকুন বলা হয়।

৯। ফাইব্রয়েন/শেরিসিন একপ্রকার আঁঠালো পদার্থ।

১০। এণ্ডি একপ্রকার রেশম/পশম।

১১। অ্যাসবেস্টস একপ্রকার রাসায়নিক তন্তু/খনিজ তন্তু।

১২। ভিসকোস্ একপ্রকার রেয়ন/পশম।

১৩। পশমে নাইট্রোজেন আছে/সূতিতে নাইট্রোজেন আছে।

১৪। লিনেন মসিনা গাছ/পাট গাছ/শন গাছের আঁশ হইতে তৈরী।

১৫। জল ফুটাইলে স্থায়ী খরত্ব/অস্থায়ী খরত্ব দূর হয়।

১৬। রিঠা একপ্রকার বন্য ফল/ফুল।

১৭। রঙ্গীন কাপড় সাবানের ফেনায় রং উঠিতে থাকিলে লবণ/সোহাগা দিলে রং ওঠা বন্ধ হয়।

১৮। সূতির বস্ত্র ইস্ত্রি করিবার জন্য ইস্ত্রির তাপ হওয়া উচিত ৩৫০° ফারেনহাইট/৫০০° ফা:।

১৯। ভিনিগারের রাসায়নিক নাম ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড/অ্যাসেটিক অ্যাসিড/নাইট্রিক অ্যাসিড।

পঞ্চম অধ্যায়

১। প্রোটোপ্লাজম একপ্রকার অম্লজাতীয় পদার্থ/ক্ষারীয় পদার্থ।

২। দেহের ভিতরের অন্তর্মুখী ক্ষরণ গ্রন্থিকে সনালী গ্রন্থি/অনালী গ্রন্থি বলা হয়।

৩। হৃদপিণ্ড ইচ্ছাধীন/অনিচ্ছাধীন পেশীময় পদার্থ।

৪। দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয় শিরার ভিতর দিয়া/ধমনীর ভিতর দিয়া।

৫। রক্তের শ্বেতবর্ণের জীবকোষগুলিকে ফ্যাগোসাইটিস্/প্লাজমা বলে।

৬। দূষিত বায়ুতে অম্লজান গ্যাস বেশী থাকে/অঙ্গার অম্লজান বেশি থাকে।

৭। বৃষ্টির জল নরম জল/কঠিন জল।

৮। ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায়/২১২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জল ফুটাইলে জল জীবাণুমুক্ত হয়।

৯। কৃত্রিম উপায়ে জলের প্রাপ্তিস্থান সমুদ্র/নদী/পুষ্করিণী।

১০। ফিল্টার বেডের বিভিন্ন স্তর—মোটাবালি/মিহিবালি/পাথরের নুড়ি। পর পর সাজাইয়া লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শিশুর রিকেট রোগ হয় ভিটামিন সি-এর অভাবে/'ডি'-এর অভাবে।

২। শিশু জন্মাইবার পর/জন্মাইবার পূর্বে মায়ের খাদ্যে ৩০০০ গ্রাম ক্যালোরি থাকা উচিত।

৩। মাতৃদুগ্ধে ল্যাক্টঅ্যালবুমিন প্রোটিন বেশী/ক্যাসীন বেশী।

৪। শিশুর দাঁত গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম/লৌহ জাতীয় খাদ্য একান্ত প্রয়োজন।

৫। শিশুর পোশাক ঢিলা/আঁট হওয়া আবশ্যক।

৬। সূর্যকিরণের উত্তাপদায়ক রশ্মি/অতিবেগুনী রশ্মি শিশুর দেহে ডি ভিটামিনের কাজ করে।

৭। শিশুকে নাতিশিতোষ্ণ জলে/গরম জলে স্নান করানো উচিত।

৮। শিশুর পক্ষে গোদুগ্ধ সহজপাচ্য/মাতৃদুগ্ধ সহজপাচ্য।

৯। শিশুর পক্ষে ক্যাসীন প্রোটিন সহজপাচ্য/ল্যাক্টঅ্যাবুমেন সহজপাচ্য।

১০। শিশুর ঘুমের ব্যবস্থা অন্ধকারস্থানে করা উচিত/আলোযুক্ত স্থানে করা উচিত।

সপ্তম অধ্যায়

১। রোগীর মুখ ধোওয়াইবার জন্য ডেটল/লিষ্টারিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। রোগীর খাদ্য ক্ষারধর্মী/অ্যাসিড ধর্মী হওয়া উচিত।

৩। মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৭·৪/৯৮·৪।

৪। মুখের ভিতর জিভের নীচে থার্মমিটার রাখিলে বগলের তাপ অপেক্ষা বেশী হয়/কম হয়।

৫। বেডসোর শায়িত অবস্থায় বৃদ্ধদের হয়/শিশুদের হয়।

অষ্টম অধ্যায় ও নবম অধ্যায়

১। পোলিওমায়লেটিস্ নামক রোগ একপ্রকার ইনফ্যানটাইল প্যারালেসিস/ইনফ্যানটাইল কলেরা।

২। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার জন্য গ্যানিনট ভাল/রিফ্ট নট ভাল।

৩। চৌয়ালে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ/রোলার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়।

৪। বিষ ঔষধ ফেলিয়া দিতে হয়/তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

৫। করতলের ব্যাণ্ডেজ ত্রিকোণ, রোলার হইলেই ভাল।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যেগুলি শুদ্ধ তাহার ডান পাশে ✓ এবং যেগুলি অশুদ্ধ তাহার ডান পাশে × চিহ্ন দাও।

প্রথম অধ্যায়

১। বালি ও কাদা সমান অনুপাতে থাকিলে সেই মাটিকে দো আঁশ মাটি বলা হয়।

২। উপমৃত্তিকায় বাড়ি নির্মাণ করা নিরাপদ নহে।

৩। দেওয়ালের মর্টার উহার আর্দ্রতা নিবারণের সাহায্য করে।

৪। যে অঞ্চলে বৃক্ষ বেশী সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়।

৫। কলিকাতার মত বড় বড় শহরে ময়লা নিষ্কাসনের দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির উপর।

৬। শয়ন ঘরের ভিতর দিয়া অন্যান্য ঘরে যাতায়াতের পথ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭। শয়ন কক্ষের দেওয়ালের রং লাল হওয়া উচিত।

৮। পুষ্প সজ্জায় ফুলদানীর সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

৯। পর্দা গৃহের আব্রু বজায় রাখে।

১০। দক্ষিণ ভারতের 'ডালি' অপূর্ব শিল্প চাতুর্যের পরিচয় দেয়।

১১। উড়িষ্যায় জলের আলপার প্রচলন আছে।

১২। খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের জন্য রেফ্রিজারেটার প্রয়োজন হয়।

১৩। হলুদ ও নীলের সংমিশ্রণে বেগুনী রং হয়।

১৪। লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি প্রাথমিক রং।

১৫। উত্তর দিকের ঘরে সূর্যের আলো পড়ে না।

১৬। যে ঘরে সূর্যালোকের অভাব নাই, সেই ঘরের রং হওয়া উচিত স্নিগ্ধ ও হাল্কা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। কর্ম সংক্ষিপ্তকরণের অর্থ কর্ম হ্রাস করা।

২। প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয়।

৩। কাপড় কাচার জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের প্রয়োজন হয়।

৪। পিতল একটি সংকর ধাতু

৫। কিউলেক্স মশা ডেঙ্গুজর ছড়ায়।

৬। বইকাটার পোকাকে 'সিলভার ফিস' বলা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

১। পশমের আর্দ্রতা নিবারক গুণ আছে।

২। স্থতি তাপ কুপরিবাহী।

৩। পোশাক গভীর কালো রংএর হইলে গরম বোধ হইবে।

৪। প্যান্টের পিছন দিকে মাঝ বরাবর ছুইটি জোড় সেলাইকে ম্যানা বলে।

৫। নাইলন একটি প্রাকৃতিক তন্তু।

৬। লিনেন মসিনা গাছের অাঁশ হইতে তৈরী।

৭। স্থতি লিনেন অপেক্ষা অনেক টেকসই।

চতুর্থ অধ্যায়

১। রেশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম।

২। উগ্র অ্যাসিডের সংস্পর্শে রেশম গলে না।

৩। স্থতির রাসায়নিক উপাদান কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন।

৪। ক্যাপক শিমুল তুলা হইতে তৈরী।

৫। অ্যাসবেষ্টস তাপ কুপরিবাহী।

৬। নাইলন প্রথমে জাপানে আবিষ্কৃত হয়।

৭। টেরিলিনে সূর্যের কিরণ কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

৮। অ্যালবুমেন তাপে জমাট বাঁধে।

৯। ভিনিগারের রাসায়নিক নাম অ্যাসেটিক অ্যাসিড্।

১০। অ্যাসেটিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে রেয়ন তন্তু নষ্ট হয়না।

পঞ্চম অধ্যায়

১। বয়স্ক অপেক্ষা শিশুদের অস্থি কম থাকে।

২। পিটুইট্যারী গ্রন্থি গলার উপরে মস্তিষ্কের ঠিক নীচে থাকে।

৩। ধমনীর রক্ত কালচে লাল, শিরার রক্ত টকটকে লাল।

৪। রক্তের ভিতর লোহিত কণিকা অপেক্ষা শ্বেতকণিকা কম আছে।

৫। হৃদপিণ্ড একটি ইচ্ছাধীন পেশীময় পদার্থ।

৬। গাছপালা দিনের বেলায় সূর্যকিরণের সংস্পর্শে বায়ুর কার্বন টানিয়া লয় ও অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়।

৭। পুষ্করিণীর জল কৃত্রিম জল।

৮। ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপে জলের জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৯। ক্লোরিণ জলের জীবাণু ধ্বংস করে।

১০। ফটকিরী জলকে জীবাণুমুক্ত করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শিশু জন্মগ্রহণের পূর্বে মায়ের খাদ্যে ২৫০০ গ্রাম ক্যালোরি থাকা উচিত।

২। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শিশুর দেহে ভিটামিনের কাজ করে।

৩। শিশুকে কলপযুক্ত ইস্ত্রিকরা পোশাক পরাইতে হয়।

৪। গোদুগ্ধের ক্যাসীন শিশুর পক্ষে সহজপাচ্য।

৫। কডলিভার অয়েলে প্রচুর 'ডি' ভিটামিন থাকে।

সপ্তম অধ্যায় ও অষ্টম অধ্যায়

১। বেডসোর সাধারণতঃ বৃদ্ধ রোগীদের হয়।

২। শিশুর চর্ম সাধারণতঃ রুক্ষ।

৩। সাধারণতঃ শিশুদের পেটের গোলমাল হইতে তড়কা রোগ হয়।

৪। হুপিং কাশিকে ঘুংড়ি কাসি বলা হয়।

৫। অণাক্রম্যতা অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানো।

৬। টাইফয়েড রোগে রোগীর জর মাঝে মাঝে ছাড়ে।

নবম অধ্যায়

১। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর খুব ধীরে ধীরে কাজ করা উচিত।

২। আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রথমে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

৩। আঙ্গুল ব্যাণ্ডেজের পক্ষে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজই ভাল।

৪। রোলার ব্যাণ্ডেজ দ্বারা স্লিং তৈরী করা হয়।

৫। ডাক্তারের কাজ কখনই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করা উচিত নয়।

———

দ্বিতীয় পত্র

আদর্শ প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

১। ফলপ্রসূ গৃহপরিচালনা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রত্যেকটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। মানবীয় উপাদান বলিতে কি বোঝ? গৃহ-পরিচালনায় মানবীয় উপাদানের প্রভাব আলোচনা কর।

৩। "পরিকল্পনা ব্যতীত সুষ্ঠু গৃহ-পরিচালনা সম্ভব হয় না"—আলোচনা কর।

৪। গৃহপরিচালনায় কাজের মূল্যায়ন কি ভাবে বিচার করা হইবে?

৫। পরিবারের বিভিন্ন দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিবার জন্য গৃহিণী কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে?

৬। ক্রোধ কি ভাবে গৃহকে অশান্তিময় করিয়া তোলে—বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে? ব্যক্তিত্বের গুণ কি কি? সুগৃহিণী তাহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা কি ভাবে সংসারটিকে সুষ্ঠু পরিচালনা করিতে সক্ষম হয় আলোচনা কর।

২। গৃহপরিচালনায় বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। "আর্থিক সচ্ছলতার উপরই প্রধানত সুষ্ঠু গৃহপরিচালনা নির্ভর করে" —সমালোচনা কর।

৪। সংসারে লোকবলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। "আধুনিক পরিবারে লোকবলের আশা এখন আর করা যায় না"—ইহার কারণ কি? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৫। সুগৃহিণী কি ভাবে অপব্যয় বন্ধ করিয়া মিতব্যয়ী হইতে পারে সে সম্বন্ধে নির্দেশ মূলক আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। বাজেট কাহাকে বলে? বাজেট রচনার প্রয়োজনীয়তা কি?

২। বাজেট রচনায় কোন্ কোন্ বিষয় চিন্তা করিতে হয় উল্লেখ কর এবং ঐ বিষয়গুলির গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের সহিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয়ের কি কি পার্থক্য হওয়া উচিত তাহার বর্ণনা দাও।

৪। নিম্নবিত্ত পরিবারের একটি বাজেটের নমুনা দেখাও।

৫। একটি মধ্যবিত্ত একক পরিবারের লোকসংখ্যা উল্লেখ করিয়া আনুমানিক একটি বাজেট তৈয়ারী কর।

৬। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে অপেক্ষা কোন্ কোন্ খাতে খরচ বেশী হয় বুঝাইয়া দাও।

৭। গৃহস্থালীর হিসাবে পরিচালনার পদ্ধতি কি? একটি পরিবারের এক সপ্তাহের যাবতীয় খরচের হিসাবের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ কর।

৮। জীবিকার মান কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা কি কি?

৯। "সঞ্চয় ব্যবস্থা জীবনের মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়"—কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

১০। স্বল্প সঞ্চয়ের সুবিধা কি কি?

১১। অর্থ বিনিয়োগ বলিতে কি বোঝ? ইহা কি কি উপায়ে সম্ভব হয় উল্লেখ কর।

১২। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার নিয়ম কি? কতভাবে টাকা জমা রাখা যায় বর্ণনা কর।

১৩। চেক কাহাকে বলে? চেক ভাঙ্গাইতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়? চেক গ্রহণে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হইবে?

১৪। ক্রশড্ চেক ভাঙ্গাইবার নিয়ম কি?

১৫। পোস্ট অফিসে কতভাবে টাকা সঞ্চয় করা যায় তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ দাও।

১৬। ন্যাশান্যাল সেভিংস সার্টিফিকেটের সাহায্যে কিভাবে সঞ্চয়ের টাকা লাভ করা যায় বুঝাইয়া দাও।

১৭। বীমা কাহাকে বলে? বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কি ভাবে আমরা সঞ্চয় করিতে পারি আলোচনা কর।

১৮। বীমা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটি বীমার সুবিধা অসুবিধা আলোচনা কর।

১৯। বীমা করিবার নিয়মগুলি উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ খাতে বীমা করায় প্রিমিয়াম বেশী দিতে হয়?

২০। কোম্পানীর শেয়ার বলিতে কি বোঝ? শেয়ার ক্রয়ের লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। তন্তু বিচারে ভৌত পরীক্ষার স্থান নির্ধারণ কর।

২। বিভিন্ন তন্তুর উপর তাপ ও আগুনের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর।

৩। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন তন্তুর পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪। রাসায়নিক পরীক্ষা বলিতে কি বোঝ ? একটি পশমের চাদর (সুতি মিশ্রিত) রাসায়নিক পরীক্ষায় কি ভাবে ভেজাল নির্ণয় করিবে আলোচনা কর।

৫। বিভিন্ন তন্তুর উপর নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ কর। (ক) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, (খ) সালফিউরিক অ্যাসিড, (গ) কষ্টিক পটাস।

৬। পরিবারে পরিচ্ছদ পরিচালনার দায়িত্ব কাহার উপর থাকা উচিত ? একটি সাধারণ পরিবারে পোশাক পরিচ্ছদ পরিচালনায় কোন্ কোন্ বিষয়গুলি বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক ?

৭। রঙ্গীন বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য কি কি দ্রবণ তুমি প্রস্তুত করিতে পার এবং ঐগুলি ব্যবহারের পদ্ধতিই বা কিরূপ ?—বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

৮। শুষ্ক ধোলাই কাহাকে বলে ? শুষ্ক ধোলাই-এর জন্য কোন্ কোন্ তরল ব্যবহার করা যায় ? ইহার ভিতর কোন্‌টি তুমি উপযুক্ত মনে কর এবং কেন ?

৯। একটি পশমের জামা কিভাবে শুষ্ক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করিবে বর্ণনা কর।

১০। শুষ্ক ধোলাইর জন্য যে সমস্ত সরঞ্জামাদির প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

১১। দাগ কাহাকে বলে ? কাপড়চোপড়ে যে সমস্ত দাগ লাগে সেগুলিকে সাধারণতঃ কতভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি ? ভিন্ন জাতীয় দাগগুলি বস্ত্র হইতে কি ভাবে তোলা যায় তাহার প্রণালী লিখ।

১২। নিম্নলিখিত দাগগুলি সুতির বস্ত্র হইতে কিভাবে তুলিবে তাহা বর্ণনা কর। চায়ের দাগ, মরিচার দাগ, পানের দাগ, কালির দাগ ও ডিমের দাগ।

পঞ্চম অধ্যায়

১। আদর্শ শুশ্রূষাকারীর আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচনা কর।

২। শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য সমূহ আলোচনা কর।

৩। শুশ্রূষাকারীর নিজের প্রতি কর্তব্য কি কি ? "শুশ্রূষাকারী নিজের প্রতি যত্ন না লইলে উহা পরোক্ষভাবে রোগীর পক্ষেই ক্ষতিকর"—আলোচনা কর।

৪। চিকিৎসকের প্রতি শুশ্রূষাকারীর কি কি কর্তব্য পালন করা উচিত ?

৫। রোগী কক্ষ কিরূপ হওয়া উচিত বর্ণনা কর।

৬। রোগী কক্ষের সুব্যবস্থার জন্য আসবাবপত্রাদির সন্নিবেশ কিরূপ হওয়া উচিত?

৭। শায়িত অবস্থায় রোগীর শয্যা রচনার প্রণালী বর্ণনা কর।

৮। যে সকল রোগী উঠিয়া বসিতে পারে উহাদের শয্যা রচনার পদ্ধতি বর্ণনা কর। শয্যা তৈরীর জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা দাও।

৯। "মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া একান্ত আবশ্যক।"—ইহা কি ভাবে উন্নততর হইতে পারে তাহা আলোচনা কর।

১০। শিশু জন্মাইবার পূর্বে মায়ের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত আলোচনা কর।

১১। "শিশুর মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করেগৃহ পরিবেশের উপরে।" —আলোচনা কর।

১২। শিশুর নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশ বর্ণনা কর।

১৩। শিশুর পোশাক কিরূপ হওয়া উচিত?—সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৪। অনাক্রম্যতা কাহাকে বলে? শিশুর অনাক্রম্যতার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায় উল্লেখ কর।

১৫। শিশুর দাঁতের যত্ন কিরূপ হওয়া দরকার আলোচনা কর। "শিশুর দাঁতের যত্ন প্রধানতঃ তাহার খাদ্যের উপর নির্ভর করে"—যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১৬। গৃহে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ কি কি অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। গৃহে এই সকল অসুস্থতার জন্য গৃহকর্ত্রী কিভাবে উহা প্রতিকার করিতে পারে তাহা আলোচনা কর।

১৭। আদর্শ গৃহিণী পরিবারে বৃদ্ধ ও অসমর্থদের কিরূপে যত্ন করিবে তাহা বর্ণনা কর।

১৮। গৃহে কোনও আশ্রিত থাকিলে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

১৯। পরিবারে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের স্থান কিরূপ হওয়া উচিত আলোচনা কর।

২০। আকস্মিক দুর্ঘটনা কাহাকে বলে? আকস্মিক দুর্ঘটনায় রোগীকে আরাম দেওয়ার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

২১। মচকানো ও অস্থিভঙ্গের ভিতর পার্থক্য কি? মচকানোর লক্ষণ কি কি? পায়ের পাতা মচকাইলে কি প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পার?

২২। অস্থিভঙ্গ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বর্ণনা দাও।

২৩। অস্থিভঙ্গের সাধারণ চিহ্ন ও লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক প্রতিবিধানগুলির বর্ণনা দাও।

২৪। দেহের কোথায়ও কাটিয়া গেলে সেই ব্যক্তিকে কিরূপ প্রাথমিক চিকিৎসা করিবে আলোচনা কর।

২৫। (ক) আহতস্থানে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার প্রণালী বর্ণনা কর।

(খ) টুর্নিকেট কিভাবে তৈরী করিবে? এবং ইহার প্রয়োগ প্রণালী বর্ণনা কর।

২৬। দাহ কত প্রকারের হয়? দাহের লক্ষণ উল্লেখ কর। কাপড়ে আগুন ধরিয়া গেলে প্রাথমিক শুশ্রূষাকারী হিসাবে তুমি তাহাকে কিভাবে সাহায্য করিবে বর্ণনা কর।

২৭। তীব্র অ্যাসিডে হাত পুড়িয়া গেলে তুমি কি প্রাথমিক প্রতিবিধান দিবে?

২৮। চোখের ভিতর কিছু পড়িলে উহা বাহির করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

২৯। শিশুর কানে ও নাকে কিছু প্রবেশ করিলে উহা কি উপায়ে বাহির করিবে?

৩০। শিশুরা হঠাৎ কোনও জিনিস গিলিয়া ফেলিলে উহা কিভাবে বাহির করা হইবে তাহা উল্লেখ কর।

৩১। সর্পদংশনের চিহ্ন কি? দেহের ভিতর সর্পদংশনের লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। সর্পদংশনের প্রাথমিক প্রতিবিধান কিরূপ হওয়া উচিত?

৩২। জলাতঙ্ক রোগের কারণ কি? এই রোগের লক্ষণ কি কি?

৩৩। ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করিলে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসাবে তোমার কি করা উচিত?

৩৪। রাস্তায় কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িলে প্রাথমিক প্রতিবিধানের কি কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শৈশবে শিশুর পরিবেশ কিরূপ হওয়া উচিত আলোচনা কর।

২। শিশুর জীবনে ছড়া সঙ্গীতের প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। "শিশুর জীবনে খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।"—সমালোচনা কর।

Multiple-type Questions

প্রথম অধ্যায়

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। গৃহ পরিচালনার ভার কাহার উপর থাকা উচিত ?

২। গৃহের কাজে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ?

৩। বার বার পুরস্কার দিলে কি খারাপ ফল হয় ?

৪। পরিবারের সকল ব্যক্তির উপর নির্দেশ চালাইতে হইলে গৃহকর্ত্রীর কোন্ গুণ একান্তভাবে থাকা উচিত ?

৫। সংসারী মানুষের ভিতর সাধারণতঃ কি কি দোষ পরিলক্ষিত হয় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ কি ?

২। গৃহপরিচালনায় কাজের সুবিধার জন্য কি ব্যবস্থা করিবে ?

৩। শ্রম বিভাগের সময় কোন্ কথা প্রধানতঃ চিন্তা করিতে হয় ?

৪। অর্থের সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও এক একটি পরিবারে অভাব অনটন দেখা যায় কেন ?

৫। সংসারে খরচ কমানোর একটি উপায় উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। পরিবারের মাসিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক খসড়াকে কি বলা হয় ?

২। মানুষের জীবনযাত্রার একান্ত আবশ্যকীয় ব্যয়গুলি কি কি ?

৩। সঞ্চয়ের প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি ?

৪। চলতি হিসাব ও মেয়াদী হিসাব—দুইয়ের ভিতর কোন্‌টিতে সুদ বেশী ?

৫। অন্য দ্বারা ভাঙ্গানো যায় এরূপ চেকের নাম কি ?

৬। বীমা প্রতিষ্ঠানের সহিত বীমাকারীর যে চুক্তিপত্র তাহাকে কি বলা হয় ?

৭। শেয়ার লোকসান দিয়ে বিক্রী করার নাম কি ?

৮। শেয়ার বিক্রয়ের অ্যাট প্রিমিয়াম কখন বলা হয় ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। স্থিতিস্থাপকতা গুণ কোন্ কোন্ তন্তুতে আছে ?

২। কোন্ কোন্ তন্তু পুড়িলে ছাই হয় ?

৩। কোন্ তন্তু পুড়িলে চুন পোড়া গন্ধ বাহির হয় ?

৪। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে কোন্ তন্তু একেবারে দ্রবীভূত হয় ?

৫। ঘামের দাগ কোন্ জাতীয় দাগ বলা হয় ?

৬। আলকাতরার দাগ পুরাতন হইয়া গেলে বস্ত্র হইতে উহা কোন্ জিনিসের সাহায্যে তুলিবে ?

পঞ্চম অধ্যায়

১। রোগীর ঘরে যাহাতে ধূলা উড়িতে না পারে সেজন্য কিসের দ্বারা পরিষ্কার করিবে ?

২। রোগী কক্ষের মাপ কিরূপ হওয়া উচিত ?

৩। শিশু জন্মাইবার পূর্বে ও পরে মায়ের খাদ্যে যথাক্রমে কত ক্যালোরি থাকা উচিত ?

৪। শিশুর দাঁতের পুষ্টির জন্য কোন্ জাতীয় খাদ্যোৎপাদন প্রয়োজন ?

৫। শিশুর অস্থি গঠনের জন্য প্রধানতঃ কোন্ ভিটামিন দরকার ?

৬। ডি-ভিটামিনের অভাবে শিশুর কি রোগ হয় ?

৭। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সেবন করাইলে শিশুর কোন্ রোগ হইতে পারে না ?

৮। কোন্ কোন্ রাসায়নিক দ্রবণে ডিসকোস্ রেয়ন গাঢ় নীল হয় ?

৯। কোন্ অ্যাসিডের সংস্পর্শে পশম হলুদ বর্ণ ধারণ করে ?

১০। কতভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে নাইলন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় ?

১১। রেয়নের রাসায়নিক উপাদান কি কি ?

১২। তাপ সুপরিবাহী তন্তুগুলির নাম কর।

১৩। মথ পোকা কোন্ তন্তুর পোশাক কাটে ?

১৪। গৃহে পরিচ্ছদ পরিচালনার ভার কাহার উপর থাকা উচিত ?

১৫। কাপড়ে পোকায় না কাটিতে পারে এরূপ কোন্ দ্রব্য কাপড়ের ভিতর রাখিবে ?

১৬। শুষ্ক ধোলাইর পক্ষে প্রশস্ত এরূপ একটি তরলের নাম কর।

১৭। জ্যাভেলী অপসারক তৈরী করার নিয়ম কি ?

১৮। কয়েকটি উদ্ভিজ্জ দাগের নাম কর।

১৯। অক্সালিক অ্যাসিড সাধারণতঃ কোন্ দাগ তুলিতে সাহায্য করে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শিশুর জীবনের গল্পের প্রভাব আলোচনা কর।

২। জন্ম হইতে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কর।

৩। কৈশোর বয়স বলিতে কি বোঝ? কৈশোর বয়সের শিশুদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৪। বয়োঃসন্ধিকাল কাহাকে বলে? এই বয়সের বালক-বালিকাদের মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বর্ণনা দাও।

৫। বয়ঃ সন্ধিকালে কিশোরকে কিরূপ পরিবেশে রাখা উচিত? বিদ্যালয়ের পরিবেশ কিভাবে এই বয়সের কিশোর-কিশোরীকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে আলোচনা কর।

৬। উত্তর কৈশোর বলিতে কোন্ বয়সকে বুঝায়? উত্তর কৈশোরের ছেলে-মেয়েকে কিভাবে পরিচালনা করিতে হয় সে সম্বন্ধে তোমার মত প্রকাশ কর।

৭। বালক-বালিকার ভিতর অপরাধ প্রবণতার কারণ কি কি? অপরাধীদের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। মানসিক স্বাস্থ্য কাহাকে বলে? বালক বালিকাদের ভিতর মানসিক ব্যাধির কারণ কি কি? কয়েকটি মানসিক ব্যাধির নাম কর। মানসিক ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুদের কি ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

১। বিবাহ সংঘটনে প্রধান সমস্যা কি? গণপ্রথা কি ভাবে দূর করা যায়?

২। বিবাহ শব্দের অর্থ লিখ এবং বিবাহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর।

৩। বিবাহের প্রস্তুতি বলিতে কি বোঝ। কোন কোন্ অবস্থায় বিবাহ করা উচিত নয় আলোচনা কর।

৪। সন্তানের উপর পিতামাতার দায়িত্ব আলোচনা কর।

৫। পরিবারের উদ্ভব কিরূপে হইল তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কর।

৬। আর্য সমাজের পারিবারিক অবস্থা সমলোচনা কর।

৭। ব্রহ্মচর্য কাহাকে বলে? ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে এখনকার লোকের কি ধারণা।

৮। "পারিবারিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকিলে সংসারের শ্রী ও শান্তি বজায় থাকে"—আলোচনা কর।

৯। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ কর।

১০। মাতা পিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক কিরূপ হইলে সন্তানের পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা আলোচনা কর।

১১। শাস্তির কুফল কি কি ?

১২। "সংসারে ভাইবোনের সম্পর্ক একটি মধুর সম্পর্ক"—সমালোচনা কর।

১৩। দাসদাসীর প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত ?

১৪। পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে ? পরিবার পরিকল্পনা কেন হওয়া উচিত এবং জনসাধারণের এ বিষয় যথেষ্ট সচেতন হওয়া আবশ্যক কেন ? বহু সন্তানের সমস্যা কি কি ?

১৫। (ক) কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ জাতির ভিতর লোকসংখ্যা খুবই কম—উল্লেখ কর।

(খ) "পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য"—এই দুই-এর ভিতর যোগাযোগ কতটা ? যুক্তি সহ আলোচনা সহ।

———